প্রথম সংস্করণ—পৌষ, ১৩৪৮

প্রকাশক :

ডি. মেহ্‌রা

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা ৭০০ ০৭৩

৯৪ সাউথ মালাকা : এলাহাবাদ ২১১ ০০১

১০২ প্রসাদ চেম্বার্স : অপেরা হাউস : বোম্বাই ৪০০ ০০৪

৩৮৩১ পাতৌদি হাউস রোড : নতুন দিল্লী ১১০ ০০২

প্রচ্ছদশিল্পী

গণেশ বসু

মুদ্রক :

খুরসিদ হাসান

প্রিন্টওয়েল অফ্‌সেট

৩৮ ম্যাকলিওড স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০১৭

শ্রদ্ধেয় দাদাবাবু,

অধ্যাপক ডক্টর কালীপদ চক্রবর্তী,

এম, এস-সি., ডি. ফিল,.

মহোদয়েষু

## চন্দ্রালোকে

ফরাসী ধর্মযাজক মারিগঁকে বলা হোতো 'ঈশ্বরের প্রহরী'। সংগত ভাবেই তাঁর এই নামকরণ হয়েছিল। দীর্ঘ, শীর্ণকায় পুরোহিত। ধর্ম সম্বন্ধে পাগলামি কিছুটা থাকলেও তিনি ছিলেন স্পষ্টবক্তা উদারচেতা। তাঁর বিশ্বাসের মূলে ছিল স্থির প্রত্যয়। কোন বিশ্বাসই কখনও ভেঙে যেত না। ভগবানকে তিনি পুরোপুরি বুঝেছেন বলে ভাবতেন। ঈশ্বরের অভিপ্রায়, ইচ্ছা, বাসনা সবই তিনি জানতেন।

গ্রামের ছোট্ট কুটিরটির বাগানে পায়চারি করে বেড়াবার সময় তাঁর মনে প্রশ্ন জাগতো, 'কেন ভগবান ওটা সৃষ্টি করলেন?' তারপর নিজেকে মনে মনে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে একমনে কারণ অনুসন্ধান করতেন। আর প্রায়ই কারণটা খুঁজে পেয়েছেন মনে করে আত্ম-প্রসাদ লাভ করতেন। তিনি এমন লোক ছিলেন না যে ধর্মীয় বিনয়ে অভিভূত হয়ে মিন্ মিন্ করে উচ্চারণ করবেন: 'হে প্রভু, তোমার উদ্দেশ্য বোধের অতীত।' বরং বলতেন: 'আমি ঈশ্বরের সেবক। তাঁর কাজের উদ্দেশ্য আমার জানা উচিত। আর যদি নাই জানি তবে অন্তত অনুমান করা উচিত।'

তাঁর মনে হোতো প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর পেছনে রয়েছে সৃষ্টি-কর্তার প্রশংসনীয় এবং যথার্থ যুক্তি। 'যেহেতু' আর 'সুতরাং' এর মধ্যে সব সময়েই সমতা থাকে। ভ্রমণে আনন্দ দেবার জন্য উষা, ফসলের পরিপক্কতার জন্য দিন, সেচের প্রয়োজনে বৃষ্টি, নিদ্রাদেবীর আরাধনার হেতু সন্ধ্যা আর প্রশান্ত নিদ্রার জন্য সৃষ্টি হয়েছে রাত্রির আঁধার।

কৃষিকর্মের সব রকম চাহিদা মেটানোর জন্যেই চার ঋতু যথাযথ-ভাবে ঘুরে ফিরে আসে। প্রকৃতির কোন উদ্দেশ্য নেই অথবা যারা

জীবনের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়া ও বস্তুর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে, তাদের কোন লক্ষ্য নেই, এমন সন্দেহ তাঁর কখনও হোতো না।

কিন্তু স্ত্রীলোককে তিনি ঘৃণা করতেন। নিজের অবচেতন মন থেকে তাদের ঘৃণা করতেন। নারীর প্রতি বিদ্বেষ তাঁর সহজাত। প্রায়ই তিনি খৃষ্টের বাণীর পুনরাবৃত্তি করে বলতেন: 'স্ত্রীজাতি, তোমায় নিয়ে আমি কি করবো?' তারপর জুড়ে দিতেন: 'এ কথা সহজেই বলা যায় যে ভগবান তাঁর হাতের ঐ বিশেষ কাজের জন্য নিজেই অসন্তুষ্ট।' রমণীকুল সম্বন্ধে কবি মুখর। কিন্তু তাঁর কাছে তারা দ্বাদশবার অপরিষ্কৃত শিশুর মতোই নোংরা। এই ছলনাময়ীই সৃষ্টির প্রথম পুরুষকে ফাঁদে ফেলেছিল, এবং এখনও সেই জঘন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। নারী দুর্বল, কিন্তু ভয়ঙ্কর। রহস্যময়ী, বিপদ ঘটাতে সিদ্ধহস্ত। রমণীর বিষাক্ত সৌন্দর্যের চেয়ে প্রেমিকা হৃদয়টিকে পাদরী বেশী ঘৃণা করতেন।

মাঝে মাঝে রমণীর কমনীয়তা তাঁকে আকৃষ্ট করতো। তাঁর ধারণা ছিল উনি এসব আক্রমণের উর্ধ্বে। তবু ভালবাসার জন্য নারী হৃদয়ের সতত শিহরণ দেখে উত্তেজিত না হয়ে পারতেন না। তাঁর মনে হোতো পুরুষকে ছলনার দ্বারা পরীক্ষা করবার জন্যই ঈশ্বর স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন। প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন না করে নারীর কাছে যাওয়া উচিত নয়। কেননা, যে সমস্ত ভয় মানুষ মনের মধ্যে সযত্নে লালন করে, সেগুলো ধারে-কাছেই ওত পেতে থাকে। বস্তুত প্রসারিত বাহু আর উন্মুক্ত অধর দিয়ে মেয়েরা পুরুষের জন্যে ফাঁদ পেতে রেখেছে।

কেবল সন্ন্যাসিনীদের তিনি সহ্য করতে পারতেন। কেননা, তারা তাদের ব্রতে আত্মোৎসর্গ করে নির্দোষ হয়েছে। তবু তিনি তাদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করতেন। কারণ তাদের শৃঙ্খলিত অন্তর, সংযত হৃদয়ের অতল তলে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন শাশ্বত কোমলতা, যা তাঁর মতো পুরোহিতের হৃদয়কেও অহরহ স্পর্শ করতো।

তাঁর এক বোনের মেয়ে ছিল। কাছেই একটা ছোট বাড়িতে মায়ের সঙ্গে থাকতো। পাদরীর ইচ্ছা ছিল তাকে ধর্মীয় সংঘের সেবিকা করে নেবেন। সে সুন্দরী, চঞ্চলমতি আর বেপরোয়া। পাদরী ধর্মোপদেশ শোনালে সে হাসতো। যখন পুরোহিত তার ওপর রেগে যেতেন, সে তাঁকে বুকে জড়িয়ে প্রচণ্ডবেগে চুমু খেতে থাকতো। তখন পাদরী অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে তার বাঁহুবন্ধন থেকে মুক্তির চেষ্টা করতেন। অস্বীকার করার উপায় নেই, এতে একটা মিষ্টি আনন্দের স্বাদ ছিল। প্রত্যেক মানুষের মনে সুপ্ত পিতৃত্বের অনুভূতি তাঁর অন্তরেও জেগে উঠতো।

প্রান্তরের মধ্যে পায়ে-চলা পথে পাশাপাশি চলতে চলতে তিনি ভাগ্নীকে প্রায়ই ঈশ্বরের, তাঁর প্রভুর কথা বলতেন। কিন্তু শ্রোতার কানে খুব কমই প্রবেশ করতো। সে তখন আকাশে, তৃণপুষ্পে দুচোখ ভরে প্রত্যক্ষ করতো প্রাণের আনন্দ। কখনও কোন পতঙ্গ ধরবার জন্য ছুটোছুটি করতো। তারপর ধরে এনে চেঁচিয়ে বলতো: "দেখ মামা, এটা কি সুন্দর। আমার চুমু খেতে ইচ্ছা করছে।" পতঙ্গ বা সুন্দর ফুলকে চুম্বনের এই আকাঙ্ক্ষা দেখে পুরোহিত উদ্‌বিগ্ন, বিরক্ত, ও উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। কেননা, এর মধ্যে তিনি দেখতে পেতেন নারীমনের সেই অদম্য, শাশ্বত প্রেমপ্রবাহ।

পাদরী মেরিগঁর ঘর দেখাশোনা করতো কবর খোদাইকারের স্ত্রী। একদিন খুব গোপনে সে বললো তাঁর ভাগ্নীর প্রেমিক আছে।

তিনি ভয়ানকভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দাড়ি কামাতে গিয়ে সমস্ত মুখে সাবান লেগে গেল। ধাতস্থ হয়ে বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়ে চীৎকার করে বলে উঠলেন: "তুমি মিথ্যা বলছো মেলান! এ সত্য নয়।" কিন্তু গ্রাম্য স্ত্রীলোকটি বুকে হাত দিয়ে বললো: "যদি মিথ্যে বলে থাকি, প্রভু তার বিচার করবেন, মসিঁয়ো ল্য ক্যুরি। আমি বলছি, প্রতি রাতে আপনার বোন ঘুমিয়ে পড়লেই সে তার কাছে যায়। নদীর ধারে

ছু'জনে দেখা করে। কেবল দশটার পর থেকে মাঝরাতের মধ্যে সেখানে গেলে নিজেই সব দেখতে পাবেন।"

দাড়ি কামানো বন্ধ করে পাদরী ঘরময় অস্থির পদচারণা করতে লাগলেন। গভীব চিন্তার সময় তিনি এ রকমই করেন। যখন আবার কামাতে চেষ্টা করলেন, নাক থেকে কানের মধ্যে তিন জায়গায় ছড়ে গেল।

প্রচণ্ড বোষে ফুলে সমস্ত দিন তিনি গুম হয়ে রইলেন। প্রেমের তুর্জয় শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর যাজকীয় ঘৃণাবোধ তো ছিলই। তার ওপব এক্ষেত্রে প্রতারিত পিতা, বঞ্চিত শিক্ষক ও পরাভূত আত্মা-রক্ষকের সক্রোধ নৈতিক ঘৃণার সংমিশ্রণ ঘটলো। মা বাবাকে ছাড়াই, এমন কি তাদের পবামর্শ না শুনে মেয়ে যখন তার বব পছন্দ করেছে বলে ঘোষণা করে, তখন যেমন পিতামাতার অহমিকায় আঘাত লাগে, পাদরীরও ঠিক তেমনি তুঃখ হোলো।

ডিনাবের পব তিনি একটু পডাশোনা করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু মন বসলো না। রাগ তাঁব উত্তবোত্তব বেড়েই চললো। ঘড়িতে যখন ঠিক দশটা তিনি তাঁব লাঠিটা তুলে নিলেন। ওক কাঠের এই ভীষণ যষ্টিটি তিনি রাত্রিতে বোগী দেখতে যাবার সময়ই ব্যবহাব কবতেন। বজ্রমুষ্টিতে ধবে সেই ভয়ঙ্কর গদা ঘুরিয়ে তিনি শূন্যে বৃত্ত রচনা কবছিলেন আর হাসিমুখে তাই নিরীক্ষণ করছিলেন। এক সময়ে হঠাৎ ওটা তুলে দাঁতে দাঁত ঘষে নিচে একটা চেয়ারের ওপর সশব্দে নামিয়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটা পেছন থেকে তুভাগ হয়ে সজোবে মেঝেব ওপব পড়ে গেল।

বাইরে যাবার জন্য দরজা খুলতেই বিস্ময়ে থমকে তিনি দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লেন।

অত্যাশ্চর্য চন্দ্রালোক তাঁকে স্তব্ধ করলো।

এমন এক মহান চেতনায় তিনি উদ্ভাসিত হলেন যা কেবলমাত্র কল্পনাবিলাসী কবিদেরই শোভা পায়। গির্জার একজন পিতা হলেও

হঠাৎ তাঁর মন নরম হয়ে এলো। বিষাদময়ী রজনীর উদার স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

তাঁর ছোট উদ্যানে সারি সারি ফলের গাছগুলো স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করছিল। হালকা সবুজ তাদের সরু লম্বা ডালপালা দিয়ে পথের ওপর তারা ছায়ার আলপনা এঁকে রেখেছে। বাড়ির প্রাচীর বেয়ে ওঠা প্রকাণ্ড পুষ্পিত সুরভী লতার সুমিষ্ট গন্ধে নিঃশ্বাস পরিতৃপ্ত হচ্ছিল। উষ্ণ স্বচ্ছ রাত্রির বুকে সুরভিত আত্মার মতোই বিরাজমান প্রসন্ন চাঁদ।

তাঁর নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এলো। মাতালের মদ্যপানের মতো তিনি বাতাস পান করতে লাগলেন। ভাগিনেয়ীর প্রসঙ্গ প্রায় ভুলে গিয়ে বিমুগ্ধ আবিষ্টচিত্তে ধীরে ধীরে পথ চলতে শুরু করলেন।

উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে তিনি থেমে গেলেন। সমগ্র ক্ষেত্রটি জুড়ে মনোরম আলোর বন্যা। প্রশান্ত যামিনী নয়নাভিরাম শান্ত সৌন্দর্যে অবগাহন রত। মত্ত দাদুরীর কর্কশ গম্ভীর স্বরের ঐক্যতান শূন্যে উত্থিত হচ্ছে। চাঁদের আলোর প্রলোভনে ভুলে দূরের নাইটিঙ্গেল পাখির দল এমন বিশেষ সুরে গাইছে যা কোন ভাবনা নয়, কেবল স্বপ্ন এনে দেয়—এমন এক হালকা স্পন্দিত সুর যা চুম্বনের মতো কম্পমান।

২

যাজক চলতে শুরু করেন। তিনি জানেন না কেন তার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে আসছে। সহসা যেন নিজেকে তাঁর বড় শ্রান্ত দুর্বল মনে হয়। বসে পড়তে ইচ্ছা যায়। হ্যাঁ, ঠিক ওখানেই। বসে ভগবানের প্রতিটি কাজের জন্য প্রাণ খুলে সুখ্যাতি করতে সাধ হয়।

ঠিক তার নীচেই, ছোট নদীর বাঁক বরাবর দাঁড়িয়ে লম্বা একসার পপলার গাছ। নদীর ধারে, আশে পাশে আঁকাবাঁকা জলের ধার আবৃত করে রয়েছে এক রকম হালকা স্বচ্ছ ছিপিজাতীয় বস্তু। ওপরে বাতাসে ঝুলন্ত সূক্ষ্ম কুয়াশা। আর শুভ্র বাষ্পের মধ্যে চন্দ্রালোক পড়ে রূপোর মতো ঝক্‌মক্‌ করছে।

পুরোহিত আবার একবার থামলেন। হৃদয়ের গভীরে এ

জোরালো ও ক্রমবর্ধমান ভাবাবেগ তাঁকে অভিভূত করল। একটা সন্দেহ, অস্পষ্ট এক অস্বস্তি তাঁকে পেয়ে বসলো। তিনি বুঝতে পারলেন, সেই বহু পুরাতন প্রশ্নটি এখন তাঁর মনে আবার জেগে উঠেছে।

ঈশ্বর কেন এটা করলেন ? রাত্রি যদি কেবল নিদ্রা, নিশ্চেতনতা, বিশ্রাম এবং বিস্মরণের জন্য, তবে কেন তাকে দিনের চেয়ে মোহনীয়, উষার চেয়ে স্নিগ্ধ, সূর্যাস্তের চেয়ে মধুর করলেন ? কেন এই মন্দগতি মোহময় নক্ষত্রপুঞ্জ সূর্যের চেয়েও কাব্যময় ? কেন মনে হয় বিরাট জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অতি সূক্ষ্ম, রহস্যময় অস্তিত্বের ওপর খুব সাবধানে আলোকপাত করবার অভিপ্রায়েই এদের সৃষ্টি ? সবগুলো ছায়াকে উজ্জ্বল করতে কেন তারকারাজির আগমন ? কেন মধুকণ্ঠ বিহঙ্গ অন্যান্যদের মতো বিশ্রাম নিতে যায় না ? কেন অস্পষ্ট বিপজ্জনক আঁধারে বসে গান গাইতে থাকে ? কেন ধরিত্রী সুন্দরীর মাথাটি ঘিরে আধেক ঘোমটা টানা ? কেন হৃদয়ের এই স্পন্দন, প্রাণের আবেগ, দেহের অবসাদ ? রাত্রি যদি কেবল ঘুমই আনবে, মানুষ যদি নাই দেখবে, তবে কেন এই প্রলোভনের আড়ম্বর ? এই মহান দৃশ্যাবলী, এই স্বর্গ থেকে মর্ত্যে উপচে-পড়া কাব্যের বন্যা তবে কার জন্য ? যাজক এর কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না।

কিন্তু ততক্ষণে, নীচে চারণভূমির ধারে দুটো ছায়ামূর্তি দেখা দিয়েছে। উজ্জ্বল কুয়াশাসিক্ত তরুরাজির অর্ধবৃত্তাকার আচ্ছাদনের তলা দিয়ে তারা পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। পুরুষটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। একটি বাহু দিয়ে প্রেমিকার কণ্ঠ বেষ্টন করে সে ঘন ঘন তার ললাটে চুম্বন এঁকে দিচ্ছিল। চতুর্দিকের নিষ্প্রাণ প্রান্তর যেন ওরা প্রাণবন্ত করে তুলেছে। ওদের জন্যই যেন এই স্বর্গীয় পটভূমির সার্থকতা। মনে হচ্ছিল ওরা দু'য়ে মিলে এক। ওদের মিলিত সত্তার জন্যই বুঝি এই নিথর নিস্পন্দ রাতের সৃষ্টি। ওরা দু'জন পুরোহিতের প্রশ্নের জীবন্ত উত্তর, তাঁর জিজ্ঞাসার প্রভুপ্রদত্ত জবাব।

হতভম্ব, অভিভূত অন্তঃকরণে তিনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাইবেলের কোন কোন কাহিনীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য যেন তাঁর চোখে ধরা পড়লো। ধর্মগ্রন্থের সেই মহৎ অধ্যায়গুলোর—যেটির মধ্যে প্রভুর ইচ্ছানুসারে অনুষ্ঠিত রুথ এবং বোয়াজের প্রেমের দৃশ্য দেখা যায়, তার সঙ্গে তিনি এর মিল দেখতে পেলেন। তাঁর মাথা থেকে, শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হোলো—সকল সংগীতের সার অনন্ত সংগীত প্রবাহ, আকুল ক্রন্দনরোল, দেহের আহ্বান আর জ্বলন্ত প্রেমপ্রীতির কাব্য থেকে উৎসারিত আবেগোচ্ছল কবিতাধারা। তিনি নিজে নিজেই বললেন—'মানুষের ভালবাসা তাঁর ভাবাদর্শে আবৃত করবার জন্যই বোধহয় ভগবান এমন রজনীর সৃষ্টি করেছেন।'

বাহুবন্দী যুগলমূর্তির কাছ থেকে তিনি সরে এলেন। এখন নিজেকে প্রশ্ন করলেন, 'তিনি কি প্রায় ঈশ্বরকে অমান্য করতে যাচ্ছিলেন না? এমন দৃষ্টি-নন্দন পরিবেশ রচনা করে ভগবান কি প্রেম অনুমোদন করেননি?'

যেন এক মন্দিরে অনধিকার প্রবেশ করেছেন, এমনি বিস্ময়ে, লজ্জায় অভিভূত হয়ে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে এলেন।

# সুখ

চায়ের সময়। একটু আগেই ঘরে আলো দেওয়া হয়েছে। কুঠি বাড়িটি সাগরমুখী। আড়াল থেকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশ ভরে অরুণিম আভা। মনে হচ্ছে মুঠো মুঠো আবীর যেন ছড়িয়ে আছে, বিছিয়ে আছে। আর ভূমধ্য সাগর, একটুও ঢেউ নেই, বিন্দুমাত্র গতি নেই, শান্ত—অপস্রিয়মাণ দিনের শেষ আভায় তখনও জ্বলছে, প্রকাণ্ড একটা ঝকঝকে ধাতুখণ্ডের মতো পড়ে রয়েছে।

দূরে দক্ষিণে বন্ধুর পর্বতশ্রেণী পশ্চিমের ঈষৎ লাল রঙের বিরুদ্ধে তাদের কালো তীক্ষ্ণ চূড়াগুলি তুলে ধরেছে।

তাদের আলোচনার বিষয় ছিল প্রেম। যে ঘটনার কথা অতীতে আরও অনেকবার বলা হয়েছে তারই পুনরুল্লেখ হচ্ছিল। তাদের আলোচনার ওপর কোমল বিষাদঘন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, আর তারই ফলে তাদের হৃদয় বিষণ্ণ ভাবাবেগে অভিভূত হোলো। ছোট ঘরটা ভরে 'ভালবাসা' এই শব্দটা ধ্বনিত হোলো কখনও পরুষ কঠিন কণ্ঠস্বর থেকে, আবার কখনও রমণীর অসংকোচ উচ্চকণ্ঠে, এ যেন দ্রুতগতিতে ধাবমান এক ছোট্ট বিহঙ্গ, যেন তাদের চতুর্দিকে সঞ্চরমাণ এক অদৃশ্য শক্তি।

কেউ কি অনন্তকাল ধরে সীমাহীনভাবে ভালবেসে যেতে পারে?

কেউ কেউ বললে, হ্যাঁ পারে।

আবার কেউ বললে, না পারে না।

আলোচনা জমে উঠলো। তারা ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করলো। বিভিন্ন বিষয়গুলোর মধ্যে ব্যবধান পরিষ্কার করে বোঝালে। মনে হোলো গভীর হৃদয়াবেগ প্রত্যেকটি স্ত্রী পুরুষকে আচ্ছন্ন করেছে। ফেলে-আসা জীবনের নানা কথা তাদের জিভের ডগায় ভিড় করে আসছে কিন্তু অসংকোচে প্রকাশ করতে না পেরে অন্তরে

অস্বস্তি জমে উঠছিল। দুটি হৃদয়ের মধ্যে এই অলৌকিক সম্বন্ধ যা মহান অথচ অতি সাধারণ, তাই নিয়ে তারা গভীর আবেগ আর অতীব উৎসাহে আলোচনা করে চললো। সুদূরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো :

"ওই দেখুন! ওখানে ওটা কি?"

সমুদ্রের ওপর অস্পষ্টতার মধ্যে মস্ত এক ধূসর আকৃতিহীন বস্তু যেন জেগে উঠেছে।

মেয়েরা দাঁড়িয়ে উঠলো এবং নির্বোধের মতো ওই বিস্ময়কর বস্তুটার দিকে তাকিয়ে থাকল, কারণ এর আগে কেউ আর কখনও এটা দেখেনি।

আর একজন বললো : "ওই কর্সিকা, সাধারণভাবে ওর দেখা মেলে না। কেননা দূরের দৃশ্যাবলী কুয়াশার বাষ্পে আবৃত থাকে। বছরে মাত্র দু-তিনবার এই বাষ্পীয় আচ্ছাদন অপসারিত হয়। মুক্ত অম্বর তখন আর কিছুতেই ওকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। কেবলমাত্র সেই দুর্লভ আবহাওয়াতে ওর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।"

খুব অস্পষ্টভাবে পর্বতের শৃঙ্গগুলো দেখা যাচ্ছিল। তাদের ধারণা হোলো যে তারা চূড়ায় বরফ দেখতে পেয়েছে। একটা পৃথিবীর এমন আকস্মিক আবির্ভাব, সমুদ্রবক্ষে এই ভৌতিক জাগরণ সকলকে বিস্মিত বিরক্ত এবং ভীত করে তুলল। তাদের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস ফুটে উঠল। তারা ভাবল অদ্ভুত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দৈবাৎ কলম্বাসের মতো কে এমন করে সমস্ত জিনিস সাজিয়ে রেখেছে! একজন বৃদ্ধ যে এতক্ষণ চুপ করেই ছিলো, বললো : "এক্ষুণি আমাদের চোখের সামনে ভেসে-ওঠা ঐ আশ্চর্য দ্বীপটা আমার মনে একটা অদ্ভুত স্মৃতি এনে দিয়েছে, এই স্মৃতিকথা আমাদের আলোচনায় রসদ জোগাবে। ওই দ্বীপে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম বিশ্বস্ত ভালবাসা—এক অবিশ্বাস্য সুখী ভালবাসার নিখুঁত নিদর্শন" :

বছর পাঁচেক আগে আমি কর্সিকাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফ্রান্সের উপকূল থেকে মাঝে মাঝে ওকে দেখা যায়, যেমন আজকে যাচ্ছে। তবু ওই বন্য দ্বীপটা আমাদের কাছে আমেরিকার চেয়েও বেশি অজানা, তার চাইতেও অনেক দূরে।

কল্পনা কর সৃষ্টির আদিপর্বের সেই বন্য বসুন্ধরা; গভীর পরিখা বিভক্ত বিশৃঙ্খল পর্বতশ্রেণী। পাদদেশে যার উদ্‌বেলিত জলস্রোত। ভূমি কোথাও একটুও সমতল নয়, সর্বত্র উন্নত ঢেউ-খেলানো, চারদিকে শুধু বিশাল গ্রানাইট পাথরের তরঙ্গ। চারদিক গভীর জঙ্গলে আচ্ছাদিত, কোথাও বা বাদাম আর পাইন বনের প্রাচুর্য। যদিও পর্বতের ওপরে ঝুলে-থাকা স্তূপাকৃতি পাথরের মতো ওখানে একটা গ্রাম সাময়িক অস্তিত্ব নিয়ে টিঁকে ছিল, কিন্তু ওখানকার মৃত্তিকা কর্ষণের অভাবে ছিল কুমারী। ওখানে কোন শিল্প নেই, সংস্কৃতি নেই, কারখানা নেই। ওখানে কাঠে খোদাইয়ের কাজ হয় না। একখণ্ড পাথরেও কেউ ভাস্কর্যের নমুনা খুঁজে পাবে না; উজ্জ্বল-সুন্দর জিনিসে বংশগত উন্নত রুচির ছিটে-ফোঁটারও সন্ধান মিলবে না। ওই সুন্দর অথচ রুক্ষ দেশে কর্সিকাই একমাত্র লক্ষণীয় বস্তু। শিল্প বলে কথিত যে ঐন্দ্রজালিক সৌন্দর্য, তার অনুসন্ধানে এখানকার অধিবাসীরা পুরুষানুক্রমে উদাসীন।

শিল্প-সমৃদ্ধ প্রাসাদগুলি বুকে করে ইটালী সৃজন প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে আছে। মার্বেল পাথর, কাঠ, ব্রোঞ্জ, লোহা, বস্তুত সেখানে সব রকম ধাতু আর মূল্যবান পাথরেই মানুষের প্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত। এমনকি সেখানে বনেদি ঘরের কুলানুক্রমে সঞ্চিত তুচ্ছ কোন বস্তু অপার্থিব সৌন্দর্য প্রকাশ করে। ইটালী আমাদের কাছে মানুষের সৃষ্টিশীল বুদ্ধির তীব্র আবেগ, জৌলুস, শক্তি ও বিজয় বার্তা ঘোষণা করছে। তাই এ দেশ আমাদের কাছে পবিত্র এবং প্রিয়।

ইটালীর কাছাকাছি থেকেও কর্সিকা সৃষ্টির সেই আদিম স্তরেই রয়ে গেছে। মানুষ সেখানে শ্রীহীন ঘরে বসে করে, দিনগত পাপ

ক্ষয় আর পারিবারিক কলহের বাইরে কোন বস্তুতে তাদের আগ্রহ নেই। সকল অসভ্য দেশের সব দোষগুণ নিয়ে ও ওখানে বেঁচে আছে। কর্সিকা নিষ্ঠুর, প্রবলভাবে ঘৃণ্য। প্রকৃতিতে তার রক্ত-পিপাসা। আবার অতিথিবৎসল, উদার, সরল হৃদয়। দরদে ভরা অন্তর। সামান্যতম অনুভূতির বিনিময়ে একান্ত অনুগত। পথিকের জন্য বন্ধুত্বের বিনয়ে দ্বার অবারিত।

একমাস ধরে আমি এই অদ্ভুত দ্বীপে ঘুরে বেড়িয়েছি। মনে হচ্ছিল যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়ে পড়েছি। সেখানে কোন পান্থশালা নেই, মদের দোকান নেই, ভাল রাস্তা নেই। খচ্চর-চলা পথ দুমড়ানো আবর্তকে উপেক্ষা করে পর্বতের গায়ে লেপ্টে-থাকা গ্রামের দিকে চলে গেছে। সেই গভীর খাদ থেকে, পাহাড়ী স্রোতের গম্ভীর, চাপা, বিশাল গর্জন অহরহ সন্ধ্যার ধ্যান ভঙ্গ করে। শ্রান্ত মুসাফির ঘরের দরজায় করাঘাত করে এবং আগামী প্রভাত পর্যন্ত একটু মাথা গুঁজবার ঠাঁই ও একটু খাবার প্রার্থনা করে। নড়বড়ে টেবিলে উপবেশন আর শোচনীয় শয্যায় শয়ন এছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছুই জোটে না। সকালে সে গৃহস্বামীর প্রসারিত কর মর্দন করে আর গৃহস্বামী তাকে গ্রামের প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়। একদিন দশ ঘণ্টা হেঁটে উপস্থিত হলাম এমন এক সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় যার দূরত্ব সমুদ্র থেকে তিন মাইলের মধ্যে। উপত্যকার মধ্যে অনেকটা ভেতরে একটি মাত্র ছোট্ট কুঁড়ে। ঘরটির সামনে এসে দাঁড়ালাম। তখন সন্ধ্যা। ঝোপঝাড়ের জঙ্গল, বড় বড় পাথর আর লম্বা লম্বা গাছে ভর্তি পাহাড়ে খাড়াই দুটো দুদিক থেকে দেয়ালের মতো এই বর্ণনাহীন অবসাদগ্রস্ত খাদটাকে অন্ধকারে আড়াল করে রেখেছিল।

সেই ছোট কুটিরটির চারদিকে কিছু আঙ্গুর লতা, একটা ছোট বাগান আর কিছু দূরে কয়েকটা বাদাম গাছ। আসলে ওই দরিদ্র দেশে, শুধুমাত্র জীবন ধারণই যেখানে একমাত্র কাম্য, সেখানে এসব যথেষ্টই বলতে হবে।

যে মহিলাটি দরজা খুললেন তিনি বয়স্কা, কর্মঠ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যেটা ওখানে অস্বাভাবিক। একটি লোক বেতের চেয়ারে বসেছিল। আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। আবার একটিও কথা না বলে বসে পড়ল।

তার স্ত্রী আমাকে বললো; "অনুগ্রহ করে ওকে মার্জনা করুন। ও এখন কানে শুনতে পায় না। ওর বয়স বিরাশী।"

মহিলাটি বিশুদ্ধ ফরাসী বলছিলেন। আমি বিস্মিত হলাম।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম: "আপনি কি কর্সিকান নন?"

তিনি উত্তর দিলেন: "না। আমরা মূল ভূখণ্ড থেকে এসেছি। কিন্তু এখানে পঞ্চাশ বছর ধরে আছি।"

শহর থেকে, মানুষের জীবন থেকে এত দূরে এই অন্ধকার গর্তের মধ্যে পঞ্চাশটা বছর কেটে গেছে এই ভাবনায় আমার মন একটা বিরক্তি ও ভীতির ভারে ভরে গেল। এমন সময় একজন বয়স্ক মেষপালক ভেতরে এলো, আমাদের খেতে দিল। খাবারে অবশ্য একপদের বেশি দু পদ ছিল না। সে ব্যঞ্জনও আবার নিতান্ত সাদাসিধে। আলু, লবণাক্ত শূয়োরের মাংস আর কপি একসঙ্গে সেদ্ধ করা হয়েছে। এই অনাড়ম্বর খাওয়া হয়ে গেলে পব আমি এসে দরজার সামনে বসলাম।

দূরে নির্জনে বিষণ্ণ সন্ধ্যায় এমনিতেই অসহায় ভাবে পথিক মন অভিভূত হয়। আমিও এই প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারলাম না। ঐ নির্জন প্রকৃতির বিষণ্ণতায় হৃদয় আমার ব্যাকুল হোলো। মনে হচ্ছিল সব কিছু শেষ হয়ে আসছে, এই জীবন, এ বিশ্ব। ধাঁধান এক ঝলক আলোয় জীবনের গভীর দুঃখ যেন চোখের নামনে ভেসে উঠল। বস্তুর অসারত্ব, তার স্বাতন্ত্র্য, মানব হৃদয়ের বোবা একাকীত্ব, যা নিজেদের শান্ত রাখে আর আমৃত্যু অলীক স্বপ্নে মশগুল থাকে—সব যেন ছবি হয়ে দেখা দিল।

মহিলাটি আমার আছে এল, এবং নেহাত সংযত স্বভাব হলেও রমণীর স্বাভাবিক কৌতূহল নিয়ে বলল:

"আপনি তাহলে ফ্রান্স থেকে এসেছেন ?"

"হ্যাঁ, নিছক আনন্দের জন্যেই আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

"আপনি নিশ্চয় প্যারিস থেকে এসেছেন ?"

"না, নান্‌সি থেকে।"

শুনে এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় তাকে দগ্ধ হতে দেখলাম। কি করে দেখলাম, বা বুঝলাম, তা বলতে পারব না। ধীরে ধীরে বললে :

"আপনি নান্‌সি থেকে এসেছেন ?"

তার স্বামী দরজার কাছে এগিয়ে এলো। সাধারণ কালা লোকের মতো নির্বিকার। স্ত্রীলোকটি বলল : "ওতে কিছু হবে না। ও শুনতে পায় না।" তারপর একটু থেমে : "আপনি তবে নান্‌সির লোকদের চেনেন ?"

"কেন বলুন তো ? হ্যাঁ, প্রায় সবাইকেই চিনি।"

"সন্ত আলাজে পরিবারকে ?"

"হ্যাঁ, খুব ভালভাবে। তারা আমার বাবার বন্ধু।"

"আপনার নাম কি ?"

বললাম। সে সাগ্রহে আমার মুখ দেখল। মনে-পড়া স্মৃতির উৎসাহে খুব মরমী গলায় বলল : "ঠিক ঠিক আমার খুব ভাল মনে আছে। আর সেই ব্রিজেয়াঁভেস্‌দের খবর কি ?"

"তার কেউ আর এখন বেঁচে নেই।"

"আহা! আর সেই সারম্‌তঁদের চেনেন ?"

"খুব ; সবচেয়ে ছোটটি এখন মেজর জেনারেল।" কথাটা শোনামাত্র ভদ্রমহিলা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠল। আমি জানতাম না, কি এক জটিল, জোরাল আন্তর প্রেরণায়, অপ্রকাশ্যকে প্রকাশ করার ব্যাকুল বাসনায় সে অশান্ত হয়ে উঠেছে। জানতাম না, সেদিনের সেই মুহূর্ত পর্যন্ত তার হৃদয়ে সযত্নে লালিত গোপন সঞ্চয় উন্মুক্ত করে দেবার জন্য সে প্রস্তুত হচ্ছে। তার মনের পর্দায় যাদের ছবি অক্ষয় হয়ে আছে, তাদের কথা বলতে গিয়ে সে কেঁপে উঠলো। বলল : "হ্যাঁ, আঁরি দ্য সারম্‌তঁ, আমার খুব চেনা। ও আমার ভাই।"

আমি তখন বিস্ময়ে বোবা। ওর দিকে তাকালাম। হঠাৎ আমার মনে পড়লো। অনেক দিন আগে অভিজাত মহলে ভীষণ দুর্নাম রটেছিল। রূপবতী ধনী কন্যা সুজানে ছ সারমুঁ একজন নিম্নপদস্থ অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিল। মেয়েটির বাবা ঐ সৈন্য বাহিনীর প্রধান ছিল।

ছেলেটি সুদর্শন। সে চাষীর ছেলে। কিন্তু নীল রংয়ের বুকখোলা একটা জামা পরে সে বীরদর্পে চলাফেরা করতো। এই সৈন্যটি তার কর্নেলের মেয়েকে প্রলুব্ধ করেছিল। সেনাবাহিনী যখন কুচকাওয়াজ করে যেত, তখন নিশ্চয় মেয়েটি ছেলেটিকে দেখত, লক্ষ্য করত, এবং এই করেই তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু কী করে মেয়েটি তার সঙ্গে কথা বলতো, কী করে তাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়েছিল, মেয়েটি কী করে যে তার ভালবাসার কথা তাকে জানাল; এসব কেউ কখনও জানেনি।

কিছুই প্রথমে আঁচ করা যায়নি। একদিন সন্ধ্যায় সৈনিকটি মেয়েটিকে নিয়ে উধাও হলো। সবেমাত্র সেই দিনই তার চাকরির মেয়াদ শেষ হয়েছে। খোঁজা হয়েছিল। কিন্তু ওদের পাওয়া যায়নি। ওদের সম্বন্ধে কোন খবরই যখন পাওয়া গেল না, তখন সবাই ধরে নিল মেয়েটি মরে গেছে।

আজ এই অবস্থায় আমি তাকে এই অশুভ উপত্যকায় দেখতে পেলাম। আমি জবাব দিলাম :

"হ্যাঁ আমার ভাল মনে আছে। আপনি সেই মহামান্য সুজানে!"

সম্মতি জানালো। "ঠিক।" তার চোখে জল গড়িয়ে পড়ল। দরজার সামনে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা বুড়ো লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল : "ওই যে তিনি"।

আমার মনে হোলো সে এখনও লোকটাকে ভালবাসে। এখনও ভালবাসার অন্ধ দৃষ্টিতে ওকে দেখে। জিজ্ঞেস করলাম :

"আপনি নিশ্চয় সুখী হয়েছেন?"

সমস্ত অন্তর ঢেলে উত্তর করল : "নিশ্চয়, খুব সুখী। ও আমাকে খুব সুখী করেছে। আমার কখনও কোন অনুতাপ হয়নি।"

আমি কিছুটা দুঃখিত, বিস্মিত ও প্রেমের দুর্বার শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকালাম। এই ধনী নন্দিনী এই লোকটাকে, এই কৃষকটিকে অনুসরণ করেছে। তার এ জীবনে অন্য কোন আকর্ষণ নেই, বিলাস নেই, কোন রকম আনন্দের উপকরণ নেই। নিতান্ত সাদামাটা জীবন যাত্রায় তাকে অভ্যস্ত হতে হয়েছে। তবু এখনও লোকটিকে ও ভালবাসে।

পাড়াগাঁয়ের কর্ষণজীবীর স্ত্রী। পোশাকের মধ্যে আছে একটা মস্তকাবরণ আর মোটা কাপড়ের একটা জামা। আসবাব বলতে বসবার জন্য ওই বেতে-বোনা চেয়ার আর খাবার জন্য পাইন কাঠের একটা টেবিল। আলু, কপি আর শূয়োরের লোনা মাংসে তৈরী একটা ঝোল মাটির বাসনে ঢেলে খাওয়া, আর খড়কুটোর বিছানায় ঐ লোকটির পাশে ঘুমিয়ে পড়া। এ জীবনে তার অভিযোগ নেই।

ওই লোকটি ছাড়া অন্য কিছুর জন্য তার কখনও ভাবনা হয়নি। গয়না, ভাল পোশাক, ফ্যাশান, আরাম কেদারা, সুগন্ধি পর্দা-ঝোলান ঘর, অথবা শরীর এলিয়ে বিশ্রাম করবার সময়ে পায়ের নীচে কোমলতার অভাব কখনও তাকে দুঃখ দিতে পারেনি। ওই ব্যক্তিটি ছাড়া সে আর কখনও কিছু চায়নি। মানুষটা পাশে আছে, কাজেই আর কিছুই প্রয়োজন নেই।

প্রথম যৌবনে সে তার জীবন, তার বিশ্ব, এবং তাকে যারা মানুষ করেছিল, যারা তাকে ভালবাসত, সবাইকে ছেড়ে এসেছিল। এই লোকটির সঙ্গে একা সে এই জংলী পার্বত্য খাদে চলে এসেছে। ওই লোকটিই তার সব। সব আশা, স্বপ্ন, তার আজন্মের আকুল প্রতীক্ষার ধন, তার সারাজীবনের ভরসাস্থল।

ঐ বুড়ো লোকটাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার অস্তিত্বকে সুখে ভরিয়ে রেখেছে।

এর চেয়ে বেশি সুখী সে আর হতে পারত না। খড়ের গদির ওপর মহিলার পাশে শুয়ে ঐ বুড়ো সেনার নাক ঘোড়ার মতো ডাকল। সারারাত ধরে তাই শুনলাম। আমি ভেবে পেলাম না কী সুখে এই মহিলা এতদূর পর্যন্ত এর সঙ্গে এসেছে! তার এই সরল অথচ দুঃসাহসী মুখ, এত সামান্য উপকরণে এমন পরিপূর্ণ সুখ কী করে সম্ভব হোলো!

পরদিন সকালে বৃদ্ধ দম্পতির সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিলাম।

গল্পের বক্তা নীরব হলো। তখন এক মহিলা বললো: "আর যাই হোক, তার আদর্শ খুবই সস্তা, তার প্রয়োজন আদিম, জীবনের ওপর তার দাবি অত্যন্ত সরল। সে একটা বোকা মেয়ে, এতে সন্দেহ নেই।"

আর একজন মহিলা ধীর গলায় বললো: "তাতে কি এসে যায়? সে সুখী ছিল।"

সুদূরে পৃথিবীর প্রান্তে কর্সিকা নিজেকে গুটিয়ে নিল, সমুদ্রের মধ্যে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হোলো। তার বুকে আশ্রিত দুটো হতভাগ্য প্রেমিকের গল্প শোনাবার জন্যই যে প্রকাণ্ড ছায়ার আবির্ভাব ঘটেছিল, এবার আস্তে আস্তে অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল।

সেদিনও যথারীতি ঠিক চারটের সময় আলেক্জাঁদ্র তিন চাকার ঠেলাগাড়িটি নিয়ে মেরাম্বেলের ছোট বাড়িটির সামনে এসে হাজির হোলো। ডাক্তারের নির্দেশমতো প্রতিদিন সে তার পঙ্গু, বৃদ্ধা প্রভুপত্নীকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত বেড়িয়ে নিয়ে আসে।

হালকা গাড়িখানাকে সে টেনে এনে সিঁড়ির এমন এক ধাপে ঠেকিয়ে রাখল, যাতে বিশাল বপু বৃদ্ধাকে সহজেই তাতে তুলে নেওয়া যায়। বাড়ির ভেতর ঢুকতে গিয়ে বৃদ্ধ সৈনিকের ক্রুদ্ধ, কর্কশ কণ্ঠের গালিগালাজ তার কানে এলো। এ কণ্ঠস্বর পদাতিক বাহিনীর প্রাক্তন কাপ্তেন, গৃহস্বামী মেরাম্বেলের।

সঙ্গে সঙ্গে দরজার ঝন্ ঝন্, টেবিল-চেয়ার উল্টানোর হুড়দাড় আর ধুপধাপ পা ফেলার শব্দ শোনা গেল। ত.রপর সব চুপ চাপ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আলেক্জাঁদ্র ঘরে. দরজায় এসে দাঁড়ালো। তার সর্বশক্তি দিয়ে সে মেরাম্বেল গৃহিণীকে শক্ত করে ধরে একটার পর একটা সিঁড়ি নামিয়ে আনতে লাগল। কারণ এ পথটুকু হেঁটেই মহিলা অবসন্ন হয়ে পড়েছেন।

কিছুক্ষণ সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করে বৃদ্ধা গাড়িতে উঠে বসতে সমর্থ হোলেন। আলেক্জাঁদ্র পেছনের হাতল ধরে গাড়িটাকে ঠেলে নিয়ে চলল নদীতীরের দিকে।

এই পথেই তারা প্রত্যেকদিন ছোট শহরটি পার হয়ে যায়। পথের দুধারে কত লোক তাদের শ্রদ্ধা জানায়: অভিনন্দন সমান-ভাবেই দুজনের ওপর বর্ষিত হয়। কেননা, বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাকে সবাই সম্মান করে, ভালবাসে। আর প্রবীণ অশ্বারোহী সৈনিকটিকে সকলেই আদর্শ পরিচারক মনে করে। তার মুখমণ্ডল বেষ্টন করে রয়েছে পৈতৃক আমলের শুভ্র শ্মশ্রু।

পথঘাট জুড়ে জুলাই মাসের নিষ্ঠুর সূর্যের প্রচণ্ড তাণ্ডব, অকরুণ দাবদাহে নীচু ঘরবাড়িগুলো যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। পথপাশে দেওয়ালের ছায়ায় কুকুরের দল নিদ্রামগ্ন। আলেক্জাঁদ্র হাঁপিয়ে উঠেছে। তাই নদীতীরবর্তী তরুবীথিতে পৌঁছবার জন্য যথাসম্ভব দ্রুত পা চালিয়ে দিল। সাদা ছাতার আচ্ছাদনে মাদাম মেরাম্বেলের চোখ তন্দ্রায় ঢুলু ঢুলু। তার ছাতার প্রান্ত আলেক্জাঁদ্রর ভাবলেশ-হীন মুখের সামনে ইতস্ততঃ দুলছে।

লেবুবীথিতে গাড়ি ঢুকতেই পাতার ছায়া পেয়ে মাদামের আচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল। তিনি স্নিগ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন: "বাছা, অত জোরে চালিও না। এই গরমে মারা পড়বে যে।"

নারী হৃদয়ের করুণাবশতঃ নয়, বরং স্বাভাবিক স্বার্থপরতার জন্যই এখন তিনি আস্তে চালাতে বলছেন। কেননা, এতক্ষণে তাঁরা পাতার ছত্রছায়ায় এসে গেছেন।

পথের যেখানটায় পুরোনো লেবুগাছের শাখা পল্লবে চন্দ্রাতপ সৃষ্টি হয়েছে, তার পাশে দুটি উইলো ঝোপের মধ্য দিয়ে চঞ্চলা নাভেৎ বয়ে চলেছে। তার জলরাশি পাক খেয়ে খেয়ে রঙ্গভরে পাথরের গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে। কোথাও বা স্রোতের মুখে হঠাৎ বাঁক। স্পন্দমান তরঙ্গমালার মৃদু সংগীতধ্বনি সিক্ত, মন্থর, পরিশুদ্ধ বাতাসে ভেসে এসে ভ্রমণ উদ্যানটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে।

স্থানটির শীতল শ্যামল শোভা আস্বাদন করে মাদাম মেরাম্বেল উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন: "এখন বেশ ভাল লাগছে। কিন্তু দেখ, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠবার সময় উনি খাটের উল্টোদিক দিয়ে নামলেন।"

আলেক্জাঁদ্র জবাব দিল: "তাই নাকি, মাদাম!"

গত পঁয়তিরিশ বছর ধরে আলেক্জাঁদ্র ওদের কাজ করে আসছে। প্রথমে ছিল অফিসারের আরদালি, পরে সাধারণ খানসামা। তবু এদের ছেড়ে যেতে কখনও তার মন চায়নি। আর এই ছয় বছর ধরে এখন তার কাজ হয়েছে প্রভুপত্নীকে তিনচাকার গাড়িতে বসিয়ে

প্রতিদিন বিকেলে শহরের সরু পথ ধরে বেড়িয়ে আনা। এই দীর্ঘদিনের আনুগত্য, প্রাণঢালা সেবা আর প্রত্যহের সাহচর্যের ফলে অসহায় রমণী আর বৃদ্ধ ভৃত্যের মধ্যে সহজেই একটা আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মহিলা মমতাময়ী আর ভৃত্য শ্রদ্ধাপরায়ণ।

ঘরোয়া ব্যাপারগুলো নিয়ে তারা এমন ভাবে আলোচনা করে যেন দুজনে সমান। কাপ্তেনের খিট্‌খিটে মেজাজই তাদের আলাপের বিষয়বস্তু ও উদ্‌বেগের কারণ। উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে লোকটির শুরু হয়েছিল, কিন্তু দীর্ঘ কর্মজীবনে না হোলো পদোন্নতি, না পেল গৌরব। এই জন্যই জীবনে বিতৃষ্ণা।

মাদাম মেরাম্বেল আগের কথার জের টেনে বললেন: "হ্যা, ঠিক উল্টো দিক দিয়ে বিছানা থেকে নামলেন। আর দেখ, কাজ ছেড়ে দেবার পর থেকে প্রায়ই এ রকম করছেন।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলেক্‌জাঁদ্র কর্ত্রীর মনের কথা পূর্ণ করে দিল: "ওঃ! মাদাম বলতে পারেন—এ ভুল তাঁর রোজই হচ্ছে। এমন কি কাজ ছাড়ার আগে থেকেই এর সূত্রপাত।"

"ঠিকই বলেছ। কিন্তু বেচারীর ভাগ্য প্রসন্ন হোলো না। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে কাজে বীরত্ব দেখিয়ে পুরস্কার পেলেন। তাই স্বাভাবিক ভাবে ভেবেছিলেন অবসর নেবার আগে অন্তত কর্নেল হতে পারবেন। কিন্তু কুড়ি গড়িয়ে পঞ্চাশ হোলো, কাপ্তেনের ওপর আর উঠতে পারলেন না।"

"যাই বলুন মাদাম, দোষ তাঁর নিজের। ঘোড়ার চাবুকের মতো অত সুবোধ না হলে ওপরওয়ালারা তাঁকে আর একটু পছন্দ করতেন এবং তাঁর উন্নতির উপায়ও করে দিতেন। মেজাজ খারাপ করে তো লাভ নেই। উন্নতি করতে হলে লোককে খুশী করতেই হবে।"

"আমাদের সঙ্গে যে উনি ও রকম ব্যবহার করেন, সে না হয় আমাদেরই দোষ। তাঁর সঙ্গে আমরা না হয় মানিয়েই চলছি। কিন্তু অন্যে তা শুনবে কেন।"

মাদাম মেরাম্বেল চিন্তায় ডুবে গেলেন। বছরের পর বছর

প্রত্যেকদিন তিনি স্বামীর নিষ্ঠুরতার কথা ভেবেছেন। কতকাল আগে তিনি এই লোকটাকে বিয়ে করেছিলেন। তখন সে ছিল তরুণ বয়সে পুরস্কার-পাওয়া এক সুদর্শন অফিসার। সবাই বলতো ওর ভবিষ্যত উজ্জ্বল। জীবনে কি চরম ভুলই না লোকে করে! শান্তভাবে তিনি বললেন: "কিছুক্ষণের জন্য একটু থাম না আলেক্জাঁদ্র। তোমার জায়গাটিতে বসে একটু বিশ্রাম করে নাও।"

ছোট একটা কাঠের আসন, অর্ধেকটা আবার পচে গেছে। রোববারে যারা বেড়াতে আসে, তাদের জন্য তরুবীথির একটা মোড়ে পাতা রয়েছে। এ পথে এলে আলেক্জাঁদ্র ওর ওপর বসে একটু জিরিয়ে নেয়।

বসে পড়ে আলেক্জাঁদ্র সহজ গর্বের ভঙ্গীতে তার সাদা ধবধবে, মসৃণ, দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল। প্রান্তভাগ মুঠো করে ধরে পেটের ওপর ছুঁইয়ে দিল। যেন কত লম্বা হয়েছে তাই দেখাতে চায়।

হারানো কথার খেই ধরে মাদাম মেরাম্বেল বলতে থাকলেন: "আমি ওকে বিয়ে করেছি, কাজেই ওর অত্যাচার সহ্য করব এটাই রীতি। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না আলেক্জাঁদ্র, তুমি কেন ভাল মানুষের মতো মুখ বুজে ওকে সহ্য করছ!"

এতটু মাথা ঝাঁকিয়ে সে উত্তর করল: "ওফ্! আমি···আমার কথা থাক মাদাম।"

"সত্যি বলছি। আমি প্রায়ই ভাবি, যখন আমাদের বিয়ে হয়, তুমি সাহেবের আরদালি ছিলে। ওকে না মেনে তোমার উপায় ছিল না, কিন্তু এত কম বেতন আর এমন দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও সেই তখন থেকে কেন আমাদের সঙ্গে রয়ে গেলে? আর দশজনের মতো তুমিও তো ঘর বাঁধতে পারতে, বিয়ে থা করে, ছেলেপুলে নিয়ে সংসারী হতে পারতে?"

সে আবার বললে: "আমার কথা ছেড়ে দিন, মাদাম। সে অন্য কথা।" মুখের কথা ফুরোলো। তার লম্বমান দাড়ি ধরে সে সজোরে

টানতে লাগল। এগুলি যেন হাতুড়ির মতো তার হৃদয়ের কোথায় ঘা মেরে চলেছে। তাই সে সব গুলোকে উপড়ে ফেলতে চায়। তার ব্যথিত দৃষ্টিতে বিব্রতভাব ফুটে উঠল।

মাদাম মেরাম্বেল তাঁর নিজের কথাই বলে যেতে লাগলেন : "তুমি তো চাষা নও, তুমি লেখাপড়া শিখেছ..." বাধা দিয়ে সে সগর্বে বলল : "জমি জরিপের কাজ শিখেছিলাম।"

"তবে জীবনটা নষ্ট করে তুমি আমাদের কাছে কেন থাকলে ?"

তো তো করতে করতে সে বলল : "কেন! কেন! এ আমার স্বভাবের দোষ।"

"স্বভাবের দোষ, তার মানে কি ?"

"হ্যাঁ, যখন কারও প্রতি আমি অনুরক্ত হই, চিরকালের জন্যই হই। বাস, ফুরিয়ে গেল।"

মাদাম হাসলেন। "দেখ, মেরাম্বেলের দয়া আর ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়ে তুমি সারাজীবন তার অনুরাগী হয়ে রইলে—এ কথাই কি আমায় বিশ্বাস করতে বলছ ?"

আলেক্জাঁদ্রকে খুব বিচলিত দেখাল। সেই ভগ্ন আসনটির ওপর সে চঞ্চল হয়ে নড়ে চড়ে বসল। অস্থিরভাবে ঘন গোঁফের ফাঁক দিয়ে বিড় বিড় করে বলল : "তার নয়, আপনার!"

ভদ্র মহিলার মিষ্টি মুখখানা হঠাৎ চমকে উঠল। বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তিনি ভৃত্যের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তার মস্তকে সযত্ন বিন্যস্ত তুষার শুভ্র কুঞ্চিত কেশদাম রাজহংসের ডানার মতো শোভা পাচ্ছিল।

"আমাকে ? হায় ভাগ্য! এ তুমি কি বলছ আলেক্জাঁদ্র ?"

গোপন কথা স্বীকার করতে বাধ্য হলে মুখচোরা লোক যেমন করে থাকে, তেমনি ভাবে সে প্রথমে শূন্যের দিকে, তারপর ডাইনে বাঁয়ে সুদূরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিল। তারপর গুলি-খেতে-প্রস্তুত সৈনিকের মতো মরিয়া হয়ে বলল : "ব্যাপারটা হয়েছিল কি, প্রথমবার আমি লেফ্‌তেনান্তের একটি চিঠি আপনার কাছে নিয়ে গেলাম।

আপনি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসেছিলেন আর এক ফ্রাঁ পুরস্কার দিয়েছিলেন। তখন থেকেই ঠিক হয়ে গেল।"

সঠিক বুঝতে না পেরে তিনি আগ্রহ দেখিয়ে বললেন :

"বল, কি ঠিক হয়ে গেল, বুঝিয়ে বল ?"

অপরাধ স্বীকার করার পর নিস্তারের কোন পথ নেই ভেবে অপরাধী যেমন আতঙ্কে অধীর হয়ে পড়ে, আলেক্জাঁদ্র তেমনি ভয়ে বিবশ হয়ে এক ঝোঁকে বলে ফেলল : "তখন থেকেই আমি মাদামের প্রতি আকৃষ্ট। তখন থেকেই।"

তিনি কোন কথা বললেন না, তার দিকে তাকালেনও না। এত দিনকার সব ঘটনা মনে মনে আগাগোড়া সাজিয়ে দেখলেন, তিনি চিরকালই দয়ালু, সরল, ভদ্র, যুক্তিবাদী ও সদাশয়।

এক মুহূর্তে মাদাম এই হতভাগা মানুষটার একনিষ্ঠ আত্মত্যাগের মহিমা উপলব্ধি করলেন, মুখ ফুটে কখনও সে কিছু চায়নি। একটি কথা বলেনি। কেবল একটু সান্নিধ্যের লোভে সারাটা জীবন উৎসর্গ করেছে। তাঁর বুক ফেটে কান্না এল।

না, রাগ বিদ্বেষ নয়, শুধু গম্ভীর হয়ে বললেন : "চল, ফেরা যাক্।"

সে উঠে দাঁড়ালো। ত্রিচক্র যানের পেছনে গিয়ে হাতল ধরে ঠেলতে লাগল।

গাঁয়ের কাছাকাছি আসতেই পথের মাঝেই কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা। তাদের দেখে কাপ্তেন এগিয়ে এলেন। কাছে এসে স্রেফ ঝগড়ার মতলবে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন : "আজ রাতে কি কি খাওয়া হবে ?"

"মুরগী আর ফ্লেজোলেতস্।"

শোনামাত্র তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন মহামান্য সাহেব : "শুধু মুরগী, মুরগী আর মুরগী ! চুলোয় যাক্ তোমার মুরগী, ওই মুরগী আমি অনেক সয়েছি। আচ্ছা, মুরগী ছাড়া আর কিছু কি তোমার মাথায় আসে না ? প্রতিটা দিন আমাকে ওই একঘেয়ে অখাদ্য খাইয়ে মারবে ?"

হাল ছেড়ে দিয়ে মাদাম বললেন : "কিন্তু লক্ষ্মীটি, তুমি তো জানো ডাক্তার তাই বলেছে। তোমার হজমের পক্ষে ওটাই সবচেয়ে ভাল। আরও তো অনেক জিনিস রয়েছে। তোমার হজমের গোল-মাল না হলে নিশ্চয়ই দিতাম।"

এবার আরও ক্ষেপে গিয়ে কাপ্তেন খেঁকিয়ে উঠলেন : "আমি যদি অসুস্থ হয়ে থাকি তো তার জন্য এই পাজিটাই দায়ী। একটানা পঁয়তিরিশটি বছর ধরে বাজে রান্না খাইয়ে ওই বদমাসই আমার হজমের বারোটা বাজিয়েছে।"

চক্ষের পলকে মাথা ঘুরিয়ে মাদাম মেরাম্বেল বৃদ্ধ ভৃত্যটির দিকে তাকালেন। মুহূর্তের জন্য চার চক্ষু মিলিত হল। সেই দৃষ্টিতে প্রকাশ পেলো উভয়ের পারস্পরিক সান্ত্বনাময় কৃতজ্ঞতা।

# শেলী

অ্যাডমিরাল ছ লা ভালে যিনি আরাম কেদারায় গা ঢেলে আধো ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন, বৃদ্ধা রমণীর মতো ধরা গলায় বলে উঠলেন:

"আমার জীবনে একবার একরত্তি রোমাঞ্চকর প্রেম এসেছিল, অতুলনীয় সে কাহিনী। শুনবে ?"

বিশাল আরাম কেদারার গর্ভ থেকে তার গলা ভেসে আসছিল, ঠোঁটে লেগে ছিল সেই চিরন্তন শুকনো কুঞ্চিত হাসি, যে হাসি ভলতেয়ারের মতো—লোকে যাকে ভয়ঙ্কর নাস্তিকতা বলে ভুল করে।

১

"আমার বয়স তখন তিরিশ, নৌ-বাহিনীর ফার্স্ট লেফতেনান্ত। মধ্যভারতে জ্যোতির্বিদ্যার এক অভিযানের ভার পড়ল আমার ওপর। কাজ চালিয়ে যাবার জন্য ইংরেজ সরকার যাবতীয় দরকারী উপকরণ যুগিয়েছিলেন, আর আমিও কাল বিলম্ব না করে জনাকয়েক সাহায্যকারী নিয়ে সেই বিশাল, অদ্ভুত, আশ্চর্য দেশে পাড়ি জমিয়েছিলাম।

"সেই ভ্রমণ কাহিনীর বর্ণনা দিতে গেলে আমায় দশ খণ্ড মহাভারত লিখতে হবে। রূপকথার মতো সুন্দর সব জায়গায় ফুটফুটে সুন্দর রাজপুত্রেরা ঘটা করে আমায় অভ্যর্থনা জানাতো, নানা ভাবে আপ্যায়ন করত। এভাবে ছ'মাস কোথা দিয়ে যে কেটে গেল, টেরই পেলাম না। যেন কল্পনার পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে পরীদের রাজ্যে ঘুরে বেড়ালাম। আদিম অরণ্যের বুকে বিস্ময়কর সব ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করলাম, যার আকৃতি পর্বতের মতো বিরাট কিন্তু গায়ে গহনার মতো কমনীয় কারুকাজ, ঝালরের মতো সূক্ষ্ম নক্সা। জীবন্ত নারীর সান্নিধ্যে যেমন ইন্দ্রিয় সুখ, ঐ প্রকাণ্ড স্বর্গীয় সৌধশ্রেণীর গঠন

সৌন্দর্যে তেমনি দেহ মনে রোমাঞ্চ জাগে। ভিক্তর হুগোর মতো বলতে হয়: পুরোপুরি জেগে থেকেও আমি স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করছিলাম।

"ভ্রমণের শেষ দিকে গনর্দ-এ এসে পৌঁছলাম। মধ্যভারতের এই শহরটি এককালে বর্ধিষ্ণু ছিল, কিন্তু এখন পড়ন্ত দশা। বিত্তবান, স্বেচ্ছাচারী, দুর্দান্ত, দয়ালু এবং নিষ্ঠুর এক রাজপুত্র ছিল ওখানকার শাসনকর্তা। তার নাম ছিল রাজা মদন। নির্ভেজাল এক প্রাচ্য রাজা, মার্জিতরুচি এবং বর্বর, অমায়িক এবং রক্তলোলুপ, নারীসুলভ কোমলতা ও নিষ্করুণ হিংস্রতার মিশ্র সংস্করণ।

"এক উপত্যকার পাদদেশে, একটি ছোট হ্রদের ধারে শহরটির অবস্থান। হ্রদটি ঘিরে রয়েছে অনেকগুলো প্যাগোডা—স্নিগ্ধ শীতল জলে যাদের দেয়ালগুলো অহরহ স্নান করছে। দূর থেকে দেখলে শহরটিকে দেখায় যেন একটি শ্বেত বিন্দু। যতই কাছে এগিয়ে যাওয়া যায়, বিন্দুটি ক্রমশ বড় হতে থাকে, ক্রমে ক্রমে চোখে পড়ে গম্বুজ এবং প্রাসাদ চূড়া, ভারতীয় স্তম্ভ-শীর্ষের সরু এবং স্বাভাবিক সৌষ্ঠব।

"শহরের প্রবেশ তোরণ তখনও ঘণ্টাখানেকের পথ; দেখলাম, একটি সুসজ্জিত হাতিকে ঘিরে একদল রক্ষী অপেক্ষা করছে, আমাকে সম্মান দেখানোর জন্য রাজা পাঠিয়েছেন। মহা সমারোহে আমাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হোলো।"

"পথের ধড়াচূড়ো ছেড়ে উৎসবের পোশাক পরে নেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু রাজকীয় অধৈর্য সেই সময়টুকু দিতে নারাজ। তার সবুর সইছিল না। আমার সঙ্গে পরিচয় করে তার সম্বন্ধে আমার মনোভাব জেনে নেবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন!"

"একটা বড় হল ঘরের মধ্যে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। ঘরটির চারদিক ঘিরে রয়েছে গ্যালারি। পথের দু'পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে জমকালো উর্দিপরা সৈন্যদল, ব্রোঞ্জের মতো উজ্জ্বল তাদের গায়ের রঙ্। দামী পাথর খচিত দর্শনীয় পোশাক পরা রাজপুরুষেরা চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।'

"সামনে চেয়ে দেখলাম একতাল জ্যোতিঃপুঞ্জ ; আমাদের দেশে পার্কে যে ধরনের হেলান দেবার অংশবিহীন বেঞ্চ পাতা থাকে, সে রকম একটি খোলা বেঞ্চের ওপর অস্তগামী সূর্যের মতো উজ্জ্বল একটি অবয়ব স্থাণুর মতো স্থির হয়ে আছে, আমারই জন্য স্বয়ং রাজা নিশ্চল হয়ে অপেক্ষা করছেন। খাঁটি মুগা রঙের পোশাক তাঁর পরনে, তাঁর দেহে যে মণিমুক্তো শোভা পাচ্ছিল, তার দাম কম করেও দশ থেকে পনের হাজার ফ্রাঁ হবে। এছাড়া তাঁর ললাটে জ্বলছে দিল্লীর বিখ্যাত তারকা—যা বরাবরই মুন্দোরের স্বনামধন্য পরিয়ারা রাজবংশের সম্পত্তি। আমার গৃহস্বামী সেই বংশেরই একজন উত্তরাধিকারী।

"রাজার বয়স পঁচিশ বছর হবে। বনেদি হিন্দু হলেও তাঁর ধমণীতে কিছুটা নিগ্রো রক্ত মিশেছে বলে মনে হয়। আয়ত দুটি চোখের দৃষ্টি প্রায় স্থির, দুর্বোধ্য। ঠোঁট দুটি পুরু, দাড়ি কোঁকড়ানো, ঢালু কপাল। থেকে থেকে তিনি যখন যন্ত্রের মতো হেসে উঠছিলেন, ঝকঝকে সাদা দাঁতের পাটি ঝিলিক দিয়ে উঠছিল। উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাতে ঝাঁকানি দিয়ে তিনি ইংরেজী কায়দায় করমর্দন করলেন। তারপর তাঁর পাশে আমাকে বসতে বললেন। বসার বেঞ্চটা এত উঁচু যে আমার পা দুটো মেঝেতে ঠেকাতে পারছিলাম না, ফলে বসে আরাম পাচ্ছিলাম না।

"সময় নষ্ট না করে পরদিনই তিনি বাঘ শিকারে যাবার প্রস্তাব দিলেন। শিকার এবং যুদ্ধ তাঁর প্রধান নেশা। এছাড়া অন্য কিছুতে লোকে যে কি আমোদ পায়, তিনি ভেবে পান না। তাঁর সঙ্গ লাভের জন্য এবং তাঁকে একটু আনন্দ দেবার জন্যই যে আমি এতটা পথ ঠেঙিয়ে এসেছি, এ বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ হল না।

"রাজার সাহায্য আমার প্রয়োজন ছিল। তাই তাঁর প্রস্তাবে উৎসাহ দেখাতে হোলো। ফলে রাজা এত খুশী হলেন যে তক্ষুণি মল্লযুদ্ধ দেখাবার জন্য আমায় রাজবাড়ির ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে নিয়ে হাজির করলেন।

"রাজার হুকুম পেয়ে দুজন শিক্ষিত মল্লবীর বেরিয়ে এল। প্রায়

উলঙ্গ দুই যোদ্ধা, হাতে ইস্পাতের বাঘ-নখ পরা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লোহার থাবা দিয়ে প্রতিপক্ষের দেহে আঘাত হানতে লাগল। তাদের শরীরের কালো চামড়া ফুঁড়ে ফিন্‌কি দিয়ে লাল তাজা রক্ত বেরিয়ে এল।

"বহুক্ষণ ধরে লড়াই চলল। যতক্ষণ না লড়িয়েরা ধারাল নখর-অস্ত্র দিয়ে পরস্পরের মাংস খুবলে খেলো, যতক্ষণ না তাদের শরীর একতাল রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত হোলো—লড়াই থামল না। একজনের চোয়াল উড়ে গেল, অপরের কান হলো তিন টুকরো।

"হিংস্র উল্লাসে রাজপুত্রের চোখ জ্বলতে লাগল, বন্য আনন্দে গলা থেকে ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ বেরিয়ে এল, উৎসাহের আতিশয্যে তিনি ওদের অঙ্গভঙ্গী নকল করতে করতে ক্রমাগত চেঁচিয়ে যাচ্ছিলেন: 'লাগাও, জোরসে লাগাও।'

"প্রতিদ্বন্দ্বী একজন জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লে পরে তাকে ক্রীড়ামঞ্চ থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হোলো। আর এত তাড়াতাড়ি লড়াইটা শেষ হয়ে গেল বলে রাজা আপসোস করলেন।

"আমার মতামত জানবার জন্য রাজা আমার দিকে ফিরে তাকালেন। মনে মনে বিরক্ত হলেও সোচ্চারে তারিফ করলাম। তখন রাজা আমাকে কুচ-মহলে ( আনন্দ পুরী ) নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। ওখানেই আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

"এই 'মণিময়' মহলটি রাজ-উদ্যানের শেষপ্রান্তে অবস্থিত। পবিত্র 'বিহার' হ্রদের জল থেকে গেঁথে তোলা হয়েছে এই প্রাসাদের এক-দিকের দেওয়াল। চতুষ্কোণ ঘরটির তিনদিকে সুবিন্যস্ত নক্সাকাটা স্তম্ভের মাথায় অনুপম গ্যালারী। প্রতি কোণে ভারহীন উঁচু নীচু গম্বুজ একক বা জোড় বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে; তাদের প্রতিটির গড়ন পৃথক; যেন প্রাচ্যের অতুলন স্থাপত্য বুকে প্রস্ফুটিত গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। প্রতিটি গম্বুজের ওপর শৌখিন আধুনিকাদের টুপির মতো বৈচিত্র্যময় আচ্ছাদন।

"এই অট্টালিকার মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড গম্বুজের চূড়া নারী-

বক্ষের মতো সুডৌল গোলাকৃতি হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তার পাশেই রয়েছে একটি সুন্দর ঘড়ি-ঘর। কুচ-মহলের আগাগোড়া নিখুঁত আরবীয় স্থাপত্য রীতিতে খোদাই-করা নক্সা-কাটা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কমনীয় মনুষ্য দেহের অনড় মিছিল ; পাথরের বুকে তাদের ভাবভঙ্গী ও অঙ্গবিন্যাস ভারতীয় রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের পরিচয় দেয়।

"জানালার মাথায় ধনুকের মতো বাঁকা খিলান, তার ভেতর দিয়ে বাগান চোখে পড়ে। জানালা দিয়ে আলো এসে ঘরগুলো আলোকিত করে। মার্বেল পাথরের ওপর নানা রঙের অনিকস্, অকীক ও নীলকান্ত মণি খোদাই করে মেঝেতে ফুলের তোড়ার নক্সা আঁকা হয়েছে।

"তখনও আমার স্নান সারা হয়নি, হরিবদ নামে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এসে জানালো মহামান্য রাজা বাহাদুর আমার ঘরে পদধূলি দেবেন। রাজা এবং আমার মধ্যে যোগাযোগ রাখার জন্য এই হরিবদকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

"জাফরান রঙের রাজা এসেই আবার আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। তারপর হাজারো বিষয়ে নানা কথা বলতে বলতে আমারও মতামত জানতে চাইলেন ; যাতে আমি একটু ফাঁপরেই পড়লাম। তারপর বাগানের অপর প্রান্তে প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখাতে চাইলেন।

"পাথরের রাজ্য, পালে পালে বানর সেই রাজ্যের বাসিন্দা। আমাদের এগিয়ে যেতে দেখে পুরুষগুলো পাঁচিলের ওপর দৌড়তে দৌড়তে আমাদের কুৎসিত ভাবে মুখ ভেংচাতে লাগল, আর মেয়েগুলো বাচ্চা বুকে করে ভয়ে পালিয়ে গেল। রাজা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে আমার বাহুতে চিমটি কেটে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই বসে পড়লেন। মুখ ভরতি সাদা দাড়িওয়ালা অগুনতি বানর পাঁচিলের ওপর, এবং প্রতিটি উঁচু জায়গায় আমাদের ঘিরে বসে জিভ বার করে ভেংচালো, হাতে মুঠো পাকিয়ে ঘুষি দেখালো।

"অনেকক্ষণ ধরে এসব দেখাবার পর জাফরান-রঙ রাজা উঠলেন এবং গাম্ভীর্য বজায় রেখে আমার পাশে পাশে হেঁটে চললেন। প্রথম দিনেই আমাকে এমন একটা দৃশ্য দেখাতে পেরেছেন বলে রাজা বেশ খুশী বলে মনে হো'লা। আমার সম্মানে পরদিন বাঘ শিকারে যাবার কথাটাও আর একবার মনে করিয়ে দিলেন।

"কেবল পরদিনই নয়, পর পর একনাগাড়ে বিশ দিন আমি তাঁর শিকারের সঙ্গী হলাম। ঐ তল্লাটে যত রকমের জীবজন্তু পাওয়া যায়, সব আমরা শিকার করলাম। চিতাবাঘ, ভাল্লুক, হাতি, হরিণ, কুমীর—বলতে গেলে তামাম দুনিয়ার অর্ধেক জানোয়ার। এত রক্ত দেখে আমার বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল এবং এই ধরনের একঘেয়ে আমোদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

"অবশেষে রাজপুত্রের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল এবং আমার সবিশেষ অনুরোধে কাজ করবার জন্য কয়েকদিনের অবসর দিলেন। এই সময়টা দামী দামী উপহারের বোঝা আমার ওপর চাপিয়েই তাঁর সাধ মেটাতে লাগলেন। মণিমুক্তো, সুন্দর শিল্প সম্ভার, এবং নিপুণ হাতে তৈরি মৃত জন্তু জানোয়ারের নানা ধরনের খোলস হরিবদ আমার জন্য বয়ে নিয়ে আসত। মনে যাই থাক না কেন, উপহার হাতে তুলে দেবার সময় লোকটা এমন ভক্তি গদ্‌গদ ভাব দেখাতো, যেন আমি স্বয়ং সূর্যঠাকুর—আকাশ থেকে নেমে এসেছি।

"প্রতিদিন ভৃত্যরা মিছিল করে আমার জন্য নিয়ে আসত ব্যঞ্জন—যা একমাত্র রাজ পাতে পরিবেশনের জন্যই বিশেষ ভাবে রাঁধা হোতো। ঢাকনা দেওয়া পাত্রে থরে থরে সাজানো নানা স্বাদের, নানা গন্ধের রাজ ভোগ। আমার জন্য প্রতিদিন নিত্য নতুন আমোদ আহ্লাদের জোগান দিয়েও রাজা অশেষ আনন্দ পেতেন: বাঈজীর নাচ, জাদুকরের ভেল্কিবাজী, সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ—একের পর এক লেগেই থাকত। নিজের দেশের সবটুকু সৌন্দর্য ও বৈভব আমাকে দেখাবার জন্য রাজার মনের যে ব্যাকুলতা—তাতে ব্যথা দেবার ইচ্ছে ছিল না বলেই সব কিছুতেই দারুন খুশী হবার ভান করতাম।

"একা থাকার একটু ফুরসত পেলেই কাজে মন দিতাম নয়ত বানর-পাল দেখতে চলে যেতাম ; ওদের মহামান্য প্রভুর চেয়ে ওদের সঙ্গেই আমার সময় কাটতো ভাল।

"একদিন সন্ধ্যেবেলা বেড়িয়ে ফিরেছি, দেখি হরিবদ আমার গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। গলায় রহস্য ঢেলে সে বলল, রাজা আজ একটা নতুন ধরনের উপহার পাঠিয়েছেন, ঘরে গেলেই নাকি দেখতে পাব। এই উপহার পাঠানোর কথা এতদিন মনে পড়েনি বলে রাজা দুঃখ প্রকাশ করেছেন, এমন একটি বস্তু থেকে এতদিন আমায় বঞ্চিত করে রাখা রাজার পক্ষে নাকি নিতান্ত অনুচিত হয়েছে।

"ঘরে ঢুকে দেখি দেওয়ালে হেলান দিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট ছ'টি মেয়ে—যেন ছয় টুকরো মাংস কাবাব করবার জন্য শিকের গায়ে গেঁথে রাখা হয়েছে। সব চেয়ে বড়টি খুব সম্ভব বছর দশেকের, এবং সবচেয়ে ছোটটির বয়স আট বছর হবে। আমার ঘরে কেন এই বালিকা-বিদ্যালয় বসে গেল, প্রথম চোটে ধরতে পারি নি, তারপরই অবশ্য রাজার সূক্ষ্ম বিবেচনাশক্তি উপলব্ধি করলাম। তিনি আমাকে একটি হারেম উপহার দিয়েছেন, এবং চরম উদারতার বশে কচি বয়সই পছন্দ করেছেন। ওদেশে ফল যত কাঁচা, তার কদর তত বেশি।

"এইসব নাবালিকার সামনে বেশ কিছুক্ষণ লজ্জায় বিব্রত বোধ করলাম, কি যে করব, ভেবে পেলাম না। ওরাও ডাগর গভীর কালো চোখে আমার দিকে অপলকে চেয়ে থাকল—সে চাহনিতে লেখা যেন আমার যে কোন সাধ মেটাতে ওরা ওদের সর্বস্ব উজাড় করে দিতে পারে।

"কি দিয়ে যে ওদের সঙ্গে কথা শুরু করব, ভেবে পেলাম না। ইচ্ছে হল ওদের ফেরত পাঠিয়ে দি, কিন্তু তাও সম্ভব নয়। কেননা, রাজার দেওয়া উপহার ফেরত পাঠালে তাঁকে অসম্মান করা হয়। কাজেই বাধ্য হয়ে এই বালিকা-বাহিনীকে আমার মহলেই রাখতে হল।

"হুকুমের অপেক্ষায় আমার দিকে চেয়ে ওরা নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল, আমার চোখে তাকিয়ে মনের কথা আঁচ করতে চেষ্টা করছিল। এমন উপহার আমার মাথায় থাক! আমার পক্ষে এ যে বিষম বিড়ম্বনা! অবশেষে, এই খুকিদের চোখে হাস্যাস্পদ হচ্ছি মনে করে বড়টির নাম জিজ্ঞেস করলাম।

"সে নাম বলল—শেলী।

"মেয়েটি একটি বিস্ময়। গায়ের রং পাকা হাতির দাঁতের মত ঈষৎ হল্‌দে, নিটোল গভীর রেখায় আঁকা তার লম্বা ধাঁচের মুখখানি যেন নিখুঁত একটি ভাস্কর্যের নমুনা।

"ওকে প্রশ্ন করলাম: 'এখানে এসেছো কেন?' কি জবার দেয় এবং ঘাবড়ায় কি না—দেখতে চাইছিলাম। কোমল সুরেলা গলায় ও জবাব দিল: 'আমি এখন প্রভুর চরণের দাসী, তাঁর হুকুম তামিল করাই আমার একমাত্র কাজ।' তার গলায় আত্ম নিবেদনের সুর।

"ঐ একই প্রশ্ন সবচেয়ে ছোটটিকেও করলাম। সরু গলায় সে তৎক্ষণাৎ চটপট্ জবাব দিল: 'হুজুর, যা করতে বলবেন, তাই করব, এই জন্যেই এখানে এসেছি।'

"ছোট্ট নেংটি ইঁদুরের মতো এই মেয়েটিও আর সকলের মতোই মোহিনী। আমি তাকে দু হাতে তুলে ধরে মুখে চুমু খেলাম। তাই দেখে, ওকেই বেছে নিয়েছি ভেবে অন্যরা চলে যাবার জন্য পা বাড়াল, আমি ওদের থামালাম; তারপর ওদের নিয়ে ভারতীয় কায়দায় মেঝেতে গোল হয়ে বসে রূপকথার গল্প জুড়ে দিলাম। ওদের ভাষা আমি মোটামুটি ভালভাবেই রপ্ত করেছিলাম।

"ওরা হাঁ করে গল্প শুনছিল; শুনতে শুনতে কখনও ভয়ে শিউরে উঠল, উদ্‌বেগে পরস্পরের হাত চেপে ধরল। আহা বেচারারা! কি জন্য এখানে এসেছে, বেমালুম ভুলে বসে আছে!

"গল্প বলা শেষ করে আমি আমার খাস চাকর লছ্‌মনকে ডেকে কেক, মিষ্টি আনতে পাঠালাম। ওরা গোগ্রাসে অনেকটা করে খেয়ে আইঢাই করতে লাগল। ক্রমশ যখন প্রেমিকাদের সঙ্গ আমার কাছে

কৌতুকের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল, আমার বধূদের আনন্দ দেবার জন্য নতুন নতুন খেলায় মেতে উঠলাম।

"একটা খেলা খুব জমেছিল। পা ছটো ফাঁক করে আমি একটা সেতু হয়ে দাঁড়াতাম, আর ওরা ছ'জন তার তলা দিয়ে সার বেঁধে পার হয়ে যেত ; সবচেয়ে ছোট্টটি থাকত সবার আগে আর সবচেয়ে লম্বা জন সবার পেছনে থেকে বেশি ঝুঁকতে পারতো না বলে বার বাব ওদের গুঁতো খেত। এতে ওরা হেসে লুটোপুটি খেত। ওদের তরুণ গলার উচ্ছল হাসি আমার মহার্ঘ প্রাসাদের নীচু খিলানে প্রতিহত হয়ে ঘুমন্ত পুরীর ঘুম ভাঙিয়ে কচি প্রাণের চপলতায় প্রাণবন্ত করে তুলত।

"এরপর আমার উপপত্নীদের শোবার বন্দোবস্ত করতে মন দিলাম। আমার এই কিশোরী সুলতানাদের দেখাশোনা করার জন্য রাজাসাহেব ওদের সঙ্গে চারজন দাসীও পাঠিয়েছিলেন ; তাদের তত্ত্বাবধানে ওদের জন্য আলাদা আলাদা শোবার ঘরের ব্যবস্থা করে নিশ্চিন্ত হলাম।

"এইসব জীবন্ত পুতুলের পিতা সেজে দারুণ আনন্দে একটা সপ্তাহ কোথা দিয়ে যে কেটে গেল টেরই পেলাম না। ঘরের কোণে কোণে লুকোচুরি খেলে, ছুটোছুটি করে ওরা খুব খুশী। প্রতিদিন ওদের নতুন নতুন খেলা শেখাতাম, ওরাও নতুন আনন্দে মেতে উঠতো।

"আমার বাড়িটা এখন ঠিক যেন একটা বড়সড় নার্সারি। জরির মীনা করা জমকালো সিল্কের পোশাকে সেজেগুজে আমার ছোট্ট সখীরা মনুষ্যাকৃতি ক্ষুদে জন্তুর মতো গ্যালারির সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করত, খালি ঘরগুলোয় দৌড়োদৌড়ি করে হৈ চৈ করত।

"শেলী বড় শান্ত, ভারী মিষ্টি মেয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই সে আমাকে গভীর ভাবে ভালবেসে ফেলল। সে ভালবাসায় কিছুটা সঙ্কোচ, ভিন্‌দেশী সাহেব বলে কিছুটা ভয় মিশেছিল ; সংযত, লাজুক হলেও তার আবেগের উষ্ণতা অনুভব করতাম। আমি ওকে আমার মেয়ের মতো ভালবাসতাম।

"আর সবাই এক ঝাঁক সুখী পায়রার মতো প্রাসাদময় বকম্ বকম্ করে বেড়াত, কিন্তু শেলী, একমাত্র আমি রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া ছাড়া, আর সব সময় আমার কাছে কাছে থাকত।

"পুরোনো কেল্লার ভগ্নস্তূপে একত্রে আমরা অনেক রমণীয় মুহূর্ত কাটিয়েছি, যেখানে বানরেরা আমাদের ঘিরে বসত— ওরাও আমাদের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল।

"আমার কোলে মাথা রেখে শেলী চুপচাপ শুয়ে থাকত। তার ছোট স্ফিংসের মতো মাথাটিতে হয়ত যত রাজ্যের ভাবনা এসে ভিড় করত, কিংবা সে হয়ত কিছুই ভাবতো না। তখন ওর নীরব ভঙ্গী দেখে মনে হতো যেন স্বপ্ন রাজ্যের মহান অধিবাসীদের কোন বংশধর, যেন প্রাচীন মিশরীয় পবিত্র মূর্তিগুলোর কোন এক অনবদ্য ভঙ্গীমা।

"একদিন একখানা বড় পেতলের থালায় করে এক থালা কেক আর ফল নিয়ে গেলাম। বানরগুলো ক্রমশ কাছে এগিয়ে এল। ভীরু বাচ্চাগুলোও এল পিছু পিছু। তারপর খুব কাছে আসার সাহস না পেয়ে ওরা আমাদের চারদিকে ঘিরে বসল। খাবারগুলো কখন ভাগ করে দেব সেই প্রত্যাশায় সময় গুনতে লাগল। এমন সময় একটা কাণ্ড হল। একটা বানর সাহস করে খুব কাছে এসে ভিখারীর মতো হাত পেতে দাঁড়াল। ওর হাতে একটা টুকরো ফেলে দিতেই সে খুশী হয়ে তার বৌকে নিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হোলো ভয়ঙ্কর কোলাহল। বাদ বাকি বানরগুলো রাগে, হিংসেয় জ্বলে উঠে কিচির-মিচির জুড়ে দিল। তখন বাধ্য হয়ে ওদের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে ওদের শান্ত করতে হোলো।

"এই ধ্বংসস্তূপে কোনরকম অসুবিধে না থাকায় আমি আমার কাজের সাজ-সরঞ্জাম এখানে নিয়ে এসেছিলাম। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-পাতির ওপর ঝক্‌ঝকে তামার ফলক দেখে বানরগুলো মনে করল মারাত্মক অস্ত্র, অমনি ভয় পেয়ে পরিত্রাহি চিৎকার করতে করতে এলো পাতাড়ি ছুটে পালালো।

"বাইরের দিকের একটা গ্যালারি—যেখান থেকে 'বিহার' হ্রদ

দেখা যায়, শেলীকে সঙ্গে নিয়ে আমি প্রায়ই সন্ধ্যায় সেখানে গিয়ে বসতাম। একদিন নিঝুম এক চাঁদনী রাতে আমরা আকাশে চেয়ে আছি, কারো মুখে কথা নেই, আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ, হ্রদের জলে রুপালী স্রোত, দূরে অপর পারে জ্যোৎস্না-ধোওয়া ছোট ছোট প্যাগোডার সারি জল থেকে গজিয়ে ওঠা শিল্পীর তৈরি ছত্রাকের মতো দেখাচ্ছে। আমার ছোট্ট প্রেমিকার ভাবাচ্ছন্ন মাথাটি দুহাতে জড়িয়ে ধরে তার মসৃণ ভুরুযুগল, তার আয়ত চোখ দুটিতে কোমল এবং সুদীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিলাম। ওই চোখে তখন এই পৌরাণিক ও রূপকথার দেশের গোপন রহস্যের ছায়া। তার প্রশান্ত ঠোঁট দুটি আমার সোহাগ পরশে পাপড়ির মতো ফুটে উঠল। তীব্র অথচ কাব্যিক এক জটিল অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করল। আমি যেন একটা গোটা জাতি—সেই রহস্যময় জাত, যার থেকে সম্ভবত বাকি সব জাতির উদ্ভব—এই বালিকার মধ্য দিয়ে তাকেই আদর করলাম।

"রাজকুমার যথারীতি আমাকে উপহার পাঠিয়ে যাচ্ছিলেন। একদিন এমন একটি উপহার এল—যা আমি আশাই করতে পারিনি—কিন্তু শেলীর দারুণ পছন্দ হোলো। নেহাত মামুলি বস্তু—ঝিনুকের কাজ করা একটা সস্তা কার্ডবোর্ডের বাক্স—ইউরোপের যে কোন সমুদ্র-তীরবর্তী শহরে দুই এক পেনিতে যা হামেশাই পাওয়া যায়। কিন্তু ওদেশে এটা এক অমূল্য রত্ন এবং সম্ভবত ঐ রাজ্যে এরকম আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না। আমি একটা টেবিলের ওপর বাক্সটাকে রেখেছিলাম এবং ওটা ওখানেই পড়েছিল; অবাক হয়ে ভাবছিলাম বাজারের একটা তুচ্ছ রঙচঙে জিনিসকে এরা কী মূল্যই না দিচ্ছে।

"কিন্তু বাক্সটা দেখে দেখে শেলীর যেন আর আশ মেটে না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে বাক্সটার দিকে চেয়ে থাকত। সময় সময় আমাকে বলত: 'একটু দেখবো?' অনুমতি পেয়ে আলতো হাতে বাক্সের ডালাটা আলগোছে একবার খুলতো আবার বন্ধ করতো, খুব আস্তে আস্তে ঝিনুকগুলোর ওপর আদর করে হাত বোলাতো। এই স্পর্শে সে যেন সত্যিকারের ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করতো।

"যাই হোক, এদিকে আমার গবেষণার কাজ শেষ হলো, এবার ঘরে ফেরার পালা। ছোট বন্ধুটির জন্য মন কেমন করছিল, তাই মন স্থির করতে বেশ কিছুটা সময় চলে গেল; কিন্তু শেষ অবধি জোর করেই যাবার দিন ঠিক করে ফেললাম।

"রাজকুমার নতুন করে শিকার ও মল্লযুদ্ধের আয়োজন করলেন; এই হুল্লোড়ে পনেরো দিন কেটে গেলে পর জানালাম যে আমার আর কোনমতেই থাকা চলে না, তখন রাজা আমায় ছেড়ে দিলেন।

"শেলীর কাছ থেকে বিদায় নিতে আমার বুক ভেঙে গেল। আমার পাশে শুয়ে, আমার বুকে মাথা গুঁজে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কি করে ওকে সান্ত্বনা দেব, ভেবে পেলাম না। চুম্বনে আদরে কোন কাজ হল না।

"চট্ করে মাথায় একটা বুদ্ধি এল। উঠে গিয়ে ঝিনুকের বাক্সটা নিয়ে এলাম। ওর হাতে দিয়ে বললাম: 'এইটা তোমায় দিলাম, বাক্সটা এখন থেকে তোমার।'

"সেই প্রথম তার মুখে হাসি ফুটল। মনের আনন্দে সারা মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কোন অসম্ভব স্বপ্ন অপ্রত্যাশিত ভাবে সফল হলেই মানুষের মুখে এমন দীপ্তি দেখা যায়। এতক্ষণে সে আমাকে আবেগে জড়িয়ে ধরল।

"কিন্তু শেষ বিদায়ের ক্ষণে সে আবার অঝোরে কাঁদতে লাগল।

"অন্য সব বধূদের পিতৃসুলভ চুম্বন আর কেক দিয়ে আমি স্বদেশের দিকে পা বাড়ালাম।

২

"দুবছর বাদে আবার বোম্বাই যেতে হয়েছিল কাজের ডাকে, যেহেতু ঐ দেশটাকে এবং ওখানকার ভাষা আমি জানি, তাই আমার ওপর আরও একটি কাজের দায়িত্ব চাপান হোলো।

"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, কাজ শেষ করে ফেললাম। হাতে বেশ কিছু সময় থাকায় ঠিক করলাম বন্ধু রাজা মদন আর আমার প্রিয়

ছোট্ট শেলীর সঙ্গে একবার দেখা করে যাব। যদিও জানি শেঁলী এখন অনেক বদলে গেছে।

"আমাকে পেয়ে রাজা ভারি খুশী, প্রথম দিনটা একটুও কাছ ছাড়া করলেন না। যাই হোক, রাতে একটু ছাড়া পেয়ে হরিবদকে ডেকে পাঠালাম। একথা সেকথার পর বললাম :

শেলী—সেই ছোট মেয়েটি, সেই যে রাজা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন— তার খবর জানো?

"হরিবদর মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল, অস্বস্তি ভরে বলে উঠল : 'ওর কথা বাদ দিন।'

'কেন? সে তো চমৎকার ছোট্ট এক মেয়ে!'

'পরে ও খারাপ হয়ে গিয়েছিল, স্যার।'

'কে, শেলী? কি করেছে ও? এখন কোথায় আছে?'

'না, মানে, বড়ই করুণ পরিণতি।'

'করুণ পরিণতি!'

'হ্যাঁ, স্যার। ও একটা জঘন্য কাজ করেছিল।'

আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়লাম, আমার বুক দুরদুর করতে লাগল; ব্যথায় হৃদয় যেন ভেঙে পড়বে। ও কি করেছিল এবং ওর কি হোলো—জানবার জন্য পীড়াপীড়ি করলাম।

"লোকটি আরও বেশি বিব্রত হয়ে আমতা আমতা করে বলল : 'সে কথা আপনার না জানাই ভাল।'

'কিন্তু, আমি জানতে চাই।'

'সে চুরি করেছিল—'

'কে, শেলী?—কি চুরি করেছিল?'

'আপনারই একটি জিনিস।'

" 'আমার জিনিস? বলছো কি?'

'যে দিন আপনি চলে গেলেন, সেদিন সে আপনার বাক্সটা— যেটা রাজা আপনাকে উপহার দিয়েছিলেন, সেইটে চুরি করেছে।'

'কোন বাক্সের কথা বলছো?'

'সেই ঝিনুক বসানো বাক্সটা।'

'কিন্তু আমিই তো ওটা ওকে দিয়েছিলাম।'

"ভারতীয় হিন্দু হরিবদ বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল। তারপর বলল: 'অবশ্য মেয়েটা দেবতার নামে শপথ করে বার বার বলেছিল যে আপনিই বাক্সটা ওকে দিয়েছিলেন; কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে নি। রাজার-দেওয়া উপহার একজন ক্রীতদাসীকে দিয়েছেন—এ কথা কে বিশ্বাস করবে? কাজেই রাজা ওকে সাজা দিয়েছেন।'

'কি সাজা হোলো তার? রাজা তাকে কি শাস্তি দিলেন?'

'এই ঘর, যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, একটা বস্তায় পুরে মুখ বন্ধ করে তাকে এই ঘরের জানালা দিয়ে হ্রদের জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কেননা—এইখান থেকেই সে চুরি করেছিল।'

"জীবনে আর কখনও এমন প্রচণ্ড ঘা খাইনি, ইশারায় হরিবদকে সামনে থেকে চলে যেতে বললাম, যাতে আমার চোখের জল ও না দেখতে পায়। হ্রদের ধারের সেই গ্যালারি—যেখানে কতদিন হতভাগিনীকে কোলে নিয়ে আমার সময় কেটেছে, সেই গ্যালারিতে বসে জলের দিকে চেয়ে চেয়ে সারা রাত কাটিয়ে দিলাম। কল্পনায় দেখতে পেলাম, বস্তার মধ্যে তার সুন্দর ছোট দেহখানি গলিত শব হয়ে আমার পায়ের নিচে অন্ধকার জলের তলায় পড়ে আছে।

"রাজার অনুনয় বিনয়, এবং সম্ভবত একটু অসন্তোষ সত্ত্বেও পরদিনই সেখান থেকে চলে আসি। এখনও মর্মে মর্মে অনুভব করি যে সারা জীবনে আমি একটি মাত্র মেয়েকেই ভালবেসেছিলাম—সে শেলী।"

কানেস থেকেই গাড়ি বোঝাই। যাত্রীরা সকলেই চেনা-পরিচিত, তাই কথাবার্তা জমে উঠতে দেরি হোলো না। তারাসকন অতিক্রম করার সময় একজন বলে উঠলো, "এই সেই বিখ্যাত খুনের জায়গা।"

এই খুন নিয়েই তখন আলোচনা চললো। গত দু'বছর ধরে এখানে সন্ধানহীন রহস্যজনকভাবে কোন না কোন ভ্রমণকারী প্রাণ হারাচ্ছে। প্রত্যেকেই এর কারণ অনুমান করলো, প্রত্যেকের মত প্রতিষ্ঠা করতে চাইলো। হঠাৎ গাড়ির দরজায় যদি কোন মানুষের মাথা উঁকি দেয়—এই ভয়ে কেঁপে মেয়েরা জানালার মধ্য দিয়ে বাইরে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকলো। ভয়ঙ্কর ডাকাতির রোমাঞ্চকর কাহিনী, চলন্ত এক্সপ্রেস গাড়িতে পাগলের কাণ্ডকারখানা, সন্দেহজনক ব্যক্তির মুখোমুখি বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানোর অভিজ্ঞতা—এমনি সব গল্পে পুরুষেরা মুখর হোলো। প্রত্যেকেই একটা উপাখ্যান বলে বাহবা পেতে চায়। সকলেই অতি অদ্ভুত পরিস্থিতিতে দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়ে সাংঘাতিক ভয়ে বিহ্বল রুদ্ধশ্বাস হয়েছে, তারপর প্রশংসনীয় সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধির বলে নিস্তার পেয়েছে।

প্রত্যেক শীতে দক্ষিণে আসেন এমন একজন ডাক্তার তাঁর অভিজ্ঞতার একটি গল্প শোনাতে চাইলেন। তিনি বললেন :

"সাহসের পরীক্ষা দেবার মতো এ রকম কোন সাংঘাতিক ঘটনা আমার ভাগ্যে কখনও ঘটেনি, কিন্তু আমার রোগীদের মধ্যে আমি একটি রমণীকে জানি যাঁর জীবনে পৃথিবীর পরমাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। তিনি এখন মৃত, কিন্তু তাঁর কাহিনী যেমন রহস্যময়, তেমনি হৃদয়-বিদারক।

"তিনি ছিলেন রাশিয়ান, সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা, কাউন্টেস মেরী বারনো, অপরূপ সুন্দরী। আপনারা জানেন রাশিয়ান মেয়েরা কি

রকম সুন্দর দেখতে, অন্তত আমাদের চোখে তারা অপূর্ব সুন্দরী। তাদের সুগঠিত নাসিকা, মসৃণ কপোল, নয়নের অবর্ণনীয় নীলাভ বাদামী রং, স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের সঙ্গে একটু কাঠিন্য। তাদের রূপ স্বকীয়তায় পরিপূর্ণ—সর্বনাশা অথচ মন ভোলানো, গর্বিত এবং সুমিষ্ট, কোমল অথচ কঠিন। সব মিলিয়ে ফরাসী পুরুষকে মুগ্ধ করে। আসল কথা সম্ভবত দেশ ও জাতিগত ব্যবধানের জন্যেই আমার কাছে তাদের এত আকর্ষণ।

"বহু বছর ধরে তিনি মারাত্মক ফুসফুসের রোগে ভুগছিলেন। তাঁর গৃহচিকিৎসক তাঁকে দক্ষিণ ফ্রান্সে পাঠাতে অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কিছুতেই সেন্টপিটার্সবার্গ ছাড়তে তাঁকে রাজী করানো যায়নি। অবশেষে তাঁর অবস্থা খুব খারাপ হচ্ছে দেখে ডাক্তার তাঁর স্বামীকে সচেতন করে দিলেন। স্বামী তখন স্ত্রীকে জোর করে মেতোঁনে রওনা করে দিল।

"গাড়ি করে একা এসে তিনি ট্রেনে চাপলেন। তাঁর কামরায় তিনি একেবারে একা, অন্য কামরায় ভৃত্য। তিনি বিষণ্ণ হয়ে দরজায় বসে বাইরে ধাবমান গ্রাম ও উপত্যকার দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর জীবন নিতান্ত নিঃসঙ্গ, ঊষর মরু। তাঁর সন্তান নেই, আত্মীয় পরিজনও প্রায় নেই বললেই চলে। স্বামীর ভালবাসাও তিনি হারিয়েছেন। তাই স্ত্রীর সঙ্গে না এসে পৃথিবীর এই শেষ প্রান্তে তাঁকে এমন করে বিদায় দিলেন, যেন একজন অসুস্থ খানসামাকে হাসপাতালে দেওয়া হচ্ছে।

"প্রতি স্টেশনে ভৃত্য আইভান এসে তাঁর কিছু প্রয়োজন আছে কিনা খোঁজ করেছে। এই বৃদ্ধ গৃহ পরিচারকটি অন্ধের মতো অনুগত, কর্ত্রীর যে কোন আদেশ পালনের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত।

"রাত নাবলো। ট্রেন পূর্ণ বেগে ছুটে চলেছে। ভয়ে স্নায়ু দৌর্বল্যে তাঁর চোখে ঘুম এলো না। স্বামী তাঁকে শেষ মুহূর্তে যে ফরাসী সোনার মুদ্রা দিয়েছেন সেগুলো গোনার কথা তাঁর মাথায় এলো। ছোট্ট ব্যাগটা কোলের ওপর মেলে ধরতেই চকচকে ধাতুখণ্ডের বন্যা বয়ে গেল।

"কিন্তু অকস্মাৎ একটা ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস তাঁর মুখের ওপর এসে পড়লো। বিস্ময়ে মাথা তুললেন। ঠিক তক্ষুণি দরজাটা খুলে গেল। বিভ্রান্ত কাউন্টেস মেরী তাড়াতাড়ি চাদর দিয়ে কোলের টাকাগুলো ঢেকে অপেক্ষা করে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে সান্ধ্য পোশাকে একজন লোকের আবির্ভাব। মাথায় টুপি নেই, হাত কেটে রক্ত ঝরছে, হাঁপাচ্ছে। লোকটি দরজাটা বন্ধ করে ভেতরে এসে বসলো। সহযাত্রীর দিকে এক নজর তাকিয়ে রক্তাক্ত মণিবন্ধে রুমাল জড়িয়ে নিল।

"যুবতী রমণীর ভয়ে মূর্ছা যাবার উপক্রম। নিশ্চয়ই এই লোকট তাঁকে টাকা গুনতে দেখেছে, তাই তাঁকে খুন করে টাকাগুলো ছিনিয়ে নিতে এসেছে। যে রকম শ্বাসরোধ করে তাঁর দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে আছে, নিঃসন্দেহে এক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে আক্রমণ করবে।

"লোকটা হঠাৎ বলে বসলো : 'মাদাম, ভয় পাবেন না।'

"মাদাম নিরুত্তর। কথা বলার ক্ষমতা তাঁর নেই। কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করছে, নিজের হৃৎপিণ্ডের ধক্‌ ধক্‌ শব্দ ছাড়া আর কিছুই তিনি শুনতে পাচ্ছেন না।

"লোকটা বলে চললো : 'মাদাম, আমি দুষ্কৃতকারী নই।'

"নারী নীরব। কিন্তু সহসা তাঁর হাঁটু দুটো নড়ে যাওয়ার ফলে নলের মুখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ার মতো সোনার মুদ্রাগুলো কামরার মেঝেতে ছড়িয়ে পড়লো।

"মানুষটি অবাক হয়ে এই ধাতুজ ঝরনার দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় নীচু হয়ে কুড়োতে শুরু করলো।

"ঐভাবে কার্পেটের ওপর ছড়িয়ে থাকা তাঁর সমস্ত সম্বল লোকটিকে কুড়োতে দেখে তিনি দারুণ আতঙ্কে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর দরজা দিয়ে ছুটে গিয়ে রেললাইনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেষ্টা করলেন।

"লোকটি তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে সবলে

আঁকড়ে ধরে ভেতরে টেনে এনে জোর করে তাঁর জায়গায় বসিয়ে দিল। পাশে বসে শক্ত করে তাঁর কব্জি ধরে থাকলো। বললো:

" 'মাদাম শুনুন, আমি দোষী নই। তার প্রমাণ আমি টাকাগুলো কুড়িয়ে আপনাকে দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আপনি যদি আমাকে সীমান্ত পার হতে সাহায্য না করেন, আমি শেষ হয়ে যাব—মরে যাব। আপনাকে আর কিছু বলতে পারবো না। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা রাশিয়ার শেষ স্টেশন পার হয়ে যাব, এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিটের ভেতর আমরা এই রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে যাব। আপনি আমায় সাহায্য না করলে আমি শেষ হয়ে যাব। আমি কাউকে খুন করিনি, ডাকাতি করিনি, এমম কি মানহানিকর কোন কাজই করিনি। আপনার কাছে শপথ করতে পারি। আর কিছু বলতে পারবো না।'

"এই বলে সে জানু পেতে বসে একটা একটা করে সব টাকা তুলে ব্যাগে রাখলো, দূরে সীটের তলায় গড়িয়ে যাওয়া টাকাটা অবধি খুঁজেপেতে আনলো। ছোট চামড়ার ব্যাগটা যখন আবার ভরে গেল সে নীরবে সহযাত্রীর হাতে সেটা তুলে দিয়ে কামরার অপর কোণে গিয়ে বসলো। দুজনেই নিশ্চল। মাদাম নিস্পন্দ নিশ্চুপ। তখনও ভয়ে আচ্ছন্ন, তবে ধীরে ধীরে ভীতি ঘুচে আসছিল। লোকটি ভাবলেশহীন নিথর। সটান বসে আছে, স্থির দৃষ্টি সামনে প্রসারিত, অত্যন্ত বিবর্ণ—যেন প্রাণ নেই। মাঝে মাঝে মাদাম চকিতে তার দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। তার বয়স বছর ত্রিশেক হবে, ভারি সুন্দর দেখতে আর চেহারাটি ভদ্রলোকের মতোই।

"অন্ধকারের মধ্য দিয়ে গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। কখনও পূর্ণবেগে কখনও বা মন্দগতিতে। কিছুক্ষণ বাদে বাদে শোনা যাচ্ছে সংকেতধ্বনির তীক্ষ্ণ আওয়াজ। কিন্তু আস্তে আস্তে গাড়ির গতি কমে এলো, বারকয়েক তীব্র বাঁশি বাজিয়ে এক জায়গায় এসে একেবারে থেমে গেল।

"আদেশ পালনের জন্য আইভান দরজায় এসে দাঁড়ালো।

"কাউণ্টেস মেরী শেষবারের মতো তার সহযাত্রীর দিকে এক পলক দেখে নিয়ে কাঁপা গলায় চাকরকে কোনক্রমে বললেন :

" 'আইভান, তুমি কাউণ্টের কাছে ফিরে যাও ; তোমাকে আমার আর দরকার নেই।'

"হতভম্ব বৃদ্ধ বড় বড় চোখে চেয়ে তোতলাতে লাগলো : 'কিন্তু কর্ত্রী মা…'

"তিনি জবাব দিলেন :

" 'না, তোমার আর আমার সঙ্গে আসার প্রয়োজন নেই। আমি আমার মত বদলে ফেলেছি। আমি চাই তুমি রাশিয়াতেই থেকে যাও। এই নাও তোমার বাড়ি ফেরার টাকা। তোমার টুপি আর জোব্বাটা আমায় দাও।'

"ভীত বৃদ্ধ ভৃত্য কোন প্রশ্ন না করেই তার টুপি আর জোব্বা খুলে প্রভুপত্নীর হাতে দিল। প্রভু পরিবারের এই মর্জি আর খামখেয়ালীর সঙ্গে তার বেশ ভাল করেই পরিচয় ছিল। চোখের জল মুছতে মুছতে সে বিদায় নিল।

"ট্রেন ছেড়ে দিল, সীমান্তের দিকে ধাবিত হোলো।

"কাউণ্টেস মেরী এবার তাঁর সহযাত্রীকে বললেন :

" 'মসিঁয়ো, এগুলো আপনার জন্য, আপনি এখন আইভান, আমার পরিচারক। আমি যা করছি তার জন্য একটা শর্ত করতে চাই। শর্তটা হচ্ছে আপনি আমার সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারবেন না— ধন্যবাদ জানাতেও নয়—অন্য কিছুই নয়।'

"একটি অক্ষরও উচ্চারণ না করে এই অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁকে অভিবাদন জানালো।

"শীঘ্রই আবার গাড়ি থেমে গেল, সরকারি পোশাক পরা অফিসারেরা ভেতরে ঢুকলো।

"কাউণ্টেস তাঁদের নিজের পাশপোর্ট দেখালেন তারপর কোণে বসা লোকটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন : 'ঐ আমার ভৃত্য আইভান, এই তার পাশপোর্ট।'

"গাড়ি আবার চলতে শুরু করলো।

"সারারাত তারা মুখোমুখি বসে থাকলো বোবা হয়ে।

"সকাল বেলায় জার্মানীর একটা স্টেশনে গাড়ি থামলে আগন্তুক বাইরে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বললো: 'প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করছি বলে আমায় ক্ষমা করবেন, মাদাম। যেহেতু ভৃত্যের সেবা থেকে আপনাকে বঞ্চিত করেছি, কাজেই সে অভাব মোচন করাই আমার কর্তব্য। আপনার কিছু চাই কি?'

"তিনি নিরুত্তাপ গলায় জবাব দিলেন: 'যান, আমার জন্য একটা ঝি খুঁজে আনুন।'

"লোকটি ঝি সংগ্রহ করে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরে মাদাম দুপুরে খাবার জন্য স্টেশনে নেবে দেখেন লোকটি দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। অবশেষে তাঁরা মেতোনে পৌছলেন।"

২

একটু চুপ করে থেকে ডাক্তার আবার শুরু করলেন:

"একদিন অফিসে বসে রোগী দেখছি, এমন সময় একজন লম্বা-গোছের এক তরুণ এসে ঢুকলো। আমায় বললো: 'ডাক্তারবাবু, আমি কাউন্টেস মেরী বারনোর খবর নিতে এসেছি। আমি ওঁর স্বামীর বন্ধু, অবশ্য উনি তা জানেন না।'

"আমি উত্তর দিলাম: 'তাঁর ভালো হবার উপায় নেই। তিনি আর কখনও রাশিয়ায় ফিরতে পারবেন না।'

"ভদ্রলোক আচম্বিতে ডুকরে কেঁদে উঠলো। তারপর উঠে মাতালের মতো টলতে টলতে চলে গেল।

"এক অচেনা ব্যক্তি তাঁর খোঁজ নিতে এসেছিল—সেদিন সন্ধ্যায় কাউন্টেসকে একথা জানাতেই তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। আপনাদের যে কাহিনী এতক্ষণ শোনালাম, সেদিন তিনিই আমায় বলেছিলেন। আরো বলেছিলেন: 'তাকে আমি আদৌ জানি না, সেই মানুষটি এখন আমায় ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। আমি

বাইরে গেলেই তাকে দেখতে পাই। সে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু কখনও কথা বলে না।'

"তিনি একটু চিন্তা করে বললেন: 'আসুন আমি বাজি রাখছি, সে এখন নিশ্চয় জানলার নীচে অপেক্ষা করছে।'

"তিনি তাঁর আরাম কেদারা থেকে উঠে জানালার কাছে গিয়ে পরদা সরিয়ে আমায় নীচে দেখালেন। দেখলাম যে লোকটি আমার কাছে এসেছিল, সত্যিই সে দেয়ালধারের বেঞ্চে বসে আছে। তার চাহনি এই বাতায়নে এসে অচল। আমাদের দেখতে পেয়ে সে উঠে চলে গেল। একবারের জন্যও পেছনে ফিরে তাকালো না।

"তখন একটি বিষাদময় আশ্চর্য বস্তু এই দু'টি অপরিচিত নর-নারীর মূক ভালবাসা আমি উপলব্ধি করলাম।

"কাউন্টেসের প্রতি তার প্রেম ছিল সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন। মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করলে কোন জীব যেমন ত্রাণকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে তার অনুগত হয়ে পড়ে, ভদ্রলোক তেমনি করে মানসীকে নিজের জীবন সঁপে দিয়েছিল। আমি তার মনের এই নির্বাক অনুভূতি বুঝতে পেরেছি ভেবে সে রোজ এসে আমায় শুধাতো: 'ও কেমন আছে।' দিন দিন কাউন্টেসকে আরও বেশি দুর্বল, ফ্যাকাশে হতে দেখে সে হাপুস নয়নে কাঁদতো।

"কাউন্টেস একদিন আমায় বললেন: 'আমি ওই অদ্ভুত মানুষটির সঙ্গে জীবনে একবারের বেশি কথা বলিনি, কিন্তু আমার মনে হয় আমি যেন ওকে বিশ বছর ধরে চিনি।'

"তাঁদের দেখা হলেই কাউন্টেস গভীর মধুর হেসে তাকে অভিনন্দন জানাতেন। মৃত্যুপথযাত্রী এই নারী জানেন তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে, তবু এই প্রেমে তিনি সুখী, আত্মতৃপ্ত। এই সম্মান, আনুগত্য, অনুরাগ, উৎসর্গ—এই উদ্‌বেলিত কাব্যোচ্ছ্বাস তাঁর রুগ্ন দেহমনের প্রশান্তি।"

"কিন্তু তাঁর অতিরিক্ত খামখেয়ালের জন্য মাদাম কিছুতেই তাঁর প্রেমিকের নাম জানতে অথবা তার সঙ্গে কথা বলতে চাইতেন না। তাঁর কথায়—'না না, তাহলে আমাদের এই আশ্চর্য বন্ধুত্ব মাটি হয়ে

যাবে। আমরা চিরকাল পরস্পরের অচেনা থাকবো।'

"তাঁর প্রেমিকটিও নিশ্চয় একটি ডন কুইক্সোট, কেন না প্রেয়সীকে কাছে টেনে নেবার কোন উচ্চমই তার ছিল না। গাড়িতে বসে একবার সে তাঁর সঙ্গে কথা না বলার যে উদ্ভট প্রতিজ্ঞা করেছিল—সেইটেই আঁকড়ে থাকলো শেষ অবধি।

"রোগে পাণ্ডুর সুদীর্ঘ নিঃসঙ্গ অবসরে প্রায়ই তিনি তাঁর হেলান-চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে জানালার পরদা একটু ফাঁক করে ধরতেন; নিচে বেঞ্চের ওপর তাকে নিশ্চল ছবির মতো বসে থাকতে দেখে আবার ফিরে এসে চেয়ারে এলিয়ে পড়তেন। তাঁর ঠোঁট দু'টি মৃদু হাসিতে ভরে ফুলের মতো ফুটে থাকতো।

"একদিন বেলা দশটার দিকে তাঁর মৃত্যু হোলো।

"বাড়ির বাইরে পা দিতেই দেখি সামনে সেই অদ্ভুত প্রেমিক। তার হাবভাবে বোঝা গেল খবরটা সে শুনেছে। সে বললো: 'কেবল এক লহমার জন্ম আমি তাঁকে একটু দেখতে চাই, আপনার সামনেই।'

"আমি তাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে হাসপাতালে আবার তাঁর ঘরে ঢুকলাম।

"আমরা গিয়ে মৃত রমণীর শয্যাপাশে দাঁড়ালাম। সে তার প্রিয়ার হাত দু'টি তুলে নিয়ে গভীর আবেগময় সুদীর্ঘ চুম্বনে সিক্ত করে দিল, তারপর চেতনাহারা লোকের মতো সোজা বেরিয়ে গেল।"

ডাক্তার থামলেন। তারপর আবার বললেন: 'এই হচ্ছে আমার জানা রেলপথের অপূর্ব রোমাঞ্চকর কাহিনী।' এই জন্মই বলা যায়, মানুষ অদ্ভুত পাগল।'

একজন স্ত্রীলোক বিড় বিড় করে বললো: '—আপনারা যে রকম ভাবছেন; এই দুটি নরনারী সত্যিই সে রকম পাগল ছিল না। তারা ছিল—তারা ছিল—'

কিন্তু কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। তাকে শান্ত করার জন্ম আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া হোলো, সে কি বলতে চেয়েছিল, কেউই জানতে পারলো না।

# বিচিত্র খেয়াল

শিকারের সময় হয়ে এলো। মারকুঁ ছ্য বাবট্রাসেঁর বাড়ি ডিনার পার্টি। এগারজন শিকারী, যুবতী মহিলা আটজন আর একজন প্রতিবেশী ডাক্তার নিমন্ত্রিত। ফুল ফলে সুসজ্জিত আলোকোজ্জ্বল একটা বড় টেবিলের চারিদিক ঘিরে তাঁবা বসেছেন। ভোজ শেষ। কথাবার্তা চলছিল। আলোচনার মধ্যে প্রেমের প্রসঙ্গ এসে পড়তেই শুরু হোলো তুমুল তর্কবিতর্ক। তর্কের ঝড় সেই চিরন্তন বিষয় নিয়ে। খাঁটি ভালবাসা জীবনে ক'বার সম্ভব, একবার না বহুবার? জীবনে একবারই মাত্র গভীবভাবে ভালবেসেছে এমন ব্যক্তির উদাহরণ অনেকে দিল। এমন লোকের দৃষ্টান্তও পাওয়া গেল যারা বহুবার প্রচণ্ড আবেগে প্রেমে পড়েছে। পুরুষের মধ্যে বেশির ভাগই জোর দিয়ে বললো—এই প্রেমাবেগ মানসিক ব্যাধির মতো। একই লোক অনেকবার এতে আক্রান্ত হতে পারে। শুধু তাই নয়, বাধা পেলে পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে খুন পর্যন্ত করা তাব পক্ষে অসম্ভব নয়। যদিও এক্ষেত্রে অস্বীকার করবার কিছু ছিল না, তবু অনভিজ্ঞা কাব্যজগত-বিহারিণী মহিলার দল সরবে ঘোষণা করলো যে প্রেম নিখাদ ভালবাসা, অমর্ত্য প্রণয়—এই মর্ত্য মানুষের জীবনে একবারই আসে। প্রেম বজ্রপাতের মতো। একবার যে হৃদয় ছুঁয়ে যায় চিরকালের জন্য তা শূন্য মরুতে পরিণত হয়। এমনভাবে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায় যাতে অন্য কোন প্রগাঢ় অনুভূতি এমন কি স্বপ্ন অবধি আর অঙ্কুরিত হতে পারে না।

মারকুঁ জীবনে বহু ভালবাসা পেয়েছেন; তাই সজোরে এই মতের প্রতিবাদ করলেন:

"আমি বলছি একজন তার পরিপূর্ণ আসক্তি দিয়ে সমস্ত প্রাণ ঢেলে বহুবার ভালবাসতে পারে। দ্বিতীয়বার প্রেম অসম্ভব এমন

প্রমাণ আছে কি? আপনারা এমন লোক দেখাতে পারেন যারা প্রেমের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে? আমি বলবো, নির্বোধের মতো আত্মহত্যার পাপ করে আবার প্রেমে পড়ার সমস্ত সম্ভাবনা যদি নষ্ট না করতো, তবে তারা আবার সুস্থ হতে পারতো, আর এভাবে স্বাভাবিক মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বার বার নতুন করে শুরু করার সুযোগ নিতে পারতো। যেমন মাতাল, তেমনি প্রেমিক। একবার যে মদ খেয়েছে, সে নেশা ছাড়বে না। আর প্রেমে যে একবার মজেছে, সে প্রেম করবেই। সোজা কথায় এটা হচ্ছে প্রেমের একটা ঝোঁক।"

সবাই তখন ডাক্তারকে মধ্যস্থ মানলো। প্যারিসের অভিজ্ঞ ডাক্তার। এখানে অবসর জীবন যাপন করছেন। তাঁর মতামত জানাতে অনুরোধ করা হোলো।

মারকুঁ যেমন বললেন এটা মেজাজের ব্যাপার, সত্যি বলতে কি ডাক্তারের তেমন কিছু বলবার ছিল না।

"আমার কথা বলতে গেলে", তিনি বলতে শুরু করলেন, "আমি এমন প্রেমের কথা জানি, যে প্রেম পঞ্চান্ন বছর টিঁকে ছিল। এক দিনের জন্যেও তাতে ছেদ পড়েনি, এবং মৃত্যুতে এর পরিসমাপ্তি।"

মারকুঁ হাততালি দিয়ে উঠলেন। এক মহিলা বলে উঠলো, অপূর্ব! এমন ভালবাসা পাওয়া একটা সুন্দর স্বপ্ন। পঞ্চান্ন বছর অতল প্রাণোচ্ছল মমতায় অবগাহন কি সুখের! এমন ভালবাসা যে পেয়েছে সে কতই না সুখী! তার জীবন ধন্য।"

ডাক্তার হাসলেন। বললেন: "মাদাম, বলতে কি, আপনি এ বিষয়ে নিরাশ হবেন। কেননা এমন ভালবাসা যিনি পেয়েছিলেন তিনি একজন পুরুষ। আপনি তাঁকে চেনেন, এই গাঁয়েরই রসায়নবিদ মসিয়ো ককেতা আর মেয়েটির কথা বলতে হলে, সেও আপনার অচেনা নয়। এ সেই বৃদ্ধা রমণী, বেত দিয়ে চেয়ারের আসন বুনতে প্রত্যেক বছরই এ বাড়িতে আসতো। কিন্তু সম্পূর্ণ বিষয়টা কি করে আপনাদের বোঝাবো!"

নারীকুলের উৎসাহে ভাঁটা পড়লো। তাদের মুখের হতাশ দৃষ্টি যেন বলতে চাইলো—'ফুঃ'। শৌখীন লোকের মনোযোগের যোগ্য প্রেম যেন সব সুন্দর এবং সম্ভ্রান্ত লোকের একচেটিয়া অধিকার।

ডাক্তার বলে চললেন :

"তিন মাস আগে এই বৃদ্ধার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন তার শেষ অবস্থা। একটা পুরোনো গাড়িতে করে সে এসেছিল। টাট্টুতে টানা ওই এক্কা গাড়িটা আপনাদের নজরে পড়েছে নিশ্চয়। ওই জীর্ণ যানটাই ছিল তার ঘরবাড়ি। আর দুটো বড় কালো কুকুর ছিল তার সবসময়ের সঙ্গী, বন্ধু এবং রক্ষক। গ্রামের গির্জার যাজক আগে থেকেই ওখানে ছিলেন। আমাকে আর যাজককে সে তার উইলের অছি করে নিল। তারপর দলিলের রহস্যোদ্ধার করতে গিয়ে বিবৃত করলো তার জীবন কাহিনী। আমার জীবনে এর চেয়ে করুণ কাহিনী আমি আর শুনিনি। এমন অনন্য, মর্মস্পর্শী।

"তার বাবা-মা চেয়ারে আসন বোনার কাজ করতো। পৃথিবীর কোনো প্রান্তে কখনও তার কপালে একটি ঘর জোটেনি। সে যখন ছোট ছিল, ময়লা ছেঁড়া জামাকাপড়ে ঘুরে বেড়াতো। শহরে ঢুকতেই পথের পাশে তারা এসে থামতো। বিশ্রাম দেবার জন্য ঘোড়াটাকে খুলে দেওয়া হোতো। সেটা চরে বেড়াতো। কুকুরটা থাবার মধ্যে নাক ডুবিয়ে ঘুমিয়ে পড়তো। ছোট্ট শিশুটি ঘাসের ওপর খেলে বেড়াতো। আর সেই সময় তার মা-বাবা রাস্তার পাশে এল্‌ম্‌ গাছের ছায়ায় বসে পাড়াপড়শীর যত রাজ্যের ভাঙা চেয়ার মেরামতে লেগে যেত।

"এই চলন্ত আস্তানায় সবাই বোবা হয়ে থাকতো। কে বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজ জোটাবে আর কে সেই পরিচিত সুরে 'চেয়ার সারাবেন' বলে হাঁক পাড়বে, এ ঠিক করতে যে ক'টি দরকারী কথা হোতো, তার বাইরে আর কেউ কথা বলতো না। পাশাপাশি অথবা মুখোমুখি বসে চুপচাপ তারা খড় গাদা করার কাজে লেগে যেত।

"ছোট্ট মেয়েটি খুব বেশি দূরে চলে গেলে অথবা গ্রামের ফচ্‌কে

ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে ভাব জমালে তার বাবার ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শোনা যেত—'এই ছুঁড়ি, এখানে চলে আয়।' সারা জীবনে এ ছাড়া আর কোন আদরের কথা সে শোনেনি :

"সে বড় হলে পর, মেরামতের জন্য ভাঙা চেয়ার খুঁজে আনতে তাকে পাঠানো হোতো। তখন এখানে ওখানে কোন কোন রাস্তায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে ভাব করতে চাইতো। কিন্তু তার এই নতুন আলাপী বন্ধুদের মা-বাবা দেখতে পেলেই রুক্ষস্বরে ছেলেমেয়েদের ডেকে বলতো—'বেয়াদপ, এলি এখানে! আবার তোকে ওই ছোট-লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখলে হয়।'

"কখনও কখনও ছেলেরা তাকে ঢিল ছুঁড়তো। মাঝে মাঝে মহিলারা তার দিকে করুণ করে তাকাতো আর দু-এক পেনি ছুঁড়ে দিত।

"সে তখন এগার বছরের। একদিন তারা এখান দিয়েই যাচ্ছিল। তখনই প্রথম ছোট্ট ককেতের সঙ্গে তার দেখা। ছোট ছেলেটি কাঁদছিল। কেননা তার বন্ধুরা তার হাত থেকে দুটি 'সু'* ছিনিয়ে নিয়েছে। এই সম্ভ্রান্ত ক্ষুদে নাগরিকটির চোখের জল তাকে ব্যাকুল করলো। সামান্য বুদ্ধিতে মনে হোলো এ অশ্রু এমন একজন সুখী নাগরিকের যার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। তবু সে ব্যথা পেল। তার কাছে গিয়ে দুঃখের কারণ জানতে পেরে সে তার সমস্ত সঞ্চয়—সাতটি 'সু' উজাড় করে ছেলেটির দু'হাত ভরে ঢেলে দিল। স্বাভাবিক অসঙ্কোচে সেগুলো সে নিল। কান্না থামলো। বিহ্বল আনন্দের স্পর্ধিত বাসনায় বালকটিকে জড়িয়ে ধরে সে চুমু খেল। ছেলেটি মন দিয়ে পয়সা গোনায় ব্যস্ত, তাই তাকে বাধা দিল না। প্রত্যাখ্যান বা প্রহার কিছুই যখন জুটলো না, তখন সে আবার চুম্বন করলো। দু'বাহু দিয়ে তাকে বুকে চেপে রাখলো। তারপর ছুটে পালালো।

"তারপর তার বিড়ম্বিত জীবনে কি ঘটলো? এই অবোধ বালকের সঙ্গে সে নিজেকে জড়ালো কেন? সে কি তার ভবঘুরে

* ফরাসী মুদ্রাবিশেষ : পাঁচ 'সেঁত'

জীবনের সৌভাগ্য তাকে উৎসর্গ করেছিল বলে, অথবা সর্বপ্রথম তাকে তার অধরের কোমল স্পর্শ দিয়েছিল তাই? ছোট বড় সকলের কাছেই এটা রহস্য।

"কবরখানার ঐ কোণটি আর ছেলেটির কথা ভেবে মাসের পর মাস কেটে গেল। যদি আবার দেখা হয়ে যায় এই আশায় মা-বাবার কাছ থেকে সে পয়সা চুরি শুরু করলো। চেয়ারের আসনের দাম অথবা তাকে কিছু কিনতে দিলে তা থেকে দু'এক 'সু' সরিয়ে এদিক ওদিক রেখে দিত।

"এখানে যখন সে ফিরে এল, তার পকেটে তখন দু'টি ফ্রাঁ। কিন্তু সে কেবল তাকে দেখলো। তার বাবার দোকানে বড় একটা রঙিন বোতলের পেছনে একটা লাল মদের কুঁজো আর টেপওয়ার্মের মাঝখানে সেই ছোট নিপুণ রসায়নবিদ্ দাঁড়িয়ে ছিল। রঙিন জলের মাহাত্ম্যে, উজ্জ্বল রক্তবর্ণে তাকে দেখাচ্ছিল দেবশিশুর মতো। সে মুগ্ধ হোলো। তার আনন্দ সীমা ছাড়িয়ে উপচে পড়তে লাগলো। সে আরও বেশি ভালবাসলো।

"এই ছবি তার মনে অম্লান হয়ে রইল। পরের বছর আবার দেখা হোলো। স্কুলের কাছে বন্ধুদের সঙ্গে ছেলেটি গুলি খেলায় ব্যস্ত। ছিটকে পড়লো সে ছেলেটির কাছে। তারপর তাকে দু'হাতে বেঁধে ফেলে উন্মত্ত আবেগে চুমু খেতে লাগলো। ভয়ে ছেলেটি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো। তখন তাকে শান্ত করতে সে তার সমস্ত ধন সম্পত্তি —সত্তরটি 'সেঁত'* দিয়ে দিল। বড় বড় চোখ করে ছেলেটি এই সত্যিকারের সম্পদের দিকে চেয়ে রইল। সবগুলো নিয়ে তারপর যতখুশি তাকে আদর করতে দিতে একটুও আপত্তি করলো না।

"পরের চার বছর তার সমস্ত বাড়তি পয়সা সে ছেলেটির হাতে ঢেলে দিল। ছেলেটিও সব বুঝে পয়সার বদলে তাকে চুমু খেতে দিতে স্বীকৃত হোতো। কখনও পনের, কখনও চল্লিশ 'সেঁত' সে তুলে দিত তার হাতে। একবার মাত্র সাড়ে পাঁচ 'সেঁত' ছিল বলে সে

* ফরাসী মুদ্রাবিশেষ: এক ফ্রাঁ-র শতাংশ।

অপমানে দুঃখে কেঁদে ফেললো। কিন্তু সেবার সময় খুবই খারাপ যাচ্ছিল। শেষবারে ছিল পাঁচ ক্রাঁ। মস্ত গোলগাল এই মুদ্রাটি পেয়ে খুশীতে তার মুখে হাসি আর ধরেনি।

"বালকটিই ছিল তার ধ্যান জ্ঞান। তার ফিরে আসার প্রতীক্ষা করে সেও অধীর হয়ে পড়তো। তারপর তাকে দেখেই ছুটে গিয়ে সঙ্গ নিত। আর তার বালিকা হৃদয় আনন্দে নেচে উঠতো।

"তারপর ছেলেটিকে আর দেখা গেল না। সে পড়তে গেল দূরের কলেজে! কৌশলে প্রশ্ন করে সে খবরটা উদ্ধার করলো। বাবা-মা ঘুরতে ঘুরতে ঠিক ছুটির সময়টা যাতে এখানে এসে পড়ে, সে জন্য সে তার বুদ্ধি খাটাতে লাগলো। সফলও হোলো। কিন্তু তখন সময় গড়িয়ে গেছে। দু'বছর তার সঙ্গে দেখা নেই। তখন তার এতো বেশি পরিবর্তন হয়েছে, প্রায় চেনাই যায় না। এতো লম্বা আর এতো সুন্দর! পেতলের ঝকঝকে বোতামওয়ালা কোটে এতো মনভোলানো! গর্বিত যুবক কিন্তু তাকে না দেখার ভান করে তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

"দু'দিন সে কেঁদে কাটালো। তারপর পড়লো অসুখে। প্রতি বছরই এখানে ফিরে আসতো। আর নত হয়ে সম্মান না জানিয়ে স্পর্ধাভরে ছেলেটির সামনে দিয়ে হেঁটে যেত। যুবকও কখনো সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চোখ তুলতো না। তার ভালবাসা প্রগাঢ়। সে আমায় বলেছিল—'ডাক্তারবাবু, পৃথিবীতে পুরুষ দেখেছিলাম ঐ একজনকেই। আমার কাছে আর কারও অস্তিত্ব ছিল না।'

"মা-বাবার মৃত্যু হোলো। তাদের ব্যাবসাটা সে চালিয়ে গেল। কিন্তু এখন একটার জায়গায় দুটো ভয়ঙ্কর কুকুর হোলো তার সাথী, যাতে কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহস না পায়।

"তার অন্তরের অবস্থান এই গ্রামে ঢোকবার মুখে সে দেখলো তার বাঞ্ছিত প্রেমিকের বাহুবল্লভা এক রমণী বেরিয়ে আসছে ককেতের দোকান থেকে। ওর স্ত্রী। সে এখন বিবাহিত!

"সেই সন্ধ্যায় সে মেয়রের বাড়ির পুকুরে ঝাঁপ দিল। কিন্তু

একজন মাতাল তাকে জল থেকে তুলে ডাক্তারখানায় নিয়ে গেল। ককেত, সেই ছেলেটি, তার ঘরোয়া পোশাকে নেমে এলো। শুশ্রূষা করতে করতে চিনতে না পারার ভান করে তার পরনের জামা কাপড় ঢিলে করে দিল। মালিশ করে দিতে দিতে ধমকের সুরে বললো: 'কেন! তুমি কি বোকা! এ রকম মূর্খের মতো কাজ করার দরকার কি ছিল?'

"ওকে সারিয়ে তুলতে ঐ যথেষ্ট। সে তার সঙ্গে কথা বলেছে। অনেকদিন ধরে এটুকু তার মনে সুখ হয়ে রইল।

"পুরোপুরি ভিজিট নেবার জন্য মেয়েটি অনেকবার অনুরোধ করলো। কিন্তু সে নিল না। সারাটা জীবন তার এমনি করেই কেটে গেল। চেয়ারের আসন বুনতো আর ককেতের কথা ভাবতো। তার মস্ত জানলার পেছনে প্রতি বছর তাকে দেখতো। দরকারী ওষুধপত্র তার কাছ থেকে কেনা ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। একটু কাছে থেকে দেখা, দুটো কথা, আর সামান্য পয়সা দেওয়া—এই ছিল ওর লাভ।

"শুরুতেই বলেছি গত বসন্তে তার মৃত্যু হয়েছে। তার দুঃখের ইতিহাস সমাপ্ত করে সে মরবার আগে আমাকে অনুরোধ করেছিল যেন তার সমস্ত সঞ্চয় তার সেই আজীবনের প্রেমিকের হাতে তুলে দিই। কারণ তার জন্যই ওর কাজ করা। সে বলেছিল, তার জন্যই সামান্য সঞ্চয় করতে গিয়ে মাঝে মাঝে উপোসও দিতে হয়েছে। মৃত্যুর পর ছেলেটি অন্ততঃ একবার তাকে স্মরণ করবে এটুকু সে নিশ্চিত জেনে যেতে চেয়েছিল।

"সে আমায় দু'হাজার তিনশো সাতাশ ফ্রাঁ দিয়েছিল। তা থেকে সাতাশ ফ্রাঁ দিলাম পাদরীকে ওর কবর দেবার খরচ। শেষ নিঃশ্বাস পড়লে পর বাকিটা রেখে দিলাম।

"পরদিন নিজেই গেলাম ককেতের বাড়ি। সবে তারা ব্রেকফাস্ট শেষ করেছে। দুজনে মুখোমুখি বসে। ওষুধে শোধন করা টকটকে লাল মূল্যবান পানীয়ের বড় বোতল তাদের সামনে। তারা পরিতৃপ্ত।

"তারা আমায় বসতে বললো। একটা কার্শ* এগিয়ে দিল, আমি নিলাম। তারপর আমার বক্তব্য আবেগভরে বলে চললাম। ভেবেছিলাম শুনে ওদের চোখ শুকনো থাকবে না।

"কিন্তু তারা যখন বুঝলো একটা ভবঘুরে উড়নচণ্ডী চেয়ারমিস্ত্রী তাকে ভালবেসেছে, ককেত ঘৃণায় রাগে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। যেন মেয়েটি তার সর্বনাশ করেছে। তার সুনাম, সম্মান, সৎলোকের শ্রদ্ধা, এমন কিছু দুর্লভ ধন যা তার কাছে জীবনের চেয়েও প্রিয়—মেয়েটি যেন সব কেড়ে নিয়েছে।

"তার স্ত্রী বারবার বলে চললো : 'ভিখিরী! ভিখিরী! ভিখিরী!' উত্তেজনায় আর কোন কথা সে খুঁজে পেল না।

"উত্তেজিত ককেত বড় বড় পা ফেলে টেবিলটার চারপাশে পায়চারি শুরু করলো। তার গ্রীক টুপিটা কানের ওপর ঝুলে রইল। গজগজ করে সে বললো : 'ডাক্তারবাবু, ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন। একজন মানুষের জীবনে কি সাংঘাতিক ঘটনা! কি যে করবো? ওঃ! ও বেঁচে থাকতে আমি যদি জানতে পারতাম, তবে নিশ্চয়ই ওকে এ্যারেস্ট করিয়ে জেলে পুরে রাখতাম। আর আপনি শুনে রাখুন, ও কিছুতেই ছাড়া পেত না।'

"আমার মহৎ বক্তব্যের এই পরিণাম দেখে বোকা বনে গেলাম। কি বলবো, কি করবো, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু আমার কর্তব্য সাধন করতে হবে। তাই বললাম : 'সে মহিলা তার সমস্ত সঞ্চয় দু'হাজার তিনশ ফ্রাঁ আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছে আপনার কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে। আমার বক্তব্য শুনেই যখন আপনাদের অসহ্য লাগছে, তবে বোধহয় টাকাটা গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়াই ভাল হবে।'

"শোক সামলে না উঠতেই স্বামী স্ত্রী দু'জনেই আমার দিকে তাকালো। টাকাগুলো পকেট থেকে বের করলাম। দেশের আনাচ কানাচ থেকে কুড়িয়ে-আনা টাকা। সু থেকে স্বর্ণ মুদ্রা, খুচরো থেকে

---

রাসায়নিক দ্রব্যে পরিশোধিত এক রকমের মদ।

আস্ত—সবই আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'আপনারা কি ঠিক করলেন ?'

"মাদাম ককেত মুখ খুললেন। বললেন : 'মেয়েটির যখন শেষ ইচ্ছা ছিল ; আমার মনে হয় ওটা ফিরিয়ে নেওয়া নিষ্ঠুরতা হবে।'

"স্বামীটি একটু হকচকিয়ে গিয়ে উত্তর করলো : 'আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য সব সময়ই আমরা ঐ টাকা থেকে কিছু না কিছু কিনতে পারি।'

"আমি শুকনো গলায় মন্তব্য করলাম : 'আপনাদের যা খুশি'।

"সে বলে চললো : 'হ্যাঁ, টাকাটা আমাদেরই দিন, মেয়েটি তো আপনাকে সেই রকমই বলে গেছে। আমরা সব সময়ই কোন না কোন ভাল কাজে ওগুলো খরচ করবো।'

"আমি টাকাগুলো ঢেলে দিলাম। তারপর অভিবাদন জানিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

"পরদিন ককেত আমার ওখানে এসেই অভদ্রের মত বললো : 'সে নিশ্চয় এখানে একটা গাড়ি ফেলে গেছে, সেই—সেই মেয়েটা। আপনি সেটা দিয়ে কি করবেন ?'

" 'কিছুই না', বললাম। 'ইচ্ছা হলে আপনি নিয়ে যান।'

"ঠিক বলেছেন, আমিও তাই চাই। ওটা দিয়ে আমার রান্নাঘরে স্টোভের ওপর একটা ছাউনী দেব।'

"সে চলে যাচ্ছিল। তাকে ফিরে ডাকলাম। 'সে তার বুড়ো ঘোড়া আর দুটো কুকুরও ফেলে গেছে। সেগুলো আপনার চাই না ?'

"সে আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়ালো। 'এ্যাঁ! ও না', সে বললো, 'ওগুলো দিয়ে আমি কি করব ? আপনার ইচ্ছে হলে ওগুলো আপনি বিলিয়ে দিন।'

"তারপর হেসে সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। করমর্দন করলাম। এ ছাড়া আর কি করবো ? আমাদের দেশে ডাক্তার হয়ে ওষুধ ব্যবসায়ীর সঙ্গে শত্রুতা রাখা চলে না।

"কুকুর দুটো আমি বাড়িতেই রেখেছি। যাজকের মস্ত ক্ষেত আছে, তাই ঘোড়াটা তিনি নিয়েছেন। গাড়িটা কুকুরের কুঠুরি হয়েছে। আর ওই টাকায় সে পাঁচটা রেলওয়ে বণ্ড কিনেছে।

"এই একমাত্র গভীর ভালোবাসা আমি আমার জীবনে দেখেছি।"

ডাক্তার চুপ করলেন। মারকুঁ জলভরা চোখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : 'দেখা গেল, মেয়েরাই শুধু ভালবাসতে জানে।'

## জ্যোৎস্না

মাদাম জুলি রুবি তার বড় বোন মাদাম লেতোরের পথ চেয়ে আছে। মাদাম লেতোর সুইজারল্যাণ্ড থেকে বেড়িয়ে ফিরছেন।

লেতোরেরা প্রায় সপ্তাহ পাঁচেক আগে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু জমিদারির কাজে কালভাদোসে স্বামীর ডাক পড়ল। তিনি একাই সেখানে গেলেন। মাদাম লেতোর এই ক'টা দিন প্যারিসে বোনের বাড়ি কাটিয়ে যাবেন।

রাত আসছে। গোধূলি বেলায় নিঝুম বৈঠকখানায় আলোছায়ার খেলা। মাদাম রুবির হাতে খোলা বই। কিন্তু পড়ায় মন নেই। বার বার চোখ তুলে দেখছে। কোন শব্দ হলেই কান পেতে শুনছে।

অবশেষে দরজায় কলিং বেলের শব্দ আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শৌখিন বেশে তার বোনের আবির্ভাব। দেখা মাত্র গভীর আগ্রহে তুজনে তুজনকে জড়িয়ে ধরলো, কেতাবী আদবকায়দার ধার ধারলো না। মুহূর্তের জন্যে বন্ধন শিথিল করে তাবা আবার নিবিড় আলিঙ্গনে বন্দী হলো। তারপর শুরু হলো কথাবার্তা। উভয়ের শারীরিক ও পারিবারিক কুশল জিজ্ঞাসা, হাজারো রকমের প্রশ্ন আর আবোল তাবোল গালগল্প। একটা প্রসঙ্গ শেষ না হতেই লাফ্ দিয়ে আর একটায় যাওয়া। এই দ্রুত আলাপ আলোচনার মাঝখানেই মাদাম লেতোর টুপি আর উড়ানি খুলে রাখলেন।

অন্ধকার নিবিড় হয়ে এল। মাদাম রুবি বাতি আনতে বলল। আলো এলে বোনের মুখ ভাল করে দেখে আর একবার জড়িয়ে ধরতে গেল। কিন্তু দিদির চেহারা দেখে বিস্ময়ে আতঙ্কে পেছিয়ে এল। মাদাম লেতোরের কানের তুধারে তু'টি শুভ্র কেশগুচ্ছ। বাদবাকী সব উজ্জ্বল কুচকুচে কালো। মনে হয় তার মাথার তু'পাশে

হু'টি রূপালী ঝরণা চলতে চলতে পুঞ্জীভূত কালিমায় পথ হারিয়েছে। অথচ তার বয়স মাত্র চব্বিশ। সুইজারল্যাণ্ড যাওয়ার সময়ও এ রকম ছিল না।

হতভম্ব মাদাম রুবি স্তব্ধ হয়ে দিদির দিকে তাকিয়ে থাকল। নিশ্চয় কোন নিগূঢ় ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটেছে। চোখহুটি জলে ভরে এল। সে জিজ্ঞেস করল: "দিদি, তোমার কি হয়েছে?"

বিদীর্ণ হৃদয়ের ব্যথাতুর হাসি দেখে মাদাম লেতোর জবাব দিলেন: "দেখেছিস আমার চুল পেকেছে?"

মাদাম রুবি আবেগে দিদির কাঁধ চেপে ধরল। তার মুখে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে বলল: "তোমার হয়েছে কি? আমায় বল কি হয়েছে। মিথ্যে বললে কিন্তু আমি ঠিক ধরে ফেলবো।"

হুজনে মুখোমুখি বসে। মদোম লেতোর এত হুর্বল যেন মূর্চ্ছা যাবেন। তাঁর চোখের কোণে নিটোল মুক্তাবিন্দুর মতো হু-ফোঁটা জল।

বোন প্রশ্ন করে চলেছে: "ব্যাপার কি? কি হয়েছে? উত্তর দাও!"

তখন অভিভূত স্বরে গুন্ গুন্ করে মাদাম লেতোর বললেন: "আমি একজনকে ভালবাসি—আমি ভালবাসি।"

ছোট বোনের কাঁধে মুখ লুকিয়ে তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। যখন উত্তাল বুকের স্পন্দন একটু শান্ত হল, মাদাম লেতোর মুখ তুললেন। অন্তরের গোপন ব্যথা সমব্যথী একটি হৃদয়ে ঢেলে দিয়ে হাল্কা হতে চাইলেন।

হু'টি নারী পরস্পরের হাত শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরে ঘরের অন্ধকার কোণে একটি সোফায় এলিয়ে রইল। ছোট বোন এক-হাতে বড় বোনের গলা জড়িয়ে তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে শুনতে লাগলো।

"ওফ্। জানি, আমি ক্ষমার অযোগ্য। নিজেকেই বুঝতে পারছি না। সেদিন থেকে মনে হচ্ছে আমি যেন পাগল হয়ে গেছি! সাবধানে থাকিস বোন—নিজেকে সামলে রাখিস।

"যদি জানতিস্ আমরা কত দুর্বল। কত অল্পেই না আমরা নিজেদের বিলিয়ে দিই। আমরা সামান্য দুঃখে গলে যাই, ক্ষণিকের মমতার স্পর্শে ভালবেসে ফেলি, বাহু মেলে আলিঙ্গনে ধরা দিই। আর সেই মুহূর্তের সুযোগে ওরা আমাদের মন চুরি করে নিয়ে যায়।

"তুই তো আমার স্বামীকে জানিস। আর এও জানিস, তিনি আমায় কত ভালবাসেন। কিন্তু তিনি প্রাজ্ঞ, বিবেচক। রমণী মনের ভালবাসার কম্পন তিনি মোটেই বুঝতে পারেন না। সর্বদা-সব সময়েই তাঁর এক রূপ। সর্বদা ভাল, সদা প্রফুল্ল, সব সময় দয়ালু, চিরকালের সচ্চরিত্র। হায়! কত সময় সাধ হত—উনি আমায় দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরুন। যে চুম্বনে দু'টি সত্তা একাকার হয়ে যায়, যার মাধুর্য অনুক্ত গোপন কথার মতো—সেই মৃদু, সুমিষ্ট চুমোয় ভরিয়ে দেন। আমি ভাবতাম, উনি যদি আত্মভোলা হতেন, অথবা দুর্বল, তাহলে আমাকে ওঁর প্রয়োজন হত। আমি তবে চোখের জলে, আদরে যত্নে ওঁকে কাছে পেতাম।

"এ সবের হয়তো কোন যুক্তি নেই। কিন্তু নারীকে বিধাতা এমনি করেই সৃষ্টি করেছেন। কেমন করে আমি এর থেকে মুক্তি পাব?

"তবু স্বামীকে প্রতারণা করার কথা আমি কখনও চিন্তা করিনি। কিন্তু এখন তাই করছি। এর কোন কারণ নেই। ভালবাসা বা অন্য কিছু নয়। লুর্সান হ্রদের ওপর এক জ্যোৎস্না-যামিনীই আমাকে অশান্ত আনমনা করে তুলেছে। যে মাসে আমরা একসঙ্গে বেড়াচ্ছিলাম, প্রশান্ত ঔদাসীন্যে স্বামী আমার ভারাবেগ অবশ করে দিলেন। আমার দুর্বার কাব্যতৃষ্ণা শুকিয়ে মরে গেল। অরুণোদয়ের পর পাহাড়ী পথ বেয়ে আমরা নেমে আসতাম। জোড়ায় জোড়ায় ঘোড়া কঠিন পরিশ্রমে কদম মিলিয়ে ছুটে যেত। স্বচ্ছ কুয়াশার মধ্যে দিয়ে উপত্যকা, অরণ্য, নির্ঝরিণী, গ্রাম অপরূপ হয়ে উঠতো। আমি আবেশভরে তাঁর হাত ধরে একদিন বললাম: 'অপূর্ব দৃশ্য। প্রিয়তম, আমায় একটা চুমু দাও'। তিনি নিরুত্তাপ করুণায় একটু

হেসে জবাব দিলেন : 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তোমার ভাল লাগছে বলে আমাদের চুমু খেতে হবে—সত্যি এর কোন মানে হয় না।'

"তাঁর কথায় আমার অন্তর বরফ হয়ে গেল। মনে হোলো নিসর্গ শোভার চেয়ে পরস্পারের প্রেমের মধ্যেই মানুষের বেশি অভিভূত হওয়া উচিত।

"বস্তুতঃ, আমার প্রাণে যে বেগবতী কল্পনার জোয়ার উছলে উঠতো, তিনি তাকে বাইরে প্রবাহিত হতে বাধা দিতেন। কি করে বোঝাবো? আমি যেন একটা টগ্‌বগে স্টীম ইঞ্জিন। কিন্তু একটু বাষ্প যাতে বেরিয়ে না যায় সেজন্য শক্ত করে মুখ বাঁধা।

"এক সন্ধ্যায় ( যখন আমরা হোতেল ড্য ফ্লুলেনে ছিলাম ) ওঁর বিশ্রী রকমের মাথা ধরলো। রাতের খাওয়া তাড়াতাড়ি শেষ করে উনি শুয়ে পড়লেন। আর নিঃসঙ্গ আমি একটু বেড়াবো ভেবে হ্রদের ধারে চলে এলাম।

"সে এক রূপকথার রাত। পূর্ণিমা চাঁদ তখন মাঝ আকাশে। উচ্চ পর্বতমালার তুষার বেষ্টিত শৃঙ্গরাজি যেন রূপার মুকুট পরেছে। মৃদু ঢেউয়ের দোলায় হ্রদের জল চিক্‌মিক করছে। মনমাতানো সুমিষ্ট মৃদুল হাওয়ায় হৃদয় কোমল হয়ে আসে। ধীরে ধীরে চেতনা বিলুপ্ত হতে থাকে। অতল বিষাদে মন আচ্ছন্ন হয়। আর এমন মনোরম মুহূর্তে স্পর্শকাতর মনের সে কি' স্পন্দন। হৃদয়তন্ত্রীতে সে কী মূর্চ্ছনা! অতুলনীয় তখনকার ভাবগভীরতা।

"স্বচ্ছন্দে ঘাসের ওপর বসে পড়লাম। প্রকাণ্ড হ্রদ বিষণ্ণ মোহময়। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার সারা শরীরে অদ্ভুত শিহরণ খেলে গেল। অন্তরে অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা আকুল হয়ে উঠলো। বৈচিত্র্যহীন অবসন্ন জীবনের বিরুদ্ধে মন বিদ্রোহী হোল। কেন? এই তটভূমিতে আমার বাঞ্ছিত পুরুষ তার দু'হাতের মধ্যে আবেগভরে আমায় নিষ্পেষণ করবে— এমন ভাগ্য আমার কোনদিন হবে না কেন? তাহলে কোনদিন কি আমার ওষ্ঠ সেই সুগভীর, সুমধুর উদ্দীপনাময় চুম্বন পরশ

পাবে না? বিধাতা-সৃষ্ট এমন রাতে যুগলপ্রাণের যে প্রেমাসক্ত আলিঙ্গন—তার স্বাদ চিরকাল আমার অনুভবের বাইরে থাকবে? একটি গ্রীষ্মরাত্রির জ্যোৎস্নাবিধৌত ছায়াছবির মধ্যে উদ্দাম উন্মত্ত ভালবাসা আমি কোনদিন জানতে পারবো না!

"অবোধ অবুঝ মেয়ের মতো আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। পেছনে কার পায়ের শব্দ হল। একটি লোক একদৃষ্টে আমায় দেখছিল। তার দিকে তাকালাম। সে আমায় চিনতে পেরে এগিয়ে এসে বলল: 'মাদাম আপনি কাঁদছেন?'

"সে একজন তরুণ ব্যারিস্টার। মায়ের সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। তার সঙ্গে আমাদের প্রায়ই দেখা হতো। ভদ্রলোক বারবার আমায় লক্ষ্য করত। আমি কিন্তু পরিস্থিতির কথা ভাবতে পারছিলাম না। তাকে যে উত্তর দেব তাও ভেবে পাচ্ছিলাম না। শুধু বললাম—আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি।

"সে স্বচ্ছন্দে এবং সসম্ভ্রমে আমার পাশটিতে এসে বসল। তারপর বেড়াতে বেরিয়ে আমরা কোথায় কি দেখেছি, সেসব নিয়ে আলোচনা শুরু করল। আমার অনুভূতিকে সে বাক্যে রূপ দিল। যে সব বস্তু আমার মনে রোমাঞ্চ জাগিয়েছিল সে যথার্থভাবে তার স্বরূপ উপলব্ধি করল। এমন কি মনে হোলো সে যেন আমার চেয়েও ভালভাবে বুঝেছে। হঠাৎ এক সময় আলফ্রেদ মাসেতের প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করল একটির পর একটি। অবর্ণনীয় ভাবাবেশে আমার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল। মনে হল—পর্বতশ্রেণী, হ্রদের জল, চাঁদের আলো—সকলে মিলে এক অবর্ণনীয়, সুস্নিগ্ধ জগতের সংগীত আমার কানে ঢেলে দিচ্ছে।

"জানিনা কি করে, বলতে পারবো না কেন—এক অপরূপ মায়ার মতো ঘটনাটা ঘটে গেল।

"তার বিদায় নেবার দিন সকালে আবার তার সঙ্গে দেখা। এর মধ্যে আর দেখা হয়নি। তার নাম ঠিকানা সে দিয়ে গেছে।"

বোনের বাহুতে মাথা গুঁজে মাদাম লেতোর আবার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলেন।

বোন রুবি অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করল। থম্‌থমে মুখে অতি ধীরে দিদিকে বলল : "দিদি, অনেক সময়ই বিশেষ কোন ব্যক্তিকে ভাল না বেসে আমরা অন্তরের ভালবাসাকেই ভালবাসি। সে রাত্রিতে তোমার প্রকৃত প্রেমিক ছিল ওই জ্যোৎস্না।"

# মহান আদর্শ

ভিয়েনায় আমার অগুণতি বন্ধুর মধ্যে একজন আছে লেখক। তার শিশুসুলভ আদর্শবাদে আমার ভীষণ আমোদ। তার আদর্শের জন্য আমার কৌতুক নয়। কেননা নৈরাশ্যবাদী হলেও মূলে আমার মনেও আদর্শবাদের আবাস। তাই নিজের সম্বন্ধে অতি সচেতন বলেই অন্যের আদর্শবাদিতা নিয়ে আমি কখনও পরিহাস করি না। কিন্তু বন্ধুর আদর্শের ধরনটা ভারি আজগুবি।

বন্ধু আমার প্রতিভাবান, চিন্তাশীল, কিন্তু অনভিজ্ঞ। সমালোচনায় তার বিচার বুদ্ধি স্বচ্ছ, পক্ষপাতশূন্য। সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য অথবা অন্য কোন বিষয়েই তার মোহ ছিল না। বিশেষ করে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তো একেবারেই নয়। কিন্তু এক বিষয়ে ব্যতিক্রম। অভিনেত্রী, থিয়েটারের রাজনন্দিনী আর নায়িকাদের প্রসঙ্গ উঠলেই সে অন্য মানুষ। তখন সে বদ্ধ পাগলের মতো আশাবাদী। হেক্‌লাদ্রর মতো যে সব ব্যক্তি রঙ্গমঞ্চের বাইরে আর কোথাও পবিত্রতার আদর্শ খুঁজে পায় না, সে ছিল তাদেরই একজন।

আমার বন্ধু সর্বদাই কোন না কোন অভিনেত্রীর প্রেমে মশগুল। অবশ্য ভাব জগতে। মনে মনে নিজেকে কোন উদীয়মানা শিল্পীর সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত প্রেমিকরূপে কল্পনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করত।

মানস সুন্দরীদের ফটো সর্বদাই তার বুক পকেটে বিরাজমান। খোশ মেজাজে থাকলে আমাকে একটি একটি করে দেখাত। তাদের কারো মুখে—আমি অন্তত—প্রশ্রয়ের ছিটেফোঁটা হাবভাবও দেখিনি।

একদিন আমরা প্রাতের একটা কাফেতে বসেছি, বন্ধু বাক্যব্যয় না করে একখানা ছবি টেবিলের ওপর আমার চোখের সামনে বিছিয়ে রাখল। একটি সুন্দরী মেয়ের ছবি। তার অবয়ব খোদাই

মূর্তির মতো নিখুঁত, তবু সবচেয়ে আগে আমার নজর গেল তার সাদা চোখ দুটির দিকে। বললাম: "যদি জীবন্ত নারীর মতো কালো চুল না থাকত, আমি একে মূর্তি বলেই ধরে নিতাম।"

"সত্যিই তাই"—বন্ধু জবাব দিল,—"ভেনাসের মূর্তি বুঝি বা মিলোর ভেনাস নিজেই।"

"এ কে?"

"একজন তরুণী অভিনেত্রী।"

"তোমার বেলায় নিশ্চয়ই তাই হবে; আমি জানতে চাইছি এর নামটি কি?"

উত্তরে বন্ধুর ছোটোখাটো বক্তৃতা। এ নাম এখন জার্মানীব রঙ্গমঞ্চে সবচেয়ে বেশি পরিচিত, এ নামেব সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক কাহিনী, অনেক রহস্য, এই নাম এখন ভিয়েনাবাসীর মুখে মুখে, ইত্যাদি ইত্যাদি···। ভেনাসের সঙ্গে এই ছবির তুলনা নির্দোষ আনন্দের পর্যায়ে পড়ে; কিন্তু এব নাম আমি এই প্রথমবাব শুনলাম।

আমার বন্ধু তাকে বিরল প্রতিভা আর পবিত্রতাব দেবী বলে উল্লেখ করল। প্রথমটা আমি বিশ্বাস কবলাম, কিন্তু দ্বিতীয়টি নয়। ঐ একটি বিষয়ে আমি কিছুতেই পরের মুখে ঝাল খেতে বাজী নই।

কিছুদিন পর না জেনে আমার আব এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর এ্যালবামের পাতা ওল্টাচ্ছি হঠাৎ সেই আশ্চর্য মৃতনয়না বমণীব সঙ্গে সাক্ষাৎ।

আমার এই বন্ধুবর কিছুটা ইন্দ্রিয়াসক্ত, অগোছালো ভিয়েনীজদের মতো স্বভাব। আমি শুধালাম: "তুমি কি করে এই ভেনাসের ছবি পেলে?"

বন্ধুর জবাব: "হ্যাঁ ভেনাসই বটে, তবে এত সস্তা দবের যে, গ্রাবেঁ* গেলেই সাক্ষাৎ পাবে। ঐ স্থানে ওদের আদর্শ কুঞ্জবন।"

"অসম্ভব!"

*—যে রাস্তায় বড় বড় বিপণি আর রূপসী পণ্য স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ মেলে।

"দিব্যি করে বলছি, সত্যিই তাই।"

এরপর আমার বলার কিছুই রইল না। আমার বুদ্ধিমান বন্ধুর এই নতুন আবিষ্কার, সেই উচ্চতম নাট্যপ্রতিভার অধিকারিণী—একজন পসারিণী ভেনাস!

কিন্তু বন্ধু একদিক থেকে ভুল করেনি। তার বিস্ময়কর অভিনয় প্রতিভা সম্বন্ধে বন্ধু প্রতারিত হয়নি। কিছুদিনের ভেতরেই মেয়েটি নাট্যজগতে প্রতিষ্ঠা পেল। শহরতলীর ছোট রঙ্গমঞ্চ থেকে একটা প্রধান রঙ্গশালায় স্থান করে নিল। দু' বছর না ঘুরতেই পার্শ্ব চরিত্রের অভিনয় ছেড়ে মুখ্য পদ লাভ করল।

তার উন্নতিতে আমার বন্ধুর নেপথ্য প্রচেষ্টা কম ছিল না। বন্ধু ঐ প্রধান রঙ্গশালার পরিচালকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বন্দোবস্ত করে দেয়। ভদ্রলোকেরও কোন সংস্কার ছিল না। তাই একটা মহড়ায় মেয়েটিকে বাজিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে দলে নিয়ে নিলেন।

তারপর নানা জায়গায় মেয়েটিকে নায়িকা করে পাঠানো হোলো। মেয়েটির সঙ্গে আমার বন্ধুও যেত। যাতে তার অভিনয়ের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে, সে দিকে দৃষ্টি বাখত। শীলারেব 'মেরী স্তুয়ার্ত' মঞ্চ অবধি তার অভিনয়ের প্রশংসা ব্যাপ্ত হোলো। এই ভাবে ভ্রাম্যমাণ অভিনয় শেষ হবার আগেই উত্তরাঞ্চলের এক শহরে বেশ বড় একটা থিয়েটারের সঙ্গে তার চুক্তি হয়ে গেল। এইবার তার বিজয় নিশান আকাশে উঠে গেল। বছর না ঘুরতেই তার সুনামে চারদিক মুখরিত হোলো। ফলে কোর্ট থিয়েটারের ম্যানেজারের আমন্ত্রণ এসে হাজির।

প্রথমে কিছু সংশয় যে ছিল না তা নয়। কিন্তু নিরসন হতে দেরি হোলো না। পর পর প্রদর্শনীতে তার প্রশংসাধ্বনি উত্তাল হয়ে উঠল। এইভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হয়ে গেল। কোর্ট থিয়েটারের নায়িকাপদ তারই জন্য তোলা রইল।

এক বিখ্যাত লেখকের একটা ঝাঁঝালো নাটকে সে নায়িকা

সাজলো। অভিনয় শেষে নামজাদা মহাজন, বিখ্যাত ধনী—সব এসে তার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল। জনপ্রিয়তা আর খ্যাতির চূড়ায় উঠে সে রাজধানীর মক্ষীরাণীর আসন দখল করে বসল।

তার বাড়ি হোলো। চারদিকে বিলাসের স্রোত বইল। এই উন্নত স্তরে আমার বন্ধুর স্থান হোলো না। নাগাল না পেয়ে আদর্শবাদী বুদ্ধিমান প্রেমিকের মতো অলক্ষ্যে বিদায় নিয়ে নতুন প্রতিভার সন্ধানে ছুটল।

কিন্তু এই মৃতলোচনা পাষাণ-হৃদয়া নারী নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আদর্শবাদীদের হৃদয় দলিত মথিত করবে—এই বোধহয় অদৃষ্টের লিখন। মোহিনীর খপ্পর থেকে একজন ডানা মেলে উড়ে যেতে না যেতেই আর একজন নীড় ছেড়ে তার জালে এসে বন্দী হোলো।

এবার একটি তরুণ ছাত্র। ছেলেটির না আছে রূপ, না আছে পরিবারের খ্যাতি। ধনী তো নয়ই। এমনকি অবস্থাও ভালও বলা চলে না। কিন্তু নিষ্ঠাবান, বুদ্ধিমান এবং ভাবপ্রবণ! ছাত্রটি তাকে 'মেরী স্তুয়ার্ত' মঞ্চে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছে।

'অরলিনসের মেয়ে' 'ক্যামেলিয়ার সহিত নারী,' ফরাসী নাট্যকারদের এমনি সব নাটকে তাকে দেখা গেল। কারণ পরিচালক তাকে পরীক্ষা করছিলেন, আর এই পরীক্ষায় সবগুলোতেই সে সসম্মানে উতরে গেল।

বেচারী দরিদ্র ছাত্রটি এই উদীয়মানা মঞ্চতারকার জন্য আত্মহারা হোলো। কল্পনায় তার প্রেমে পাগল হয়ে গেল।

প্রেয়সীকে দুচোখ ভরে দেখবার বাসনায় সে প্রায় উপোস করে এক পেনি এক পেনি করে জমিয়ে রাখত। সামনের সারিটি ছিল তার জন্য বাঁধা। পাছে অলিম্পাস* বেদখল হয়ে যায় এই

*—রোমান দেবতা জুপিটারের সিংহাসন। জুপিটারের অবস্থান অলিম্পাস পর্বতে। এখানে নাট্যামোদীদের জন্ত সংরক্ষিত আসন।

ভয়ে দরজা খোলার পুরো তিন ঘণ্টা আগে থেকে সে এসে ঠায় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত। মঞ্চের ওপর নায়িকাকে দেখেই তার মুখ ফ্যাকাশে, বুকে তুফান। নায়িকাকে কাঁদতে দেখলে সে উল্লাসে উছলে উঠত! সজোরে হাততালি দিয়ে প্রশংসা করত। যেন এই কান্নায় নারী হৃদয়ের সর্বোত্তম উপচার সজ্জিত রয়েছে। হায়, তবু তার মানসী তাকে চিনত না, এমন কি তার উপস্থিতিটুকুও জানত না!

অবশেষে কোর্ট থিয়েটারের নিয়মিত দর্শকদের দৃষ্টি পড়ল ছেলেটির ওপর। তার পাগলামি নিয়ে শুরু হোলো মুখরোচক আলোচনা। কানাঘুষোয় কথাটা স্বয়ং নায়িকার কানেও গেল। কিন্তু উন্মাদ যুবকের কাছ থেকে কোন দামী গয়না আসেনি—এমনকি একটা ফুলের তোড়াও নয়। কাজেই সে অনেকদিন অচেনাই থেকে গেল।

শেষকালে যুবক তার প্রেয়সীর মনোযোগ আকর্ষণে সফল হোলো।

হলঘরের বাইরে এক মহাজনের দামী গাড়ি অভিনেত্রীর প্রতীক্ষায় থাকত। অভিনয় শেষে দর্শকেরা বিদায় নিলে নায়িকা বহুমূল্য পশমী পোশাকে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে সেই গাড়িতে উঠে বসত। প্রেমে উন্মাদ যুবক গোড়ালি বরফে ডুবিয়ে, বৃষ্টিতে ভিজে তার দর্শন প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থাকত।

অভিনেত্রী প্রথমে তাকে খেয়ালই করেনি। কিন্তু ঝি কানে কানে কিছু বলায় সে অবাক হয়ে তাকাল। সেই দুটি আশ্চর্য ডাগর আঁখি। কিন্তু মৃত নয়। উজ্জ্বল কৃষ্ণ। এক পলকের দৃষ্টি প্রসাদে যুবক ধন্য। ঐ চাহনিতে তার সমস্ত দুর্ভোগের জ্বালা জুড়িয়ে গেল। মনে গর্বিত দুরাশার সঞ্চার। নম্র আদর্শবাদী ছাত্রের আশা বেড়ে চলল।

ধীরে ধীরে রঙ্গালয়ের রাজকন্যা আর তার মূক প্রেমিকের মধ্যে অকথিত ভাব বিনিময় হোলো। গাড়ির পা-দানিতে দাঁড়িয়ে সে

একবার চোখ তুলত যুবকের দিকে। প্রেমিক যুবকের দৃষ্টি তার সর্বাঙ্গে পরশ বুলিয়ে দিত। তাই দেখে পরিতৃপ্ত নারী গিয়ে গাড়িতে উঠে বসত। কিন্তু সে ফিরে তাকালে দেখতে পেত তার উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক গাড়ির পিছনে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে আসছে। দেখতে পেত যুবক তার রুদ্ধদ্বারের বাইরে শ্রান্ত দেহ এলিয়ে দিয়েছে।

গ্রীষ্মকালে একদিন ঝড় উঠল। ক্রুদ্ধ বাতাসের সরোষ গর্জনে চিমনির গায়ে বিকট আওয়াজ। জানালায় দরজায় বৃষ্টিধারার প্রবল আঘাত, পথের ওপর জলবন্যা। হতভাগ্য ছাত্রটি প্রেমিকার ঘরের বাইরে পাষাণ সোপানে পড়ে আছে। এমন সময় নিঃশব্দে সন্তর্পণে দরজা খুলে গেল। একজন তরুণ অফিসার [illegible] [illegible]। অফিসার ছোট সুন্দর সারবারাস*টিকে আদর করে [illegible]নেত্রীর হাতে একটি স্বর্ণমুদ্রা গুঁজে দিল।

চলতে গিয়ে হঠাৎ বাইরে শায়িত যুবকটির গায়ে পা ঠেকল। একসঙ্গে তিনজনের চিৎকার শোনা গেল। মেয়েটি ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিল, অফিসার অভ্যাসবশে তলোয়ার অর্ধেক টেনে বার করল, আর ছাত্রটি দৌড়ে পালাল।

সেই রাত্রির পর থেকে ঐ দরিদ্র, প্রমত্ত লোকটি তার কোমরবন্ধে একটা ছোরা লুকিয়ে রাখত। ছোরাটি এখন তার দিবারাত্রির একমাত্র সঙ্গী। থিয়েটারের ভেতরে, দরজার বাইরে—যেখানে অভিনেত্রীর জন্য গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত, তার বাড়ির দরজায়—যেখানে সে জ্বালাময় রাত্রির প্রহরী—সর্বত্র ছোরাটি তার সঙ্গেই থাকত।

প্রথমে সে ভাবল তার ভাগ্যবান প্রতিদ্বন্দ্বীকে আর প্রেয়সীকে খুন করে নিজে আত্মহত্যা করবে। কিন্তু আবার সে তার দরজায় ধরনা দিল। সড়কে দাঁড়িয়ে মেয়েটির বাতায়ন পথে সচল ছায়াগুলিকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। নারীর মোহিনী শক্তিরই জয় হোলো।

---

—* প্লুটোর বহু মস্তক বিশিষ্ট কুকুর, যে যমালয়ের দরজায় পাহারা দিত।

[illegible]

এরপর এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। যুবক বিস্মিত, হতচকিত, বিহ্বল হয়ে গেল।

রূপসী রমণী তখন একটা নামকরা নাটকে অভিনয় করছে। এক সন্ধ্যায় সে নাটক শেষ হয়ে যাবার পর অনেকক্ষণ দেরি করে গাড়ির কাছে এল। গাড়ির ভেতর উঠেও দরজা বন্ধ করল না। আদর্শবাদী ছাত্রটিকে ইশারায় কাছে ডাকল।

হতাশার অতল থেকে উঠে এসে যুবক আনন্দের সাগরে ভেসে গেল। ছুটে গেল তার কাছে। সারাটা পথ প্রেয়সীর পদপ্রান্তে বসে সে তার হাতদুটিকে চুমোয় ভরে দিল। মেয়েটি খুশী মনে চুপচাপ সব মেনে নিল। বাড়ির দরজায় গাড়ি থামলে প্রেমিক যুবক তাকে ধরে নামাল, হাতে হাত জড়িয়ে তারা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

অভিনেত্রী পোশাক বদলাতে গেলে তার পরিচারিকা যুবককে একটি সুসজ্জিত বিলাসবহুল বৈঠকখানায় নিয়ে বসালো।

একটু বাদে ঘরোয়া সাজে অভিনেত্রী এসে একটা আরাম কেদারায় গা ঢেলে দিল। যুবকটিকে পাশে ডেকে বসালো। তারপর বলল :

"আমাকে তোমার খুব ভাল লাগে, তাই না?"

"তুমি আমার সাধের স্বপ্ন!"—উৎসাহের আতিশয্যে ছাত্রটি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

থিয়েটারের রাজকন্যা একটু হেসে বললে: "বেশ, যে করেই হোক, আমি সাধের স্বপ্ন হয়েই থাকবো। তোমায় প্রতারণা করবো না। আর তোমার নবীন যৌবনের অত্যুগ্র আবেগ আমি অপব্যবহার করেছি—একথা তুমিও বলতে পারবে না। আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করবো"

তার পদতলে লুটিয়ে হতভাগ্য আদর্শবাদী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল "ওঃ! ভগবান!"

তার সাধের স্বপ্ন স্মিত হাস্যে জবাব দিলো: "আঃ! থামো!

এক মুহূর্ত দাঁড়াও।—আগে শোনো! আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। অভিনেত্রী—অথবা তুমি আমায় যে নামেই ডাকো—সেই মেয়েকে যারা প্রয়োজনীয় বিলাস উপকরণ যোগাতে পারে, সে কেবল তাদেরই ভালবাসতে পারে। যতদূর জেনেছি—তুমি গরীব। তবু তোমায় আমি নিরাশ করবো না।—কেবলমাত্র আজকের রাতটা তোমার। কিন্তু তার বদলে তোমায় শপথ করতে হবে, কাল রাত থেকে আর আমার পিছু নেবে না। আমার সম্বন্ধে আবোল তাবোল বলবে না। কি, করতে পারবে?"

ভাগ্যতাড়িত যুবকের বুকের পাঁজর ক'খানাকে যেন মড়মড় করে ভেঙে দিলো। হাঁটুগেড়ে বিবর্ণ মুখে তার সামনে বসে থাকলো। অভিনেত্রী আবার প্রশ্ন করলো: "কি, রাজী?"

"হ্যাঁ।"—যুবকের গলায় গোঙানো আওয়াজ। পরদিন সকালে এক ব্যক্তি তার আদর্শের সমাধি দিয়ে টলতে টলতে নীচে নেমে এলো। শুকনো, মড়ার মতো সাদা তার চেহারা। কিন্তু তবু এখনও সে বেঁচে আছে। আর এখন যদি তার কোন সাধের স্বপ্ন থেকেও থাকে, নিশ্চয় তা কোন রঙ্গমঞ্চের রাজকন্যা নয়।

# প্রেয়সীর চাপরাসী

এখন সে একজন নামকরা মহিলা, মার্জিত বুদ্ধিমতী এবং স্বনামধন্যা অভিনেত্রী। কিন্তু ১৮৪৭ সালে, যখন থেকে আমাদের কাহিনীর সূত্রপাত, তখন কেউ তাকে চিনত না। রূপ ছিল, কিন্তু মান মর্যাদা কিছুই ছিল না। উঠতি বয়সের এক প্রতিভাবান হাঙ্গেরীয় কবিই প্রথম তার মধ্যে অভিনয় প্রতিভা আবিষ্কার করে তাকে লোকসমাজে পরিচয় করিয়ে দেয়।

সুন্দরী তন্বী মেয়েটি তার উজ্জ্বল বাদামী চুল আর ডাগর নীল চোখ দিয়ে আপন-ভোলা কবিকে আকৃষ্ট করেছিল। কবি তাকে ভালবেসেছিল, তার কাব্যিক ভালবাসার সূর্যকিরণে মেয়েটির অন্তরের মাধুর্য ও মহত্ত্ব ডালপালা মেলে বেড়ে উঠেছিল।

দানিয়ুবের ধারে প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদী শহরে একটি চিলেকোঠায় তারা ঘর বেঁধেছিল। মেয়েটি কবির দারিদ্র্য, যশ এবং আনন্দের অংশীদার হয়েছিল ; হাঙ্গেরীর বিপ্লব যদি তাকে কবির বাহু থেকে ছিনিয়ে নিয়ে না যেত—সে তার বিশ্বস্ত এবং অনুগত স্ত্রীও হতে পারত।

কবি মুক্তি যুদ্ধে যোগ দিল। ম্যাগিয়ারদের* তেরঙ্গা ঝাণ্ডার মান রাখতে হনভেদ্† ড্রামের তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে গেল। এদিকে মেয়েটিও রাজধানীর বিপ্লবের স্রোতে ভেসে গেল। বীরাঙ্গনা আমাজনদের‡ মতো তাকে বন্দুক হাতে ক্রোট্সে লড়তে দেখলে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। ক্রোটস তখন জর্জিয়ার হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

*হাঙ্গেরীর মোঙ্গলগোষ্ঠীর জাতিবিশেষ।

†'হন্‌ভেদ' একটি হাঙ্গেরীয় শব্দ—যার অর্থ পিতৃভূমির স্বাধীনতা-রক্ষক।

‡সিদিয়ার রণপ্রিয় পৌরাণিক নারী যোদ্ধা।

কিন্তু শেষ অবধি হাঙ্গেরী দমে গিয়ে বিজিত দেশের মতো শত্রুর শাসন মেনে নিল।

শোনা গেল, টেম্‌সভার-এ তরুণ কবির মৃত্যু হয়েছে। তার প্রেয়সী তার জন্য চোখের জল ফেলে অন্য এক ভদ্রলোককে বিয়ে করল। এটা অবশ্য নতুন বা অসাধারণ কিছু নয়। তার নতুন নামকরণ হলো ফ্রাউ ফন্‌ কুবিনাই। কিন্তু এ বিয়ে সুখের হলো না। একদিন মনে পড়ল প্রেমিক বলেছিল তার অভিনয় প্রতিভা আছে, আর কবির সব কথাই তো ফলে গেছে। অতএব এরপর বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং কয়েকটি ভূমিকার অভিনয় শিখে নিয়ে মঞ্চে অবতরণ। আর যায় কোথা! দর্শক, সমালোচক, অভিনেতা এবং নাট্যকারেরা দল বেঁধে তার পায়ে-এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

একটা খুব লাভজনক চুক্তিতে সে সই করল, এবং দিনকে দিন তার অভিনয়ের খ্যাতি বেড়েই চলল। মঞ্চে পা দেবার পর বছর না ঘুরতেই সে হয়ে বসল সমাজের শিরোমণি। এখন সকলেই তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং নামকরা ধনীরা তার কৃপা লাভের জন্য লালায়িত। কিন্তু সে ছিল নিরুত্তাপ এবং সংযত। কিন্তু এক সেনাধ্যক্ষ—যার ওপর বর্তমানে এই জেলার শাসন ভার পড়েছে, সে যখন আবেদন জানাল, অভিনেত্রী তাকে ফেরাতে পারল না। ভদ্রলোক ভাল ঘরের ছেলে, সুপুরুষ এবং প্রকৃত অর্থেই ভদ্র।

লোকেরা যার নামে ভয়ে কাঁপে, জেলার হাজার হাজার অধিবাসীর জীবন-মরণ সুখ-সম্মানের ভার যার ওপর, এমন এক শক্তিমান পুরুষকে তার নরম কোঁকড়া চুলের ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে দেখেই কি সে মজেছিল, অথবা তার রহস্যময় নারী হৃদয় নতুন করে আবার খাঁটি ভালবাসার সন্ধান পেয়েছিল—বলা শক্ত। তবে একথা ঠিক যে অল্পদিনের মধ্যেই অভিনেত্রী তার প্রেমিকায় পরিণত আর রাজপুত্রের মতো ধনী প্রেমিকটিও তাকে প্রাচ্যরাণীর মতো বিলাস ব্যসনে ডুবিয়ে দিল।

কিন্তু ঠিক তখনই ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা—যাকে বলা চলে

মৃত ব্যক্তির কবর থেকে উঠে-আসা। একদিন সেনাধ্যক্ষের গাড়িতে চড়ে ফ্রাউ ফন্ কুবিনাই কোরসো-র পথ দিয়ে যাচ্ছে ; পেছনের নরম গদিতে হেলান দিয়ে বসে সে অলস দৃষ্টিতে পথচারীদের ওপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একজন সাধারণ অষ্ট্রীয়ান সেপাইয়ের দিকে চোখ পড়ায় সে সজোরে আর্ত্তনাদ করে উঠল।

নারী হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত সেই মর্মভেদী কান্না কেউ শুনল না, কেউ দেখল না কেমন করে মার্বেল পাথরে গড়া মূর্ত্তি আবেগে কম্পিত ও বিবর্ণ হয়ে গেল, এমন কি যার জন্য এই দশা—সে সৈনিকটিও নয়। সে আসলে সেই হাঙ্গেরীয় কবি, অন্যান্য হাঙ্গেরীয় মুক্তিযোদ্ধার মতো এখন অষ্ট্রীয়ান সৈনিকের বেশ ধরেছে।

দুদিন পর যখন সেনাধ্যক্ষের চাপরাসীর কাজ করবার জন্য তার ডাক পড়ল, সে বিন্দুমাত্র অবাক হল না। সহকারী সেনাধ্যক্ষের কাছে হাজির হলে তাকে ফ্রাউ ফন্ কুবিনাই-এর কাছে গিয়ে তার হুকুম তামিল করতে বলা হল।

আমাদের কবি লোকের মুখে কুবিনাই-এর সম্বন্ধে শুনেছিল। এই সুন্দরী রমণী দেশের শত্রুর কাছে আত্মবিক্রয় করেছে জেনে সে তাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করত ; কিন্তু এখন সে নিরুপায়—হুকুম মেনে চলা ছাড়া আর কোন গতি নেই।

অভিনেত্রীর বাড়ি গিয়ে পৌছন মাত্র একজন ভৃত্য তাকে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে গেল। মনে হয়, তার জন্যই ভৃত্যটি অপেক্ষা করছিল, কেননা সে তার নামও জেনে নিয়েছে। এরপর কোন রকম ভূমিকা না করে তার হাতে চাপরাস তুলে দিয়ে পরে নিতে বলা হলো। তার চোয়াল শক্ত হলো, কিন্তু একটিও কথা না বলে নীরবে সে ভাগ্যের এই শোচনীয় অথচ হাস্যকর পরিহাস মাথা পেতে নিল। কবিকে নিজের চাপরাসী বানানর পেছনে অভিনেত্রীর নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে। সে কি আগে কোনদিন তার অভিনয়ের বিরূপ সমালোচনা করেছিল ?—কবি মনে করতে চেষ্টা

করল। কিন্তু ভাববার অবসর হলো না, তাকে ফ্রাউ ফন্ কুবিনাই-এর সঙ্গে দেখা করতে বলা হলো। তার এই অপমান অভিনেত্রী নিশ্চয়ই রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করবে।

ছোট একটি বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে তাকে বসতে বলা হলো। ঘরটি জমকালো অথচ রুচিকর আসবাব-পত্রে সুন্দর করে সাজানো —এমনটি সে এর আগে আর কখনও দেখেনি। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, পর্দা ঠেলে ভেতরে এল ফ্রাউ ফন্ কুবিনাই। শান্ত মুখশ্রী কিন্তু একেবারে যেন রক্তশূণ্য; পরনে তুরস্ক পশমে তৈরি চমৎকার একখানি ড্রেসিং গাউন। কবি তার অতীত প্রেয়সীকে চিনতে পারল।

"ইরমা!" সে আঁতকে উঠে বলে ফেলল। কবির এই অন্তর্ভেদী সুখ বিলাসিনী নারীর হৃদয় এমনভাবে স্পর্শ করল যে পরক্ষণেই দেখা গেল, এতদিন যাকে সে মৃত বলে ধরে রেখেছিল—সেই মানুষটির বুকে আছড়ে পড়েছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই কবি নিজেকে তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নিল।

"তাহলে এমন করেই আবার আমাদের দেখা হল!"—অভিনেত্রী বলল।

"এতে আমার কোন দোষ নেই নিশ্চয়ই।"—কবির তিক্ত মন্তব্য।

"আমারও নেই।"—অভিনেত্রী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল। "সকলেই ভেবেছিল, তুমি বেঁচে নেই। তোমার জন্য আমি অনেক চোখের জল ফেলেছি; সেটুকুই আমার সান্ত্বনা।"

"তোমার অশেষ দয়া"—কবি বিদ্রূপ করে বলল। "আমার কাছে সাফাই গাইবার জন্য তুমি কি তোমার উচ্চাসন থেকে নেমে আসতে পারবে? এখন আমি তোমার চাপরাসী; তুমি ফরমাশ করবে, আমি সেই ফরমাশ খাটব; এখন আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক জলের মতো সহজ।

চোখের জল লুকোতে ফ্রাউ ফন্ কুবিনাই পেছনে ঘুরে দাঁড়াল।

"তোমাকে আঘাত দেবার ইচ্ছে আমার নেই,"—বলে চলল;

"তবু বলব, আমাদের আর দেখা না হলেই ভাল ছিল। কিন্তু আমাকে তোমার আরদালীর চাপরাস পরালে কেন? আমার জীবনের সুখ শান্তি গেছে, তাতেও কি তোমার আশ মেটে নি? আমাকে আরও অপদস্থ করে কি সুখ পাচ্ছ?"

"অমন কথা ভাবলে কি করে?"—বিমর্ষ গলায় অভিনেত্রী বলল—"যে দিন থেকে তোমার দুর্ভাগ্যের কথা জেনেছি, কি করে তোমাকে মুক্ত করা যায়—শুধু সেই কথাই ভেবে আসছি; কিন্তু যতদিন তা সম্ভব না হয়, তুমি যাতে একটু ভালভাবে থাকতে পার, তাই এই ব্যবস্থা করেছি।"

অসুখী কবি নাক কুঁচকে বলল: "বুঝলাম! আর সেই জন্যই তুমি তোমার বর্তমান সেবককে বলে কয়ে পুরোনো প্রেমিককে চরণের বান্দা বানিয়েছো!"

"আমাকে তুমি এমন করে বলতে পারলে!"

"এ ছাড়া কি তোমার স্ফূর্তির অন্য কোন পথ ছিল না? একদিন তোমায় ভালবেসেছিলাম, দেবীর আসনে বসিয়েছিলাম, সেই জন্যেই কি আজ আমায় এ শাস্তি দিলে?" কবি বলেই চলল: "নারীর যোগ্য কাজই করেছো! এখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, নতুন আমোদের খোরাক পেয়ে তুমি মেতে উঠেছো।"

তার কথা শেষ না হতেই অভিনেত্রী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কবি তার ফোঁপানির শব্দ শুনতে পেল কিন্তু নিজের কথার জন্য তার অনুতাপ হলো না, বরং চারদিকে প্রাচুর্য এবং রাজকীয় বিলাসিতার ছড়াছড়ি দেখে তার রাগ আর ঘৃণা বেড়েই গেল। কিন্তু তার রাগের কি দাম আছে? সে এখন ঐ মহিলার চরণের দাস, ও যা বলবে তাই করতে হবে, কারণ ওপরওয়ালার চাবুক ওর হাতে। সে যেন সত্যিই কোন কোপনস্বভাব নারীর প্রতিহিংসার কবলে পড়েছে; সেনাধ্যক্ষের দুর্বিনীত প্রেমিকা যেন তার ক্ষমতার দাপট কবির ওপর খাটাতে চায়; যেন তার চরম দুরবস্থা না দেখে সে ছাড়বে না।

সেনাধ্যক্ষ এবং ফ্রাউ ফন্ কুবিনাই-এর দুই বন্ধু একদিন চায়ের আসরে এল। বন্ধু দুজনও শিল্পকলার সাধক, কেননা একজন ব্যালে-নর্তকী এরং অন্যজন এক অভিনেত্রী। এদের দেখাশোনার ভার পড়ল কবির ওপর।

চায়ের আয়োজন চলার সময় সে পাশের ঘরে ওদের হাসি মস্করা শুনতে পেল। বাবুর্চি দরজা মেলে দিলে ফ্রাউ ফন্ কুবিনাই সেনাধ্যক্ষের বাহুলগ্না হয়ে ভেতরে এসে ঢুকল। দেখে চড়াক্ করে কবির মাথায় রক্ত উঠে গেল। এই নতুন চাপরাসী বা পুরোনো প্রণয়ীর দিকে সে কিন্তু বিজয়ী বা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাল না; বরং এক পলকের চোরা চাহনিতে ফুটে উঠেছিল গভীর মমতা।

তাহলে কি কবি ওকে ভুল বুঝেছে? ঘৃণা ও ভালবাসা, অবজ্ঞা ও ঈর্ষায় তার হৃদয় দগ্ধ হতে থাকল; গ্লাসে পানীয় ঢালতে গিয়ে হাতের মুঠোয় বোতলটা ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকল।

"এই লোকটিই কি সেই?"—ভাল করে কবিকে লক্ষ্য করে সেনাধ্যক্ষ জিজ্ঞেস করল।

ফ্রাউ ফন্ কুবিনাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

"যাই বলো, চাপরাসী হবার জন্য ওর জন্ম হয় নি।"—সেনাধ্যক্ষের মন্তব্য।

"সৈনিক হবার জন্য তো আরও নয়।"—অভিনেত্রী জুড়ে দিল।

কথাগুলো হতভাগ্য কবির অন্তরে গিয়ে ঘা দিল, কিন্তু অভিনেত্রী তার ব্যথার ভাগ নিয়ে তাকে বিড়ম্বনা থেকে বাঁচানোর জন্যই ওকথা বলেছিল।

যাই হোক, সেদিনও সন্দেহ থেকে গেল। কবি মনে মনে বলল: "ওর বোধহয় আনন্দে অরুচি ধরেছে, ভোগ বিলাসে আর রুচি নেই। এখন চাই ওর উত্তেজনা; যাকে ও এককালে ভালবেসেছিল এবং ও খুব করেই জানে, সে লোকটি এখনও ওকে ভালবাসে; সে ওর সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপছে দেখে ও বোধহয় খুব

মজা পাচ্ছে। আর ওর মর্জি হলেই ও আমায় কাঁপাতে পারে; জীবনের জন্য পরোয়া করি না, কিন্তু ওর আমোদের জন্য যে কোন সময় ওর হাতে আরও কত নাকাল হতে হয়—এই ভয়।

এমন সময় অভিনেত্রী একবার তার দিকে চোখ তুলে তাকাল; এত করুণ আর মর্মস্পর্শী সে দৃষ্টি যে কবি বিভ্রান্ত হয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

যদিও সেই বাড়িতেই রয়ে গেল, কিন্তু সেদিন থেকে তাকে আর নায়িকার ফাই ফরমাস খাটতে হল না। বস্তুত সেদিন থেকে সে আর অভিনেত্রীর দেখাও পেল না; তার কথা কাউকে জিজ্ঞেস করতেও সাহস পেল না। এভাবে দু'মাস গেল। একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সেনাধ্যক্ষ তাকে ডেকে পাঠাল পাশের ঘরে আরও অনেকের সঙ্গে সেও আদেশের অপেক্ষায় বসে রইল। সেনাধ্যক্ষ কুচকাওয়াজ থেকে ফিরে এসে তাকে বসে থাকতে দেখে আড়ালে ডেকে বলল:

"মুক্তিপণের বিনিময়ে তোমাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।"

"হা ঈশ্বর!" কবি আমতা আমতা করে বলল: "আ—আমি কি করে—"

"ইতিমধ্যে তা দেওয়া হয়ে গেছে, তুমি এখন মুক্ত।"—সেনাধ্যক্ষ জানাল।

"তা কি করে সম্ভব? হুজুর, আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব!"

"আমাকে ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই। ফ্রাউ ফন্ কুবিনাই তোমার মুক্তি খরিদ করেছে।"—সেনাধ্যক্ষ বলল।

কবির হৃদযন্ত্র যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে; মুখে রা নেই, তোতলামী পর্যন্ত বেরোলো না। কোনক্রমে মাথাটা একটু নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে সে ছুটে পথে বেরিয়ে গেল, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে বেপরোয়ার মতো রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে সেই মহিলার বাড়ির দোরগোড়ায় এসে হাঁপাতে লাগল—যাকে এতদিন সে কতই না

ভুল বুঝে এসেছে। তার পায়ে লুটিয়ে পড়ার জন্য, অন্তত আর একবার তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

"যাচ্ছো কোথায় ?"—দারোয়ান শুধাল।

"ফ্রাউ ফন্ কুবিনাই-এর সঙ্গে দেখা করতে।"

"উনি এখানে নেই।"

"এখানে নেই ?"

"না, তিনি চলে গেছেন।"

"চলে গেছেন ? কোথায় ?"

"দু' ঘণ্টা আগে উনি প্যারিসে রওনা হয়ে গেছেন।"

## অনুতাপ

শরতের এক বিষণ্ণ দিন। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। গাছের পাতা ঝরছে টুপটাপ। এও যেন এক ধরনের বৃষ্টি। তবে আরও ভারী, আরও মন্থর। মসিয়ো সেভেল এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলেন। তাঁর মন ভারাক্রান্ত। তিনি কাঁদছিলেন। মঁতেসের সকলের তিনি 'পিতা সেভেল'। আজ অশান্তভাবে পায়চারি করছিলেন, একবার আগুনের কাছে, আবার জানালায়। আলো আর আঁধার নিয়ে মানুষের জীবন। তাঁর এই বাষট্টি বছরের জীবনে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই। তিনি একা। একজন অবিবাহিত বৃদ্ধ। আপন বলতে কেউ কোথাও নেই। হায়, নিঃসঙ্গ মৃত্যু কি মর্মান্তিক। একান্ত একা। অশ্রুবিহীন। স্নেহার্দ্র অন্তরের স্পর্শহীন নির্মম মৃত্যু।

সেভেল তাঁর নিষ্ফল শূন্য জীবনটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। ফেলে-আসা দিনগুলোর স্মৃতি মানস নেত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। শিশুকাল, বাবা মায়ের ঘর, কলেজ জীবন, দু'চারটে ভুলভ্রান্তি, প্যারিসের সেই শিক্ষানবিসী, বাবার অসুখ ও মৃত্যু, একে একে ভিড় করে মনে এলো। বাবার মৃত্যুর পর এলেন মায়ের কাছে। দু'টি প্রাণীর সংসার। একজন বৃদ্ধা, অন্যজন তরুণ। ভোগবিলাসহীন নিরিবিলি জীবন। একদিন মাও গেলেন। হায়, বেঁচে থাকা ব্যাপারটাই দুঃখের। সারাটা জীবন তিনি একা। আর এখন, তাঁর পালাও শেষ হয়ে এলো। তাঁকেও যেতে হবে। তিনিও হারিয়ে যাবেন। তারপর সব শেষ। পৃথিবীতে সেভেল বলে আর কিছু থাকবে না। কি নিদারুণ। আর সবাই থাকবে। তারা বাঁচবে, হাসবে। হ্যাঁ, অন্য সকলে আনন্দ করবে। কেবল তিনি থাকবেন না। মৃত্যু শাশ্বত ও নিশ্চিত জেনেও মানুষ হাসে, আনন্দ করে, সুখী হয়—এ কি অদ্ভুত নয়! মৃত্যু যদি শুধু অনিশ্চিত সম্ভাবনা হোতো,

তবে মানুষ আশা করতে পারতো। কিন্তু তাতো নয়! এ যে অবশ্যম্ভাবী দিনের পর রাতের মতোই সত্য।

তবু যদি তাঁর জীবন পূর্ণ হোতো। যদি তিনি একটা কিছু করতে পারতেন। কোন দুঃসাহসের তীব্র আনন্দ, একটুখানি সাফল্য, অথবা যে কোন রকমের একটু আত্মতৃপ্তি! কিন্তু না, কিছু নেই। তিনি কিছুই করেননি। কখনও নয়। কেবল ঘড়ির কাঁটা ধরে ঘুম থেকে উঠেছেন, খেয়েছেন, আবার যথাসময়ে শুতে গেছেন। এভাবে বাষট্টি বছর পেরিয়ে গেল। অন্য সকলের মতো একজন জীবনসঙ্গিনী তাঁর মেলেনি। কিন্তু কেন? এমন কি কারণ থাকতে পারে যার জন্য তিনি অবিবাহিত রয়ে গেলেন? তিনিও বিয়ে করতে পারতেন। তাঁর যথেষ্ট সঙ্গতি ছিল। তবে কি সুযোগ পাননি? হতে পারে। কিন্তু একজন লোক ইচ্ছে করলে সুযোগ তৈরি করে নিতে পারে। আসল কথা' তিনি এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। এই উদাসীনতাই তাঁর স্বভাবের সবচেয়ে বড় দোষ, তাঁর খুঁত। এমন ঔদাসীন্যই মানুষের জীবনে বিফলতা এনে দেয়। বিছানা ছেড়ে ওঠা, এখানে ওখানে বেড়ানো, কখনও বা দূরে কোথাও যাওয়া, লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, কোন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো—এসব কারও'কারও কাছে রীতিমত কঠিন কাজ।

সেভেল কখনও প্রেমে পড়েননি। কোন নারী কখনও ভালবেসে তাঁর বুকে আবেশে লুটিয়ে পড়েনি। প্রতীক্ষা করে থাকার ছন্দময় ক্রোধ, তাঁর অনাস্বাদিত। বাহু নিষ্পেষণে যে স্বর্গীয় শিহরণ—তা তিনি কখনও অনুভব করেননি। জয়ী কামনার মোহময় আনন্দ থেকে তিনি চিরবঞ্চিত।

দু'টি অধরের প্রথম মিলনের আনন্দ অলৌকিক। আনন্দের জোয়ার হৃদয় উপচে পড়ে। চার বাহুর দৃঢ় আবেষ্টনীতে দুটি সত্তা এক হয়ে যায়। সে এক অবর্ণনীয় সুখ। পরস্পরের মধ্যে সম্মোহিত দুটো অস্তিত্বের একক বিকাশ।

মসিয়ো সেভেল ফেণ্ডারের* ওপর পা রেখে ঘরোয়া পোশাকে বসেছিলেন। তাঁর জীবন বিফলে গেছে সন্দেহ নেই, একেবারে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি অবশ্য ভালবেসেছিলেন। কিন্তু সে ভালবাসা অত্যন্ত গোপন, নিছক যন্ত্রণাময় আর উদাসীন। অন্যান্য বিষয়ের মত এ ব্যাপারেও তাঁর স্বভাব বৈশিষ্ট্যই জয়ী হয়েছিল। তাঁর পুরোনো সঙ্গী সডারের স্ত্রী মাদাম সডারকে ভালবেসেছিলেন। সত্যি তাই। আঃ! ও যখন অল্প বয়সের মেয়েটি ছিল তখন থেকে যদি আলাপ থাকতো। যখন হোলো, খুব দেরি হয়ে গেল। তখন তার বিয়ে হয়ে গেছে। না হলে নিশ্চয় তার পাণিপ্রার্থী হতেন। কি ভালই না বেসেছিলেন। প্রথম দর্শনের দিন থেকে আজ পর্যন্ত সেই ক্লান্তিহীন প্রেমের ছেদ পড়েনি। ভাবাবেগ নয়, এমনিতে সব কথা মনে পড়লো। যতবার দেখা হয়েছে বিদায় মুহূর্তে ব্যথা পেয়েছেন। ওর ভাবনায় বিভোর হয়ে কত রাতে ঘুম আসেনি। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাকার উদ্দাম প্রেমাবেগ সকাল হতে হতে অনেকটা যেন স্তিমিত হয়ে যেত।

কেন? তিনি আগেও যে ওকে দেখেছেন। কেমন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর। সোনার বরণ গায়ের রঙ, সোনালী চুল। সর্বদা হাসিখুশি। আর যাই হোক, সডার ওর পছন্দের যোগ্য নয়। ওর বয়স এখন বাহান্ন। দেখে তো সুখীই মনে হয়। হায়! সেই সব হারিয়ে যাওয়া দিনে যদি ওর ভালবাসা পেতেন! হ্যাঁ, সত্যি যদি শুধু ভালবাসতো! আর কেনই-বা নয়? তিনি তো তাকে, হ্যাঁ মাদাম সডারকে, প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন!

আহা! ও যদি জানতো! কিন্তু ওকি কিছুই অনুমান করেনি? কখনও কিছু দেখেনি বা অনুভব করেনি? তাহলে তখন কি ভাবতো? আচ্ছা তিনি যদি সব প্রকাশ করতেন, তবে ও কি বলতো?

* জলন্ত আগুন যাতে মেঝেয় ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্ত লোহার ঝাঁঝরি শীতের দেশে ব্যবহৃত হয়।

সেভেল এভাবে নিজেকে হাজার রকম প্রশ্ন করে চললেন। মনে মনে জীবনটা খুঁটিয়ে দেখলেন। ছোট ছোট অসংখ্য স্মৃতি তাঁর চোখে ভেসে উঠলো। মাদাম সভার তখন পূর্ণ যুবতী ও প্রিয়দর্শিনী, ত্বজনে কত কথা হোতো। তার সুরেলা গলা আর টুকরো অর্থপূর্ণ হাসি যেন আরও অনেক কিছু প্রকাশ করতো।

সভার কাজ করতেন ডেপুটি মেজিস্ট্রেটের অফিসে; রবিবার এলেই তাঁরা বেরিয়ে পড়তেন। মনে এলো, সেন নদীর তীর ধরে তাঁদের সেই হেঁটে বেড়ানো, আর ঘাসের ওপর বসে লাঞ্চ খাওয়া। একটা বিকেলের স্মৃতি খুব স্পষ্ট মনে পড়লো। নদীর ধারে একটা ছোট বাগানে তাঁরা ত্বজন একসঙ্গে কাটিয়েছিলেন। এক উজ্জ্বল বাসন্তী প্রভাত। দরকারী জিনিসপত্র বাস্কেটে ভরে নিয়ে তাঁরা বেরিয়ে পড়েছিলেন। চারিদিকে সুমিষ্ট আঘ্রাণ, সর্বত্র সতেজ লাবণ্য। পাখীর ডানায় চাঞ্চল্য, কণ্ঠে খুশীর বন্যা। সূর্য কিরণে দীপ্ত নদী জল। এমন দিনে মন এমনিতেই মেতে ওঠে। নদীর কোল ঘেঁষে একটি উইলো গাছের তলে তৃণাসনে বসে তাঁরা ত্বপুরে খেয়েছিলেন। সজীব প্রকৃতির সুবাসিত বাতাস শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছিল। সেই সঙ্গে অতি সুস্বাত্থ মদে তাঁদের তৃষ্ণা মিটেছিল। সেই দিনটির সব কিছুই কত না মধুর লেগেছিল।

খাওয়া শেষ হতেই সভার তাঁর প্রশস্ত পিঠ ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। তার মতে সেদিনকার মত অত ভাল দিবানিদ্রা নাকি আর কখনও হয়নি।

তাঁরা ত্ব'জন নদীর ধার ধরে হাঁটছিলেন। তাঁর হাত জড়িয়ে নিয়ে মাদাম আলতো ভাবে তার ওপর এলিয়ে পড়েছিল। আর হাসতে হাসতে বলছিল: "আমি মাতাল হয়ে গেছি বন্ধু, একেবারে মাতাল হয়ে গেছি।" চোখের দিকে সোজা তাকিয়েছিল আর তাতেই তাঁর হৃদস্পন্দন গিয়েছিল বেড়ে। যখন বুঝলেন, ওর দিকে তাকিয়ে থাকার মত মনোবল নেই, আর হাতের শিহরণেও যখন মনের আবেগ প্রকাশ পেল না—তখন তিনি বিবর্ণ হয়ে গেলেন।

কিছু বুনো ফুল আর জলপদ্ম মাথায় গুঁজে তাঁর দিকে ফিরে মাদাম বলেছিল : "আমায় এ সাজে দেখতে তোমার ভাল লাগছে না ?"

তিনি কোন উত্তর দিতে পারেননি। বলার মত কথা খুঁজে পাননি। বরং সেই মুহূর্তে হাঁটু ভেঙে বসে পড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল। মাদাম হেসে উঠলো। একটা অতৃপ্ত হাসির টুকরো সরাসরি তার মুখে ছড়িয়ে দিয়ে বললো : "বোকা সম্রাট, তোমার হয়েছে কি ? অন্ততঃ কথা তো বলতে পার।" তাঁর বুক ফেটে কান্না এলো। মুখ ফুটে কথা বেরল না।

সেদিনকার সব কথা পরিষ্কার মনে পড়লো। যেন আজ সবে ঘটেছে। আচ্ছা ওই কথাটা কেন বলেছিলে, 'বোকা সম্রাট, তোমার হোলো কি ? অন্ততঃ কথা তো বলতে পার।'

মনে পড়লো কেমন কোমল আবেশে সে তাঁর বাহুতে এলিয়ে পড়েছিল। যখন তাঁরা একটা গাছের ঘন ছায়া পার হচ্ছিলেন, তখন হয়তো একটু বেশি আলগা হয়েছিলেন। ফলে মাদামের কর্ণমূল তাঁর গাল স্পর্শ করেছিল। এতে ও কিছু ভাবতে পারে এই ভয়ে তিনি তাড়াতাড়ি মাথা সরিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর একসময় বলেছিলেন : 'এখন কি আমাদের ফেরা উচিত নয় ?' তাঁর দিকে একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করে মাদাম অদ্ভুত ভঙ্গীতে বলে উঠেছিল : 'নিশ্চয়।' সেদিন তিনি কিছুই ভেবে দেখেননি। কিন্তু আজ সবই জলের মতো পরিষ্কার বোধ হোলো। বলেছিল : 'তোমার যা খুশি, বন্ধু আমার ! যদি ক্লান্ত হয়ে থাক, তবে চল ফিরি।'

তিনি উত্তর করেছিলেন : 'আমার ক্লান্তির জন্য বলছি না। তবে এতক্ষণে হয়তো সভার উঠে পড়েছে।'

তার উত্তর : 'তুমি যদি আমার স্বামীর জেগে উঠবার ভয় করে থাক তো সে আলাদা কথা। . চল ফেরা যাক।'

ফিরবার পথে তাঁর বাহুতে ঢলে পড়েনি। একটা কথা পর্যন্ত বলেনি। চুপচাপ হেঁটেছে। কেন ? সেই সময় এ নিয়ে মনে কোন

প্রশ্ন জাগেনি। কিন্তু তখন যা বুঝতে চাননি, এখন সব পরিষ্কার বোধগম্য হোলো। সেটা কি হতে পারে?

মসিয়ো সেভেলের মুখ আরক্তিম হোলো। এক লাফে তিনি উঠে পড়লেন। মনে হোলো যেন তিরিশ বছরের একটি যুবক। তিনি নিশ্চিত বুঝলেন যে তখন মাদাম সডারকে বলতে হোতো: 'আমি তোমায় ভালবাসি।'

কিন্তু এও কি সম্ভব? এই সন্দেহ তাঁকে দগ্ধ করতে থাকলো। যা তিনি কখনও দেখেননি, স্বপ্নেও জানতে পারেননি, তাও কি সম্ভব?

হায়! আনাড়ি হয়েও যদি তিনি এই সৌভাগ্যকে বরণ করতেন!

মনে মনে বললেন: 'আমি জানতে চাই। এই সন্দেহ অসহ্য হয়ে উঠছে। আমাকে জানতে হবে।' তাড়াহুড়ো করে জামাকাপড় পরে তৈরি হয়ে নিলেন। ভাবলেন: 'আমি এখন বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ আর ওর বয়স আটান্ন। একথা জিজ্ঞেস করলে এখন আর দোষের হবে না।' তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

রাস্তার উল্টোদিকে প্রায় তাঁর বাড়ির মুখোমুখি সডারের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। কড়া নাড়তে অল্পবয়সী একজন চাকরানী দরজা খুলে দিল। 'মসিয়ো সেভেল, এ সময় আপনি এখানে? কোন দুর্ঘটনা হয়নি তো?'

মসিয়ো জবাব দিলেন: 'না গো মেয়ে, তেমন কিছু নয়। তোমার গিন্নীমাকে গিয়ে বল, তাঁর সঙ্গে একটি জরুরী ব্যাপারে কথা বলতে চাই।'

'কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে, তিনি এখন উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে শীতের জন্য নাসপাতির জেলি তৈরি করছেন। বুঝতে পারছেন, তিনি এখন গোছালো অবস্থায় নেই।'

'বুঝেছি। কিন্তু তুমি গিয়ে বল আমি একটা খুব প্রয়োজনীয় কাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

পরিচারিকা গেলে পর সেভেল বিচলিত হয়ে পায়চারি শুরু করলেন। লম্বা পা ফেলে ড্রইং রুমের এধার থেকে ওধারে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন। অবশ্য বিব্রত বোধ করার কিছু নেই। কেনই বা করবেন। শুধু ক'টা কথা জিজ্ঞেস করা বৈ তো নয়? যেমন রান্নার ব্যাপারে কোন কিছু। আর সেটা হচ্ছেঃ 'তুমি কি জান যে আমার বয়স বাষট্টি?'

দরজা খুলে গেল। মাদাম ঘরে ঢুকলেন। বেশ গোলগাল মোটাসোটা চেহারা। শিথিল কপোল আর তাতে প্রাণখোলা হাসি। তার জামার হাতা কাঁধ অবধি গোটানো। চিনির রসে সিক্ত হাত দুটো দূরে আলগা করে রাখা।

'ব্যাপার কি বন্ধু? শরীর খারাপ নয়তো? নিশ্চয় তা নয়?'

'না প্রিয়সখী, তা নয়। তবে আমি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। কথাটা আমার কাছে খুব দরকারী, কেননা এর জন্য আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছে। কিন্তু কথা দাও স্পষ্ট করে উত্তর দেবে?'.

তিনি হাসলেন। 'আমি তো সব সময়েই স্পষ্ট করে বলি। বল, কি বলতে হবে।'

'বেশ। যেদিন তোমায় প্রথম দেখেছিলাম সেদিন থেকেই তোমায় আমি ভালবেসেছি। তুমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলে?'

অনেকটা সেই আগেকার দিনের মতো সুর করে মাদাম হেসে হেসে বললেন: 'পণ্ডিতমশায়, তোমার হোলো কি? সে তো প্রথম দিন থেকে আমি ভালভাবে জানতাম।"

সেভেল কাঁপতে লাগলেন। তাঁর তোতলামো শুরু হোলো। 'তুমি জা-ন-তে?' তাঁর গলা বুজে এলো।

মাদাম বললেন, 'তবে? তবে কি?'

'তখন—তুমি কি মনে করেছিলে? তাহলে—তুমি—কি—কি বলতে?'

উচ্ছ্বসিত হাসিতে মাদাম ভেঙে পড়লেন। তাঁর আঙুলের ডগা বেয়ে চিনির রস কর্পেটে গড়িয়ে পড়লো।

'আমি ? কিন্তু তুমি তো আমায় কিছু জিজ্ঞেস করনি। প্রথমেই আমার জানাবার কথা নয়।'

সেভেল তাঁর দিকে দু'পা এগিয়ে গেলেন: 'বল—আমায় বল—। সে দিনটির কথা। তোমার মনে পড়ে ? সেই—যেদিন সডার খাওয়ার পর ঘাসের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর আমরা হাঁটতে হাঁটতে একেবারে নদীর বাঁক অবধি চলে গিয়েছিলাম নিচে—'

ব্যাকুল আগ্রহে তিনি অপেক্ষা করে থাকলেন। মাদাম সডার হাসি চেপে সোজাসুজি তাঁর চোখে চোখ রেখে বললেন—'হ্যাঁ নিশ্চয়। আমার মনে আছে বৈকি।'

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সেভেল বললেন: 'আচ্ছা—সেদিন যদি—আমি—যদি আমি – দুঃসাহসী হয়ে উঠতাম—তুমি কি করতে ?'

তিনি হাসতে লাগলেন। অত্যন্ত পরিতৃপ্ত সে হাসি। একজন সত্যিকারের সুখী রমণী, যার পরিতাপ করবার কিছু নেই, তিনিই এমন হাসি হাসতে পারেন। কণ্ঠস্বরে একটু ব্যঙ্গ মিশিয়ে তিনি স্পষ্ট করে বললেন: 'তাহলে আমি নিজেকে সমর্পণ করতাম।' তারপর আর দেরি না করে ঘুরে সোজা জেলি তৈরির কাজে চলে গেলেন।

সেভেল মাথা নীচু করে ছুটে পথে বেরিয়ে এলেন। দেখে মনে হচ্ছিল যেন তাঁর কোন বিরাট সর্বনাশ হয়ে গেছে। বাইরে তখন বৃষ্টি। বৃষ্টির মধ্যেই তিনি জোর কদমে ছুটতে আরম্ভ করলেন। কোথায় যাচ্ছেন কিছু না ভেবেই উন্মাদের মতো সোজা এগিয়ে চললেন। একেবারে সেই নদীর ধারে গিয়ে থামলেন। সেখান থেকে এগিয়ে চললেন দক্ষিণ দিকে। যেন এক সহজাত আবেগে অভিভূত হয়ে বহুক্ষণ হাঁটলেন। বৃষ্টিতে তাঁর জামা প্যাণ্ট ভিজে

সপ্‌সপে হোলো। টুপিটা হোলো নরম এক টুক্‌রো ন্যাকড়ার মতো। আর ভেজা খোড়ো চালের মতো তা থেকে জল ঝরতে লাগলো। তিনি সোজা এগিয়ে চললেন যেদিকে দু'চোখ যায়। অবশেষে এলেন সেই বিশেষ স্থানটিতে, সেই যেখানে বসে তাঁরা বহু বহু দিন আগে খেয়েছিলেন। পুরোনো স্মৃতি তাঁর হৃদয়কে কাঁটার মতো বিঁধে রইলো। পাতাবিহীন উইলো গাছটার তলায় বসে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লেন মসিয়ো সেভেল।

# নববর্ষের উপহার

একা ঘরে বসে জাক্ ছ রাঁদাল খাওয়া শেষ করলেন। তারপর খানসামাকে ছুটি দিয়ে চিঠিপত্র লেখার জন্য একটি টেবিলের সামনে এসে বসলেন।

বছরের শেষ দিনটি তাঁর কেটে যায় লেখা আর স্বপ্নের মধ্যে। বিগত নববর্ষ থেকে যে সব ঘটনা ঘটে গেছে, পেছন ফিরে তার ওপর তিনি চোখ বুলিয়ে যান। অনেক ঘটনাই ফুরিয়ে যায়, মুছে যায়। এর মধ্যে যে সব বন্ধুবান্ধবের মুখ তাঁর স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে, তিনি আন্তরিক সুরে তাদের কয়েকটি ছত্র লেখেন—'জানুয়ারীর প্রথম দিনটিতে সুপ্রভাত জানাই।'

সেই জন্যই টেবিলে বসা। দেরাজ খুলে তিনি এক মহিলার ছবি বার করলেন। কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে চুম্বন করলেন। তারপর সেটিকে একখানা চিঠি লেখার কাগজের পাশে রেখে শুরু করলেন :

'প্রিয় ইরাণী আমার,

যে স্মরণ-চিহ্ন তোমায় পাঠিয়েছি, তুমি তা নিশ্চয়ই পেয়েছ। আজ সন্ধ্যায় শুধু তোমায় লিখবো বলে আমি ঘরে আবদ্ধ হয়ে আছি—'

এখানে এসে কলম থেমে গেল। জাক্ উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। ছ'মাস আগে তাঁর জীবনে এই প্রেমিকার উদয়। কিন্তু অন্যান্য প্রেমিকা থেকে এ স্বতন্ত্র। ক্ষণস্থায়ী অবৈধ মিলন কামনায় পুরুষ যে নারীর সঙ্গ চায়, যার সঙ্গে অভিনয় করে অথবা পতিতা বলে যাকে মনে করে—তাদের কারও সঙ্গে এর তুলনা হয় না। এই রমণীকে তিনি ভালবাসেন, তাকে তিনি জয় করে নিয়েছেন। ভদ্রলোককে যুবক বলা চলে

না। যদিও বয়সের তুলনায় তিনি এখনও তরুণ। জীবন সম্পর্কে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি নিরপেক্ষ এবং বাস্তব। তাঁর জীবনে যত ঘটনা, যত মানুষের আবির্ভাব, যত বন্ধুত্বের সমাপ্তি, নূতন বন্ধুত্বের সূচনা সব কিছুই তিনি হিসাব মিলিয়ে দেখতেন। তেমনি তিনি তাঁর আবেগ অনুভূতিরও হিসাব নিকাশ করতেন। প্রথম প্রেমের উদ্দীপনা এখন প্রশমিত। বর্তমানে তাঁর হৃদয়ে এই নারীর স্থান কোথায়, ভবিষ্যতে কি হবে—এ সব তিনি খাঁটি ব্যবসায়ীর মন নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মনে হয় স্নেহ, কৃতজ্ঞতা আর সহস্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে রচিত হয়েছে মহৎ এবং সুগভীর ভালবাসা। তাই তাঁদের আকর্ষণ দীর্ঘস্থায়ী ও প্রবল।

দরজায় ঘণ্টার শব্দে তিনি চমকে উঠলেন। মনে দ্বিধা এলো। খোলা উচিত হবে কি? কিন্তু ভেবে দেখলেন খোলাই উচিত। নববর্ষের রাত্রিতে যদি কোন পথিক তাঁর দুয়ারে আঘাত করে, তবে সে যেই হোক না কেন, দুয়ার খুলে দেওয়া কর্তব্য।

তিনি একটা মোমবাতি নিয়ে বাইরের ঘর পেরিয়ে গিয়ে খিল খুলে ফেললেন, চাবি ঘোরালেন, তারপর দরজার পাল্লা টেনে ধরতেই দেখতে পেলেন তার প্রণয়িনী বিবর্ণ শবদেহের মত দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। তিনি অবাক হয়ে বলে উঠলেন: 'তোমার হয়েছে কি?'

তার জবাব: 'তুমি কি একা আছ?'

'হ্যাঁ।'

'চাকরবাকর নেই তো?'

'না।'

'তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ না তো?'

'না।'

সে তখন ভেতরে ঢুকলো। মহিলার হাবভাবে মনে হোলো যেন এ বাড়ির সবকিছুই তার চেনা। বৈঠকখানায় ঢুকেই সে একটা সোফার মধ্যে এলিয়ে পড়ে দুহাতে মুখ ঢেকে ভীষণ কান্না জুড়ে দিল।

জাক্ হাঁটু গেড়ে তার পায়ের কাছে বসে পড়লেন। তার হাত দু'টি চোখের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে তার দিকে তাকাতে চেষ্টা করলেন। বিস্মিত স্বরে বললেন ঃ

'ইরাণী, ইরাণী তোমার কি হয়েছে? মিনতি করছি তোমার কি হয়েছে আমায় বল।' তখন সে ফোঁপাতে ফোঁপাতেই গুণগুণ করে বললো :

'এ রকম করে আমি আর বাঁচতে পারছি না।'

তিনি বুঝতে পারলেন না।

'এ রকম! কি বলছো?'

'হাঁা, এ রকম ভাবে আমি আর বাঁচবো না। আমি অনেক সয়েছি। আজ বিকেলে সে আমার গায়ে হাত তুলেছে।'

'কে—তোমার স্বামী?'

'হ্যা—আমার স্বামী।'

'এঁ্যা!'

তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। কেননা, কোনদিন ভাবতে পারেননি যে তার স্বামী এমন বর্বর হতে পারে। তার স্বামী একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সদ্‌বংশজাত, সভাসমিতির সভ্য; ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসে, থিয়েটার দেখতে যায়, আর একজন সুদক্ষ অসিচালক। লোকে তাকে চেনে, তার সম্বন্ধে আলোচনা করে। সর্বত্রই তার প্রশংসা। তার বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ গোছের। চিন্তা করবার জন্য যে প্রকৃত শিক্ষা সংস্কৃতির প্রয়োজন, সুশিক্ষিত মার্জিত-রুচির লোকের মতো তা তার ছিল না। কিন্তু আচার ব্যবহারে সে ছিল খুব ভদ্র। আর সব সময়েই সামাজিক সংস্কারগুলোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে চলতো।

শিক্ষিত ধনী ব্যক্তির অনুকরণে সে তার স্ত্রীর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করে দিয়েছিল। স্ত্রীর ইচ্ছা, তার স্বাস্থ্য, তার পোশাক সব কিছু নিয়ে তার উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা সে তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল।

রাঁদাল ইরাণীর বন্ধু হওয়াতে তার সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ করমর্দনের অধিকার পেয়েছিলেন। কারণ প্রত্যেক রুচিবান পতি তার সহধর্মিণীর অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সে রকম আচরণই করে। কিছুদিন বন্ধুত্বের পর জাক্ যখন প্রেমিক হলেন, তখন স্বামীটির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়লো।

জাক্ স্বপ্নেও ভাবেননি এমনি ঝড় বয়েছে এই পরিবারের মধ্যে। তাই এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারে আতঙ্কিত হলেন।

জিজ্ঞেস করলেন: 'কি করে এমন ঘটলো? আমায় বল?'

ইরাণী তখন সুদীর্ঘ এক ইতিহাস বিবৃত করে গেল:

সেই বিয়ের দিন থেকে শুরু করে তার সারা জীবনের ইতিকথা। প্রথমে তুচ্ছ কারণ থেকে সূত্রপাত। তারপর দুটি বিপরীতধর্মী চরিত্রের মধ্যে দিন দিন বিভেদ বাড়তে বাড়তে ব্যবধান হয়ে উঠলো।

এরপর শুরু হোলো কলহ। সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ, বাহ্য নয়, প্রকৃত বিচ্ছেদ। অবশেষে তার স্বামী হয়ে গেল ঝগড়াটে, সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত এবং উৎপীড়ক। এখন সে ঈর্ষাপরায়ণ, জাক্ তার ঈর্ষার পাত্র। এমন কি আজও কিছুক্ষণ ঝগড়া-ঝাটির পর সে ইরাণীকে প্রহার করেছে। সে সিদ্ধান্ত করলো:

'আমি আর তার কাছে যাব না। এখন আমাকে নিয়ে তোমার যা খুশি করো।'

জাক্ তার সামনাসামনি বসে পড়লেন। উভয়ের জানু মিলিত হোলো। তিনি ইরাণীর হাত দুটি ধরে বললেন: 'প্রিয়তমা, তুমি একটা মস্ত অপূরণীয় ক্ষতি করতে যাচ্ছ। যদি তুমি তোমার স্বামীকে পরিত্যাগ করতে চাও তো তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনো। তাহলে সম্ভ্রান্ত মহিলা হিসাবে তোমার নাম বজায় থাকবে।'

অশান্ত দৃষ্টিতে জাকের দিকে তাকিয়ে ইরাণী প্রশ্ন করলো:

'তাহলে তুমি আমায় কি পরামর্শ দিচ্ছ?'

'বাড়ি ফিরে যেতে বলছি। যতদিন না আইন অনুযায়ী বিচ্ছেদ মানে, বিবাহ-বিচ্ছেদ হচ্ছে, এই সম্মানের যুদ্ধে যতক্ষণ না জয়ী হচ্ছ, ততদিন এই জীবন সহ্য করে যাও।'

"তুমি যে পরামর্শ আমায় দিলে তা একটু ভীরুতা হচ্ছে না কি?'

'না, এই যথার্থ এবং যুক্তিযুক্ত। তোমার উচ্চ মর্যাদা আছে, রক্ষা কবচের মতো সম্মান আছে। বন্ধু তোমায় বাঁচাবে, আত্মীয় পরিজন খোঁজখবর নেবে। শুধুমাত্র খামখেয়ালীর বশে এসব তুমি কিছুতেই নষ্ট করতে পারবে না।'

সে উঠে দাঁড়ালো। অশান্ত গলায় বললো: 'আচ্ছা, না! আমি ওই ঘটনার পুনরুক্তি চাই না। ওর শেষ হয়েছে, শেষ হয়েছে!'

সে তখন তার প্রেমিকের কাঁধের ওপর দিয়ে দুহাত ঝুলিয়ে দিয়ে সোজা তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো:

'তুমি কি আমায় ভালবাস?'

'হ্যাঁ।'

'প্রকৃত এবং যথার্থ?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে আমায় রাখ।'

জাক্ আশ্চর্য হয়ে বললেন:

'তোমায় রাখবো? আমার নিজের বাড়ীতে? এখানে? কেন, তুমি কি পাগল হলে। এর অর্থ তোমাকে চিরতরে হারানো; আবার ফিরে পাবার কোন আশাই থাকবে না। তুমি সত্যি পাগল হয়েছ!'

নিজের কথার ওজন বোঝে এমন মহিলার মতো ইরাণী ধীরে ধীরে গাম্ভীর্যের সঙ্গে উত্তর দিল:

'আমার কথা শোনো জাক্, সে আমায় তোমার সঙ্গে দেখা করতে বারণ করে দিয়েছে। আমি আর তোমার বাড়িতে চুপি চুপি এসে গোপন মিলনের খেলা খেলবো না। তুমি হয় গ্রহণ কর, নয় হারাবে।'

'আমার প্রিয় ইরাণী, তুমি তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাও। আমি তোমায় বিয়ে করবো।'

'হ্যাঁ, তুমি আমায় বিয়ে করবে—খুব তাড়াতাড়ি হলেও দু'বছর দেরি করতে হবে। তোমার ভালবাসার ধৈর্য আছে।'

'দেখ বিবেচনা করে দেখ। তুমি এখানে থাকলে, সে কালই এখানে এসে উপস্থিত হবে। তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। কারণ সে তোমার স্বামী। তার সে অধিকার আছে। আইন তার পক্ষে।'

'তোমার নিজের বাড়িতে আমাকে রাখতে বলিনি জাক্। তোমার ইচ্ছেমতো অন্য যে কোন জায়গায় আমায় নিয়ে যেতে পার। আমি ভেবেছিলাম ভালবেসে এটুকু তুমি করতে পারবে। আমার ভুল হয়েছিল। ভগবান তোমায় রক্ষা করুন। বিদায়!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে সে এত তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোল যে ঘরের বাইরে ছুটে গিয়ে জাক্ তাকে কোনক্রমে ধরতে সমর্থ হোলেন।

'ইরাণী শোনো।'

সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো। জাকের কথা শুনতে চাইল না। চোখ জলে ভরে এলো। ঠোঁট নেড়ে শুধু বললো: 'আমায় একা যেতে দাও! আমায় একা যেতে দাও! আমায় একা যেতে দাও!'

জাক্ তাকে জোর করে বসিয়ে নিজেও হাঁটু মুড়ে তার সামনে বসলেন। তার পরিকল্পনা যে নির্বুদ্ধিতা আর ভয়ঙ্কর বিপদের ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়, একথা অসংখ্য যুক্তি আর নানা-রকম উপদেশ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। ওকে বুঝিয়ে রাজী করানোর জন্য জাকের বিবেচনায় যা বলা প্রয়োজন মনে হোলো তিনি কিছুই বলতে বাকী রাখলেন না। কারণ ইরাণীর এই দৃঢ় সংকল্পের জন্য তার প্রতি গভীর মমতা বোধ হচ্ছিল। ইরাণীকে নিরুত্তাপ চুপচাপ থাকতে দেখে তিনি দয়া করে তার কথা শুনতে, বিশ্বাস করে তার পরামর্শ মেনে চলতে বার বার মিনতি জানালেন।

তাঁর বলা শেষ হলে পর ইরাণী বললো :

'এখন তুমি কি আমায় যাবার জন্যে ছেড়ে দেবে ? হাত সরিয়ে নাও। আমি এখন উঠবো।"

'ইরাণী, দেখ।'

'যেতে দেবে কি ?'

'ইরাণী তোমার সংকল্প কি পরিবর্তন করা যায় না ?'

'আমায় যেতে দাও।'

'তোমার এই নির্বোধ সিদ্ধান্তের জন্য তোমাকে পরে চরম অনুতাপ করতে হবে। কিন্তু আমায় শুধু বল—সত্যি কি তোমার এই মত পালটানো অসম্ভব ?'

"হ্যাঁ, আমাকে যেতে দাও।"

'তবে থাক। তুমি ভাল করেই জান এখানে তুমি বাড়ির মতই থাকবে। কাল সকালে আমরা চলে যাব।'

তার কথা না শুনেই ইরাণী উঠে দাঁড়িয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলো : 'এখন আর তার সময় নেই। আমি ত্যাগ চাই না, সমর্পণ চেয়েছিলাম।'

'দাঁড়াও, আমার যা করা উচিত আমি করেছি। আমার যা বলা উচিত, আমি বলেছি। আমার আর কোন দায়িত্ব নেই। আমার বিবেক এখন শান্ত হয়েছে। এখন কি করতে হবে আমায় আদেশ কর ; আমি তাই করবো।'

এবার ইরাণী তার জায়গায় বসলো। জাকের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে খুব ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করলো : 'তাহলে বুঝিয়ে বল।'

'সেটা আবার কি ? আমাকে কি বুঝিয়ে বলতে বলছো ?'

'সমস্ত—এই সিদ্ধান্তে আসার আগে তুমি যা যা ভেবেছ, সব। তারপর আমার কি করা উচিত আমি দেখবো।'

'কিন্তু আমি তো কিছুই ভাবিনি। তুমি একটা দারুণ ভুল করতে যাচ্ছ, তাই মনে হোলো তোমাকে সতর্ক করে দেওয়া

উচিত। তুমি জেদ ধরলে। তখন আমিও এই বোকামীতে ভাগ নিতে চাইলাম। এমন কি কাজটা আমি সমর্থনও করলাম।'

'এত তাড়াতাড়ি কারও মত বদলানো স্বাভাবিক নয়।'

'শোন, মণি আমার। এখানে ত্যাগ বা আত্মদানের প্রশ্নই উঠছে না। যেদিন তোমায় ভালবাসি বলে অনুভব করলাম, সেদিন আমি নিজের মনে বলেছিলাম সেই কথা— যে কথা প্রত্যেকটি প্রেমিকের মনে মনে উচ্চারণ করা উচিত। কোন পুরুষ যখন রমণীকে ভালবাসে, যখন সে তাকে জয় করতে চেষ্টা করে, যখন তাকে পায়, তার সঙ্গ লাভ করে— তখন উভয়ের ক্ষেত্রেই তা একটি পবিত্র অঙ্গীকার। লক্ষ্য কর, এখানে তোমার মতো নারীর সঙ্গে ব্যবহার করার প্রশ্ন, উচ্ছ্বাসপ্রবণ সাধারণ মেয়ের সঙ্গে নয়।

'বিয়ের সামাজিক মূল্য অনেক, আইনগত মূল্যও যথেষ্ট। কিন্তু যে সমস্ত পারিপার্শ্বিকে সাধারণত বিয়ে হয়, সে সব ধরতে গেলে আমার চোখে বিয়ের নৈতিক মূল্য অতি সামান্যই ধরা পড়ে।

'কাজেই যখন কোন স্ত্রীলোক এই আইনের বাঁধনে বাঁধা পড়ে, অথচ স্বামীকে ভালবাসতে না পারায় তার প্রতি কোন আসক্তি বোধ করে না; যখন মুক্ত হৃদয়ে সে তার মনের মতো পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়, সেই পুরুষের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয়; পুরুষটিও যখন আর কোন বন্ধন না থাকলেও তাকে গ্রহণ করে, আমি বলবো তাদের সেই পারস্পরিক বন্ধনহীন শর্তের মধ্যে যে অঙ্গীকার থাকে, নগরাধ্যক্ষকে সাক্ষী রেখে 'হ্যাঁ' বলার চেয়ে তা অনেক বেশি।

'আমি বলতে চাই তারা উভয়েই সম্মানিত ব্যক্তি হলে তাদের মিলন সমস্ত ধর্মীয় মন্ত্রের দ্বারা পবিত্র না হলেও অনেক বেশি প্রগাঢ়, অধিকতর সত্য, আরও বেশি সুস্থ হবে।

'এই নারী সমস্ত বিষাদের ঝুঁকি নেয়, এবং যা করে, জেনে

শুনেই করে। কারণ সে তার সর্বস্ব দিয়েছে— তার দেহ, মন, আত্মা, তার সম্মান, তার জীবন। সে রমণী সমস্ত দুঃখ, বিপদ, বিপর্যয় আগেই অনুমান করে। দুঃসাধ্য ভয়ংকর কাজ সে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে। সে প্রস্তুত। যে স্বামী তাকে হত্যা করতে পারে, যে সমাজ তাকে পরিত্যাগ করতে পারে— তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে সে স্থির প্রতিজ্ঞ। এই জন্যেই সে তার দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা না রেখেও সাহসিকা। এই জন্যই তার প্রেমিক তাকে গ্রহণ করবার আগে সমস্ত কিছু দেখে নেবে, তার সমস্ত কাজ সমর্থন করবে, যা কিছু ঘটুক না কেন মেনে নেবে। আমার আর কিছু বলার নেই। শুরুতে আমি ছিলাম একজন বিবেচক ব্যক্তি। আমার কর্তব্য ছিল তোমায় সতর্ক করে দেওয়া। কিন্তু এখন আমার মধ্যে মাত্র সেই লোকটিই বেঁচে আছে, যে তোমায় ভালবাসে। এখন তাহলে বল, আমি কি করবো!'

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ইরাণী অধরের পরশ দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দিল। আধো স্বরে বলতে লাগলো:

'প্রিয়তম, এসব সত্য নয়! কোন কিছুই ঘটেনি! আমার স্বামী কিচ্ছু সন্দেহ করেনি। কিন্তু তুমি কি কর, আমি তাই দেখতে চেয়েছিলাম, জানতে চেয়েছিলাম। আমার নববর্ষের একটা উপহার পাবার সাধ হয়েছিল—তোমার হৃদয়ের উপহার—তোমার সদ্য পাঠানো নেকলেশটার পাশে আর একখানি উপহার। তুমি আমাকে তা দিয়েছ। অসংখ্য ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! যে আনন্দ তুমি আমায় দিলে তার জন্য ঈশ্বরকেও ধন্যবাদ!'

## বনান্তরালে

দুপুরের আহারে বসে মেয়র খবর পেলেন চৌকিদার দু'জনকে গ্রেপ্তার করে তাঁর জন্য টাউন হলে অপেক্ষা করছে। খাওয়া মাথায় উঠলো। গিয়ে দেখলেন চৌকিদার হোচেছুর রেগে টং। বন্দী এক বয়স্ক গ্রাম্য দম্পতি। পুরুষটি স্থূলকায়। নাক রাঙা, কেশ শুভ্র। চেহারায় মুষড়ে পড়ার ছাপ। মহিলাটি গোলাগাল, খর্বকায়। পরনে সুন্দর রবিবাসরীয় পোশাক। দেহে রক্তিমাভা। দৃষ্টি উদ্ধত।

মেয়র প্রশ্ন করলেন ; 'ব্যাপার কী ?'

হোচেছুর অভিযোগ পেশ করলো :

রোজকার মতো আজও সে কাজে বেরিয়েছিল। প্যারিসের উলটো দিকে শ্যামপিয়ক্রা বন যেখানে আর্জেনাতিউলে গিয়ে মিশেছে, যথারীতি সেদিকেই সে হাঁটছিল। নগর প্রান্তে মনোরম আবহাওয়া আর অকৃপণ গমের ফলন ছাড়া কোন অস্বাভাবিক দৃশ্য চোখে পড়েনি। ছোকরা ব্রাদেল আঙুর ক্ষেতের ডালপালা ছাঁটছিল। তাকে দেখতে পেয়ে বললো :

'এই যে হোচেছুর। জলদি যাও। বনে গিয়ে কমসে কম একশ তিরিশ বছরের একজোড়া কপোত কপোতী দেখে এসো গে।'

নির্দেশিত পথে সে বনে প্রবেশ করে। কিছু দূর যেতে না যেতেই অস্পষ্ট এক গুঞ্জন শুনে সে হীন সামাজিক অপরাধের আঁচ পায়। শিকার করা পশুর চুরি ঠেকাতে যে কৌশলে গুঁড়ি মেরে চোরের পেছনে এগোতে হয়, সেই ভাবে অতি সন্তর্পণে এগোতে এগোতে ঝোপের ভেতর আপত্তিজনক অবস্থায় এই দু'জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে।

বিস্ময়ে হতবাক মেয়র অপরাধীদের দিকে চোখ ফেরালেন। লোকটির বয়স প্রায় ষাট, মহিলার কম হলেও পঞ্চান্ন।

মেয়র প্রথমে লোকটিকে জেরা করলেন। কিন্তু তার ক্ষীণ কণ্ঠের জবাব শুনতে যথেষ্ট মনোযোগের দরকার হোলো।

'নাম ?'

'নিকোলাস ব্যুরেন।'

'পেশা !'

'বস্ত্র ব্যাবসা। প্যারিসের রুঁ দ্য মার্তারস্-এ বাস।'

'বনের মধ্যে কি করা হচ্ছিল ?'

ব্যাবসায়ী নিরুত্তরে অধোবদনে দণ্ডায়মান। দৃষ্টি স্ফীত উদরে নিবদ্ধ, হাত দু'টি অলসভাবে জানুর উপর লম্বমান।

মেয়র জিজ্ঞেস করলেন :

'অভিযোগ অস্বীকার করেন ?'

'না স্যার।'

'তাহলে সব স্বীকার করছেন ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'স্বপক্ষে কিছু বলবার আছে ?'

'কিছু না স্যার।'

'অপকর্মের সঙ্গীটি জুটলো কোথা থেকে ?'

'ও আমার স্ত্রী স্যার।'

'আপনার স্ত্রী ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তবে—তবে—প্যারিসে আপনারা এক সঙ্গে থাকেন না ?'

'মার্জনা করবেন স্যার, আমরা একত্রেই থাকি।'

'যত সব পাগল—আলবত পাগল। পাহারাদারদের হাতে ধরা পড়বার সখেই কি বেলা দশটায় বনের মধ্যে এই কীর্তি ?'

লজ্জায় ব্যাবসায়ীটির কেঁদে ফেলবার উপক্রম। মিন্ মিন্ করে বললো : 'উনি তাই চাইছিলেন। আমি বারংবার বারণ করেছিলাম

এটা একটা লজ্জার ব্যাপার হবে। কিন্তু জানেন তো স্যার, মেয়েদের মস্তিষ্কে কোন মতলব এলে তা থেকে নিষ্কৃতি নেই।'

মেয়র হেসে ফেললেন। তিনি রসিক ব্যক্তি, পরিহাস করতে ছাড়লেন না।

'ঠিকই বলেছেন। ওনার মাথায় এ মতলব না এলে আজ আপনাকে এখানে আসতে হোতো না।'

স্ত্রীর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে ব্যাবসায়ী বললো :

'তোমার এই কাব্যবিলাসের জন্যে কী ফ্যাসাদে পড়তে হোলো দেখতে পেয়েছ? বুড়ো বয়সে অশালীনতার অভিযোগে এখন কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। তারপর দোকানপাট বিক্রি করে অন্য কোথাও পাড়ি দিতে হবে। বেশ মজার ব্যাপার হবে, কি বল?'

স্বামীর কথায় ভ্রূক্ষেপ করলো না মাদান ব্যুরেন। উঠে দাঁড়িয়ে বিন্দুমাত্র বিব্রত বা সঙ্কুচিত না হয়ে স্পষ্ট ভাষায় প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করে চলল :

'জানি আমরা নির্বোধ। কিন্তু স্যার, আমার মতো একজন নগণ্য মহিলার পক্ষ থেকে আমাকে ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝিয়ে বলতে দিন। আমার বিশ্বাস আছে, সবটুকু শুনলে কাঠগড়ায় দাঁড়াবার লজ্জা থেকে আপনি আমাদের অব্যাহতি দেবেন। আমরা ঘরে ফিরে যাবার অনুমতি পাব।

"সে অনেক কালের কথা। আমি তখন কিশোরী, মসিয়ো ব্যুরেনের সঙ্গে এই অঞ্চলেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। সেদিন ছিল রবিবার। এমন স্পষ্ট মনে পড়ছে, যেন কালকের ঘটনা। ও কাজ করতো কাপড়ের দোকানে, আমি দরজীর। রোজলাইভাকু আমার বান্ধবী। আমরা একসঙ্গে থাকতাম। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে বেড়াতে আসতাম এখানে। আমার কোন পুরুষ বন্ধু ছিল না, কিন্তু রোজের ছিল। তার সঙ্গেই আমরা এখানে আসতাম। সহাস্যে একদিন সে আমায় সংবাদ দিল আগামী ছুটির দিন তার এক বন্ধুকে সঙ্গে করে আনবে। সে কি বলতে চায় তা না বোঝার

কথা নয়। বললাম, তাহলে বেচারীর সময়ই নষ্ট হবে। কোন লাভ হবে না। আমি ভদ্র মেয়ে ছিলাম স্যার।

'পরের দিন মসিয়ো ব্যুরেন আমাদের জন্যে স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। তখন ও একটি সুশ্রী যুবক। অবশ্য নিজে সংযত থাকবো স্থির করেছিলাম, আর ছিলামও তাই।

'এরপর একদিন গেলাম বেঅনস্-এ। সে এক অপূর্ব দিন। এমন মনোরম দিনে শুধু অকারণ অশ্রু বিসর্জন করতে মন চায়। অমন উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে আমি বারে বারে অন্যমনস্ক হতে থাকি, আর কেমন পাগলের মতো আচরণ করে বসি। এ স্বভাব আমার চিরকালের। সবুজ ঘাস, বাতাসে পাকা ফসলের আন্দোলন, আকাশে দোয়েল পাখির অবাধ বিচরণ, শুকনো ঘাস আর বুনো আফিমের মন-মাতানো গন্ধ, ডেইজি ফুল, নানা বর্ণের পাখি—এসব একত্রে ইন্দ্রিয়ের পথে প্রবেশ করে অনভ্যস্ত লোকের শ্যাম্পেনের নেশার মতো মনকে তন্দ্রাতুর করে তোলে। সে এক চমৎকার দিন, উজ্জ্বল আর মনোমুগ্ধকর। খোলা চোখের মধ্য দিয়ে এ আমেজ মরমে প্রবেশ করে প্রাণ আকুল করে তুলছিল। মসিয়ো ব্যুরেনের সঙ্গে হাঁটছিলাম। মাঝে মাঝে দুটো একটা কথা। অপরিচিত লোকের সঙ্গে আমার ঠিক কথা আসে না। আর ওরও লাজুক-লাজুক ভাবটা ভাল লাগছিল। রোজ ও সিমঁ আগে চলতে চলতে পরস্পর চুম্বন করছিল। আর আমার সে কী অস্বস্তি। অবশেষে বনে ঢুকে পড়লাম। নরম ঘাসে ছড়িয়ে বসা হোলো। চারদিকে কোমল শীতলতায় সন্তস্নানের অনুভূতি। আমার গাম্ভীর্যের জন্য রোজ আর তার বন্ধুর পরিহাস শুনতে হোলো। কিন্তু আমার দ্বারা আর কীই বা সম্ভব হোতো? আমাদের উপস্থিতি নস্যাৎ করে ওরা আবার চুম্বন আর গুঞ্জন শুরু করল। তারপর কথা নেই, বার্তা নেই এক সময় উঠে গিয়ে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। অপরিচিত যুবকের সঙ্গে একাকী আমি লজ্জায় মরে গেলাম। সরীসৃপের মতো ওদের

অন্তর্হিত হতে দেখে সাহস করে একটা ছুটো কথা শুরু করলাম। জিজ্ঞেস করলাম ও কি করে। আগেই বলেছি ও তখন কাপড়ের দোকানে কাজ করত। কিছুক্ষণ কথা বলাতে ওর সাহস বাড়ল। আমাকে অধিকার করতে চেষ্টা করল। কিন্তু আমি বাধা দিয়ে নিরস্ত করেছি, তাই না ব্যরেন ?'

মাটির দিকে তাকিয়ে ব্যরেন দাঁড়িয়ে রইল। কোন জবাব দিল না।

'ও সেদিন বুঝল,' মহিলা বলে চললো, 'আমি কেমন মেয়ে। তারপর থেকে আমার সঙ্গে সমঝে চলতো। প্রতি রবিবার আমার কাছে আসতো। আমাকে সত্যিই ও ভালবেসে ফেলল, আমিও। তখন কি ভালই না ছিল ও।

'সংক্ষেপে বলতে গেলে সেপ্টেম্বর আমাদের জীবনের স্মরণীয় কাল। আমাদের বিয়ে আর রুঁদ্য মারতারস-এর দোকান এক মাসেই হয়।

'প্রথম প্রথম দোকান চলেনি। কষ্টে দিন কেটেছে। গাঁয়ে বেড়ানো হয়নি। তারপর কি হোলো, বেড়ানোর কথা মনেই রইল না। ব্যাবসায়ীদের কাছে গোলাপের চেয়ে ক্যাসবাক্সের কদর বেশি। সারাদিন কাজের মধ্যে ডুবে থেকে আর কিছুর খেয়াল রইল না। অজান্তে বয়স বাড়তে লাগলো। তারপর প্রেম ভালবাসা থেকে দূরে সরে এসে বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে দাম্পত্য জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম। যে অভাববোধ নেই তার জন্য ক্ষোভ থাকাও সম্ভব নয় স্যার।

'তারপর ধীরে ধীরে সুদিন এল, ভবিষ্যতের ভাবনা রইল না। আর সেই সময় থেকে আমার কি যে হোলো জানি না—সত্যিই জানি না স্যার।

'অবশিষ্ট স্কুল ছাত্রীর মতো আবার কল্পনার জাল বুনতে শুরু করলাম। ক্যাসবাক্সের পেছনে থেকেও ফুলের সুমিষ্ট ঘ্রাণে হৃদয় নেচে উঠল। পথে ফুলওয়ালা দেখলে চেঁচিয়ে ডাকতাম, ছুটে গিয়ে দাঁড়াতাম দরজায়। দু'পাশের বৃহৎ অট্টালিকার ওপর অসীম

নীল আকাশ। পথের ওপর ওটা আকাশ তো নয়, যেন প্যারিসের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এক সুদীর্ঘ নীল নদী; আর দোয়েল পাখিরা যেন তার স্বচ্ছ বুকে স্বচ্ছন্দ ক্রীড়ারত মৎস্যকুল। আমার বয়সে এ ধরনের ভাববিলাস হয়ত বেমানান। কিন্তু সারাটা জীবন কাজে ডুবে থেকে যে অমূল্য সম্পদ হারিয়েছি, তার জন্য দুঃখ হওয়াটা স্বাভাবিক। দেখুন, আর দশটি মেয়ের মতো গত বিশ বছর ধরে আমিও এই অরণ্য পরিবেশে প্রেমিকের চুম্বন সুধা পান করতে পারতাম। মনের মানুষটিকে পাশে রেখে এই গাছের ছায়ায় নিজেকে এলিয়ে দেওয়ার স্বর্গসুখ উপভোগ করতে পারতাম। দিনরাত এই এক ভাবনা আমায় পেয়ে বসল। স্বপ্নের অতল তলে যেতে যেতে জ্যোৎস্নার অবাধ বন্যায় প্রাণভরে অবগাহন করে নিতাম।

'মসিয়ো ব্যুরেনের কাছে এ কথা প্রকাশ করবার সাহস হয়নি। জানি কপালে জুটবে উপহাস আর টুকিটাকি জিনিস বিক্রির উপদেশ। সত্যি বলতে কি, ওর জন্য আমার আগ্রহও ছিল কম। কিন্তু দর্পণে নিজের চেহরা দেখে অন্য কোথাও প্রস্তাব করার দুঃসাহস পোষণ করিনি।

'সাহস করে একদিন বলেই ফেললাম—ওগো চলো না, আমাদের প্রথম মিলনের স্থানটি থেকে বেড়িয়ে আসি। আমার কথা অবশ্য ওর জানবার কথা নয়। ও রাজী হোলো। আর দীর্ঘ ব্যবধানের পর আজ সকাল নটায় আবার আমরা এখানে এলাম।

'শস্যক্ষেতের মধ্যদিয়ে চলতে চলতে দেহ মনে যেন কৈশোরের চপলতা ফিরে এলো। স্বামীকে দেখলাম যেন সেই অতীত দিনের সুদর্শন যুবক। নারী মনের বসন্ত সত্যি চিরন্তন। ওকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলাম। আমি তখন আবেগে মাতোয়ারা। ও বললো। "তোমাকে আজ কিসে পেয়েছে? অমন করছো কেন?"

কোন কথাই তখন আমার কানে প্রবেশ করেনি। শুধু আমার

বুকের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি ওকে জোর করে বনের অন্তরালে নিয়ে গেছি। তারপর—বাকিটুকু শুনেছেন স্যার। আগাগোড়া সবটুকু খুলে বলেছি—সবটুকু।"

মেয়র লোক ভালো। ঠোঁটের কোণে একটু হেসে তিনি বললেন: 'নিশ্চিন্তে ফিরে যান, মাদাম। তবে বনের মধ্যে এমন কাণ্ড আর যেন না হয়।'

# ভালোবাসা

## [ শিকারীর ডায়েরী থেকে ]

সংবাদপত্রে এইমাত্র একটা যৌনাবেগের নাটক পড়লাম। মেয়েটিকে হত্যা করে ছেলেটি পরে আত্মহত্যা কবল। অতএব মেয়েটিকে সে ভালোবাসতো। কিন্তু নারী-পুরুষ নয়, তাদের ভালোবাসাটাই আমার বিবেচ্য। বিষয়টায় আমি আঘাত পাইনি, বিস্মিতও হইনি। ব্যাপারটা আমায় অভিভূত করেছে অথবা ভাবিয়ে তুলেছে তাও নয়। তবু ঘটনাটায় আমার আগ্রহ জেগেছে। কারণ যৌবনের এক অদ্ভুত শিকারের স্মৃতি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল। প্রাচীন যুগে ধার্মিক খ্রীষ্টানদের জীবনে যেমন দেবতার আবির্ভাব হোতো, আমার জীবনেও তেমনি প্রেমের উদয় হয়েছিল।

আদিম মানবের সহজাত প্রবৃত্তি ও অনুভূতি নিয়ে আমার জন্ম, আর সভ্যসমাজের আধ্যাত্মিকতায় ও যুক্তিবাদে মনের বিকাশ।

শিকার খুবই ভালোবাসতাম। জীবজন্তুব শবীর থেকে রক্ত ঝরে যখন প্রাণ বেরিয়ে যেত, আহত পশুর লোমে, আমার হাতে রক্ত লেগে থাকত ; তখন আমাব প্রাণ উল্লাসে নৃত্য করে উঠত।

শরৎ বিদায় না নিতেই সে বছর শীত এসে পড়ল। আমার মাসতুতো ভাই কার্লের কাছ থেকে জলাভূমিতে হাঁস শিকারের আমন্ত্রণ পেলাম।

ভাইয়ের বয়স হবে চল্লিশ। কিন্তু স্ফূর্তিবাজ লোক। মুখের রং টক্‌টকে লাল, ইয়া গোঁফ আর দশাসই চেহারা। গ্রামের জমিদার হলেও দিলদরিয়া মেজাজ। জাত ফরাসীদের মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর প্রফুল্ল অন্তঃকরণের জন্য তার সাদামাটা স্বভাবটা সয়ে যেত।

এক বিশাল উপত্যকার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ছোট নদী। সেখানে জমিদারীর খামারবাড়িতে ছিল তার বসতি।

উত্তর দক্ষিণের ঢালু অঞ্চল জুড়ে ঘন বন। অনেক কালের পুরোনো মূল্যবান গাছে ভরা। শিকারের জন্য নাম আছে ফ্রান্সের এই অঞ্চলের। দুর্লভ শিকারের সন্ধান মেলে এখানে। মাঝেমধ্যে বাজপাখীও ধরা পড়ে। যাযাবর পক্ষীকুল যদি কদাচিৎ এই জনাকীর্ণ দেশে এসে পড়ত, তবে ওই প্রাচীন বনে না থেমে পারত না। সমস্ত দিনমান অনাবৃত আকাশের নীচে উড়ে ক্লান্ত-ডানা পাখীরা বিশ্রাম নিত এই আদিম অরণ্যের বুকে। যেন ওদের সাময়িক আস্তানার জন্যই এই জঙ্গলের সৃষ্টি।

এই উপত্যকায় ছিল বড় বড় চারণক্ষেত্র, এখানে ওখানে ঝোপ-ঝাড়, জল যাবার খাল। এখানের নদীর বাঁধ থেকে প্রকাণ্ড জলা-ভূমির ওপর জল ফুলে ফুলে উপছে পড়ত। আমার ভাই এই জলা-ভূমিকে উদ্যানে পরিণত করেছিল। এটি ছিল তার গর্বের সামগ্রী। আর আমার কাছে শিকারের নন্দন-কানন। নলখাগড়ার উপনিবেশ সমুদ্র-তরঙ্গের মতো দুলত। খস্‌খস্‌ শব্দ করত। মনে হোতো যেন প্রাণ পেয়েছে। এর মধ্যে কার্লে খাল কাটিয়েছিল। খালের প্রশান্ত জলে প্রশস্ত নৌকো প্রকাণ্ড লগির ঠেলায় ভেসে চলত। দুধারে খাগড়াবন কাঁপিয়ে, মৎস্যকুলে আলোড়ন তুলে নৌকো তর্‌তর্‌ করে এগিয়ে যেত। তাই দেখে ছুঁচ্‌লো ঠোঁট বুনোপাখী সন্ত্রাসে ঝুপ্‌ করে ডুব দিত জলে।

জল আমার অতি প্রিয়। সমুদ্র অশান্ত, অনায়ত্ব, বিশাল। নদী চঞ্চলা, মনোরমা; ছুটে আসে, ছুটে পালায়। বিশ্বচরাচরে জলাভূমি এক স্বতন্ত্র জগৎ। তার আছে এক পৃথক সমাজ। গৃহস্থ, মুসাফির, তাদের বিচিত্র ভাষা আর বিভিন্ন শব্দসম্ভার নিয়ে গড়ে উঠেছে নিজস্ব সংসার, রহস্যময় জীবন। এই জলাভূমি কখনও বিরক্তি, ভীতি আর উদ্‌বেগে ভরে ওঠে। জলে-ডোবা নীচু সমতল ভূমির ওপর ভয় ওৎ পেতে থাকে, যেন সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সে কি নলবনের অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি, ভৌতিক আলেয়া অথবা নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে সৃষ্টিছাড়া নীরবতা? একি সেই অলৌকিক

কুয়াশা যা মৃতদেহের আচ্ছাদনবস্ত্রের মতো খাগড়াবন জড়িয়ে থাকে ? অথবা এক ধূসর অনুভূতি—কোমল, নিরুত্তাপ অথচ মানবসৃষ্ট আগ্নেয়াস্ত্রের চেয়েও ভয়াল ; ভগবানের বজ্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর ? এই পরিবেশ জলাভূমিকে অবাস্তব করে তুলেছে। এ যেন এক স্বপ্নলোক, কোন শঙ্কার দেশ। এখানে অনিবার্য, অগম রহস্য লুকিয়ে বাস করে।

না, এ ছাড়াও অন্য কিছু আছে। আর এক মোহিনী মায়া—নিগূঢ়, নিথর ঘন কুয়াশার অন্তরালে যার গোপন অভিসার। অন্ধকার ধরিত্রীগর্ভে প্রাণের বীজ যখন অস্বস্তিতে অবরুদ্ধ, যখন আতপদগ্ধ পৃথ্বী সৃষ্টি-প্রেরণায় ক্রন্দনরতা—এমনি স্থির পঙ্কিল সলিলেই না জীবনচেতনা অস্থির আবেগে প্রথম দিনের আলো দেখেছিল? এখানে বোধহয় সেই সৃষ্টির প্রথম বিস্ময় বিরাজমান।

সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছলাম ভাইয়ের ওখানে। মনে হচ্ছিল পাথরগুলো অবধি জমে গেছে। খাবার ঘরের প্রকাণ্ড দেওয়াল, ছাদ, আলমারির তাক—সর্বত্র কেবল পাখীর মমি আর মমি। কোনটার ডানা মেলা, কোনটা বা নখের ওপর ভর করে জলে বসে। চড়াই, শিকারী-বাজ, বক, পেঁচা, গোটসাকার, বাজার্ড, হ্যারিয়ার, ভ্যালাব্‌স্‌, ফলকনস প্রভৃতি অসংখ্য পাখীর মৃতদেহ চারিদিকে ছড়ানো। খেতে খেতে আমাদের কথা হচ্ছিল। সে রাত্রির শিকারের পরিকল্পনা কার্লে আমাকে বুঝিয়ে বলল। তার পরনে শীলমাছের চামড়ার কোট। মেরুপ্রদেশের কোন অদ্ভুত জন্তুর মতোই তাকে দেখাচ্ছিল।

আমাদের রওনা হতে হবে শেষ রাত সাড়ে তিনটেয়। তাহলে সাড়ে চারটের মধ্যেই শিকারের জন্য নির্দিষ্ট জায়াগায় পৌঁছতে পারব। ভোরের কন্‌কনে বাতাস থেকে রক্ষা পাবার জন্য বরফের টুকরো সাজিয়ে সেখানে একটা কুঁড়ে তৈরি করা হয়েছিল। সেই হিমেল হাওয়ায় শরীরের মাংস করাতের মতো চিরে ফেলে, ছুরির মতো কাটে, বিষাক্ত তীরের মতো বেঁধে, সাঁড়শীর মতো আঁকড়ে ধরে, আগুনের মতো জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

হাতে হাত ঘষে আমার ভাই বলল : "এমন ঠাণ্ডা আর কখনো দেখিনি। সন্ধ্যা ছ'টায় তাপমাত্রা শূন্যেরও বার ডিগ্রি নীচে নেমে গিয়েছিল।"

খাওয়ার পরই আমি বিছানা নিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। চুল্লিতে তখন গন্‌গনে আগুন জ্বলছে। ঠিক তিনটেয় আমায় ডেকে তোলা হোলো। আমি একটা ভেড়ার চামড়ার কোট পরে নিলাম। দেখলাম কার্লের গায়ে ভালুকের চামড়ার কোট। ছ'কাপ করে কফি আর কয়েক গ্লাস ব্রাণ্ডি গিলে আমরা তৈরী হলাম। একজন সহকারী আর আমাদের কুকুর দুটো—প্লাজাঁ ও পিরত আমাদের সঙ্গী হোলো।

বাইরে পা বাড়াতেই মেনে হোলো যেন অস্থিমজ্জা জমে গেছে। মনে হচ্ছিল সে রাতে পৃথিবী ঠাণ্ডায় মরে গেছে। ভয়ঙ্কর হিমে বাতাস যেন জমে কঠিন হয়ে উঠেছে, জমাট বেঁধে স্তব্ধ হয়ে গেছে। কোন প্রবাহই যেন একে সচল করতে পারবে না। এই তুহিনতুষার কড়মড় করে কামড়ায়, কট্‌মট্‌ করে কাটে, অবশ করে দেয়। বনস্পতি, চারাগাছ, পোকামাকড়, এমনকি ছোট ছোট পাখী পর্যন্ত মেরে ফেলে। গাছের ওপর থেকে মরা পাখী টুপ করে ঝরে রুক্ষ মাটিতে, তারপর বরফের চাপে জমে শক্ত হয়ে যায়।

চাঁদ তখন দিগন্তে ঢলে পড়েছে। মহাশূন্যের বন্ধুর পথপরিক্রমায় তার দেহ নিঃশেষিত, অবসন্ন। মুমূর্ষু চন্দ্রিমা উর্ধ্বমুখে শায়িত। তার বিশীর্ণ মুখমণ্ডল থেকে বিষাদপাণ্ডুর ক্ষীণালোক প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। এ যেন শব-মিছিলের নিষ্প্রাণ আলো। কৃষ্ণা চতুর্দশীর ত্রিযামা রজনীতে এমনি আলোই ফুটে ওঠে।

কার্লে আর আমি পাশাপাশি হাঁটছিলাম। আমাদের হাত পকেটের মধ্যে। বগলের তলে বন্দুক চেপে রেখেছি। পিঠ কুঁজো হয়ে পড়েছে। জমাট নদীর ওপর দিয়ে চলতে গিয়ে যাতে পা পিছলে না যাই সেজন্য আমাদের জুতো পশমে মোড়া ছিল। ঐ জন্য আমাদের পায়ের শব্দ হচ্ছিল না। কুকুর দুটোর নিঃশ্বাস লক্ষ্য

করলাম—ধোঁয়াটে, সাদা। কিছুক্ষণের মধ্যেই জলাভূমির প্রান্তে এসে পড়লাম। বনের মধ্য দিয়ে একটা সরু পথ। সেটা ধরে এগিয়ে গেলাম। আমাদের কাঁধের সঙ্গে শুকনো পাতার ঘষা লাগছিল। তাই পেছন থেকে ভেসে আসছিল মরা-পাতার মর্মরধ্বনি। উপত্যকা জমাটবাঁধা, মৃত। নলখাগড়ার বন বিশুষ্ক। তার মধ্য দিয়ে আমাদের পথ চলতে হচ্ছে। কী যেন এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় আমার মন ব্যাকুল হোলো। কিন্তু এ অনুভূতি আমার কাছে সম্পূর্ণ নূতন। পথের মোড়ে আমাদের জন্য তৈরি সেই বরফের ঘরটাকে আবিষ্কার করলাম।

আমি ভেতরে ঢুকলাম। বিহগকুলের নিদ্রাভঙ্গের তখনও প্রায় ঘণ্টাখানেক বাকি আছে। এ সময়টা আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। শরীর গরম করার উদ্দেশ্যে জামাকাপড় শুদ্ধই গড়াগড়ি দিয়ে নিলাম।

চিৎপাত হয়ে শুয়ে চাঁদের দিকে তাকালাম। বরফের ঘরের স্বচ্ছ দেওয়ালের মধ্য দিয়ে মনে হচ্ছিল চাঁদের যেন চারটে শিং গজিয়েছে। কিন্তু এখানকার এই হাড়-কাঁপানো শীতে, বরফদেওয়ালের তীব্র শীতলতায় আর আকাশ থেকে ঝরে পড়া তুষারপাতে আমায় কাবু করল। আমি কাশতে শুরু করলাম।

ভাই খুব চিন্তায় পড়ল। উদ্‌বিগ্ন হয়ে বলল: "আজ বেশি কিছু শিকার না করলে এমন কিছু এসে যাবে না, কিন্তু তোমার সর্দি হলে খুব বিপদ। এসো, আমরা বরং কিছুটা আগুন জ্বালি।"

তার আদেশ পেয়ে সহকারী দারোয়ানটি কিছু শুকনো উলুখড় কেটে নিয়ে এলো। সেগুলোকে ঘরের মধ্যে স্তূপাকৃতি সাজিয়ে আগুন দেওয়া হোলো। ধোঁয়া বেরোনোর জন্য ছাদে একটা ফুটো ছিল। আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। সেই আগুনের পরশ পেয়ে স্ফটিক-স্বচ্ছ বরফ-দেওয়াল থেকে স্বেদবিন্দু ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। কার্লে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। চীৎকার

করে আমায় ডেকে বলে উঠলো : "শীগ্‌গির বাইরে এসো, দেখো এসে।"

বাইরে এসে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। আশ্চর্য দৃশ্য। আমাদের মোচাকৃতি ঘরটা জ্বলছে। যেন তুষার-কঠিন জলাভূমির আগ্নেয় হৃদয়, যেন প্রকাণ্ড এক হীরের টুকরো। ভেতরে দুটো অদ্ভুত অবয়ব। আগুন পোয়াচ্ছে।

মাথার ওপর শুনতে পেলাম আর্তরব, অদ্ভুত বেদনার্ত ধ্বনি। নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে সকরুণ প্রতিবাদ। হঠাৎ আগুনের উত্তাপে বুনো পাখী সচকিত হয়ে জেগে উঠেছে।

জীবনের এই প্রথম সঙ্কেতে আমি বিচলিত বোধ করলাম। শীতের পূর্বদিগন্তে তখনও দিনের আলো ফোটেনি। তবু নিঃসীম মহাশূন্য ভেদ করে প্রাণের তাগিদে বিহঙ্গদল অন্ধবেগে ধেয়ে চলেছে সুদূরপানে। তুষার শুভ্র এই ব্রাহ্মমুহূর্তে আমার মনে হোলো ভাসমান পাখীর পাখার শোঁ শোঁ শব্দ নয়, এ যেন মহাপ্রকৃতির হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস।

কার্লে কথা বলল : "আগুন নিভিয়ে দাও, সকাল প্রায় হয়ে এসেছে।"

সত্যই আকাশে রক্তিমাভা দেখা দিল।

ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁসের দল শূন্যপথে মিলিয়ে যেতে লাগল। যেন অতি দ্রুত তুলির আঁচড়ে এক একটি রেখা টেনে তক্ষুনি মুছে ফেলা হচ্ছে।

কার্লের বন্দুক থেকে এক ঝলক আগুন অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে গেল। কুকুর দুটো দৌড়াল। খাগড়াবনের উপর উড়ন্ত শিকারের ছায়া লক্ষ্য করে আমরা পর পর গুলি ছুঁড়লাম। বিজয়োল্লাসে অক্লান্ত পিরত আর প্লাজা রক্তাক্ত শিকারগুলো মুখে করে বয়ে আনছিল। কোন কোনটার চোখের দৃষ্টি তখনও যেন সজীব।

চারিদিকে আলো জাগল। নির্মেঘ ঝক্‌ঝকে একটি দিন।

উপত্যকার অন্দরেও সূর্যদেব উঁকি দিলেন। আমরা ফেরার কথা ভাবছি। এমন সময়ই ঘটল ঘটানাটি।

আমাদের মাথার ওপর দিয়ে দুটি পাখী পাখা মেলে সামনে মাথা বাড়িয়ে উড়ে যাচ্ছিল। আমার বন্দুক গর্জে উঠল। হংসমিথুনের একটি এসে পড়ল ঠিক আমাদের পায়ের কাছে। বুক-সাদা একটা বালিহাঁস। সেই মুহূর্তে ওপর থেকে পাখীর কণ্ঠের কান্না ভেসে এলো। সাথীহারা পাখীটির বিদীর্ণ হৃদয় আর্তনাদ করছিল একটানা সুরে ইনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ করছিল। আমাদের মাথার ওপর আকাশের নীলিমায় বৃত্তাকারে ঘুরপাক খাচ্ছিল, কিন্তু আমার হাতের মুঠোয় ধরা তার সাথীটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ।

কার্লে বন্দুক উঁচিয়ে হাঁটুমুড়ে বসে অপেক্ষা করে রইল। নাগালের মধ্যে এলেই গুলি ছুঁড়বে। খুশিতে ডগমগ হয়ে কার্লে বলল: "তুমি স্ত্রী পাখীটাকে মেরেছ, পুরুষটা কিছুতেই পালাবে না।"

সত্যিই পাখীটা গেল না। মাথার ওপর কেঁদে কেঁদে ঘুরতে লাগল, ঘুরতেই থাকল। নির্জন অরণ্যে তার বেদনাসিক্ত অভি-শাপ বাণী শূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। নগণ্য এই পাখীটার শোক সেদিন আমায় যেমন করে দগ্ধ করেছে, এমন আর কোনদিন করেনি।

একবার ও আওতার বাইরে চলে গেল। ভাবলাম বোধহয় অনন্ত চরাচরে একা পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু তখনি আবার ও ফিরে এলো সঙ্গিনীর সংবাদ নিতে। কার্লের গলা শুনলাম: "ওটাকে নীচে রাখ, পুরুষটা এক্ষুনি নেমে আসবে।" ক্ষুদ্র বালিহাঁসের বিষাদ শিকারী গ্রাহ্য করে না।

পাখীর ভালোবাসা নিয়ে সত্যই ও নেমে এলো। ফিরে এলো আমার গুলিতে হত ওর প্রেমিকার জন্য।

কার্লের অব্যর্থ নিশানায় পাখীটা স্থির হয়ে গেল। যেন কেউ সঙ্গীতের সুর কেটে দিল। কালো একটা কি যেন পড়তে দেখলাম।

খাগড়াবনে কোন বস্তু পতনের আওয়াজও কানে এলো। পিরত দৌড়ে গিয়ে তাকে আমার কাছে নিয়ে এলো।

ক্রমে তাদের তপ্ত শোণিত শীতল হয়ে জমে গেল। আমি ওদের দুটিকে একই গর্তে কবর দিলাম। তারপর সেইদিনই ফিরে এলাম প্যারিসে।

# মারোকা

প্রিয় বন্ধু, আফ্রিকা সম্বন্ধে আমার ধারণা কি তোমায় জানাতে বলেছ। সেই সঙ্গে সেখানে আমার অভিযান—বিশেষ করে এই মন মাতানো দেশে আমার প্রেমের অভিজ্ঞতার কথা তুমি জানতে চাও। আমার এই কৃষ্ণা প্রেমিকাদের ( ওই নাম অবশ্য তোমারই দেওয়া ) নিয়ে তুমি আগে আমাকে অনেক উপহাস করেছ।

তুমি তো দেখেছ, আমি একজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সে ফিরেছিলাম। সে ছিল লম্বা, আবলুস কাঠের মতো গায়ের রং, মাথায় একটা হলদে সিল্কের রুমাল, আর পরনে ঝক্‌মকে রঙের ট্রাউজার।

সন্দেহ নেই, ওই মরোক্কোবাসী পুরাঙ্গনাদের একদিন সময় আসবে। কেননা, এমন অনেক ললনা আমায় আকর্ষণ করেছে, আর তাদের সঙ্গে প্রেমে পড়ার জন্য আমি তীব্র কামনা অনুভব করেছি। কিন্তু শুরুতেই আমি এমন এক বস্তুর সন্ধান পেলাম যা আরও ভাল এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

গতবারের চিঠিতে তুমি লিখেছ—'একটা দেশের লোক কি ভাবে প্রেম করে, এ কথা যদি আমি জানতে পারি, তবে ঐ দেশ সম্বন্ধে আমার বেশ ভালভাবেই জানা হয়ে যায়। এমনকি দেশটি না দেখেও তার বর্ণনা দিয়ে দেওয়া যায়।' তাই যদি হয় তবে বলি, এখানকার লোকেরা খ্যাপার মতো ভালবাসে।

ওদের সংস্পর্শে এলে প্রথম মুহূর্ত থেকেই অনুভব করা যায় উন্মাদনার আলোড়ন, অফুরন্ত বাসনা। আঙুলের ডগায় শিহরণ ক্রমে উত্তেজনার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ইন্দ্রিয় লোলুপ হোয়ে ওঠে, দেহে আসুরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। হাতের সামান্য স্পর্শ থেকে নেমে আসতে হয় সেই প্রয়োজনে, যার ফলে আমরা অনেক বোকামি করে বসি।

আমায় ভুল বুঝো না। তোমরা যাকে বল হৃদয়ের ভালবাসা, আত্মার প্রেম, ভাবাবেগ ভরা আদর্শ, 'প্লেটনিক লাভ' ইত্যাদি, এসব সত্যি আছে কিনা আমি জানি না। অন্তত আমার এতে সন্দেহ আছে। কিন্তু আর এক রকমের ভালবাসা আছে যার নাম ইন্দ্রিয়াসক্তি। এই জাতীয় প্রেমের মধ্যে কিছু কিছু ভালও আছে। হ্যাঁ, এর মধ্যে একটা বড় রকমের ভাল আছে। এই ইন্দ্রিয় প্রেম এই জলবায়ুতে সত্যি ভয়ংকর। এখানকার তাপ-দগ্ধ আবহাওয়া শরীরে আনে জ্বরের উত্তাপ। অদূরের মরু-সমুদ্র থেকে বহ্নি-লহরী তুলে ছুটে আসে দখিনা বাতাস। তার ঝাপটায় নিঃশ্বাস রুদ্ধ হোতে চায়। আর উত্তর মরু থেকে বইতে থাকে সেই প্রাণান্তকর মরুঝঞ্ঝা, যা অগ্নি অপেক্ষা শুষ্ক আর ধ্বংসাত্মক। সমগ্র মহাদেশ যেন এক অনন্ত প্রসারিত অগ্নিকুণ্ড। সূর্যের বিভীষিকাময় তাণ্ডব দহনে পাথরগুলো পর্যন্ত জ্বলছে। এই উত্তাপ রক্তে আগুন ধরায় দেহে উত্তেজনা জাগায়, আর আমাদের পশু করে তোলে।

কিন্তু এবার আমার গল্পে আশা যাক। আফ্রিকা অবস্থানের গোড়া থেকেই কিন্তু আমি স্থায়ী বসবাস শুরু করিনি। বোনা, কনস্তান্তাইন, বিস্কারা এবং স্তেফ্ ঘুরে আমি চাবেতের সংকীর্ণ মরুপথ দিয়ে বোগীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। পথটি অতীব সুন্দর; বৃহৎ অরণ্যের বুক চিরে ছ'শ ফুটের বেশি ওপর থেকে সোজা নেমে এসেছে বোগীর সেই আশ্চর্য সুন্দর উপসাগরে। নেপ্‌লস্, এ্যাজাকিও, জেনিজ ছিল আমার জানার মধ্যে সুন্দরতম উপসাগর। কিন্তু বোগী উপসাগর তাদের চেয়ে কিছুমাত্র কম সুন্দর নয়। শান্ত এই সমুদ্র খাঁড়িটি প্রদক্ষিণ করবার আগেই বহুদূর থেকে বোগী দেখা যায়। বৃক্ষাচ্ছাদিত উঁচু পাহাড়ের খাড়াই-এ বোগী গড়ে উঠেছে। শ্যামল পার্বত্য ঢালুতে বোগী যেন একটি শ্বেত বিন্দু, ঠিক সমুদ্রে পতিত কোন জলপ্রপাতের শুভ্র ফেনা।

এই ছোট্ট মন-ভোলানো দেশটাতে পা দিতেই মনে হোলো

ওখানে অনেকদিন থাকতে হবে। চারদিকে জড়াজড়ি দাঁড়ানো রুক্ষ অদ্ভুতাকৃতি পাহাড় চুড়ো দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গায়ে গায়ে জড়োসড়ো পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে উন্মুক্ত সমুদ্র প্রায় চোখেই পড়ে না। তাই উপসাগরটিকে মনে হয় যেন একটা হ্রদ। নিচে নীল জল আশ্চর্য স্বচ্ছ। ওপরে মেঘমুক্ত আকাশ ঘন নীল। মনে হয় দুটি রঙের প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে। জলের বুকে আকাশের বিস্ময়কর সৌন্দর্যের প্রতিফলন। তারা যেন একটা আয়নায় মুখ রেখেছে, একে অপরের প্রকৃত রূপ দেখে নিচ্ছে।

বোগী একটা শহরের ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু জেটির ওপর এই ধ্বংস এত চমৎকার যে মনে হবে তুমি কোন অপেরা দেখছো। এটা হচ্ছে প্রাচীন সারাসেন* গেট। এখন আইভি লতায় আচ্ছাদিত। শহরের চারিদিক ঘেরা পাহাড়ের ওপরেও রয়েছে ভাঙ্গনের চিহ্ন। রোমের প্রাচীরের ভগ্নাংশ, প্রাচীন আরব্য মনু-মেন্টের টুকরো আর আরবী প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। শহরের ওপরের দিকে ছোট একটা মরোক্কো বাড়ি নিয়েছিলাম। এই জাতীয় আস্তানার কথা তোমার জানা আছে। কেননা প্রায়ই এদের বর্ণনা দেওয়া হয়। এই ঘরগুলোয় বাইরের দিকে কোন জানালা নেই কিন্তু ভেতর দিকে একটা খোলা উঠোন থাকায় আগাগোড়া সব ঘরগুলো আলো পায়। দোতলায় রয়েছে একটা প্রশস্ত শীতল কক্ষ। দিন কাটানোর ব্যবস্থা। আর রাতে শোবার জন্য আছে খোলা সমতল ছাদ।

গরম দেশের অধিবাসীদের মতো দিবানিদ্রা প্রথায় আমিও অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। যখন পথ প্রান্তর নির্জন, ঝকঝকে সাদা সুদীর্ঘ রাজপথ জনশূন্য, মানুষের নিশ্বাস নিতে যখন খুব কষ্ট হয়, তখনই আফ্রিকায় সবচেয়ে গরম। এ সময়ে সবাই যথাসম্ভব কম

---

*সারাসেন—আরবীয়দের প্রাচীন নাম। যে সময় ধর্মযুদ্ধ হয় তখনকার মুসলমানদের এই নামে অভিহিত করা হোতো।

আচ্ছাদনে দেহ আবৃত করে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা ঘুমের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে।

আরবী ভাস্কর্যরীতিতে গঠিত স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আমার বসবার ঘর। যেখানে বড়গোছের সৌখিন এক পালঙ্ক পেতে তার ওপর দিজাবেল আমের থেকে আনা নরম কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছিলাম। সেখানে প্রায় এস্যাঁর মতো পোশাক পরে বিশ্রাম নিতে চাইতাম। কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় আমি ঘুমোতে পারতাম না। পৃথিবীতে দু রকমের অত্যাচার আছে। আশা করি তার একটাও তুমি কখনও জানবে না। এর একটা হচ্ছে জলের অভাব, আর একটা নারীর। আমি জানি না এদের মধ্যে কোনটা যে বেশি ভয়াবহ। এক গ্লাস পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলের জন্য মরুভূমিতে মানুষ যে কোন অসদাচরণ করে; আর কতগুলো উপকূল শহরে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গ পাবার জন্য লোকে কীই না করে। আফ্রিকায় মেয়ের অভাব নেই, বরং ঢের মেলে। কিন্তু আমার উপমা ধরে বললে বলা যায়—তারা যেন মরু সাহারার বুকে কর্দমাক্ত জলাশয়, তেমনি অরুচি ও অস্বাস্থ্যকর।

একদিন অস্বাভাবিক ক্লান্তি বোধ করছিলাম। চোখ বোজার চেষ্টা বৃথা হোলো। পা দুটোয় এত যন্ত্রণা হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন কেউ সূঁচ ফোটাচ্ছে। আমি অস্বস্তিতে খাটের ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছিলাম। শেষকালে সহ্য করতে না পেরে উঠে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। জুলাই-এর মাঝামাঝি সেদিন মারাত্মক গরম। পাকা রাস্তা এত তেতেছে যে সহজেই তার ওপর রুটি সেঁকা যায়। আমার শার্ট ঘামে ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেল। দিগন্ত জুড়ে আবছা সাদা বাষ্প। মনে হচ্ছে এই উত্তাপ যেন স্পর্শ করা যাবে।

আমি সমুদ্রের দিকে চলতে লাগলাম। সেখানে গিয়ে বন্দর প্রদক্ষিণ করে সুন্দর উপসাগরটির তীর ধরে এগিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম স্নানের ঘাটগুলোর কাছে। ধারে কাছে কেউ ছিল না।

চারদিক নিঝুম। একটা পাখি কিংবা পশুর ডাকও শোনা যাচ্ছিল না। এমন কি ঢেউ পর্যন্ত থমকে শান্ত হয়ে ছিল। সমুদ্র যেন সূর্যের আলোয় ঘুমিয়ে আছে।

হঠাৎ স্থির জলে অর্ধনগ্ন একটা শিলাখণ্ডের পেছনে ধীর নড়া-চড়ার শব্দ পেলাম। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম আবক্ষ জলনিমগ্ন এক দীর্ঘাঙ্গী নারী। নগ্নদেহে স্নানরত। সন্দেহ নেই দিবসের এই জ্বালাময় মুহূর্তে তার নিঃসঙ্গতার শোধ নিচ্ছে। তার মাথা সমুদ্রের দিকে ঘোরানো। তাই আমাকে দেখতে না পেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে নিচে দোল খাচ্ছিল। সেই দগ্ধ প্রহরে স্ফটিকস্বচ্ছ জলের তলায় একটি সুন্দরী রমণীর ছবির চেয়ে বিস্ময়কর আর কি হতে পারে? যেন এক খোদিত মূর্তি। সে ঘুরে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো। তারপর কিছুটা হেঁটে, কিছুটা সাঁতার দিয়ে গিয়ে শিলাস্তূপের আড়ালে নিজেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে ফেললো। আমি জানতাম, তাকে বেরিয়ে আসতেই হবে। তাই বেলাভূমিতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রথমে দেখা গেল থাকে থাকে সজ্জিত ঘন কালো চুলেভরা তার মাথা। তারপর তার মস্ত মুখাবয়ব। তাতে পুরু ঠোঁট, তেজোদীপ্ত আয়ত চক্ষু। এই জলবায়ুতে পরিপুষ্ট তার ত্বক দেখাচ্ছিল পুরোনো শক্ত মসৃণ হাতির দাঁতের মতো। সে আমায় ডেকে বললে: 'চলে যান।' জোরালো উচ্চ কণ্ঠস্বর তার দৈহিক সামর্থ্যের পরিচয় দিচ্ছিল। আমি নড়লাম না দেখে সে বলে উঠলো—'মসিয়ো, ওখানে আপনার বসে থাকা ঠিক হচ্ছে না।' তবু আমি উঠলাম না, মস্তক অদৃশ্য হোলো। দশ মিনিট কেটে গেল। ধীরে ধীরে দেখা গেল তার চুল, তারপর কপাল, তারও পরে তার চোখ। কিন্তু এত ধীরে আর সন্তর্পণে যে মনে হচ্ছিল লুকোচুরি খেলছে। দেখে নিচ্ছে কাছাকাছি কেউ আছে কিনা। এবার সে ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে বললে—'আপনি দেখছি আমায় ঠাণ্ডা লাগিয়ে ছাড়বেন। কেননা, আপনি যতক্ষণ ওখানে থাকবেন, আমি কিছুতেই উঠবো না।' এরপর আমি উঠে চলে

গেলাম। কিন্তু বার কয়েক ঘুরে ফিরে না দেখে পারলাম না। যখন সে বুঝলো আমি অনেক দূরে চলে গেছি, জল থেকে বেরিয়ে এলো। আমার দিকে পিঠ দিয়ে নিচু হয়ে সে পাহাড়ের একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল। সেখানে সামনে ঝোলানো একটা সায়ার মধ্যে তার দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরদিনও আমি সেখানে গেলাম। তাকে আবার স্নান করতে দেখলাম। কিন্তু এবার তার পরনে স্নানের পোশাক ছিল। আমাকে দেখে সে তার সাদা ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হাসতে শুরু করলো। এক সপ্তাহ পরে আমাদের বন্ধুত্ব হোলো। আরও এক সপ্তাহে আমরা ঘনিষ্ঠ প্রণয়ী। নাম ছিল তার মারোকা। সে তার নাম এমন করে উচ্চারণ করতো যেন তার মধ্যে এক ডজন 'র' আছে। মারোকা ছিল একজন স্পেনীয় ঔপনিবেশিকের কন্যা। তার বিয়ে হয়েছিল পেনতাবেজ নামে এক ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে। ভদ্রলোক একজন সরকারী চাকুরে। যদিও সঠিক কাজ কি ছিল, তা আমি কখনও জানতে পারিনি। দেখেছিলাম সে সর্বদাই অতি ব্যস্ত ; আর কিছু নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি।

মারোকা তার স্নানের সময় বদলে নিল। আর দিবানিদ্রার জন্য রোজই আমার বাড়ি আসতে আরম্ভ করলো। সে কি দিবানিদ্রা! ওকে বিশ্রাম বলা চলে না কিছুতেই। সে এক অদ্ভুত মেয়ে ; কিছুটা পশু প্রকৃতির কিন্তু অত্যুৎকৃষ্ট। আঁখিতারা কামনায় সব সময় জ্বলছে। তার অর্ধোন্মুক্ত মুখগহ্বর, তীক্ষ্ণ দশনপংক্তি, হাসি, তার সব কিছুই অদম্য প্রেমাকাঙ্ক্ষা জাগায়। তার স্তনদ্বয় দুর্লভ, দীর্ঘ এবং শঙ্খের মতো ছুঁচলো। সব মিলিয়ে তার দেহ ছিল পাশবিক, কিছুটা নিকৃষ্ট অথচ মহিমময়ী। অবৈধ প্রণয়ের জন্যই যেন তার সৃষ্টি। ওকে দেখে আমার মনে পড়েছিল সেইসব প্রাচীন দেবীদের কথা, যারা তাদের কোমলতা রূপায়িত করেছিল বৃক্ষের তলায় ঘাসের ওপর।

তার মন ছিল অতি সরল। দুয়ে দুয়ে যেমন চার, ঠিক তেমনি। আর ভাবনার পরিবর্তে উদ্দাম হাসি ছিল তার বৈশিষ্ট্য।

সৌন্দর্য সম্পর্কে তার ছিল সহজাত গর্ব। সেজন্য সামান্যতম আচ্ছাদনও সে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করেছিল। আর অচেতন ঔদ্ধত্যে বেপরোয়ার মতো ঘরে ছুটাছুটি লাফালাফি করে বেড়াতো। অবশেষে যখন তার আবেগ প্রশমিত হোতো চেঁচামেচি হুটোপাটিতে শ্রান্ত হয়ে পড়তো, তখন সে প্রশান্ত গভীর ঘুমে তলিয়ে যেত। সর্বগ্রাসী তাপ বাদামী ত্বকের ওপর ক্ষুদ্র স্বেদবিন্দুর আলপনা এঁকে দিত।

কখনও কখনও তার স্বামী সন্ধ্যার দিকে কোথাও কাজে বেরিয়ে গেলে মারোকা আবার আমার কাছে ফিরে আসতো। তখন আমাদের শয্যা হোতো খোলা ছাদে। সূক্ষ্ম স্বচ্ছ প্রাচ্য বস্ত্রের সামান্য আবরণ ছাড়া আর কোন আড়াল এই ছাদে থাকতো না। পাহাড়-ঘেরা উপসাগর এবং শহরের ওপর পূর্ণ চন্দ্র আলো ছড়িয়ে দিত, আমরা অন্যান্য ছাদে দেখতে পেতাম দলে দলে অর্ধশায়িত নিশ্চুপ প্রেতবৎ ছায়া। নক্ষত্রখচিত রজনীর ক্লান্তিকর উষ্ণতায় এই সব ছায়া মাঝে মধ্যে উঠে স্থান পরিবর্তন করে আবার শুয়ে পড়তো।

আফ্রিকার রাত্রির উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও মারোকা পরিষ্কার চন্দ্রালোকে তাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করার জন্য পীড়াপীড়ি করতো। কেউ আমাদের দেখে ফেলতে পারে ভেবে সে বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ করতো না। আমার ভয় এবং অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও সে মাঝে মাঝে এত জোরে গুমরানো আর্তনাদ করে উঠতো, যাতে দূর থেকে কুকুর-গুলো অবধি ঘেউ ঘেউ আওয়াজ তুলতো।

একদিন রাত্রে আমি যখন তারাভরা আকাশের নিচে শুয়ে, সে এসেই আমার গালিচার ওপর হাঁটুগেড়ে বসে পড়লো। তারপর তার ঈষৎ বঙ্কিম অধরোষ্ঠ প্রায় আমার মুখের ওপর রেখে বললো: 'তুমি আজ অবশ্যই আমার বাড়ি গিয়ে থাকবে।'

তার কথা বুঝতে না পেরে বললাম :

'কি বলছ তুমি ?'

'হ্যাঁ, আমার স্বামী যখন চলে গেছে, তুমি অবশ্যই আসবে; আমাব সঙ্গে থাকবে।'

আমি না হেসে পারলাম না। বললাম: 'কেন তুমি তো এখানে এসেই পড়েছ ?'

অধরের স্পর্শে আমার গোঁফ সিক্ত করে, তপ্ত নিশ্বাস আমার কণ্ঠে প্রবেশ করিয়ে প্রায় আমার মুখের ভেতরে সে বলে গেল : 'আমি একে স্মৃতি হিসেবে রাখতে চাই।'

তবু তার কথার অর্থ আমার বোধগম্য হোলো না। তখন সে দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো : 'যখন তুমি আর এখানে থাকবে না, আমি একথা ভাববো।'

আমি একই সঙ্গে অভিভূত হলাম আবার কৌতুকবোধ করলাম। বললাম : 'তুমি নিশ্চয় পাগল হয়েছ। আমাকে এখানেই থামতে হবে।'

বস্তুত কোন দম্পতিগৃহে অভিসার আমার পছন্দ নয়। ওগুলো ইঁদুর ধরা ফাঁদ। অবাঞ্ছিতজন সব সময় ওতে ধরা পড়ে। কিন্তু মারোকা অনুনয় বিনয় করলো, এমন কি চিৎকার করে উঠলো। শেষে বললো : 'দেখো, সেখানে তোমায় আমি কত ভালবাসি।'

তার ইচ্ছা আমার কাছে এত অদ্ভুত মনে হোলো যে আমি নিজের কাছে এর কোন কারণ ব্যাখ্যা করতে পারলাম না। পরে এ বিষয়ে চিন্তা করে মনে করলাম স্বামীর ওপর মারোকার রয়েছে গভীর ঘৃণা। এ থেকে জন্ম নিয়েছে রমণীর সেই গোপন প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা, যা পুরুষকে বঞ্চনা করে, বিশেষতঃ তারই আপন আলয়ে তাকে প্রতারিত করে আনন্দ পেতে চায়। তাকে প্রশ্ন করলাম : 'তোমার স্বামী কি তোমার ওপর খুবই নির্দয় ?'

তার দৃষ্টিতে বিরক্তি ফুটে উঠলো। উত্তর করলো: 'না, তা নয়, তিনি খুবই সদয়।'

'তবে তুমি কি তাকে পছন্দ কর না?'

সে তার ডাগর চোখ দুটোয় বিস্ময় ফুটিয়ে তুলে আমাকে দেখলো। তারপর বললো: 'অবশ্যই। আমি তাকে খুবই পছন্দ করি। খু-ব। কিন্তু তোমায় যতটা ভালবাসি ততটা নয়।'

আমি এসব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আর যখন তার কথার মানে বুঝতে চেষ্টা করছি, সে আমার ঠোঁটে এমন একটি চুম্বন বর্ষণ করলো, যার ক্ষমতা সম্বন্ধে সে বিশেষ ভাবেই ওয়াকিফহাল। তারপর ফিস্‌ফিস করে বললো: 'কিন্তু তুমি এসো। আসবে না কি?' আমি নিষেধ করলাম। আর তক্ষুনি সে উঠে দাঁড়ালো এবং চলে গেল। এক সপ্তাহের মধ্যে আর এলো না। অষ্টম দিবসে সে আবার ফিরে এলো। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বললো: 'তুমি কি আজ রাতে আমার বাড়ি আসছ? যদি না যাও, আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।'

বন্ধু, আটদিন বড় দীর্ঘ সময়। আফ্রিকায় এই আটদিন পুরো একটা মাসের সমান। সম্মতি জানিয়ে দুই হস্ত প্রসারিত করলাম। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রাত্রিতে পাশের একটা রাস্তায় সে অপেক্ষা করে ছিল। আমি যেতেই তাদের বাড়ি নিয়ে গেল। পোতাশ্রয়ের কাছে ছোট একটা বাড়ি। প্রথমে তাদের রান্নাঘর পেরিয়ে গেলাম! যেখানে খাবার চিহ্ন পড়ে আছে। তারপর চুণকাম করা খুব পরিপাটি একটা ঘর। নানা ধরনের ছবি দিয়ে দেওয়াল সাজানো। একটা কাঁচের পাত্রে রয়েছে কিছু কাগজের ফুল। মারোকা আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচতে শুরু করে দিল। বললো: 'তাহলে এখন তুমি এসেছ।'

আমি খানিকটা বিচলিত হলাম। কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। তবু ব্যবহারে কিছু প্রকাশ করলাম না।

এই অচেনা অদ্ভুত পরিবেশে নরদেহের শেষতম আচ্ছাদনটুকু সরিয়ে ফেলতে সংকোচ হচ্ছিল। ব্যর্থ-পৌরুষ গোপন করতে না পারার বিদ্রূপের মতো একটা অস্বস্তিতে দগ্ধ হচ্ছিলাম। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরেও সে ওই সামান্য ব্যবধানটুকু রাখতে চাইল না। ছিনিয়ে নিয়ে আমার অন্যান্য বস্ত্রের সঙ্গে অন্য ঘরে রেখে এলো।

ধীরে ধীরে সাহস সঞ্চয় করলাম। এবং আমার সার্থক পৌরুষের এমন যথাযোগ্য প্রমাণ দিলাম যে দুঘণ্টা কেটে যাবার পরও আমাদের দেহে মনে অবসাদ আসেনি।

আচমকা দরজায় জোরে করাঘাত আমাদের চমকে দিল। একটি মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল :

'মারোকা, আমি।'

সে কেঁপে উঠে বললো: 'আমার স্বামী, এস বিছানার তলায় লুকিয়ে পড়। শীগ্‌গির।'

আমি হতবুদ্ধি হয়ে পরিধেয় বস্ত্র খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু সে আমাকে ঠেলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে: 'ঢুকে পড়, ঢুকে পড়।'

আমি সোজা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। তারপর একটিও কথা না বলে বুকে হেঁটে বিছানার নিচে ঢুকে পড়লাম। সে রান্না ঘরে গেল। একটা আলমারির পাল্লা খোলা এবং লাগানোর আওয়াজ পেলাম। সে কিছু একটা নিয়ে এসে খুব তাড়াতাড়ি রেখে দিল। যদিও সেটা কি বস্তু দেখতে পেলাম না। তারপর তার স্বামী যখন অধৈর্য হয়ে পড়লো সে শান্তকণ্ঠে উত্তর করলো —'দেশলাইটা খুঁজে পাচ্ছি না।' হঠাৎ সে বলে উঠলো—'ও, এইতো এখানে। আমি আসছি। তোমাকে ভেতরে আনছি।'

লোকটি ভেতরে এলো। আমি তার পা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। তার পা দুটো বিরাট। অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যদি এই অনুপাতে হয়, তবে সে নিশ্চয় দৈত্যাকৃতি।

চুম্বনের শব্দ পেলাম। মারোকার নগ্ন দেহে আলতো আদর।

তারপর উচ্চ হাসি। মারসেলজের* মতো জোর উচ্চারণে সে বললো: 'আমার পয়সার ব্যাগ ফেলে গিয়েছি। তাই ফিরে আসতে হোলো। মনে হচ্ছে তুমি বেদম ঘুমোচ্ছিলে।'

ভদ্রলোক আলমারির কাছে গেল। যা চাইছিল তা খুঁজতে অনেক সময় লাগিয়ে দিল। যেন খুব শ্রান্ত-ক্লান্ত এইভাবে যখন মারোকা বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল, সে মারোকার কাছে গেল। নিঃসন্দেহে সে চাইছিল মারোকাকে আলিঙ্গন করতে। কেননা মারোকা এক ঝাঁক ক্রুদ্ধ 'র' তার দিকে নিক্ষেপ করলো। তার পা আমার এত কাছে যে ও দুটোকে চেপে ধরবার এক নির্বোধ অবর্ণনীয় ইচ্ছা আমায় পেয়ে বসলো। কিন্তু সামলে গেলাম। সে যখন দেখলো তার বাসনা চরিতার্থ হোলো না সে রেগে গিয়ে বললো: 'আজ রাতে তুমি মোটেই ভাল মেয়ে নও। বিদায়।'

আর একটি চুম্বনের শব্দ ভেসে এলো। তারপর সেই বৃহৎ পদযুগল ঘুরে দাঁড়ালো। সে অন্য ঘরে যাবার সময় আমাকে জুতোর সুকতলা দেখিয়ে গেল। সামনের দরজা বন্ধ ছিল। তাই বেঁচে গেলাম।

ধীরে ধীরে লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এলাম। মারোকা হাস্যরোলে মুখর হয়ে হাততালি দিয়ে আমার চারদিকে ঘুরে নৃত্য শুরু করে দিল। আমি কেমন যেন অপমানিত বোধ করছিলাম। সামনেই একটা চেয়ারে ধপাস্ করে বসে পড়লাম। কিন্তু বসতে না বসতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। কেননা কোন একটা শীতল বস্তুর ওপর বসে পড়েছিলাম। আমার নগ্ন সহচরীর চেয়ে আমার অঙ্গে বেশি কোন বস্ত্র ছিল না, তাই ওই ঠাণ্ডা জিনিসটির সরাসরি স্পর্শে আমি চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখি ছুরির মতো ধারালো একটা ছোট কাঠকাটা টাঙ্গির ওপর বসেছিলাম। ওটা এলো কোত্থেকে? আমি যখন এসেছি, তখন কিছুতেই ওটা

---

* মারসেলজ—ফরাসী গণতন্ত্রের জাতীয় সংগীত। ফরাসী বিপ্লবের সময় মারসেলজের স্বদেশী সৈন্যরা প্রথম এই গান গেয়েছিল।

দেখিনি। কিন্তু আমাকে ওভাবে লাফিয়ে উঠতে দেখে মারোকার হাসিতে দম বন্ধ হবার উপক্রম। দুদিকে দুহাত ছড়িয়ে সে কাশতে আরম্ভ করে দিল।

তার এই কৌতুক আমার কাছে সময়োপযোগী মনে হোলো না। বোকামীর জন্য জীবন বিপন্ন করেছিলাম, আমি তখনও আমার পিছনে একটা হিম-শিহরণ অনুভব করছিলাম। তাই তার এই নির্বোধের মতো হাসি আমায় আহত করছিল।

'তোমার স্বামী যদি আমায় দেখতে পেতো?' আমি বললাম।

জবাবে সে বললো: 'তাতে কোন বিপদ হোতো না।'

'কি বলছ? বিপদ হোতো না? আচ্ছা রসিকতা! সে মাথা নোয়ালেই আমায় দেখতে পেত।'

এবার সে হাসলো না। তার ডাগর চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল করে আমার দিকে তাকিয়ে বললো: 'সে উঁকি মারতো না।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলাম। 'ধর যদি মাথা থেকে টুপিটা পড়ে যেত, সে নিশ্চয় কুড়িয়ে নিতে যেত। আর তখন এই চেহারায় আমি কি আত্মরক্ষা করবার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত ছিলাম?'

সে তার সবল, সুডৌল দুটি হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। যেমন ফিস্‌ফিস্‌ করে সে বলতো 'তোমায় ভালবাসি', তেমনি নিচুগলায় বলে উঠলো—'তাহলে তাকে আর উঠতে হোতো না।'

আমি বুঝতে না পেরে বললাম: 'তুমি বলছ কি?'

মারোকা আমার দিকে চতুর কটাক্ষ নিক্ষেপ করলো। যে চেয়ারটায় বসে পড়েছিলাম, সেটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো। তার প্রসারিত হাত, তার হাসি, তার আধখোলা ঠোঁটদুটি, তার শুভ্র তীক্ষ্ণ এবং ভয়ঙ্কর দন্তপাটি, সবকিছু আমায় টেনে নিয়ে গেল সেই কাঠ কাটবার ছোট্ট টাঙ্গিটার দিকে। মোমের আলোয় অস্ত্রটার ধারালো ইস্পাত ঝক্‌ঝক্‌ করছিল। বামহাতে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে তার দিকে টেনে নিল। আমার অধরে অধর

মিলিয়ে ডানহাতে অস্ত্রটাকে নিয়ে এমন ভঙ্গী করলো যেন সেটা দিয়ে হাঁটুগেড়ে বসা কোন লোককে বলি দিচ্ছে।

বন্ধু, এই হচ্ছে এখানকার রীতি! এর দ্বারাই এখানকার লোকে দাম্পত্য কর্তব্য, প্রেম এবং আতিথেয়তা বোঝে।

# ভুলের মাসুল

এবার শীতে প্যারিসে গিয়ে শ্রীমতী জাদেলের সঙ্গে পরিচয়। প্রথম সাক্ষাতেই মুগ্ধ হলাম। তুমি তো তাকে প্রায় আমার মতোই জানো। জানো, সে কবি এবং খেয়ালী। এও জানো তার ব্যবহার সরল অমায়িক আর তার ভাবপ্রবণ হৃদয় সহজেই অভিভূত হয়। কিন্তু সে বীরাঙ্গনা, দুঃসাহসী, উদ্ধত—সর্বোপরি সংস্কারাচ্ছন্ন হলেও আবেগপ্রবণ, মার্জিতরুচি, স্পর্শকাতর, কোমল হৃদয় এবং বিনীত।

সে বিধবা, আল্‌সে বলে আমি আবার বিধবাদেরই পছন্দ করি। একজন জীবন সঙ্গিনীর খোঁজে ছিলাম, তাই শ্রীমতী জাদেলকে আমার প্রেম নিবেদন করলাম। আমাদের তখন পূর্বরাগের পালা চলছে। অচিরেই বিপদ সীমা পেরিয়ে যাবার আভাস পাচ্ছি। তাই ভাবলাম, এবার তার দরবারে আরজি পেশ করার ঝুঁকি নেব। পুরুষের পক্ষে বিয়ের পর স্ত্রীকে বেশি ভালবাসা উচিত নয়, তাহলে বোকা বনতে হয়, উদ্দেশ্য ভেস্তে যায়। দৃঢ় সংযমের সঙ্গে পুরুষদের নিজের অধিকার বজায় রাখা উচিত। প্রথম চোটেই বুদ্ধি খুইয়ে বসলে বছর খানেক বাদে তার আর কোন কদরই থাকবে না। সুতরাং একদিন একজোড়া পাতলা দস্তানা পরে তার বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। বললাম: 'মাদাম, আপনাকে ভালবাসি, এই কথাটা সসম্মানে জানাতে এসেছি। আপনাকে নন্দিত করার বাসনা কি আমার পূর্ণ হবে? আপনার সংসার, আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কি আমার সযত্ন তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হবেন? আপনি কি আমার নাম পদবী গ্রহণ করতে রাজী হবেন? আপনার কাছে এই আমার সানুনয় প্রশ্ন।'

সে শান্ত ভাবে জবাব দিল: 'মহাশয়, এ আপনার কেমন ধারা প্রশ্ন! আপনি আমায় খুশী করতে কতটা সময় নেবেন, অথবা আদৌ

পারবেন কিনা—এ সম্বন্ধে এখনও আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কাজেই পরীক্ষা করে দেখা ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না। মানুষ হিসেবে আপনাকে খারাপ বলে মনে হয় না। আর বাকি থাকছে আপনার অন্তঃকরণ, স্বভাব চরিত্র এবং খুঁটিনাটি অভ্যাস। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিয়ের পর যে তুলকালাম কাণ্ড অথবা আইন আদালত হয় তার কারণ যথেষ্ট খোঁজ খবর না নিয়েই অনেকে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কখনও অতি তুচ্ছ কারণে বিরোধের সূত্রপাত হয়। হয়তো কোন বাতিক বা ধর্মীয় এবং নৈতিক মতবাদের একগুঁয়েমি অথবা এমনি কিছু। কোন বিশ্রী মুদ্রাদোষ, সামান্য ক্রটি বা বিরক্তিকর কোন গুণ—এই সব থেকেই কোন বাগদত্ত দম্পতির মধ্যে বিরাগ জন্মাতে পারে। খুব শান্ত স্নেহশীল হলেও তাদের মধ্যে ক্রোধ এবং স্থায়ী শত্রুতা দানা বাঁধতে পারে। কিন্তু তবুও তাদের আমরণ বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে হয়। না মহাশয়, যে আমার অস্তিত্বের অংশীদার হবে—তার মনের নিভৃত অলিগলি, আত্মার গভীরতা না দেখে বিয়ে করতে পারবো না। আমি তাকে অন্ততঃ কয়েকমাস পরিপূর্ণ অবসরে যাচাই করে দেখতে চাই।

'সুতরাং আমার প্রস্তাব—আসুন, আমরা এবারের গ্রীষ্মটা ছ্য লাভিলে আমার গ্রামের বাড়িতে কাটাই। তখন বুঝবো, পাশাপাশি কাটাবার মতো সত্যি আমাদের স্বভাব খাপ খাবে কিনা। আরে, আপনি হাসছেন। আপনার মাথায় কু মতলব। হায় ভগবান! নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিত না হলে এমন উক্তি আমি উচ্চারণই করতাম না। আপনারা পুরুষেরা যাকে ভালবাসা বলেন—সেই ভালবাসার ওপর আমার এমন ঘৃণা, এমন বিতৃষ্ণা যে আমার পক্ষে পদস্খলন কখনই সম্ভব নয়। যাহোক, এই শর্তে আপনি রাজী?

আমি তার হাতে চুমু খেয়ে বললাম: 'আমরা কবে রওনা হব মাদাম?'

'মে মাসের দশই।'

'আমি রাজী।'

এক মাস পরে তার বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। সে সত্যিই একজন নিঃসঙ্গ মহিলা। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি আমার পরীক্ষা চলতো। সে ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসতো বলে প্রতিদিন আমরা ঘোড়ার পিঠে বনের মধ্যে বেড়াতাম। দুনিয়ার সব কিছু নিয়ে আমাদের আলোচনা হোতো। কিন্তু আমার ছোট্ট হাবভাবও তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াত না। সে সব সময় আমার চিন্তাভাবনাগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে চাইত। প্রেমে পড়ে আমি ক্যাবলা হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের স্বভাবের গরমিল নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো বুদ্ধি আমার ঘটে আর অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু শীগ্‌গিরই লক্ষ্য করলাম, ঘুমের মধ্যেও আমাকে পাহারা দেওয়া হয়। আমার শোবার ঘরের লাগোয়া একটা চিলে কোঠায় কেউ একজন শোয়। অনেক দেরিতে খুব সাবধানে সে আসে। প্রতি মুহূর্তে এই গোয়েন্দাগিরিতে শেষকালে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। কি করে তাড়াতাড়ি এর একটা বিহিত করা যায়—মনে মনে ফন্দি আঁটতে লাগলাম। কিন্তু এমন ভাবে নজর বন্দী হয়েছিলাম যে নতুন কিছু করা আমার পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু যেহেতু এই কড়া নিয়মের রাজত্বে আমাকে স্বাধীনতা খোয়াতে হয়েছিল, তাই তাকে সমুচিত শিক্ষা দেবার দুর্দম আকাঙ্ক্ষায় অহোরাত্র জ্বলে মরছিলাম। ভেবেচিন্তে একটা উপায় বার করলাম।

তার খাস চাকরানী, গ্রাঁভিলের সেই সুন্দরী সীজারিনকে নিশ্চয় তুমি চেনো। গ্রাঁভিলের সব মেয়েরাই সুশ্রী। কিন্তু সীজারিনের কাছে তার কর্ত্রী ঠাকুরুণও কত নিষ্প্রভ! যাই হোক, একদিন সেই ছোট্ট রূপসীকে আমার ঘরে ডেকে এনে তার হাতে একশ' ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে বললাম: 'দেখ বাছা, তোমাকে দিয়ে কোন দুষ্কর্ম করাবার মতলব আমার নেই। কিন্তু তোমার মনিবও যাতে আমার ওপর সেরকম কিছু না করে—আমি শুধু সেই সুবিধাটুকু চাই।'

মেয়েটি চোখে মুখে চতুর হাসি ফুটিয়ে তুললো। আমি বলে চললাম: 'আমি জানি, দিন রাত আমাকে পাহারা দেওয়া হয়।

আমি কি করে আহার করি, পানীয় খাই, পোশাক পরি, দাড়ি কামাই, জুতো-মোজা পরি—সব যে তোমরা নজরে রাখ—তা আমি ভাল করেই জানি।'

মেয়েটি আমতা আমতা করে বললো: 'হ্যাঁ মহাশয়।' তারপর চুপ করে গেল। আমি বলেই যাচ্ছি: 'আমার নাক ডাকে কিনা, কিংবা স্বপ্নের মধ্যে চিৎকার করি কিনা—এসব দেখবার জন্য তুমি আমার পাশের ঘরে শোও—একথা নিশ্চয় অস্বীকার করবে না?'

'না মহাশয়'—আবার চুপচাপ।

এবারে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম: 'আঃ শোন, আমি বলছি কি, আমার সম্বন্ধে সব কিছু জেনে নেওয়া হচ্ছে, অথচ যে আমার স্ত্রী হবে—তার সম্বন্ধে কিছুই আমি জানতে পারছি না—এ কখনই ভাল নয়। তোমার এটা নিশ্চয়ই বোঝা উচিত। আমার সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে আমি তাকে ভালবাসি। তার তনু মন-প্রাণ আমার স্বপ্নের ধন। এদিক থেকে আমি সব চেয়ে সুখী। তবুও কতকগুলো জিনিস আমার জানা দরকার—'

এতক্ষণে আমার দেওয়া ব্যাঙ্কনোট সীজারিন তার পকেটে পুরলো। বুঝলাম দর পছন্দ হয়েছে। 'আমার কথা শোন'—আমি বললাম, 'মেয়েদের কতকগুলো খুঁটিনাটি আমাদের জানা দরকার। এতে অবশ্য মেয়েদের সৌন্দর্যের ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু আমাদের চোখে তার মূল্য বদলে যায়। ভেবো না তোমার কর্ত্রীর নামে আপত্তিকর কিছু বলতে বলছি, এমন কি সত্যিই যদি তাঁর কোন খুঁত থেকেও থাকে, আমার কাছে তা ফাঁস করতেও বলবো না। আমি শুধু তোমায় চারটে কি পাঁচটা প্রশ্ন করবো, তুমি খোলাখুলি তার জবাব দেবে। প্রতিদিন তুমি মিসেস জাদেলের পোশাক পরাও এবং খোলো, কাজেই তার সব কিছুই তুমি জানো। তাহলে এখন বলতো, তাকে দেখতে যেমন ঢলো ঢলো তিনি আসলেও কি তাই?"

সীজারিন নিরুত্তর।

আমি বলে চললাম: 'মেয়েরা যে অনেক জায়গায়—অর্থাৎ যেখানে তারা সন্তানকে খাওয়ায় এবং যেখান দিয়ে বসে, তুলোর প্যাড ব্যবহার করে—একথা তুমি না জেনেই পার না। বলতো তিনি তেমন কিছু ব্যবহার করেন?'

সীজারিন চোখ নামিয়ে নিল। পরে মৃদু গলায় বললো: 'আপনার যা যা জানবার আছে, জিজ্ঞেস করুন, আমি একসঙ্গে সব গুলোর জবাব দেব।'

'বেশ, কোন কোন মেয়ের চলতে গেলে জঙ্ঘায় ঘষা লাগে, আবার অনেকের বেশ দূরত্ব থাকে। যার ফলে তাদের প্রত্যঙ্গগুলোকে মনে হয় যেন সেতুর ওপরে খিলান, যেন তার মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে পড়বে। শেষের গড়নটাই বেশি সুন্দর। এবার বল তো তোমার মনিবের অঙ্গবিন্যাস কোন ধরনের?'

পরিচারিকা নিরুত্তর।

আমার প্রশ্ন: 'কারো কারো গ্রীবা এত সুন্দর যাতে ত্রিবলী রেখা পড়ে। কেউ বা তন্বী, কারো বাহু লম্বা ও সুডোল। কোন নারীর সমুখ উন্নত, পশ্চাতে ঢাল; কারো আবার পশ্চাতে প্রাচুর্য সামনে অভাব। এ সবই সুন্দর—খুব সুন্দর। কিন্তু আমি তোমার কর্ত্রীর গড়নটাই জানতে চাইছি। আমায় খুলে বলো, তোমায় আরও টাকা দেব।'

সীজারিন আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে প্রাণখুলে হেসে উত্তর দিল: 'একমাত্র ময়লা রং ছাড়া কর্ত্রীঠাকুরুণের আর সব কিছুই ঠিক আমার মত।' বলেই ছুটে পালাল।

আমার সঙ্গে মস্করা করে গেল। এবার নিজেকে উপহাসের পাত্র বলে মনে হোলো। ঠিক করলাম এর প্রতিশোধ নিতে হবে—অন্তত ওই অবাধ্য দাসীটাকে শায়েস্তা করতে হবে।

পাশের যে ছোট কুঠুরি থেকে মেয়েটা আমার ঘুমের ওপর নজর রাখতো, ঘণ্টাখানেক বাদে খিল খুলে সেখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকলাম। মাঝরাতের দিকে সে তার চৌকি ঘাঁটিতে এসে ঢুকতেই

তাকে পাকড়াও করলাম। চেঁচিয়ে উঠতে গেলে হাত দিয়ে তার মুখে চাপা দিলাম। এবং খুব বেশি কসরৎ না করেই টের পেলাম, সে যদি মিথ্যে না বলে থাকে—তবে মিসেস জাদেল সত্যিই সুগঠিত।

এমনকি এই জীবন্ত প্রমাণটিকে একটু বেশি পরিমাণে নেড়ে চেড়ে দেখলেও সে চটেছে বলে বোধ হোলো না। প্রতিটি বিষয়ে সীজারিন নরম্যান কৃষককুলের অতি মনোহর নমুনা—যেমন শক্ত সমর্থ, তেমনি সুন্দর। হয়তো তার তনুদেহে সুচারু কারুকার্যের কিছু অভাব থাকতে পারে—ষষ্ঠ হেনরী হোলে হয়তো খুঁত ধরতেন, কিন্তু আমার ওসব খুঁতখুতানি নেই। আমি অতি সত্বর নানা উপচার তার সামনে এনে হাজির করলাম। আমি গন্ধ দ্রব্য পছন্দ করি, সুতরাং পরদিন একটা সেন্টের বাক্স আর এক বোতল ল্যাভেণ্ডার আনতেও ভুললাম না।

কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়লো, আমরা প্রায় বন্ধু হয়ে গেলাম। এতটা আমি ভাবতেই পারি নি। এখন সে একজন নিখুঁত প্রেমিকা, স্বভাবতই এখন তার সারা অঙ্গে স্বর্গীয় আনন্দের হিল্লোল। যেন প্যারিসের কোন সুশিক্ষিতা বার-বিলাসিনী।

এই নতুন আনন্দের সন্ধান পেয়ে আমার অস্থির মন সুস্থির হল। সিদ্ধান্ত গ্রহণে মিসেস জাদেলের গড়িমসি এখন আর অসহ্য লাগে না। এখন আমি এক অতুলনীয় চরিত্র ; নম্র, বাধ্য, এবং আত্মতৃপ্ত। আমাকে উৎফুল্ল দেখে আমার প্রেয়সীর কোন সন্দেহ হোলো না। কিছু কিছু লক্ষণ মিলিয়ে বুঝলাম যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে আমার আর বেশি দেরি নেই। প্রিয়তমার বৈধ চুম্বনের প্রত্যাশায়—যাকে ভালবাসি সেই রূপবতী যুবতীকে বাহুলগ্ন করার কামনায় আমি প্রশান্ত মনে প্রতীক্ষা করে থাকলাম।

মাদাম, এখন আমি এমন এক সূক্ষ্ম স্তরে পৌঁছে গেছি—সেখান থেকে আপনাকেই আর একটু ধৈর্য ধরতে বলতে পারি।

একদিন সন্ধ্যায় বেড়িয়ে ফেরার পথে মাদাম তার সহিসদের

সম্বন্ধে জোর নালিশ জানালো। ঘোড়াটাকে যে ভাবে যত্ন নিতে বলা হয়েছে, তার কিছুই নাকি তারা করছে না। সে বেশ কয়েক-বার বললো: 'হয় তারা ঘোড়ার যত্ন নেবে, নয় তাদের সমুচিত শাস্তি পেতে হবে। কাজে গাফিলতি আমি বরদাস্ত করবো না।'

নিরুদ্‌বেগ নিদ্রায় আমার রাত কেটে গেল। ভোর হল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে। ঘুম থেকে উঠে বেশভূষা করে নিলাম।

এখানে এসে থেকে রোজ সকালে গম্বুজের ওপর উঠে ধূমপান করা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। চুনা পাথরে তৈরি সিঁড়ি খাড়া উঠে গেছে। একতলার মাথায় প্রকাণ্ড একটা জানালা দিয়ে আলো এসে সিঁড়িটাকে আলোকিত করেছে। সিঁড়ির ধাপে পা দিতেই চোখে পড়ল সীজারিন ঝুঁকে পড়ে জানালা দিয়ে বাইরে নিচের দিকে দেখছে। আমার পায়ে ঘাসে মোড়া মসৃণ মরক্কো চামড়ার চটি। কাজেই আমার চলায় শব্দ হচ্ছিল না।

সীজারিনের পুরো দেহ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, কেবল তার নিম্নাংশ আমার চোখে পড়ছিল। এই নিম্নাঙ্গই আমায় বেশি মুগ্ধ করে। মিসেস জাদেলের সম্ভবত ঊর্ধ্বাঙ্গেই অধিক শোভা। কিন্তু সীজারিনের সুঠাম, সুডোল নিম্নাংশ শুভ্র ঘাঘরায় স্বল্পাবৃত হয়ে আমায় আমন্ত্রণ জানালো।

আমি এত নিঃশব্দে উঠে এলাম যে সে আমার আসা টের পেল না। কাছে এসে হাঁটু মুড়ে বসে অতি আলগোছে ঘাঘরার প্রান্ত ভাগ তুলে ধরলাম।

আমার প্রেয়সীর গাত্রের অপরূপ, সুমিষ্ট আঘ্রাণ নিলাম।

মাদাম, আমায় ক্ষমা করবেন, আমি সেখানে একটি কোমল আলপনা এঁকে দিলাম—দুঃসাহসী প্রেমিকের চুম্বনের সাক্ষর।

আমি তন্ময়। একটি ভার্বিনা।* কিন্তু ভাববার সময় পেলাম না। হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিট্‌কে পড়লাম। কে যেন মুখের ওপর সজোরে ঘুষি মারলো, নাক কেটে যাবার যোগাড়। আমার মাথার

* ভার্বিনা—এক ধরণের গাছ, যাতে নানা রঙের ফুল ধরে।

চুল খাড়া হয়ে উঠলো। চেঁচিয়ে উঠলাম। ঘুরে তাকিয়ে দেখি—মিসেস জাদেল।

উন্মাদের মতো মিসেস জাদেল শূন্যে হাত পা ছুঁড়ছে। কয়েক মিনিট দম নিয়ে হাঁপালো, তারপর ঘোড়াকে চাবুক মারার মতো হিসহিস শব্দ করলো, তারপরই ছুটে বেরিয়ে গেল।

মিনিট দশেক পরে হতভম্ব সীজাবিন এক টুকরো চিরকুট এনে আমার হাতে দিল। তাতে লেখা: 'মিসেস জাদেল আশা করেন যে এই মুহূর্তে মিঃ ড্য ব্রাইভ তাঁর সামনে থেকে দূরে যাবেন।'

অতএব বিদায় নিলাম। এখনও আমি নিজেকে পুরোপুরি সান্ত্বনা দিতে পারি নি। এই ভুলের জন্য আমি সব রকমে জবাব-দিহি করেছি, তার ক্ষমা পাবার আশায় নানা ভাবে চেষ্টা করেছি, কিন্তু সব প্রচেষ্টাই অঙ্কুরে বিনষ্ট হ'য়েছে।

সেই থেকে আমি আমার অন্তরে—আমার হৃদয় গহনে ভার্বিনার সৌরভ বয়ে বেড়াচ্ছি, ওই সুরভি আব একবার আঘ্রাণের মাতাল কামনায় এখন আমি উদ্‌বেল।

## সংকট

চুল্লিতে গনগনে আগুন, চায়ের টেবিলে দু'জনের মতো চায়ের আয়োজন। কাউণ্ট ছ সাল্ তার টুপি, দস্তানা, পশমী কোট খুলে চেয়ারে রাখলো। কাউণ্টেস তার বাহারে পোশাক আগেই খুলে রেখেছে। এখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মণিমুক্তা শোভিত আঙ্গুলে এলোমেলো অলকগুচ্ছ পরিপাটি করতে ব্যস্ত। নিজের প্রতিবিম্ব দেখে তার ঠোঁটের কোণে মৃদুমদির হাসি ফুটে উঠলো। তার স্বামী কয়েক মিনিট ধরে তার দিকে তাকিয়ে। কিছু যেন বলতে চাইছে, কিন্তু সঙ্কোচ হচ্ছে। অবশেষে বলেই ফেললো : 'আজ রাতে তুমি কিন্তু দারুণ খেলায় মেতে উঠেছ।'

স্ত্রীর মুখে বেপরোয়া ভাব। বিজয়িনীর ভঙ্গীতে স্বামীর চোখের দিকে স্পষ্ট তাকিয়ে জবাব দিল :

'তাই নাকি, সত্যি?' চেয়ারে এসে চা ঢালতে শুরু করলো। স্বামী বসলো মুখোমুখি।

'এতে আমাকে, মানে, আমি অপদস্থ হচ্ছি।'

'আমি কি অনুচিত কিছু করছি?' সে ভ্রূ বাঁকিয়ে প্রশ্ন করলো, 'তুমি কি আমার চালচলনের সমালোচনা করতে চাও?'

'আহা, না, তা নয়। আমি শুধু বলতে চাইছি তোমার প্রতি মসিয়ো বুরেলের অত্যধিক টান নিতান্ত অশোভন। আমার যদি অধিকার থাকতো—আমি কখনই এ ব্যবহার বরদাস্ত করতাম না।'

'কেন, আমার যাদুমণি, তোমার আবার কি হোলো? গত বছর থেকে এবার কি তোমার মত পালটেছে? আমাকে কেউ প্রণয় নিবেদন করছে কিনা— এ নিয়ে এক বছর আগে তো তোমার কোন মাথা ব্যথা ছিল না। যখন আমি টের পেলাম তোমার একজন প্রণয়িনী আছে— আর তার প্রেমে তুমি একেবারে মশগুল— ঠিক

যেমন করে তুমি আমায় বললে, তেমনি করে আমিও তোমায় সাবধান করে দিয়েছিলাম। (কিন্তু আমার যথেষ্ট কারণ ছিল, তোমার তা নেই) বলেছিলাম— মাদাম ছ্য সারভির সঙ্গে তুমি জড়িয়ে পড়ছো; বলেছিলাম—তোমার ব্যবহারে আমি মরমে মরে যাচ্ছি, তোমার আচরণে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে— তুমি আমায় কি জবাব দিয়েছিলে শুনি? তোমার জবাব ছিল— দুজন ইণ্টেলেকচুয়াল ব্যক্তির পক্ষে বিয়েটা হচ্ছে একটা চুক্তি, ভাগের কারবার, এক ধরনের সামাজিক বন্ধন; কিন্তু নৈতিক বাঁধন নয়। কাজেই আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। সত্যি কিনা বল? তুমি আমায় বুঝিয়েছিলে তোমার প্রেয়সী আমার চেয়ে মনোহারিণী, অনেক বেশি কোমল; হ্যাঁ তুমি ঠিক এই কথাই উচ্চারণ করেছিলে— আরও কোমল। অবশ্য এসব কথা তুমি খুব সুন্দর করে বলেছিলে। আমি বুঝেছিলাম আমায় আঘাত না দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা তুমি করেছ। দিব্যি করে বলেছি সেজন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমার আর কিছুই বুঝতে বাকী নেই।

'সেই থেকে একই ছাতের তলায় বাস করেও আমরা আসলে আলাদা। আমাদের একটি সন্তান ছিল, কাজেই সংসারে দশজনের কাছে ভান করতে হোতো। তুমি হাবেভাবে বুঝিয়েছিলে আমি বিপথে গেলেও তোমার আপত্তি নেই, শুধু সেকথা গোপন থাকলেই হোলো। এ বিষয়ে স্ত্রীলোকের চাতুর্য নিয়ে তুমি বরং বেশ লম্বা চওড়া খুব মজাদার একটা বক্তৃতাও দিয়েছিলে। মেয়েরা কি করে এসব ব্যাপার সামলে-সুমলে গোপন রাখে, ইত্যাদি। আমি সমস্ত কিছু খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলাম। তুমি তখন মাদাম ছ্য সারভির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ। তাই আমার দাম্পত্য প্রেম— বৈধ ভালবাসা তোমাদের সুখের কাঁটা হয়েছিল। কিন্তু সেই থেকে আমাদের মধ্যে অতি উত্তম সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সমাজে আমরা এক সঙ্গে বেরোই ঠিকই, কিন্তু এখানে— এই আমাদের নিজের বাড়িতে আমরা পরস্পর সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু গত মাসখানেক

বা মাসছয়েক ধরে তুমি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠছ, এর কারণ আমি বুঝতে পারছি না।'

'আমার ঈর্ষার কিছু নেই, প্রিয়ে। কিন্তু তুমি যুবতী, তার উপর খুব আবেগপ্রবণ। তাই আমার ভয়— তুমি হয়তো নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে জগতের সমালোচনার পাত্রী হবে।'

'হাসালে! তোমার চলাফেরাও সমালোচনার বাইরে নয়। উপদেশের চাইতে উদাহরণ দেওয়া ভাল নয় কি?'

'হেসো না আমার মিনতি। এটা হাসির বিষয় নয়। আমি বন্ধুর মতো বলছি, সত্যিকারের বন্ধুর মতো। তোমার মন্তব্যগুলো খুব বেশি অতিরঞ্জিত।'

'একটুও নয়। যে মুহূর্তে তুমি মাদাম দ্য সারভির প্রতি তোমার মোহের কথা আমার কাছে স্বীকার করলে, তোমাকে অনুসরণ করার ক্ষমতা তুমি আমায় তখন থেকেই দিলে। এ আমি নিশ্চিত ধরে নিলাম। কিন্তু আমি তোমার মতো কিছুই করিনি।'

'আমাকে বলতে দাও—'

'আমায় বাধা দিও না। আমি তোমার মতো কিছুই করিনি। এখনও আমার কোন প্রেমিক হয়নি। আমি একজন প্রেমিকের সন্ধানে আছি, কিন্তু এখনও মনোমতো কাউকে পাইনি। আমার প্রেমিক খুব সুন্দর হবে— তোমার চেয়েও সুন্দর— এ তো তোমার প্রশংসা, কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি ঠিক উপভোগ করতে পারছো না।'

'এ রকম তামাশা তোমার কাছ থেকে আশা করিনি।'

'মোটেই তামাশা করছি না। আমি অন্তর থেকেই বলছি। তোমার এক বছর আগেকার একটি কথাও আমি ভুলিনি। আজ তুমি কি বলবে বা করবে তা নিয়ে আমি একটুও মাথা ঘামাই না। আমার যখন ইচ্ছে হয়েছে আমি একটি প্রেমিক জোটাবই। তোমার অগোচরে, এমন কি তোমার সন্দেহের অবকাশ থাকবে না— অন্য অনেকের চেয়ে তুমি এ বিষয়ে বেশি চালাক নও।'

'এসব কথা তুমি বলছ কি করে?'

'কি করে আমি এসব বলছি ? কিন্তু প্রিয়তম, বেচারা অসন্দিগ্ধ মসিয়ো দ্য সারভিকে নিয়ে মাদাম দ্য জারস্ যখন ঠাট্টা করেছিল, তুমিই তো সবার আগে হেসে উঠেছিলে।'

'তা হতে পারে, কিন্তু তোমার মুখে এ ভাষা শোভা পায় না।'

'তাই নাকি ! মসিয়ো দ্য সারভির বেলায় যা কৌতুক, তোমার বেলায় তা অনুচিত। হায় মানুষের কি বিচিত্র ভাগ্য। যাহোক এসব নিয়ে কথা বলতে আমারও ভাল লাগে না। তুমি তৈরী আছো কিনা, কেবল তাই দেখবার জন্যে কথা তুললাম।'

'তৈরী ? কিসের জন্যে ?'

'প্রতারিত হবার জন্যে। তৈরী না থাকলে, এ সব কথা শুনেই লোকে রেগে যায়। আমি বাজী রেখে বলতে পারি, দু'মাসের মধ্যেই আমি যদি তোমার কাছে কোন প্রবঞ্চিত স্বামীর কথা উল্লেখ করি— তুমিই সবচেয়ে আগে উপহাস করবে। কেন না প্রতারিত ব্যক্তিরা সাধারণত তাই করে থাকে।'

'আমি শপথ করে বলতে পারি, আজ রাতে তুমি খুব রূঢ় ব্যবহার করছো। এ রকম তোমায় আগে কখনও দেখিনি।'

'ঠিক— আমি বদলে গেছি। খুবই খারাপ হয়ে গেছি, কিন্তু তোমার দোষেই।'

'এসো প্রিয়ে, আমরা একটু আন্তরিকভাবে কথা বলি। তোমার কাছে আমার অনুরোধ, আমার ভিক্ষা, মসিয়ো বুরেলের অনুরাগ তুমি প্রশ্রয় দিও না।'

'আমি জানি তোমার হিংসে হচ্ছে।'

'না, না ; কিন্তু আমি উপহাসের পাত্র হতে চাই না। আর যদি দেখি আজকের মতো আর কোনদিন ওই লোকটা তোমায় চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে, আমি তাকে পিষে ফেলবো।'

'তাহলেই কি আমায় তুমি ভালবাসতে পারবে ?'

'কেন নয় ? আরও সাংঘাতিক কিছু করতে পারি— এ বিশ্বাসও আমার আছে।'

'ধন্যবাদ, তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে—কারণ আমি তোমায় ভালবাসতে পারবো না।'

কাউন্ট উঠে চায়ের টেবিলের চারপাশে এক চক্কর ঘুরে এসে স্ত্রীর চেয়ারের পেছনে দাঁড়ালো। চকিতে তার গলায় একটা চুমু খেল। স্ত্রী চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চোখ লাল করে বললে :

'তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়? মনে রেখো, আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, আমরা একেবারে অচেনা।'

'লক্ষ্মীটি, রাগ করো না, আমি আদর না করে থাকতে পারছি না। আজ তোমায় ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে!'

'তাহলে আমার বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে?'

'তোমাকে অতি লোভনীয় দেখাচ্ছে; তোমার বাহু আর গ্রীবা খুব সুন্দর, আর তোমার মসৃণ ত্বক—'

'মসিয়ো বুরেলকে মুগ্ধ করতে পারবে—'

'কি নীচ তুমি; কিন্তু সত্যি, আজকে তোমার মতো এমন মোহিনী রূপ আর মেয়ের দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।'

'সম্প্রতি তুমি বোধহয় উপোসী আছ?'

'সে আবার কি?'

'আমি বলছি, এখন বোধহয় তোমার উপোস যাচ্ছে।'

'কেন? কি বলতে চাও তুমি?'

'আমি যা বলছি, তাই বলতে চাই। তোমায় অবশ্যই কিছুদিন উপোস করতে হয়েছে, আর এখন তুমি বুভুক্ষু। যা আগে কখনও ছোঁয়নি, ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ তাও খায়। আমি অবহেলিত— অখাদ্য, আজ রাতে সেই অখাদ্যেও তোমার অরুচি হচ্ছে না।'

'মার্গারেত! এমন বিশ্রী কথা তুমি কার কাছে শিখেছ?'

'তোমার কাছেই শিখেছি। আমার জ্ঞানত তোমার চার চারটি সহচরী আছে। অভিনেত্রী, উচ্চসমাজের মেয়ে, বাজারে মেয়ে, ইত্যাদি। কাজেই অনেকদিনের অনাহার ছাড়া আমাকে তোমার এই হঠাৎ ভাল লাগার আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে?'

'তুমি আমায় নিষ্ঠুর বর্বর ভাবতে পারো, কিন্তু আমি যে দ্বিতীয়বার তোমার প্রেমে পড়েছি। আমি তোমার প্রেমে পাগল!'

'বেশ, বেশ! তাহলে তুমি— তোমার ইচ্ছে—'

'ঠিক তাই।'

'আজ রাতেই?'

'ওঃ, মার্গারেত!'

'ওখানে দাঁড়াও, আবার অসভ্যতা শুরু করলে! শান্তভাবে কথা বলতে দাও, বন্ধু। আমাদের তো কোন সম্পর্ক নেই, আছে কি? আমি তোমার স্ত্রী, এ কথা সত্যি। কিন্তু আমি স্বাধীন। আমি কোথাও ভালবাসায় আবদ্ধ হবো। কিন্তু যদি সমান মূল্য দাও, আমি তোমায় প্রথম সুযোগ দেব।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না! কি বলছ?'

'আরও স্পষ্ট করে বলছি। আমি কি তোমার প্রেয়সীদের মতো রূপসী?'

'সহস্র গুণে।'

'সবচেয়ে সুন্দরীদের চেয়েও?'

'হ্যাঁ, হাজার গুণ বেশি।'

'এই তিন মাসে তাকে তোমার কত দিতে হয়েছে?'

'সত্যি— কি যে তুমি বলতে চাও?'

'আমি বলতে চাই তোমার সবচেয়ে দামী প্রেমিকাটির পেছনে এই তিন মাসে অলঙ্কারে, গাড়ি ভাড়ায়, খাওয়া-দাওয়ায় তোমার কত খরচ হয়েছে?'

'আঃ! কি করে আমি তা জানবো!'

'তোমার জানা উচিত ছিল। ধরে নেওয়া যাক, মাসে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ। প্রায় ঠিক হয়েছে না?'

'হ্যাঁ, ওই রকমই।'

'বেশ বন্ধু, আমাকে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ দাও। আজ রাত থেকে এক মাসের জন্য আমি তোমার হব।'

'মার্গারেত। তুমি পাগল হয়ে গেলে ?'

'না,। আমি হইনি। তবে তোমার ইচ্ছে হলে বলতে পার। বিদায়!'

কাউণ্টেস গিয়ে তার নিজের ঘরে ঢুকলো। সমস্ত ঘরটা মৃদু সুগন্ধে ভরে আছে। কাউণ্ট তার দরজায় দাঁড়িয়ে বললো :

'এখানে কি চমৎকার গন্ধ!'

'তোমার ভাল লাগে ? আমি সর্বদাই পয় দ্য এস্পেন ব্যবহার করি। অন্য কোন সুগন্ধি আমার পছন্দ হয় না।'

'তাই নাকি ? আমি লক্ষ্য করিনি— এটা সত্যি ভাল।'

'হবে। কিন্তু দয়া করে এখন যদি যাও, আমি এখন শুতে যাব।'

'মার্গারেত!'

'তুমি দয়া করে যাবে কি ?'

কাউণ্ট ভেতরে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়লো। কাউণ্টেস বললে :

'তুমি যাবে না ? ঠিক আছে।'

সে ধীরে সুস্থে তার পোশাক খুলতে লাগলো। তার বাহু, কাঁধ অনাবৃত হোলো। তারপর চুল খোলার জন্য মাথায় হাত দিল। এমন সময় কাউণ্ট তার দিকে এগিয়ে এলো এক পা। কাউণ্টেস বললে : 'আমার কাছে এসো না, তাহলে আমি সত্যি সত্যি রেগে যাব। শুনতে পাচ্ছ ?' কাউণ্ট তার হাত দুটি ধরে তাকে চুমু খেতে চেষ্টা করলো। সে তাড়াতাড়ি ড্রেসিং টেবিল থেকে একটা সেণ্টের শিশি তুলে নিয়ে স্বামীর মুখে ছুঁড়ে মারলো। কাউণ্ট রেগে আগুন। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সে দাঁতে দাঁত ঘষে বললো :

'কি বেয়াদপ তুমি!'

'হবে হয় তো— কিন্তু তুমি তো আমার শর্ত জানই। মাসে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ।'

'অ-স-ম্-ভ-ব।'

'কেন, বল।'

'কেন? কারণ কে কবে শুনেছে যে মানুষ তার স্ত্রীর কাছে আসে টাকা দিয়ে!'

'হায়! তুমি কি নির্দয়!'

'আমার ধারণা আমি নির্দয়। কিন্তু আমি আবার বলছি স্ত্রীকে টাকা দিয়ে কেনার ধারণা অসম্ভব! সম্ভবত কুৎসিতও।'

'বাজারে মেয়েকে টাকা দেওয়াটা কি আরও খারাপ নয়? বিশেষ করে যাদের স্ত্রী রয়েছে, তাদের পক্ষে এটা অবশ্যই কদর্য।'

'হতে পারে, কিন্তু আমি পরিহাসের পাত্র হতে চাই না।'

কাউণ্টেস বিছানায় বসে তার মোজা খুলে ফেললো। সুপুষ্ট পদযুগল নগ্ন হয়ে পড়লো। কাউন্ট একটু কাছে গিয়ে নরম গলায় বললে:

'মার্গারেত, এই মতলবটা তোমার কত অসংগত বল তো!'

'কোন্ মতলব?'

'আমার কাছে পাঁচ হাজার ফাঁ দাবি করা!'

'অসংগত? অসংগত কেন? আমরা কি অপরিচিত নই? তুমি বলছো, আমার সঙ্গে প্রেম করতে চাও; ভাল কথা। তুমি তো আমায় বিয়ে করতে পার না, কেননা, আগেই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। কাজেই আমায় কিনে নিতে পার। হা ঈশ্বর! তুমি অন্য মেয়েদের কেননি? একটা উটকো মেয়ে তোমার টাকা অপব্যয় করবে, তার চেয়ে তোমার স্ত্রীকে দেওয়াই বেশি ভাল নয় কি? দেখ, তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, স্ত্রীকে টাকা দেবার ধারণাটা একেবারে আনকোরা নতুন। তোমার মতো বুদ্ধিমান লোকের তো এতে মজা পাওয়াই উচিত। তাছাড়া একগাদা টাকা খরচ না হলে পুরুষের সে জিনিসে মন ওঠে না। তোমার ওই অবৈধ প্রেমের তুলনায় আমাদের এই নতুন দাম্পত্য প্রেম অনেক বেশি মুখরোচক হবে। ঠিক বলিনি আমি?'

সে উঠে কলিং বেল টিপতে গেল। স্বামীকে বললে: 'মশায়, এখন আপনি সসম্মানে বিদায় না হলে আমার ঝিকে ডাকবো।'

হতবুদ্ধি বিমর্ষ কাউন্ট একটু দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক তাড়া কাগজের নোট বার করে স্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠলো:

'এখানে ছ'হাজার আছে। তুমি একটা ডাইনি; কিন্তু মনে রেখো—'

কাউন্টেস টাকাগুলো গুনে তুলে রাখলো। স্বামীকে প্রশ্ন করলো, 'কি মনে রাখতে হবে?'

'তুমি এ টাকা খরচ করতে পারবে না।'

কাউন্টেস হেসে গড়িয়ে পড়ে বললো:

'প্রতি মাসে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ, নাহলে আবার অভিনেত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেব। আর যদি আমায় দিয়ে তোমার সাধ মেটে— তবে আমার দর বাড়িয়ে দেব।'

দুনিয়ার সব কিছু থেকে দূরে নিজের ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে যারা বাস করে তেমনি এক পরিবারে সে মানুষ। রাজনীতিতে তাদের উৎসাহ নেই। অবশ্য টেবিলে বসে সে সম্বন্ধে গালগল্প চলে ঠিকই। কিন্তু তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয় মান্ধাতার আমলের কোন রাজশক্তির পরিবর্তন বা ঐতিহাসিক ঘটনা, যেমন সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের মৃত্যু অথবা নেপোলিয়নের বিজয়।

সমাজে রীতিনীতি হালচাল ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে, সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা সেই প্রাচীন ঐতিহ্য আঁকড়ে রয়েছে। পাড়ায় হয়তো কোন অঘটন ঘটেছে, কিন্তু সে কেলেঙ্কারি এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতে পারবে না।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলা বাপ মা একা থাকলে, এ রকম দুচারটে কথা ওঠে। তবে তাদের কথা হয় ফিস্‌ফিসিয়ে। বিশ্বাস কি—দেওয়ালেরও কান আছে। খুব ভেবে চিন্তে বাবা হয়তো বললে :

'বিভোল পরিবারের সেই ভয়ানক ঘটনার কথা শুনেছ ?'

মা জবাব দিলে : 'কে-ই বা বিশ্বাস করবে ? সাংঘাতিক !'

ছেলেমেয়েদের মনে কখনও কোন সন্দেহ জাগে না। চোখে মনে ঠুলি এঁটে তারা বড় হয়ে উঠেছে। নিজেদের ছাড়া অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নেই। মানুষ যে সব সময় যা ভাবে তা বলে না, যা বলে তা করে না—এ সব তাদের কল্পনার বাইরে। বেঁচে থাকবার জন্যে যে পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, অন্ততঃ সশস্ত্র থাকতে হয়, এ জ্ঞান তাদের হয়নি। তারা আন্দাজ করতে পারে না যে সাদাসিধে লোকেরা প্রায়ই ঠকে, আন্তরিকতার পরিবর্তে মানুষ পায় তাচ্ছিল্য আর ভাল লোকের

ভাগ্যে জোটে অন্যায় অবিচার। এদের কারও কারও জীবনে এই অন্ধ সততা, নিষ্ঠা এবং সম্মান এমন ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, যার ফলে মৃত্যু পর্যন্ত আর কোনদিনই তাদের চোখ ফোটে না।

এই পরিবারের অষ্টাদশী কন্যা বার্থেকে বিয়ে করলো জর্জ ব্যারন সেভিজোঁলস। প্যারিসের যুবক। স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যাবসায়ী। মন-মাতানো তারুণ্যে ভরপুর। সুমিষ্ট কথাবার্তা। প্রয়োজনমতো সে সমস্ত বাহ্য আদবকায়দা মেনে চলে। কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে সরল সুবোধ শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি নাক সিঁটকানো ভাব। বন্ধু-মহলে তাদের সম্বন্ধে ঠাট্টা করে বলে: 'আমার প্রিয় একজোড়া প্রাচীন ভূত।"

তার পরিবারের নাম ডাক আছে। অবস্থাও ভাল। বিয়ের পর বধূকে নিয়ে এলো প্যারিসে। সেখানে অসংখ্য অঞ্চলের অগুনতি মানুষের মধ্যে একটি কোণে বার্থে নিজেকে গুটিয়ে ফেললো। জীবনের রহস্য এবং বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ যেমন চিরকাল তার অজ্ঞাতই রয়ে গেল, তেমনি সুবিশাল নগরীর মার্জিত নাগরিক ও তাদের আমোদ-আহ্লাদ, আচার-ব্যবহার এ সব কিছুই সে জানলে না।

তার চেনা জগৎ বলতে বাসস্থান সংলগ্ন রাস্তাটুকু আর নিজের পরিবার। কাজেই যখন বাড়ি পালটাতে হয়, তার মনে হয় সে যেন এক সুদূর, অচেনা, অদ্ভুত শহরে অভিযানে বেরিয়েছে।

বছরে বড় জোর দু'দিন কি তিনদিন স্বামী তাকে থিয়েটারে নিয়ে যেত। এ ছিল তার কাছে অবিস্মরণীয় ঘটনা। প্রায়ই সে এই নাটক দেখার স্মৃতি রোমন্থন করতো। হয়তো তিন মাস পরে একদিন খাবার টেবিলে বসে হাসির দমকে উছলে উঠে বললো: 'সেই যে মুরগীর ডাক নকল করেছিল যে মজার অভিনেতা, তাকে তোমার মনে আছে?'

প্রতিবেশী পরিবারই তার কাছে সমগ্র মানব জাতি। তার যা কিছু আগ্রহ ওদের ঘিরেই। সে তাদের নামের আগে সর্বদা

'মাননীয়' বিশেষণটি প্রয়োগ করতো। সসম্ভ্রমে উল্লেখ করতো 'মাননীয় মারতিনেস্' অথবা 'মাননীয় মাইকেলিতস্'।

তার স্বামী নিজের খেয়ালে চলতো। ইচ্ছে মতন যখন খুশি বাড়ি ফিরতো। কখনও কখনও ব্যাবসার দোহাই দিয়ে রাত ভোর করে ফেলতো। কোন দিক দিয়েই সে বাধ্যবাধকতা অনুভব করতো না। কোন রকম সন্দেহ স্ত্রীর অকপট হৃদয়টিকে বিক্ষুব্ধ করবে না ভেবে সে পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছিল।

একদিন বার্থে একটা উড়ো চিঠি পেল। পত্র প্রেরক লিখেছে— যেহেতু সে অনাচারকে গর্হিত কাজ মনে করে, সত্য বলতে ভালবাসে এবং বার্থের সুখের কথা ভেবে অভিভূত হয়েছে, তাই এই চিঠি লিখছে। চিঠিটা পড়ে বার্থের দারুণ ঘৃণা হোলো। গভীর অবসাদে দেহ মন তার ভেঙ্গে পড়লো।

কিন্তু তার কাছে সত্য উদ্‌ঘাটিত হোলো। সে বুঝলো গত দু'বছর ধরে মাদাম রোসেত নামে এক তরুণী বিধবার সঙ্গে স্বামীর প্রেমলীলা চলেছে। তার বাড়িতেই সে প্রত্যেকটি সন্ধ্যা কাটিয়েছে।

ছলচাতুরী বা প্রবঞ্চনায় সে নিতান্ত অপটু। গোয়েন্দাগিরি বা কৌশল প্রয়োগ বিদ্যা তার অনায়ত্ত।,

স্বামী দুপুরে খেতে এলে বার্থে চিঠিটা তারদিকে ছুঁড়ে দিল। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ব্যাপারটা বোধগম্য হতে ভদ্রলোকের বেশ কিছুটা সময় লাগলো। মনে মনে জুতসই একটা জবার ঠিক করে উঠে গিয়ে স্ত্রীর বন্ধ দরজায় ঘা দিতে শুরু করলো। বার্থে দরজা খুলে দিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল।

পতিদেবতাটি হাসতে হাসতে বসে পড়লো। স্ত্রীকে কোলের ওপর বসিয়ে নিয়ে গলায় মধু ঢেলে সামান্য একটু রহস্য মিশিয়ে বললো : 'আমার ছোট্ট মণি, মাদাম রোসেত আমার বন্ধু। দশ বছর ধরে আমি তাকে চিনি। তাকে আমি খুবই পছন্দ করি।

দেখ, এ রকম আরও গোটা বিশেক পরিবারের সঙ্গে আমার জানা শোনা আছে। তাদের কথাও তোমাকে বলিনি। কেননা, পৃথিবীর কোন কিছুতেই তোমার আগ্রহ নেই। নতুন কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করার আকাঙ্ক্ষাও দেখি না। কিন্তু এ ধরনের মিথ্যা কুৎসা বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। আমি চিরতরে এর অবসান চাই। খাওয়া দাওয়ার পর তৈরী হয়ে নাও, চলো ভদ্র মহিলার সঙ্গে পরিচয় করে আসবে। আমি নিশ্চিত যে আলাপ পরিচয় হলে উনি তোমারও বন্ধু হবেন।'

বার্থে গভীর আবেগে স্বামীকে জড়িয়ে ধরলো আর যেহেতু স্ত্রীলোকের কৌতূহল একবার জেগে উঠলে আর শান্ত হতে চায় না, তাই সে এই অপরিচিতার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়ে গেল। কারণ এত সব শোনার পরও তার মন থেকে এই মেয়েটি সম্বন্ধে সন্দেহ একেবারে দূর হোলো না। সহজাত প্রবৃত্তির বলে সে অনুভব করলো একটা সম্ভাব্য বিপদ শীঘ্রই দূর হতে চলেছে।

কারুকলা মণ্ডিত প্রাচীন চীনা অলঙ্করণে সজ্জিত একটা সুন্দর বাড়ির তেতলায় একটি ছোট সুচারু ঘরের মধ্যে তারা প্রবেশ করলো। ঘরটি বৈঠকখানা। দরজা জানালার পরদা সুরুচি-সম্মত। আলোর গায়ে ঝালর ঝুলিয়ে দেওয়াতে উগ্রতা দমিত হয়েছে। প্রায় পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর একটা দরজা খুলে একজন যুবতী ঘরে এলো। গায়ের রঙ্ মিশ কালো। বেঁটে, বেশ গোলগাল চেহারা। মুখে হাসি, চোখে অবাক চাহনি। জর্জ তাদের পরিচয় করিয়ে দিল—'আমার স্ত্রী, আর ইনি হচ্ছেন মাদাম জুলি রোসেত।'

যুবতী বিধবাটি আনন্দে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠে বার্থের দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিল। মাদাম ব্যারন কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করে না বলেই সে জানতো। তাই আজকের আনন্দ তার কাছে অপ্রত্যাশিত। কিন্তু তার কী যে আনন্দ হচ্ছে। সে জর্জকে এত ভালবাসে! ( সে যে 'জর্জ' বলবে, এতো

খুবই স্বাভাবিক, কারণ সে তার বোনের মতো ) তাই জর্জের বৌ-এর সঙ্গে আলাপ করতে, তাকে ভালবাসতে তার খুবই সাধ ছিল।

মাস না ঘুরতেই এই তুটি বান্ধবী সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হোলো। প্রত্যহ তারা মিলিত হোতো বেশির ভাগ দিনই অন্তত তু'বার। আর রাতের খাওয়াটাও প্রায়ই একত্রে হোতো—হয় এ বাড়ি নয় ও বাড়ি।

জর্জ এখন খুব কমই বাইরে থাকে। কাজের ওজর দেখানোরও প্রয়োজন হয় না। এখন বলে—চুল্লির ধারের কোণটি তার খুব প্রিয়।

মাদাম রোসেত যে বাড়িতে থাকতো, এর মধ্যে সেখানে একটা ফ্ল্যাট খালি হোলো। মাদাম ব্যারন নতুন বন্ধুকে আরও কাছে পাবার জন্য তাড়াতাড়ি এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়ে নিল।

পুরো তুটি বছর তাদের মধ্যে নিখাদ বন্ধুত্ব বজায় রইল। হৃদয় মনের বন্ধুত্ব—সর্বোত্তম, স্নেহময়, আত্মবিস্মৃত, সুখদায়ক। জুলির উল্লেখ না করে বার্থে কোন কথাই বলতে পারতো না। কেননা জুলি ছিল তার কাছে পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা। নিরুদ্‌বেগ, প্রশান্ত, পরিপূর্ণ আনন্দে সে সত্যই সুখী হোলো।

হঠাৎ মাদাম রোসেত রোগে পড়লো। বার্থে সর্বদা তার কাছে থাকলো। গভীর হতাশায় তার রাত কাটতে লাগলো। তার স্বামীরও মন গেল ভেঙ্গে।

এক সকালে রোগী দেখে বেরিয়ে আসবার সময় জর্জ আর তার স্ত্রীকে একপাশে ডেকে ডাক্তার বললে—তাদের বন্ধুর অবস্থা ভাল বোধ হচ্ছে না।

ডাক্তার চলে গেলে বেদনাহত এই তরুণ দম্পতি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থেকে কেঁদে উঠল। রোগীর শয্যাপাশে তু'জনেই রাত জাগলো। বার্থে মুহূর্তে মুহূর্তে এই অসুস্থ নারীকে ব্যাকুল স্নেহে আদর করছিল, আর জর্জ পায়ের দিকে তার খাটের কাছে

দাঁড়িয়ে পরম ধৈর্যে আত্মদমন করে দুই সখীকে দেখছিল। পরের দিন রোগীর অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল।

অবশেষে সন্ধ্যার দিকে রোগী জানালে সে একটু ভাল বোধ করছে। তাই জোর করে ডিনার খাবার জন্য বন্ধুদের ঘরে পাঠিয়ে দিল।

খাবার টেবিলে তারা বিষণ্ণ হয়ে রইল। প্রায় কিছুই খাওয়া হোলো না। এমন সময় পরিচারিকা জর্জের হাতে একখানা খাম এনে দিল। খামটা খুলে চিঠি পড়েই জর্জের মুখ ফ্যাকাশে। দাঁড়িয়ে উঠে বিকৃত গলায় স্ত্রীকে বললো :—'কিছু মনে কোরো না, খানিকক্ষণ তোমায় একা রেখে যাচ্ছি। আমি দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবো। লক্ষ্মীটি বাইরে বেরিও না।' বলেই টুপি নেবার জন্য ঘরের দিকে ছুটে গেল।

বার্থে অপেক্ষা করে রইল। নতুন এক ভয় তাকে পেয়ে বসলো। কিন্তু স্বামীর নিষেধ আছে, তাই সে ফিরে না আসা পর্যন্ত বন্ধুর ঘরে তার যাওয়া উচিত হবে না।

স্বামী ফিরছে না দেখে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে তাড়াতাড়ি স্বামীর ঘরে এসে দেখে নিল তার দস্তানা জোড়া আছে কি না, কারণ দস্তানা ছাড়া সে কখনও বাইরে কোথাও যায় না।

প্রথম নজরেই চোখে পড়লো দস্তানা ঠিক জায়গায় রয়েছে। কাছেই একটা দলাপাকানো কাগজ। জর্জ ওখানে ওটা ছুঁড়ে ফেলেছিল। বার্থে কাগজটা দেখেই চিনতে পারলো, একটু আগে তার স্বামীর হাতে এটাই দেওয়া হয়েছিল।

জীবনে এই সর্বপ্রথম গোপনে কিছু পড়ে জানবার জন্য তার মনে দুর্বার প্রলোভন দেখা দিল। বিবেক সায় দিল না। কিন্তু এক তিক্ত, নিষ্ঠুর দংশনের ফলে হাত এগিয়ে গেল। সে কাগজটা তুলে নিল। খুলে ধরতেই দেখতে পেল জুলির হাতের লেখা। কম্পিত হস্তে পেনসিলে লেখা আছে :

'একা এসে আমায় আদর কোরো, আমার হতভাগ্য প্রিয়তম, আমি যে মরে যাচ্ছি।'

মৃত্যু চিন্তায় আহত হয়ে বার্থে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ তার মাথায় আর কিছুই ঢুকলো না। তারপর হঠাৎ লেখার মধ্যেকার ঘনিষ্ঠতা তার মনে চেপে বসলো। তার চোখ ফুটলো। এক তীব্র আলোর ঝলকে সে তার সমস্ত জীবন স্পষ্ট দেখতে পেল। তাদের সকল ষড়যন্ত্র—সমস্ত বিশ্বাসঘাতকতা—সমস্ত ঘৃণ্য সত্য তার সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তাদের সেই ধূর্ত চাতুরী-মাখানো প্রলম্বিত দৃষ্টির অর্থ এখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। তার ভালমানুষীর সুযোগ নেওয়া হয়েছে, তার বিশ্বাস প্রতারিত হয়েছে। তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো সেই সব ছবি—একজন অপর জনের দিকে তাকিয়ে থাকা, সন্ধ্যায় তার ঝালর দেওয়া বাতির আড়ালে বসে একই বই থেকে দু'জনের পড়া আর পৃষ্ঠা ওলটানোর ফাঁকে ফাঁকে কটাক্ষপাত।

তার অন্তর রাগে বিতৃষ্ণায় জ্বলে উঠলো, যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকলো, সীমাহীন হতাশার অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে লাগলো। পায়ের শব্দ শোনা যেতেই সে ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে খিল দিল।

তার স্বামী তাকে ডেকে বললে: 'শিগগির এসো, মাদাম রোসেতের সময় হয়ে এসেছে।'

বার্থে দরজা খুলে দিয়ে কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করলো: 'একাই তার কাছে যাও। আমাকে আর প্রয়োজন নেই।'

বেদনায় হতবুদ্ধি হয়ে সে বার্থের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকলো। তারপর আগের কথার পুনরাবৃত্তি করলো: 'শীগগির, শীগগির! ও যে মারা যাচ্ছে!'

বার্থের জবাব: 'যদি আমি হতাম, তুমি খুশী হতে।'

তখন সম্ভবত বুঝতে পেরে জর্জ বার্থেকে ফেলে একাই মুমূর্ষু রমণীর কাছে ওপরে চলে গেল।

লজ্জা ভয় বিসর্জন দিয়ে সে আকুল হয়ে কাঁদলো। যে স্ত্রী এখন থেকে তার সঙ্গে কথা বলবে না, ফিরে তাকাবে না, যে তার আপন বিরাগ আর অদম্য ক্রোধের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকবে, সকাল সন্ধ্যায় ঈশ্বরের কাছে নালিশ জানাবে—জর্জ সেই স্ত্রীর দুঃখের পরোয়া করলো না।

কিন্তু তারা একত্রেই রইলো। নিঃশব্দ নিরাশায় মুখোমুখি বসে আহার সমাধা করতো।

এক সময় জর্জের রাগ পড়লো। কিন্তু বার্থে তাকে ক্ষমা করতে পারলো না। কাজেই দু'জনের কাছেই জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো।

সারাটা বছর এভাবেই কাটলো। কেউ যেন কাউকে চেনে না। বার্থে প্রায় পাগল হয়ে গেল।

একদিন খুব ভোরে উঠে বার্থে বেরিয়ে গেল। ফিরে এলো ঠিক আটটায়। শুভ্র, তুষার ধবল মস্তবড় একটা শ্বেতগোলাপের তোড়া তার হাতে।

কথা আছে বলে স্বামীকে ডেকে পাঠালো। ব্যথিত, উদ্‌বিগ্ন জর্জ তার কাছে উপস্থিত হোলো।

'চল একসঙ্গে বেড়িয়ে আসি।' স্ত্রী বললে: 'এই ফুলের তোড়াটা নাও, আমার খুব ভারি লাগছে।'

তোড়াটা নিয়ে সে স্ত্রীর পিছে পিছে এলো। একটা ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করছিল। তারা চড়ে বসতেই ছুটতে শুরু করলো।

একটা সমাধি ক্ষেত্রের দরজায় এসে গাড়িটা থামলো। অশ্রুসিক্ত বার্থে জর্জকে অনুরোধ জানালো: 'আমাকে তার সমাধির কাছে নিয়ে চলো।'

জর্জ কেঁপে উঠলো। কেন সে জানে না। কিন্তু ফুলগুলো নিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে একটা সাদা মার্বেল পাথরের স্তম্ভের কাছে এসে থামলো। মুখে কথা না বলে আঙুল দিয়ে সেদিকে দেখালো।

বার্থে তার হাত থেকে ফুলের তোড়াটা নিয়ে নতজানু হয়ে স্তম্ভের গোড়ায় রাখলো। তারপর আন্তরিক বিনীত প্রার্থনায় ধ্যানস্থ হয়ে গেল।

পেছনে দাঁড়িয়ে স্মৃতি-তাড়িত স্বামীর চোখে জল এলো। বার্থে উঠে দুহাত বাড়িয়ে দিল স্বামীর দিকে। বললো: 'তোমার ইচ্ছে থাকলে আমরা বন্ধু হতে পারি।'

## বার্ধক্য

দুই বন্ধুর ডিনার শেষ হয়েছে। কাফের জানালায় দাঁড়িয়ে তারা দেখলো বুলভার্দ লোকে লোকারণ্য! এখন প্যারিস নগরীর দেহে মনোরম গ্রীষ্ম রজনীর উষ্ণ দখিনা বায়ুর সোহাগ পরশ। এমন মনোহর আবহাওয়ায় চোখে ঘুম আসে না। তরুপল্লব ছায়ায়, চাঁদনিবিধৌত স্রোতস্বিনীর স্বপ্নময় সৌন্দর্যে, খদ্যোতের মোলায়েম আলোক কম্পনে, নাইটিঙ্গেল পাখীর সুমধুর কলকাকলিতে মোহাবিষ্ট নরনারী যথেচ্ছ বিচরণে রত। এই মধু যামিনীর নেশায় বাতায়নে দণ্ডায়মান বন্ধু দুটি আকুল।

এক বন্ধু, অঁ্যারি সিমঁ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে: 'হায়! আমি জুড়িয়ে যাচ্ছি। বড়ই দুঃখের কথা। আগে এমন সাঁঝে আমার দেহমনে আসুরিক উন্মত্ততার বান ডাকত। আর এখন শুধুই অনুতাপ। জীবন কত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়!'

এর মধ্যেই বেশ মোটা হয়ে পড়েছে, মাথা জুড়ে মস্ত টাক। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ হবে।

আরেক বন্ধু পেতার কারনিয়ঁ আরও বয়স্ক; কিন্তু বন্ধুর মতো মেদবহুল নয় আর বেশ সপ্রতিভ। সে জবাবে বললে: 'আমার কথা বলতে গেলে বয়স সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র হুঁশ হবার আগেই আমি বুড়িয়ে গেলাম। আমি ছিলাম সদানন্দ, হাসি-খুশি, সর্বদা উৎসাহে ভরপুর। মানুষ প্রতিদিন আয়নায় মুখ দেখে, কাজেই বয়সের অদৃশ্য কারসাজি সঠিক ধরতে পারে না। বয়স অতি ধীরে ধীরে তিল তিল করে পলে পলে মানুষের মুখের চেহারা বদলাতে থাকে। এজন্য রূপান্তর আমাদের চোখে পড়ে না। তারপর শেষ দু'তিন বছরে ধ্বংসটা বিশেষ করে নজরে পড়ে— আমরা নৈরাশ্যে বিষাদে মরে যাই। বার্ধক্যের মূল্য নির্ণয়

আমাদের ক্ষমতার বাইরে। বয়সের হিসাব নিকাশ করতে হোলে অন্তত ছ'মাস আয়নায় মুখ দেখা বন্ধ রাখতে হবে। তারপর, কি প্রচণ্ড আঘাত!

'আর নারী, হায় বন্ধু, তাদের জন্য আমার মায়া হয়; হতভাগ্য জীব। নারীর সমস্ত সুখ, সমস্ত শক্তি— সারা জীবনের মূল্য— তাদের রূপের ডালিতে সঞ্চিত। কিন্তু সেই রূপের আয়ু বড়জোর দশ বছর!

'নিজের অগোচরে আমার ভাঙন শুরু হয়েছিল। পঞ্চাশে পা দিয়েও আমি নিজেকে যুবক ভাবতাম। দেহের কোথাও কোন বিকলতা অনুভব করিনি। তাই নিরুদ্‌বেগ প্রশান্তিতে আমার দিন কেটে যাচ্ছিল।

'কিন্তু অতি সহজে অথচ ভয়ঙ্কর বেশে একদিন আমার অবক্ষয় উদ্‌ঘাটিত হোলো। গত ছ'মাস ধরে আমি অবসাদগ্রস্ত, জীবন আমায় বাতিল করেছে!

'অন্য অনেকের মত আমিও প্রেমের ক্ষেত্রে যথেচ্ছবিহারী। কিন্তু তার মধ্যে একটি আমার মনে অক্ষয় আসন অধিকার করে নিয়েছে।

'যুদ্ধের কিছু পরে প্রায় বারো বছর ,আগে অত্রেতাতের সমুদ্র তটে আমাদের প্রথম ,সাক্ষাৎ। সকালে স্নানের সময়ে এই তীরভূমির সৌন্দর্য অতুলনীয়। ক্ষুদ্র অশ্বক্ষুরাকৃতি উপকূল উন্নত, শুভ্র পর্বতে বেষ্টিত। বন্দর নামধারী অদ্ভুত গহ্বরগুলো এর মর্মস্থলে বিদ্ধ। একটি অতিকায় দৈত্যের মতো সমুদ্রে পা বাড়িয়ে আছে, অপরটি গোলাকার, উল্টোদিকে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। স্নানঘাটের দক্ষিণে রমণীকুলের ভিড়। সুউচ্চ পর্বতের মধ্যে অবস্থিত এই স্নানক্ষেত্রটি তাদের স্নানের পোশাকের বর্ণবাহারে উদ্যানের মতো শোভা পায়। রবিকিরণে উপকূল, বেলাভূমি, সবুজ-নীলাভ জলরাশি উজ্জ্বল। সব কিছুই নয়নাভিরাম, আনন্দময়, হাস্য-মুখর। তীরে বসে দুচোখ ভরে স্নান দেখা যায়। সুন্দরীদল জলের

কিনারায় সফেন ছোট ছোট ঢেউয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের ঝক্‌মকে স্নানের গাউনগুলো চমৎকার ভঙ্গীতে তীরে ছুঁড়ে দিয়ে উর্মিমালায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। রূপসী তরুণীদের সন্তরণ, অবগাহন, মাতামাতি আমি প্রাণ ভরে উপভোগ করতাম।

'এই স্নান পরখ করে অতি অল্প লোকই অবিচলিত থাকতে পারে। পদপ্রান্ত থেকে কণ্ঠ অবধি উন্মুক্ত নমনীয়তা। তরঙ্গের ছন্দে ছন্দে কোমল অঙ্গের হিল্লোল। অসুন্দর সুন্দর সহজেই বাছাই করা যায়।

'এই স্নানের মেলায় আমার প্রেয়সীকে খুঁজে পেলাম। তাকে দেখে আমি বিভোর, প্রাণে জাগলো নৃত্যের উল্লাস। সুগঠিত তনু, অপরূপ। বিশেষ একটি মুখের লাবণ্য হঠাৎ মনে আলোড়ন তোলে, অলক্ষ্যে হৃদয়ে গাঁথা হয়ে যায়। তাকে দেখেই মনে হোলো—এ রতন আমার। ওর প্রেমসুধা আকণ্ঠ পান করে ধন্য হবার জন্যই আমার জন্ম। এই নতুন অনুভূতিতে চিত্তে চমক্ লাগলো।

'নিজেকে আড়ালে রাখতে পারলাম না। ও আমার হৃদয় মন লুটে নিল। এর আগে আর কখনও এমন করে ধরা দিইনি। রমণীর মনোরাজ্যে পদার্পণ ভয়ঙ্কর অথচ মধুর। এ যেন নিদারুণ শাস্তি, কিন্তু অবিশ্বাস্য সুখাবেশ। তার নয়নে বিদ্যুতের ঝিলিক, মুখে সুস্মিত হাসি, গ্রীবাদেশে বাতাসে আন্দোলিত কুন্তলরাজি। মুখমণ্ডলের প্রতিটি সূক্ষ্মরেখা, দেহের সামান্যতম ঢেউ আনন্দে আমায় পাগল করে দিত। আমি ভালবাসার অতলে তলিয়ে যেতাম। আমার সমগ্র সত্তায় সে মিশে গিয়েছিল। তার চলন বলন, কথাবার্তা এমনকি তার ব্যবহৃত জিনিসপত্রগুলো পর্যন্ত যেন আমায় জাদু করেছিল। টেবিল, চেয়ারে ছড়িয়ে পড়ে থাকা তার পরিত্যক্ত ওড়না, দস্তানার দিকে তাকিয়ে থেকে মন মমতায় ভরে উঠত। আমার চোখে তার সাজপোশাক অনুপম বোধ হোতো। তার টুপির মতো সুন্দর টুপি আর কারও মাথায় দেখিনি।

'সে ছিল বিবাহিত। স্বামী প্রতি শনিবার এসে সোমবার অবধি থাকত। ভদ্রলোকটির প্রতি আমি ছিলাম নির্বিকার। আমার বিন্দুমাত্র ঈর্ষা হোতো না। কেন জানি না এই লোকটির মতো আমার সারা জীবনে আর কারও প্রতি এত ঔদাসীন্য অনুভব করিনি।

'তাকে প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছিলাম, উজাড় করে দিয়েছিলাম। সে ছিল সতেজ, স্নিগ্ধ, মোহিনী। যেন উচ্ছল যৌবন, ভরা গাঙ, একগুচ্ছ তাজা ফুল। নারীর যে এত মাধুরী, এমন প্রখর অথচ কোমল, এমন মদির লাবণ্য— তাকে দেখার আগে ভাবতেও পারিনি। তার রক্তিম কপোলের ভাঁজে, বঙ্কিম অধর প্রান্তে, কর্ণের জটিল বৃত্তে, বাদ্যযন্ত্রের মতো সরল নাসিকায়— সর্বত্র রূপের আমন্ত্রণ।

'তিনমাস পর বিদায় নিয়ে চলে আসতে হোলো আমেরিকায়। বুক ভেঙ্গে খান্ খান্। হৃদয় বিকল। হতাশার গভীর আঁধারে ডুবে গেলাম। কিন্তু আমার মনে তার ছবি তেমনি অটুট, উজ্জ্বল। বহুদূরে থেকেও তাকে ঠিক তেমনি করেই কাছে পেলাম।

'দিনের পর দিন গেল। তাকে ভুলতে পারলাম না। তার অম্লান মূর্তি আমার নয়নে, আমার তনুমন জুড়ে। আমার প্রেম এখনও নিখাদ। কিন্তু এখন প্রশান্ত, সমাহিত। জীবনের সঞ্চিত ভাণ্ডারে তার স্মৃতি মধুরতম।

"মানুষের জীবনে দশ বছর কিছুই নয়। চোখের পলকে কেটে যায়, টেরই পাওয়া যায় না। নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে একটির পর একটি বছর চুপি চুপি উধাও হয়ে যায়। সময় কত দীর্ঘ অথচ কত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। তার পশ্চাতে কোন চিহ্ন পড়ে থাকে না। সময় এমন ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, মানুষ পেছনে ফিরে কিছুই দেখতে পায় না। টের পায় না মহাকাল কি করে তাকে একটু একটু করে বার্ধক্যের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আমার

তখন মনে হয়েছিল এই তো সবে কয়েকমাস আগে আমি অত্রেতাতের সাগরবেলায় সেই চিরবসন্তের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি।

'গত বসন্তে বন্ধু মহলের নিমন্ত্রণ রাখতে মায়জোঁ-লাফিতে চলেছি। গাড়ি ছাড়ার মুখে একজন স্বাস্থ্যবতী ভদ্রমহিলা চারিটি মেয়ে সঙ্গে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আমার কামরায় এসে উঠে পড়ল। এই জবরদস্ত সাদামাটা, রিবনহীন টুপিতে আচ্ছাদিত পূর্ণচন্দ্রের মতো সুগোল মুখ বিশিষ্ট মাতৃদেবী আমার তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করল না।

'দৌড়ে আসার দরুন তখনও সে হাঁপাচ্ছে। শিশু চারিটি তাকে ঘিরে সোরগোল শুরু করল। আমি খবরের কাগজে মন দিলাম।

'গাড়ি আসনিয়েরেস ছেড়েছে, হঠাৎ আমার সহযাত্রী আমায় শুধালে: 'মাপ করবেন, আপনার নাম কি কাবনিয়ঁ ?'

'হ্যাঁ মাদাম।'

'মহিলার মুখে প্রশান্ত হাসি ছাড়িয়ে পড়ল! কিন্তু জড়তা না থাকলেও কোথায় যেন একটু বেদনার আভাস।

'আপনি বোধহয় আমায় চিনতে পারেননি ?'—সে বললে।

'আমি দ্বিধাগ্রস্ত। এ মুখ নিশ্চয় কোথাও দেখেছি; কিন্তু কোথায়? কখন? জবাব দিলাম—

"হাঁ,—না—মানে আপনাকে খুবই চিনি, কিন্তু নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না।

'সে একটু লজ্জা পেয়ে বললে: 'মিসেস জুলি লেফেভা।'

'জীবনে এমন প্রচণ্ড আঘাত আর কখনও পাই নি। খানিকক্ষণ মনে হোলো সব শেষ হয়ে গেছে। আমার চোখের সামনে থেকে কে যেন একটানে পর্দা সরিয়ে দিল, ভয়ঙ্কর বিভীষিকা দেখে আমি বিবশ, হতচেতন হয়ে পড়লাম।

'এই কি আমার সেই দিবারাত্রির স্বপ্ন। স্থূলকায়া, আটপৌরে,

নিতান্ত সাধারণ রমণী। সত্যিই কি সে? আমার চোখের আড়ালে এই চারটে মেয়ের জন্ম দিয়েছে। চারিটি খুদে জীব আর তাদের মা অবাক বিস্ময়ে আমায় দেখতে লাগল। ওই চারজন তার থেকেই এসেছে; ভবিষ্যতে মায়ের মতোই হবে হয়ত।—কোথায় গেল তার মার্জিত সাজসজ্জা—সে ভুবন-ভোলান লাবণ্যপুঞ্জ। সে সব ঘটনা কালকের বলে মনে হচ্ছে, আর এখন তাকে এইরূপে দেখতে হোলো! এও কি সম্ভব? তীব্র বিদ্বেষে অন্তর জ্বলে গেল। প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর, ঘৃণ্য বিনাশ চক্রান্তের বিরুদ্ধে মন জেহাদ ঘোষণা করল।

'বিস্ময় বিহ্বল আমি তার দিকে তাকিয়েই থাকলাম। আলগোছে তার হাত দুখানি আমার মুঠোর ভেতর তুলে নিলাম। ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। তার হারিয়ে-যাওয়া যৌবন, তার মৃত্যুর জন্য আমার এই বেদনা। আমি এই প্রৌঢ়া মহিলাকে চিনি না, চিনতাম না।

'সেও বিমর্ষ, থেমে থেকে বললে—

'"আমি খুব বদলে গেছি, তাই নয় কি? এই সুদীর্ঘ সময় পার হয়ে এসে আর কিই বা আশা করা যায়? দেখছেন তো এখন আমি মা হয়েছি, শুধুই মা, আদর্শ মাতা। আর কিছুই নেই, সব নিঃশেষিত। হায় ভগবান! দেখা হলে আপনি আমায় চিনতে পারবেন না, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি! আর আপনারও তো অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অনেকক্ষণ আমি তো চিনতেই পারিনি। দেহে বয়সের ছাপ পড়েছে। ভাবুন তো— বারো বছর! বারো— বছর! আমার বড় মেয়েই তো দশে পড়ল।"

'মেয়েটির দিকে তাকালাম। মায়ের সৌন্দর্যের পূর্বাভাস তার আদলে। পূর্ণ বিকশিত নয়, কিন্তু পাপড়ি মেলার আর বেশি দেরি নেই। আকর্ষণ করে না, কিন্তু চোখ জুড়িয়ে যায়। জীবন যেন এক দ্রুতগামী রেলগাড়ি।

'মায়জোঁ-লাফিত এসে গেল। আমার পুরানো সখীর হস্ত

চুম্বন করে নেমে গেলাম। মামুলি দুচারটে ছাড়া আর কোন কথাই মুখে যোগাল না।

'সেদিন সন্ধ্যায় নিজের ঘরে একাকী আয়নার মুখোমুখি দাঁড়ালাম। অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে খুঁটিয়ে দেখালাম। কোথায় গেল সেই ঘন কৃষ্ণ কেশ, বাদামী গুম্ফ! কোথায় গেল সেই তরুণ যুবকের মুখচ্ছবি! এখন আমি বৃদ্ধ। হা ঈশ্বর।'

## নিষিদ্ধ ফল

বিয়ের আগে ওদের ভালবাসা ছিল নক্ষত্রালোকের মতো পবিত্র। সাগর বেলায় প্রথম সাক্ষাৎ। রঙ্গিন ছাতা আর পরিচ্ছন্ন পোশাকে কিশোরী তাকে পাশ কাটিয়ে যেত। যেন সত্ত ফোটা গোলাপ। সমুদ্রের পটে মেয়েটি তাকে মুগ্ধ করলো। উন্মুক্ত অম্বরতলে উর্মিমুখর নীল সমুদ্রের ধারে সেই সোনালী কেশ, সোনার বরণ লবঙ্গলতাকে ভাল লাগলো। আরামদায়ক লবণ হাওয়া আর রোদে-ঘেরা সমুদ্রতীরে ঢেউএর দোল তার হৃদয়ে দোলা দিল। মেয়েটি তার মনে এক অজানা তীব্র বাসনা জাগালো। এক অনিবার্য অশান্ত অনুভূতি। তার শিরা উপশিরা, হৃদয় মন ভালবাসার জন্য ব্যাকুল হোলো।

মেয়েটিও ভালবাসলো। কেননা ছেলেটি তাকে মনোযোগ দিয়ে দেখতো। তাছাড়া ছেলেটির বয়স অল্প, বেশ ধনী, সম্ভ্রান্ত আর রুচিবান। আর যে সব তরুণ তরুণী মেয়েদের সঙ্গে মিষ্টি করে আলাপ করতে পারে, মেয়েরা তাদের ভাল না বেসে পারে না।

পর পর তিনটি মাস কেটে গেল চোখে চোখ রেখে, হাতে হাত ধরে, পাশাপাশি বেড়িয়ে। প্রত্যহ প্রথম অভিবাদন বিনিময় স্নানের আগে, নতুন দিনের সতেজ প্রভাতে। আর বিদায় সম্ভাষণ প্রশান্ত রাত্রির উষ্ণতায়। ওপরে থাকতো আকাশ-ভরা তারা, পায়ের তলায় বালুকা বেলা। ওদের অধর কখনও মিলিত হয়নি। তবু অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরের মৃদু থেকে মৃদুতর গুঞ্জরণ যেন চুম্বনের স্বাদ এনে দিত।

মুখ ফুটে না বললেও সমস্ত তনুমন দিয়ে ওরা দুজনে দুজনকে চেয়েছিল। নিদ্রায় একে অন্যকে স্বপ্ন দেখতো, আর জাগরণে পরস্পরকে ভাবতো।

বিয়ের পর এই ভালবাসা সীমার শাসন মানলো না। উদ্দাম

ইন্দ্রিয়াসক্তি চরিতার্থ হোলো। তারপর সেই ভোগবাসনাই ধীরে ধীরে প্রেমানুভূতির কাব্যরূপ নিল। বিভিন্ন পন্থায় প্রেম আস্বাদ করতে চাইল ওরা। স্থূল দেহবিলাস। সূক্ষ্ম রসবোধ। সবই ছিল। এজন্য নিত্যনূতন উপায় উদ্ভাবনে ছিল ওদের অপার আনন্দ। দিনের সারাক্ষণই তাদের চাহনি সংযত থাকতো এমন বলা যায় না। অঙ্গভঙ্গিতে কখনও রাতের নিবিড় ঘনিষ্ঠতার স্মৃতি জাগতো।

কিন্তু ক্রমশ নিজের অজান্তেই ওরা ক্লান্তি বোধ করতে শুরু করেছিল। অবশ্য মুখে এ বিষয়ে কেউ কিছু বললো না। ওদের ভালবাসা ছলনা নয়, সত্যি। কিন্তু তাতে নতুনত্ব কিছু নেই। কিছু অপ্রকাশ নেই। সব ফুরিয়ে গেছে। সব কথাই যেন পুরানো। পবস্পরের কাছ থেকে নতুন কিছু পেতে আর বাকী নেই। এমন কি একটি প্রেমের কথাও আর নতুন লাগে না। ইঙ্গিত ইশারায় রহস্য জাগে না। যে সুর না বলেই অনেক কিছু বলে যায়, সে সুরও লুপ্ত।

প্রথম প্রেমেব দীপশিখা নিভে এলো। কিন্তু তাকে উস্কে তোলার প্রচেষ্টা অন্তহীন। নিত্যনূতন কারুকলার উদ্ভাবন চললো। শুরু হোলো সহজ, জটিল নানারকমেব ছলচাতুবী। কিন্তু বৃথাই। প্রথম দিনগুলোর অশান্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা এখন আর মনে সাড়া দেয় না। বিয়ের মাসের সেই উত্তাপ শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ে না।

মদনবাণে জর্জরিত হয়ে কখনও কখনও ওরা উত্তেজনায় ঘণ্টাখানেক কৃত্রিম সুখে মগ্ন হোতো। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা দিত অবসাদ আর বিতৃষ্ণা।

বৈচিত্র্য খুঁজতে তারা বিভিন্ন পরিবেশে ঘুরে বেড়ালো। মধু-যামিনীতে পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি। কুয়াশাস্নাত পাহাড়শ্রেণীর কাব্যময় সৌন্দর্য। আবার কখনও বা সর্বজনীন উৎসবের হৈ হট্টগোল।

এমনি সময় এক সকালে আঁরিয়েত বললো পলকে, 'কোন হোটেলে একদিন আমায় খাওয়াবে?'

'কেন ? তা বেশ তো, যাওয়া যাবে একদিন।'

'খুব নামজাদা হোটেলে যাবে তো ?'

'নিশ্চয়।'

পল বুঝলো তার স্ত্রী কিছু একটা গোপন করতে চাইছে। তাই সে তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো। আঁরিয়েত বলে চললো, 'তুমি তো জান, একটা হোটেল—কি করে যে ছাই বোঝাই ? —ধর একটা হোটেল, মানে যেখানে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করা যায়।'

পল হাসলো : 'হুঁ, বুঝলাম। কোন বড় কাফের আলাদা একটা ঘরের কথা বলছো তো ?'

'ঠিক তাই। কিন্তু সেই অভিজাত কাফে তোমার আগের পরিচিত হওয়া চাই। মানে যেখানে তুমি এর আগেও দুপুরে—না, না,—রাত্রে খেয়েছে— অর্থাৎ— আমি বলি কি—না থাক, বলতে সাহস হচ্ছে না।'

'বলেই ফেল তো লক্ষ্মীটি। আমার কাছে লজ্জা কেন ? তা ছাড়া ছোটখাট ব্যাপারগুলো আমরা তো অন্যদের মতো নিজেদের মধ্যে লুকোই না।'

'তা নয়, আসলে আমার সাহসে কুলোচ্ছে না।'

'ওঃ! এদিকে এসো তো! অবুঝ হয়ো না। এবার বলতো দেখি।'

'আচ্ছা বলছি। দেখ—ভাবছি—আমি তোমার প্রেমিকা সেজে ওখানে যাব। বেয়ারাগুলো তো জানে না যে, তুমি বিয়ে করেছ, আমাকে তোমার প্রণয়িনী বলেই ভাববে। আর তুমিও সেই এক ঘণ্টার জন্য আমায় তোমার অনুরক্ত বলেই মনে কোরো। ঠিক সেই জায়গায় যেতে চাই, যেখানে তোমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে—বাস্। আমিও মনে করবো তোমার পরিণীতা নই প্রেমিকা। মন চায় খুব একটা অন্যায় করতে। ওখানে—তোমার সঙ্গে—তোমাকে প্রতারণা করবো। খুব খারাপ হবে, তবু তাই করবো। আমাকে

আর লজ্জা দিও না। একেই রাঙা হয়ে উঠছি—ভেবে দেখ—যে নিরালা ঘরে প্রতিদিন—হ্যাঁ প্রতিদিন সন্ধ্যায় কত শত কপোত-কপোতী নিজেদের বিলিয়ে দেয়—সেখানে তোমার সঙ্গে ডিনার খেতে যাওয়া খুব অশোভন—এটা খুবই অসভ্যতা। পিয়নির* মতো লাল হয়ে উঠছি! না, না, আমার দিকে তাকিয়ো না।"

ভারি মজা পেয়ে পল হেসে উঠলো। বললো: "ঠিক আছে। আমার চেনা একটা বাহারে জায়গায় আজ সন্ধ্যায় যাব।"

তরুবীথির এক ধারে অভিজাত একটি রেস্তোরাঁ। সন্ধ্যা সাতটা। ওরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে। পলের মুখে বিজয়ীর হাসি। আঁরিয়েত একটু সঙ্কুচিত। মুখে লাজুক আনন্দের মিষ্টি আভা। ওরা একটা ছোট ঘরে এলো। ঘরে চারটে ইজিচেয়ার, আর একটা বড় সোফা, আগাগোড়া লাল ভেলভেটে মোড়া। বাড়তি কিছু নেই। তাদের ঢুকতে দেখেই কালো উর্দিপরা স্টুয়ার্ড এসে মেনু এগিয়ে দিল। পল স্ত্রীর দিকে এগিয়ে ধরে বললো:

"বল কি খাবে।"

"আমি জানি না। এখানে ভালো কি পাওয়া যায়?"

ওভার কোটটা খুলতে খুলতে পল তালিকার নামগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর কোটটা বেয়ারার হাতে দিয়ে বললো: "এই খাবারগুলো আনো—বিস্ক সূপ, ডেভিল চিকেন, সাইডস অব হেয়ার, ডাক-আমেরিকান স্টাইল, ভেজিটেবল স্যালাড, আর ফল মিষ্টি। আমরা শ্যাম্পেন খাব।"

স্টুয়ার্ড তরুণীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। মেনুটা তুলে নিতে নিতে আস্তে করে বললো: "মসিয়ো পল, মৃদু না কড়া শ্যাম্পেন আনবো?"

"খুব কড়া"।

এই লোকটা স্বামীর নাম জানে দেখে আঁরিয়েতের খুব ভাল লাগলো। সোফায় পাশাপাশি বসে তারা খেতে শুরু করলো।

* এক রকম ফুল গাছ, ঝাড়ে গোলাকৃতি লাল লাল ফুল ধরে।

দশটা মোমবাতির আলোয় ঘর উজ্জ্বল। সামনে একটা প্রকাণ্ড দর্পণে খচিত একটি মুক্তোর ওপর আলোর প্রতিফলনে মনে হচ্ছে যেন সহস্র মুক্তায় রচিত কোন মাকড়সার জাল।

এক পাত্র নিঃশেষ করতেই আঁারিয়েতের গা গুলিয়ে উঠল। তা সত্ত্বেও উত্তপ্ত হবার বাসনায় সে একের পর এক গিলে চললো। ফেলে-আসা কোন সুখ স্মৃতিতে পলের মন মোহগ্রস্ত। সে ঘন ঘন স্ত্রীর হাতে চুম্বন করলো। আঁারিয়েতের চোখে আগুন। এ রহস্যময় পরিবেশে সে অভিভূত। কিছুটা অশুচি মনোভাব। তবু তার মধ্যেই আছে দুর্বার উত্তেজনার সুখ।

গোমড়ামুখো দুজন বেয়ারা তাদের তদারক করছিল। তাদের চোখ খোলা, কিন্তু এসব কিছুই তাদের চোখে পড়ে না। ওরা প্রয়োজনের সময় নিঃশব্দে প্রবেশ করে, বাড়াবাড়ি দেখলে আলগোছে তাড়াতাড়ি সরে পড়ে।

খাওয়ার মাঝপথেই আঁারিয়েত মাতাল, সম্পূর্ণ বেসামাল। আর খুশীতে মাতোয়ারা পল সবটুকু শক্তি দিয়ে তার জানু চেপে ধরেছে। আঁারিয়েতের গালে রক্তের উচ্ছ্বাস। ঢুলু ঢুলু নয়ন কামনায় জ্বলছে। লাজলজ্জা তাকে ছেড়ে উধাও। অনবরত সে আবোল তাবোল বকে চলেছে: "ওঃ। পল, এবার বল, বলবে না? আমি যে সব কিছু জানতে চাই।"

"ওগো প্রিয়া, কি জানতে চাও বলো।"

"বলতে ভয় করছে যে।"

"কিন্তু সব সময় অবশ্যই তোমাকে—"

"আমার আগে তোমার কি প্রেমিকা—মানে, অনেক প্রেমিকা ছিল?"

পল একটু মুশকিলে পড়ল। কিছুটা দ্বিধা। বুঝে উঠতে পারলো না তার সৌভাগ্য সগর্বে ঘোষণা করবে, না চেপে যাবে।

আঁারিয়েত তখন বকে চলেছে: "আঃ! মিনতি করছি, বল, অনেকেই ছিল কি?"

"কেন ? ছিল কয়েকজন।"

"ক'জন ?"

"জানি না যাও। এসব কি মনে রাখার ব্যাপার ?"

"গুনে বলতে পার না ?"

"না, পারি না।"

"ওফ্! তাহলে তো অগুনতি ছিল।"

"হ্যাঁ, তাই।"

"আচ্ছা, ক'জন বলে তোমার আন্দাজ ? ঠিক মনে করে বলবে কিন্তু—"

"মাণিক আমার, সত্যি মনে নেই। কোনো বছর অনেকেই এসেছে, আবার কখনও খুব কম।"

"বছরে ক'জন বলে তোমার অনুমান ?"

"কখনও কুড়ি থেকে তিরিশ, আবার কখন কখন চার পাঁচজন।"

"উঃ! তার মানে মোট একশ জনেরও বেশি মেয়ে।"

"হ্যাঁ, প্রায় তাই হবে।"

"উফ্! বিরক্তিকর!"

"বিরক্তিকর কেন ?"

"কেন নয় ? ওই সব মেয়েদের কথা ভাবলে—একেবারে বেহায়া—আর সকলের সঙ্গে ওই একই জিনিস—উঃ! ঘেন্নার ব্যাপার—একশ'র ওপরে!"

এ ব্যাপারটাকে ঘৃণার চোখে দেখছে বলে পল দুঃখ পেল। পুরুষ সব সময়ই নিজেদের বিজ্ঞ ভাবে। তাই যখন মনে করে মেয়েরা বোকার মতো কথা বলছে, তখন স্বভাবসিদ্ধ প্রভুত্বের ভঙ্গীতে তাদের ভুল ধরিয়ে দিতে উদ্যত হয়। পলেরও সেই ভঙ্গী। বললো: "ভারি অদ্ভুত তো! একশ'জন মেয়ে যদি কারও বিরক্তির কারণ হয়, তবে একজনও তাই।"

"না, না, মোটেই নয়।"

"কেন নয় শুনি ?"

"কারণ একজন মেয়ের সঙ্গেই প্রকৃত একাত্মতা সম্ভব। সেইতো সত্যিকার প্রেম। তাতেই ছুটি হৃদয় বাঁধা পড়ে। একশ জনের সঙ্গে যা সেতো নোংরামি, তার নাম ব্যাভিচার। বুঝে পাই না, ওই সব নোংরা মেয়েদের সঙ্গে লোক কি করে মাখামাখি করে—"

"না, তারা খুবই পরিচ্ছন্ন।"

"মোটেই না। ওই ব্যাবসা চালিয়ে কেউ পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে না।"

"ঠিক তার উল্টো। ওই কারবারের জন্যই তাদের পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন।"

"হায় ধিক! তারা যে রাতের পর রাত অন্যের সঙ্গে কাটিয়েছে, তা কি কেউ ভেবে দেখে না? এটা খুবই অরুচিকর!"

"এই গ্লাশে করে মদ খেতে ঘেন্না হচ্ছে না? কে জানে সকাল থেকে কত লোকের মুখে এটা এঁটো হয়েছে। আর এটা যে একেবারে বিশুদ্ধ করে ধোয়া হয়নি, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

"আঃ! চুপ করো! বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।"

"তবে আমার প্রণয়িনী ছিল কিনা [illegible]"

"এবার বলতো, তোমার সব [illegible] কি একজাতের মেয়ে?"

"তা কেন, তা নয়।"

"তাহলে?"

"কেউ অভিনেত্রী—কেউ বা [illegible]—আবার কেউ বা গেরস্থ ঘরের মেয়ে।"

"ঘরের মেয়ে ক'জন ছিল?"

"দু'জন।"

"মাত্র দুটি?"

"হ্যাঁ।"

"তারা কি সুন্দরী ছিল?"

"নিশ্চয়।"

"বাজারের মেয়েদের চেয়েও ?"

"না।"

"তুমি কাদের পছন্দ করতে, ওই সব ব্যাবসায়ী মেয়ে, না সাধারণ মেয়ে ?'

"জনপদের মেয়েদেরই।"

হায় ভগবান। কি জঘন্য। কেন ?"

"কেননা, সখের ছলাকলায় আমার অরুচি।"

"উঃ কি সাংঘাতিক। জান সুরুচির বালাই তোমার নেই ?— আচ্ছা বল তো, একজন ছেড়ে আরেক জন, তারপর আরেক জন— এতে তোমার আমোদ লাগতো ?"

"বোধহয় তাই।"

"খু-উ-ব ?"

"খুব।"

"কি ভাল লাগতো ? তারা কি সবাই এক রকম নয় ?"

"না, তা কেন হবে ?

"আঃ। সব মেয়েই কি এক রকম নয় ?"

"মোটেই না।"

"কোনো কিছুতেই নয় ?

"কিছুতেই নয়।"

"অদ্ভুত। কিসে তাদের পার্থক্য ?"

"সব বিষয়েই।"

"দেহে ?"

"হ্যাঁ, দেহে।"

"সর্বাঙ্গে ?"

"হ্যাঁ সর্ব অঙ্গে।"

"আর কিসে ?"

"কেন, তাদের কথা বলার ঢংয়ে, তাদের আলিঙ্গনে, এমন কি খুঁটিনাটি সব বিষয়ে ?"

"আর—আর ব্যবধান খুবই উপভোগ্য, তাই না ?"

"তাই।"

"আচ্ছা, পুরুষে পুরুষে তফাত হয় ?"

"আমি তা কি করে জানবো ?"

"ও, তুমি জান না ?"

"না।"

"নিশ্চয়, তাদের মধ্যেও পার্থক্য আছে।"

"হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে।"

আঁরিয়েতের মুখ থমথমে। হাতে ধরা শ্যাম্পেন ঠোঁটে উঠলো না। তারপর হঠাৎ এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করে ঠকাস করে টেবিলে রেখে দিল। মুক্ত দুই বাহুতে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে অস্ফুট স্বরে আবৃত্তি করে চললো : "প্রিয় আমার! তোমায় কত ভালবাসি।"

পল তাকে আবেগভরে বেষ্টন করলো। একজন বেয়ারা ঘরে ঢুকতে গিয়ে পেছন ফিরে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় দরজা বন্ধ করে গেল। প্রায় পাঁচ মিনিট তার কাজ বন্ধ রইল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন সংযত, গম্ভীর স্টুয়ার্ড ফল আর মিষ্টি নিয়ে এলো, দেখলো, মহিলার হাতে আর'এক পূর্ণ পাত্র। পাত্রের পীতবর্ণ স্বচ্ছ তরল পানীয়ের তলদেশে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। যেন তার মধ্যে কোন কল্পনার স্বর্গলোক সন্ধান করছে। তার কণ্ঠনিঃসৃত চিন্তামগ্ন স্বগতোক্তি শোনা গেল :

"হ্যাঁ! ঠিক! ওটা নিশ্চয় খুব মজার, খু-উ-ব!"

# বিপরীত স্রোত

নিস্তরঙ্গ উজ্জ্বল সমুদ্র। মৃদুমন্দ পবনে স্বল্প আন্দোলিত। সমগ্র হাভয় শহর জাহাজ ঘাটে ভেঙ্গে পড়েছে। সকলের দৃষ্টি কূলাগত জাহাজগুলোর দিকে নিবদ্ধ।

দূর থেকে অনেকগুলো জাহাজ দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে কিছু স্টীমার। তাদের মুখ থেকে রাশি রাশি ধূমোদ্গীরণ হচ্ছে। বাকী সব গাধাবোট। অদৃশ্য রশির টানে ভাসমান। তাদের নগ্ন মাস্তুল নিষ্পত্র বৃক্ষের মতো আকাশে উদ্ধত।

দিক্‌দিগন্ত ছেড়ে জেটির মধ্যে প্রবেশের জন্য ওরা ব্যগ্র। জেটি যেন তার সংকীর্ণ মুখবিবরে পুরে এই যন্ত্রদানবগুলোকে অবহেলাভরে উদরসাৎ করেছে। আর ওরা আর্তনাদে, তীক্ষ্ণ চীৎকারে দিক্‌বিদিক কাঁপিয়ে তুলছে। হুসহাস্‌ করছে, আর মাঝে মাঝে ঝলকে ঝলকে বাষ্পের থুথু ছিটিয়ে দিচ্ছে। ঠিক যেন রুদ্ধশ্বাস অসহায় পশুর নিঃশ্বাস নেবার আকুল আকাঙ্ক্ষা।

অবতরণ পথে বহুলোকের ভিড়। অল্প বয়সের দুজন অফিসার ভিড়ের মধ্যে নমস্কার বিনিময় করে এগিয়ে চলেছে। কথাবার্তা বলবার জন্য মাঝে মাঝে থামছে।

দুজনের মধ্যে যে লম্বা তার নাম পল দ্য আঁরিকল। হঠাৎ পল তার বন্ধু জাঁ রেনলদির হাতে চাপ দিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললে : "বন্ধু, মাদাম পয়কতের দিকে একটু চোখ ফেরাও। সত্যি বলছি, উনি ঘন ঘন তোমায় দেখছেন।"

মহিলা তার স্বামীর হাত ধরে চলেছে। বয়স প্রায় চল্লিশ। কিন্তু এখনও খুবই সুন্দরী। একটু যেন কোমলতা ক্ষয়ে গেছে। তবু দেহের পূর্ণতায় এখনও বিশ বছরের তন্বীর জলুস। ভ্রমরকৃষ্ণ আয়ত চক্ষু। গর্বিত চালচলন। আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্বের জন্য বন্ধু

মহলে সে দেবী বলে পরিচিত। তার কোনো নিন্দুক ছিল না। তার জীবনের পবিত্রতা নিয়ে কখনও কোনো সন্দেহের ছায়া দেখা দেয়নি। সৎ আর ধার্মিক মহিলা নামে তার খ্যাতি রটেছিল। কাজেই অন্য রকম ভাববার দুঃসাহস কারও ছিল না।

তবু একমাস ধরে পল দ্য আঁরিকল তার বন্ধু রেনলদিকে আশ্বাস দিচ্ছে, মাদাম পয়কত যে তার প্রেমে পড়েছে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

"জেনে রাখ, আমার ভুল হয় না। স্পষ্ট দেখছি সে তোমায় ভালোবাসে। হ্যাঁ, তোমার প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে। ঠিক যেন একজন অনভিজ্ঞা নতুন প্রেমিকা। এই চল্লিশ বছর বয়সটা এই সতী সাধ্বীদের পক্ষে মারাত্মক। এই বয়সে তাদের আসক্তি বাড়ে, কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়, তারা নানা রকম অপরাধ করে বসে। পঞ্চশর ওকে বিদ্ধ করেছে। শরাহত বিহঙ্গের মতোই ও নিম্নগামী। তোমার যুগল বাহুর আশ্রয় প্রত্যাশী। বন্ধু, আমি বলছি একবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখ।"

বারো আর পনেরো বছরের কন্যা দুটি আগে আগে চলেছে। পেছনে দীর্ঘাঙ্গী মহিলা! অফিসারের দিকে চোখ পড়তেই সে একেবারে ফ্যাকাশে। তবু চোখ নামিয়ে নিল না। অপলকে চেয়ে রইল। তার চোখের সামনে থেকে স্বামী, সন্তান এমন কি পাশের লোকজন মুছে গেল। যুবক দুটির নমস্কারের প্রত্যুত্তর দিতে গিয়েও তার দৃষ্টি ফিরলো না। আঁখিতারায় বাসনার এই বহ্ন্যুৎসব দেখে লেফ্‌তেনান্ত রেনলদির মনেও সন্দেহের বাষ্প ঘনিয়ে এল। তার বন্ধু তেমনি ফিস্‌ফিসিয়ে বললো: "আমার স্থির বিশ্বাস ছিল। এবার তুমি লক্ষ্য করনি? হা ঈশ্বর, চমৎকার মেয়ে!"

* * *

গোপন প্রণয়ে জাঁ রেনলদির চিরকাল অরুচি। প্রেম নিয়ে মাথা ঘামানো তার ধাতে ছিল না। তবে মাঝে মাঝে একটু আধটু আমোদ প্রমোদ কোন্ যুবকের জীবনেই না আসে? মোটের ওপর

শান্ত নিরুদ্‌বেগ জীবনই জাঁর কাম্য। সুশিক্ষিত রমণীর আবেগ-উচ্ছ্বাস কমনীয়তা, ছলাকলা এসবে তার বিরক্তি ধরতো। দুঃসাহসিক প্রেমে তার বড় ভয়। এ ধরনের প্রেমে শেষ পর্যন্ত ফাঁদে পড়ে যেতে হয়। বড় না হোক, ছোটখাট বন্ধন অন্তত আসবেই। সে বলে : "এক মাস না যেতেই বাঁধন অনেক এসে পড়বে। তারপর বাধ্য হয়ে নিতান্ত বিনয়ে ধৈর্য ধরে আরও মাস ছয়েক অপেক্ষা করতে হবে।"

অর্পিতা নারীর ঘনসান্নিধ্য, মোহাবিষ্টতা তার ইন্দ্রিয়ের ছিদ্রপথে প্রবেশ করে তাকে তখন উত্তেজিত করে চলেছে। মাদাম পয়কতকে সে এড়িয়ে চলতে লাগলো। কিন্তু এক সন্ধ্যায় ডিনার সভায় জঁা তাকে দেখলো তারই পাশের আসনে। সেই সুশ্রী পার্শ্ববর্তিনী তখন দৃষ্টি দিয়ে তার সর্বাঙ্গ, চোখ এমন কি অন্তর পর্যন্ত লেহন করছিল। হাতে হাত এলো। আর যেন দুটি করতল আপনা-আপনি উষ্ণ আবেগে নিষ্পেষিত হয়ে চললো। তখন থেকেই গোপন প্রণয়ের শুরু।

ইচ্ছে না থাকলেও তার সঙ্গে মহিলার দেখা হয়ে যেত। সে বুঝলো ও তাকে ভালবাসে। এই রমণীর অন্তরের উদ্‌বেলিত বাসনা সে অনুভব করতে লাগলো। তাই একটু করুণা করার লোভ সংবরণ করতে পারলো না। সে তাকে ভালবাসতে দিল। আর সমস্ত ব্যাপারটাই ভাবাবেগ মনে করে নিজেও একটু অনুরাগ দেখাতে শুরু করলো।

কিন্তু ভাল করে দুজনের দেখাশোনা, স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলবার জন্য একদিন সেই মহিলা সময় ঠিক করলো। দেখা হতেই সে জাঁর বাহুতে আবেশে এলিয়ে পড়লো : তখন তার প্রেমাস্পদ হওয়া ছাড়া রেনলদির আর কোন উপায় ছিল না।

এমনি করে ছ'মাস কেটে গেল। জঁা রেনলদি পেল অগাধ অবাধ ভালবাসা। উন্মাদ কামনায় মগ্ন নারী। আর কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। এই কামনায় সে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিল। পবিত্র চিতাগ্নিতে লোক যেমন করে সমস্ত মূল্যবান বস্তু আহুতি দেয়, তেমনি করে সে তার মনের আগুনে তনু-মন, যশ-

মান, সুখ-শান্তি,—তার সব কিছু সমর্পণ করলো। 'মাঝে মাঝে রেনলদির ক্লান্তি বোধ হোতো! এমন চমৎকার একজন অফিসার হয়ে এত সহজে ধরা পড়লো ভেবে গভীর অনুতাপে মন বিষিয়ে উঠতো। কিন্তু সে নিরুপায়, সে বন্দী। প্রতি মুহূর্তে মহিলা তাকে মনে করিয়ে দিত।

"তোমাকে আমি সব দিয়েছি! বল, আর কি চাও?"

"কিন্তু তোমার কাছে তো কিছুই চাইনি। বরং প্রার্থনা করি যা দিয়েছ সব ফিরিয়ে নাও।"

প্রতি সন্ধ্যায় সে বেপরোয়া হয়ে তার কাছে আসতো। কেউ দেখে ফেললে যে বিপদ হবে, কেলেঙ্কারি হতে পারে, এ সব চিন্তা তার ছিল না। সাক্ষাতে তার কামনার আগুন আগের চেয়ে বেশি করে জ্বলে উঠতো। সে তার বাহুতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচণ্ড আবেগে তাকে সজোরে জড়িয়ে ধরতো। তারপর অজস্র চুম্বনের ধারায় তলিয়ে গিয়ে চৈতন্য হারাতো। কিন্তু জাঁ এতে ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠতো।

অবসাদ ভরে সে বলতো: "দেখ এত অবুঝ হোয়ো না।"

তার জবাব: "আমি তোমায় ভালবাসি।" তারপর হাঁটুগেড়ে বসে মুগ্ধ বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো। ওই তন্ময় দৃষ্টিতে বিরক্ত হয়ে রেনলদি ওকে ওঠাতে,চেষ্টা করতো। বলতো: "উঠে বস। এসো কথা বলি।"

সে জবাব দিত ফিস্ ফিস্ করে:

"না, আমায় ছেড়ে দাও।" তারপর যেমন ছিল তেমনি বসে থাকতো। তার আত্মা যেন সমাধিস্থ।

রেনলদি তার বন্ধু দ্য আঁরিকলকে বললে:

"দেখ ওকে না মারলে এর শেষ হবে না। আমার ঘেন্না ধরে গেছে। আর একটুও দেরি না করে এর শেষ করতে চাই। বন্ধু, তুমি আমায় কি করতে বল?"

বন্ধু, উত্তর দিল: "চুকিয়ে ফেল।"

মাথা ঝাঁকিয়ে রেনলদি বললে:

"তুমি তো নির্লিপ্ত হয়ে কথাটা বললে। ভাবছ ব্যাপারটা খুবই সহজ। যে মেয়ে যত্ন দিয়ে অত্যাচার করে, মমতা দিয়ে বিরক্তি ঘটায়, ভালবাসা দিয়ে উত্যক্ত করে, তোমাকে খুশী করাই যার একমাত্র ভাবনা, যার একটি মাত্র দোষ তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেকে তোমার কাছে উজাড় করে দেওয়া—তাকে তুমি এড়িয়ে চলবে কি করে?"

এমন সময় হঠাৎ এক সকালে খবর এলো এই ঘাঁটি থেকে সেনাবাহিনী বদলী হয়েছে। রেনলদি আনন্দে নেচে উঠলো। সে বেঁচে গেছে। মান-অভিমান, কান্নাকাটি এ সব কিছুই সহ্য করতে হোলো না, রক্ষা পেয়েছে। এখন শুধু ধৈর্য ধরে তু'মাস অপেক্ষা করা? তারপর শান্তি।

কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যায় সে এলো। তার উত্তেজনা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তুঃসংবাদটা সে পেয়েছে। মাথা থেকে টুপি না খুলেই সে বিচলিত ভাবে হাত তুটি চেপে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। তার অটল কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হোলো:

"আমি জানি, তুমি চলে যাচ্ছ। প্রথমে খুব আঘাত পেয়েছিলাম। পরে পথ বেছে নিলাম। আমার আর কোন দ্বিধা নেই। প্রেমের জন্য একটি মেয়ে যতদূর যেতে পারে আমি যাব। নারীর ভালবাসার চরম প্রমাণ দেব। আমি তোমার সঙ্গে যাব। তোমার জন্য আমি আমার স্বামী, সন্তান, পরিবার—সব ছেড়ে যাচ্ছি। নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছি। তবু আমি সুখী। মনে হচ্ছে আবার যেন নতুন করে তোমাকে আমি আমার সব কিছু দেব। এটাই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দান। চিরকাল আমি তোমার।"

রেনলদির মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে যেন একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। অবসাদ, ক্রোধ আর প্রচণ্ড জেদ তাকে পেয়ে বসলো। তবু সে ধৈর্য হারালো না। একটু দয়ার ভাব মুখে টেনে নিরাসক্ত গলায় তার দান নিতে অস্বীকার করলো, তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা

করলো। যুক্তি দিয়ে ওর নিজের ভুল বোঝাতে চেষ্টা করলো। মহিলা কিন্তু একটি কথাও বললো না। কেবল ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ছুটি ডাগর কালো চোখ মেলে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

রেনলদি গড় গড় করে এক নাগাড়ে কথা বলে যখন থামলো, সে শুধু বললো: "সত্যিই কি তুমি কাপুরুষ হতে পারবে? যারা মেয়েদের লোভ দেখিয়ে বিপথে আনে, তারপর নিছক খেয়ালে একদিন ছুঁড়ে ফেলে দেয়—তুমিও কি তাদেরই একজন?'

বিবর্ণ মুখে সে আরও যুক্তির অবতারণা করলো। বোঝালো তাদের সারা জীবনে এর অবশ্যম্ভাবী ফল হবে ভয়ংকর। সমস্ত জগত তাদের প্রতি বিমুখ হবে। তাদের জীবন বরবাদ হয়ে যাবে। কিন্তু খুব সহজ সুরে মহিলা জবাব দিল: "আমরা যখন ছুজনে ছুজনাকে ভালবাসি তখন ওতে কি এসে যায়?"

এ কথা শুনে রেনলদি রেগে উঠলো: "ঠিক আছে। আমি পারবো না। না, কিছুতেই না, বুঝেছ? আমি নিজে তো এ কাজ করবোই না, তোমাকেও না [illegible]।" তারপর দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ রেনলদির কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেল।

"উচ্ছন্নে যাও। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এতদিন তুমি আমার ওপর ভর করেছিলে। এখন [illegible] কো গলে পড়। তুমি যদি দয়া করে আমার কথা শোনো তো বাধিত হব।"

মহিলাটি কোন জবাব দিল না। কিন্তু তার মুখের কালশিরাগুলো এমন ভাবে সঙ্কুচিত হোলো যেন তার সমস্ত স্নায়ু, মাংসপেশী যন্ত্রণায় বিদ্ধ হচ্ছে। বিদায় না জানিয়েই সে চলে গেল।

সে রাতেই সে বিষ খেল।

এক সপ্তাহ অবধি তার জীবনের আশা ছিল না। ঘটনাটা তখন শহরের লোকের মুখে মুখে ফিরছে। কামনায় উত্তেজনায় একটা পাপ করে ফেলেছে বলে লোক তাকে করুণা করলো। সীমাহীন আবেগ গাঢ় গভীর হলে বীরত্বে উন্নীত হয়। সবাই তখন নিন্দনীয়

দিকটিকে ক্ষমা করে। সত্যি বলতে কি, যে মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে, সে আর যাই হোক— উচ্ছৃঙ্খল নয়। তাকে দেখতে অসম্মত হওয়ায় লেফ্‌তেনান্ত রেলনদির ওপর সবাই বিরূপ হোলো। সর্বত্র তার নিন্দা রটে গেল।

সবাই আলোচনা করতে লাগলো, অফিসার মহিলাকে রিক্ত করেছে, প্রতারণা করেছে, তার সঙ্গে অসদ্‌ব্যবহার করেছে। সহানুভূতিতে বিগলিত কর্নেল পর্যন্ত লেফ্‌তেনান্তকে বোঝাপড়া করে নিতে অনুরোধ করলেন। বন্ধু পল উপদেশ দিল: "ক্ষতি স্বীকার করেও ওকে গ্রহণ কর রেনলদি। একটা মেয়েকে এভাবে মরতে দেওয়া জঘন্য লজ্জার বিষয়। যাই বল না কেন, এটা ঠিক নয়।"

রেনলদি রেগে গিয়ে পলকে মুখ সামলাতে বললো। তারপর পল বন্ধুকে সম্বোধন করলো দুরাচার বলে। ফলে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। সকলকে খুশী করে জখম হয়ে রেনলদি কিছুদিন বিছানায় পড়ে রইল। সব শুনে মহিলার ভালবাসা আরও বেড়ে গেল। সে ভাবলো বোধহয় তার জন্যই সে যুদ্ধে নেমেছিল। কিন্তু অত্যধিক দুর্বলতার জন্য হাঁটাচলা করতে না পারায় তার সঙ্গে আর দেখা হোলো না। এর মধ্যে সৈন্যদল চলে গেল।

লিলেতে তিনমাস কেটে গেল। একদিন সকালে পয়কতের এক বোন এলো রেনলদির সঙ্গে দেখা করতে।

দীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণা আর মানসিক বিষাদে ভুগে মাদাম পয়কতের জীবনে এখন হতাশা ছাড়া আর কিছু নেই। চিরকালের মত চোখ বোজার আগে এক মুহূর্তের জন্য—মাত্র এক লহমার জন্য সে তাকে দেখতে চায়।

সুদীর্ঘ সময়ের অদর্শনে যুবকের বিরাগ সম্পূর্ণ শান্ত হয়েছিল। সে অভিভূত হোলো। তার চোখে আষাঢ় নামলো। তক্ষুনি সে হাভয়ের দিকে রওনা হোলো।

মৃত্যুর করাল ছায়া মহিলাকে ঘিরে ফেলেছে। রেনলদি একাকী তার কাছে এলো। মৃত্যুপথযাত্রী এই নারীর পাশে বসে সে

অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগলো। তার মনে হোলো, হাতে না মারলেও এই মৃত্যুর জন্য সেই দায়ী। জাঁ ফুঁপিয়ে কাঁদলো। পরম স্নেহে ওকে জড়িয়ে ধরে আবেগভরে চুমো খেল। এর আগে ঠিক এমনি করে আর কোনদিন ওকে সে ভালবাসেনি। ভাঙ্গা গলায় গুনগুন করে আবৃত্তি করলো : "না, না, তুমি মরবে না। তুমি সেরে উঠবে। আমরা চিরকাল ভালবাসবো—চিরকাল!"

মহিলা ক্ষীণকণ্ঠে বললো : "সত্যিই তুমি তাহলে আমায় ভালবাস?"

হতভাগিনীর দুঃখে গলে গিয়ে রেনলদি দিব্যি কেটে বসলো। প্রতিজ্ঞা করলো ওর সেরে ওঠা অবধি অপেক্ষা করবে। করুণার্দ্র প্রেমভরে অভাগিনীর শীর্ণ হাত দুটি বারে বারে চুম্বন করলো। রোগিনীর জ্বরোত্তপ্ত হৃদয়ের অস্বাভাবিক স্পন্দন তখন দ্রুত-লয়ে শুরু হয়েছে।

পরের দিন রেনলদি ব্যারাকে ফিরে এলো। দেড়মাস বাদে মহিলা তার সঙ্গে দেখা করতে এলো। বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে। চেনাই যায় না। কিন্তু আগের চেয়ে আরও বেশি প্রেমোন্মাদ।

মনের এই দুর্বল মুহূর্তে রেনলদি ওকে কাছে রাখতে রাজী হয়ে গেল। তারপর এমন ভাবে ওরা বাস করতে লাগলো যেন ওদের মিলন বৈধ। যে কর্নেল ওকে পরিত্যাগ করার জন্য রেনলদিকে তিরস্কার করেছিলেন, এখন তাদের এই অবৈধ মেলামেশায় তিনিই বেশি আপত্তি জানালেন। কেন না সেনাবাহিনীর কাছে অফিসারদের ভাল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। এই নমুনা তার বিপরীত। তিনি প্রথমে রেনলদিকে এই বিষয়ে হুঁশিয়ার করে দিলেন। তারপর তার আচরণের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি তুললেন। ফলে রেনলদি চাকরি ছাড়তে বাধ্য হোলো।

ভূমধ্যসাগর শাশ্বত প্রেম সমুদ্র। তার তীরবর্তী এক গ্রামে তারা নীড় বাঁধলো।

তিন বছর কেটে গেল। রেনলদি প্রেমের জোয়াল ঘাড় পেতে নিয়েছে। সে পরাজিত। ওই রমণীর একঘেয়ে আত্মদান তার সয়ে গেছে। চুলে তার পাক ধরেছে। নিজের দিকে তাকালে তার মনে হোতো আর কিছুই করার নেই। সব ফুরিয়ে গেছে। তার কোন আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, তৃপ্তি নেই। জীবনের সব আনন্দ সে হারিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু এক সকালে একখানা নামাঙ্কিত কার্ড তার হাতে এলো। তাতে লেখা—

'জোসেফ্ পয়কত,

জাহাজ মালিক, হাভয়।'

ওর স্বামী! সেই স্বামী—যে কিছুই বলেনি। বুঝতে পেরেছিল এই উদ্ধত নারীর একগুঁয়েমির সঙ্গে সংগ্রাম করা নিষ্ফল। এখন সে কি চায়?

ভদ্রলোক বাগানে অপেক্ষা করেছিলেন। ঘরে আসতে রাজী হননি। তিনি নমস্কার করলেন। কিন্তু আসতে চাইলেন না। এমন কি পাথর-বিছানো পথের পাশের বেঞ্চে অবধি বসলেন না। সহজ সুস্পষ্ট গলায় তিনি তাঁর বক্তব্য রাখলেন:

"মসিয়ো, আমি আপনাকে ভর্ৎসনা করতে আসিনি। কেন এমন হোলো আমি ভাল করেই জানি। শুধু আমিই নই, আমরা দুজনেই দুর্ভাগ্যের বলি হয়েছি। অবস্থার চাপে না পড়লে আমি আপনার এই নিরালা বাসস্থানে এসে কখনও বিরক্ত করতাম না। মসিয়ো, আমার দুটি মেয়ে আছে। তাদের বড়টি এক যুবককে ভালবাসে। ছেলেটিও তাকে ভালবাসে। কিন্তু মেয়ের মার কথা শুনে ছেলেটির পরিবার বেঁকে বসেছে। আমার রাগ বা বিদ্বেষ কিছুই নেই। কিন্তু মসিয়ো, আমি আমার সন্তানদের ভালবাসি। আমি তাই আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি। আশাকরি আজ আমার বাড়ি—ওর নিজের ঘরে ফিরে যেতে ও রাজী হবে। আর আমি, আমি—আমার মেয়েদের জন্য সব কিছু ভুলে যাবার ভান করবো।"

রেনলদির হৃদয় তোলপাড়। আনন্দের বন্যায় সে যেন ভেসে যাবে। অপরাধী ক্ষমা লাভ করলে যেমন আনন্দ পায় তেমনি আনন্দে তার হৃদয় নেচে উঠলো। সে তোতলাতে শুরু করলো: "কেন, হ্যাঁ—হ্যাঁ, অবশ্য অবশ্য; মসিয়ো আমি নিজেই—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন— কোন সন্দেহ নেই—ঠিকই তো, এটা অত্যন্ত সঙ্গত কথা।"

এবার মসিয়ো পয়কত বসতে আপত্তি করলেন না। রেলনদি দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে এলো। মনের ভাব ঠিকমত গুছিয়ে নেবার জন্য প্রেমিকার ঘরের দরজায় একটু থামলো। তারপর গম্ভীর মুখে ভেতরে ঢুকলো। সে বললো:

"তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য একজন নিচে অপেক্ষা করছে। তোমার মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলতে চায়।"

সে উঠে দাঁড়ালো। 'আমার মেয়ে? তাদের কি হয়েছে? তারা বেঁচে আছে তো?"

রেনলদি: "আছে; কিন্তু একটা গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। একমাত্র তুমিই তার সমাধান করতে পার।"

আর কিছু শোনার অপেক্ষা না করে সে ছুটে নেমে গেল।

অভিভূত রেনলদি একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

বহুক্ষণ সে অপেক্ষা করলো। তারপর নিচে থেকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে নিচে নেবে যাবে যাবে বলে ভাবলো।

নিচে এসে দেখলো উত্তেজিত মাদাম পয়কত গমনোদ্যত। আর স্বামীটি তার জামার প্রান্ত ধরে আক্ষেপ করে বলছে:

"কিন্তু ভেবে দেখ আমাদের মেয়ে দুটোর সর্বনাশ করছো। তোমার নিজের মেয়ে, আমাদের সন্তান।"

স্ত্রীর উদ্ধত জবাব এলো: "আমি তোমার কাছে আর ফিরে যাব না।"

রেনলদি সব শুনলো। বুঝলো। উদ্‌বিগ্ন হয়ে কাছে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো: "কি, ও কি যেতে আপত্তি করছে?"

প্রকৃত স্বামীকে যেন চেনেই না, এমনি ভাব দেখিয়ে রেনলদির দিকে লজ্জাবতীর মতো তাকিয়ে বললে :

"জান ও আমাকে কি করতে বলছে? আমায় ফিরে যেতে বলছে, একই ঘরে ওর সঙ্গে আমায় বাস করতে বলছে!"

ভদ্রলোক প্রায় হাঁটু গেড়ে বসে উপরোধ করছেন, আর মহিলা চরম অবজ্ঞায় মুখ টিপে হাসছে।

রেনলদির আর সহ্য হোলো না। মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করলো। হতভাগা মেয়েছুটো, স্বামী, এমন কি নিজের কথাও বোঝাতে চাইলো। অনেক যুক্তির অবতারণা করলো। তারপর নূতন যুক্তি খুঁজে বার করবার জন্য থামলো। সেই ফাঁকে মসিয়ো পয়কত তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে সেই পুরানো দিনের মত দরদ ঢেলে গুঞ্জন শুরু করলেন :

"আমার দিকে তাকাও, দেলফিঁ! তোমার মেয়েদের কথা একবার ভেবে দেখ!"

এরপর সে তাদের দুজনের দিকেই পরিপূর্ণ ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। তারপর এক লাফে সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে তিরস্কার ছুঁড়ে মারলো : "তোমরা দু'জনেই দুরাত্মা!"

ভগ্নোদ্যম, একই ব্যথার ব্যথী দুজন মুহূর্তকাল পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। ধীরে ধীরে মসিয়ো পয়কত তাঁর টুপিটি কুড়িয়ে নিলেন। সেটি কাছেই মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। মেঝেতে হাঁটু-গেড়ে বসায় যে ধুলো লেগেছিল, তা ঝেড়ে ফেলে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। রেনলদি দুয়ার পর্যন্ত তার সঙ্গে এলো। তিনি দু'হাত নমস্কার করতে করতে বললেন : "মসিয়ো, আমাদের দু'জনেরই বরাত খুব খারাপ।" তারপর ভারি পা ফেলে বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

## পিতা

সে বাস করতো বাতিজোঁলায় আর কাজ করতো পাবলিক এডুকেশন অফিসে। তার কর্মক্ষেত্র মধ্য প্যারিসে যেতে রোজ সকালে যাত্রী-গাড়ি ধরতে হোতো। আর প্রত্যেকদিন মুখোমুখি বসতো একটি মেয়ে। এভাবে মেয়েটিকে সে ভালবেসেই ফেললো।

মেয়েটি কাজ করতো একটা দোকানে। প্রতিদিন ঠিক সময় ধরে কাজে যেত। সে যেন ছোট্ট এক কোকিল। তার ভ্রমর কালো চোখ দুটো যেন কালো বিন্দু। গায়ের রং-এ হাতীর দাঁতের দ্যুতি। একই রাস্তার একই মোড় থেকে প্রত্যেকদিন তাকে আসতে দেখা যেত। ভারী গাড়িটা ধরবার জন্য প্রায়ই সে দৌড়তো, আর ঘোড়া দুটো সম্পূর্ণ না থামতেই লাফিয়ে পাদানিতে উঠে পড়তো। গাড়ির ভেতরে ঢুকে একটু হাঁপাতো। তারপর বসা হলে, এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে নিতো এক নজর।

তার মুখদর্শনে যে অসীম আনন্দ, এ কথা প্রথম দিন থেকেই অনুভব করেছিল ফ্রাঁজোয়া তেসা। ক্বচিৎ এমন মেয়ের দেখা মেলে যার সম্বন্ধে কিছু না জেনেও পাগলের মতো দুই হাতে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা যায়। তার আন্তর কামনা, গোপন বাসনা, মনের গহনে উচ্ছ্বসিত প্রেমাদর্শে মেয়েটি অজান্তেই সাড়া দিয়েছিল।

ইচ্ছে করেও সে মেয়েটির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারতো না। তার দৃষ্টি মেয়েটিকে বিঁধতো। আর মেয়েটি অস্বস্তিতে লাল হয়ে উঠতো। এটা লক্ষ্য করে সে চোখ তুলে অন্যদিকে তাকাতে চেষ্টা করতো। কিন্তু উল্টোদিকে চাইলেও ঘুরে ফিরে তার দৃষ্টি আবার মেয়েটির ওপরেই স্থির হয়ে থাকতো। কথাবার্তা না হলেও ক'দিন বাদে তারা আর অপরিচিত রইল না। গাড়িতে ভিড় থাকলে নিজের জায়গা মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে সে নেমে পড়তো।

অবশ্য এতে তার কষ্টই হোতো। মেয়েটিও একটু এগিয়েছে। এখন সে একটু হেসে তাকে অভিনন্দন জানায়। তার ব্যগ্র দৃষ্টির সামনে সে চোখ নামায় ঠিকই, কিন্তু এই আচরণে তার রাগ হয় বলে মনে হয় না।

কথার শুরুতে এ পর্বের অবসান। তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই বন্ধুত্ব। প্রতিদিন আধ ঘণ্টার ঘনিষ্ঠতা। ওই আধ ঘণ্টা ছিল স্বর্গসুখ, তার জীবনের পরম আনন্দ। দিনের বাকি সময়টুকু ওর ধ্যানেই কেটে যেতো। অফিসের দীর্ঘ সময় মনে মনে তাকে দেখেই যেতো ফুরিয়ে। সে তখন অভিভূত, মোহিত। মনের মধ্যে যেমন প্রিয় নায়িকার মূর্তি গড়ে ওঠে, তার স্মৃতিতেও তেমনি মেয়েটির ভাসাভাসা অথচ স্থির চিত্র আঁকা হয়ে গিয়েছিল। তার মনে হোতো, ওই ছোট্ট দেহটিকে সম্পূর্ণ পেলে সে আনন্দে পাগল হয়ে যাবে। সে সুখ লোকে ধারণা করতেও পারে না।

এবার থেকে প্রত্যেক দিন সকালে মেয়েটি তার করমর্দন করতে আরম্ভ করলো। এই ছোঁয়ার সুখটুকু সে সযত্নে রেখে দিত। ছোট আঙুলের মৃদু চাপ পরদিন অবধি তার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে থাকতো। মনে হোতো তার চামড়ায় যেন ছাপ রেখে গেছে। স্বল্পকালীন পথ-যাত্রার কথা ভেবে সে সারাক্ষণ কাটিয়ে দিত। তাই রোববার তার হৃদয় ভেঙে যেত। সন্দেহ নেই মেয়েটিও তাকে ভালবেসেছিল। কেননা বসন্তের এক রবিবার সে কথা দিল পরদিন তার সঙ্গে মায়জোঁ-লাফিত-এ গিয়ে একসঙ্গে লাঞ্চ খাবে।

## ২

রেল স্টেশনে এসে দেখলো মেয়েটি আগে থেকেই এসে গেছে। তার বিস্মিত ভাব দেখে সে বললো: 'যাবার আগে তোমায় ক'টা কথা বলতে চাই। এখনও কুড়ি মিনিট সময় আছে। আমার কথার জন্য এই সময়ই যথেষ্ট।' তার বাহুতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সে

তখন কাঁপছে। চোখ তার মাটির দিকে, মুখ শুকনো। সে বলে চললো: 'আমি চাই না যে তুমি আমায় প্রতারণা কর। যদি প্রতিজ্ঞা না কর, শপথ না নাও—যে—করবে না, এমন কিছু করবে না—যা অনুচিত—তাহলে আমি তোমার সঙ্গে কিছুতেই যাব না।'

কথা শেষ হতে সে পপির* মতো রাঙা হয়ে উঠলো। ছেলেটি যুগপৎ সুখী ও হতাশ হোলো। কি জবাব ভেবে পেল না। অন্তর থেকে সে এমনি একটা কিছু চায়। তবু রাতের আঁধারে এমন সব কল্পনা প্রশ্রয় পেয়েছিল যার ফলে উত্তপ্ত রক্তের তুফান উঠেছিল তার শিরায় শিরায়। মেয়েটির ব্যবহারে চপলতা দেখলে নিশ্চয় এত ভালবাসতে পারতো না। কিন্তু সাময়িক ভাবে তার কাছে কত মধুর আর উপাদেয় হোতো! তাই আর সব পুরুষদের মতো সেও প্রেমের হিসেব কষতে থাকলো।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে মেয়েটি জলভরা চোখে তাকিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলো: 'আমার সম্মান রক্ষা করবে—এ কথা না দিলে আমি কিন্তু সত্যি বাড়ি ফিরে যাব।'

আলগোছে তার হাতে চাপ দিয়ে ফ্রাঁজোয়া বললে: 'কথা দিলাম তোমার ইচ্ছাই থাকবে।'

স্বস্তিতে সে হেসে বললে: 'সত্যি বলছো?'

তার চোখে চোখ রেখে জবাব দিল:

'শপথ করছি।'

'এবার তাহলে টিকিট কাট।' মেয়েটি বললো।

গাড়ি ভর্তি। পথে তাই বিশেষ কথা হোলো না। মায়জোঁ-লাফিতে নেমে তারা পাশাপাশি হেঁটে চললো। নদীর ধারে জেলেরা তাদের জাল শুকোতে দিয়েছে। তার পাশ দিয়ে নদীর ধারে ওরা বেড়ালো। নদীর জলে, ঘাসে ঘাসে, গাছের পাতায় সূর্যের উজ্জ্বল আলো ঠিকরে পড়ছে। জলের কিনারে ছোট ছোট মাছের ঝাঁক খেলায় মত্ত। হাতে হাত দিয়ে ওরা মনোযোগ দিয়ে সেদিকে

* এক রকমের লাল ফুল।

দেখলো। খুশী আর ধরে না। হালকা মনে ওরা মাটির ওপর ভেসে বেড়ালো। মেয়েটি বললো :

'কত বোকাই না তুমি আমায় ভেবেছ!'

'কেন?'

'একা একা এ ভাবে তোমার সঙ্গে চলে এলাম বলে।'

'মোটেই না। এতো খুবই স্বাভাবিক।'

'না না, আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। আমি তো কোন ভুল করতে চাই না। আর এ ভাবেই তো মেয়েরা বিপদে পড়ে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের কথা যদি জানতে। একঘেয়ে জীবন। মাসের প্রত্যেকটা দিন, বছরের প্রতিটি মাস আমার একই রকম কাটে। মা আর আমি। দু'জনেই একেবারে একা। মা'র জীবনে অনেক অশান্তি। তাই সব সময় মনমরা। আমার যা সাধ্য আমি করছি। এত সবের মধ্যেও আমি একটু হাসতে চাই, আনন্দ পেতে চাই। কিন্তু সব সময় পারি না। তুমি দুঃখ পেও না, সত্যি আমার আসাটা ঠিক হয়নি।'

ফ্রাঁজোয়া তেসার মুখে কথা নেই। মেয়েটির কান ঠোঁটের খুব কাছাকাছি পেয়ে সে আবেগভরে একটা চুমু দিল। তার কথার জবাব।

মেয়েটি এক ঝটকায় সরে গেল। হঠাৎ রেগে গিয়ে বললে : 'ও মসিয়ো ফ্রাঁজোয়া, কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন?'

তারা মায়জোঁ-লাফিতে ফিরে এলো। লাঞ্চ খাওয়া হোলো পেতিতাভে। নদীর ধারে চারটে বড় পপলার গাছের আড়ালে ছোট বাড়িটি। চারিদিকের বাতাস, মনোরম উত্তাপ, ক্ষুদ্র বোতলে রক্ষিত শ্বেত সুরা, আর ঘন সান্নিধ্যের মাদক অনুভূতি—এর মধ্যে ওরা বসে রইল আরক্ত, উৎপীড়িত এবং নীরব। কফি খাবার পর এভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেল। আবার নতুন উৎসাহে মেছো জালগুলো পেরিয়ে নদীর ধারে ধারে হাঁটতে শুরু করলো লা ফ্রিত গাঁয়ের দিকে।

'তোমার নাম কি ?'

'লুই'

'লুই, লুই, লুই।' সে আবৃত্তি করলো। আর কোন কথা নেই। নদীটা এখানে লম্বা বাঁক নিয়েছে। দূরে এক সার সাদা বাড়ি। জলের তলায় তাদের সারবাঁধা ছায়াগুলো যেন নাইতে নেমেছে। লুই ডেইজি ফুল তুলে তোড়া বাঁধছিল। আর সে তখন মদমত্ত হস্তি-শাবকের মতো উৎফুল্ল হয়ে গলা ছেড়ে গান জুড়েছে। বাঁয়ে জমিটা ঢালু হয়ে নদীতে গিয়ে মিশেছে। আঙ্গুর লতায় জায়গাটা একেবারে ঢাকা। সহসা বিস্ময়ে ফ্রাঁজোয়া থমকে গেল। বললে : 'ওঃ, এদিকে দেখ।' যেখানে আঙ্গুর ঝোপ শেষ হয়েছে, সেখান থেকেই শুরু হয়েছে লিলাক গুচ্ছ। সবটুকু ঢালু জুড়ে লিলাক ফুলের ছড়াছড়ি। যেন এক বেগুনী রঙের বন। যেন এক বড় কার্পেট। দু তিন মাইল দূরের গ্রাম অবধি বিছিয়ে রয়েছে। বিস্মিত মুগ্ধ চোখে লুইও দাঁড়িয়ে পড়লো। ধীরে ধীরে বললো :

'ওঃ! কী অপরূপ!' একটা সবুজ মাঠ পেরিয়ে তারা এগিয়ে চললো নিচু পাহাড়টার দিকে। সারা বছর প্যারিসের পথে পথে ঠেলাগাড়িতে যত লিলাক ফুল ফিরি হয়, ঐ অদ্ভুত ছোট পাহাড়টাই তার যোগান দেয়।

সংকীর্ণ তরুবীথি ধরে ওরা এগিয়ে চললো। সামনে এক টুকরো ফাঁকা মাঠ পেয়ে বসলো। ওদের ঘিরে শুরু হোলো অসংখ্য মৌমাছির একটানা মৃদু গুঞ্জরণ। নদীর গড়ানো পারের বুকে নিস্তব্ধ দিনের প্রদীপ্ত সূর্যালোক লুটিয়ে পড়েছে। সেই ফুলবন থেকে ভেসে আসছিল উগ্র সুবাস। তরঙ্গায়িত সুগন্ধ, অজস্র ফুলের মাতাল নিঃশ্বাস।

দূরে কোন গির্জার ঘড়িতে ঘণ্টা বাজলো। তৃণশয্যায় শায়িত দু'টি প্রাণ কাছাকাছি ঘনিয়ে এলো। ওরা কোমল আলিঙ্গনে আবদ্ধ, পৃথিবী হারিয়ে গেল। ওদের দ্বৈত চেতনায় জেগে রইল শুধু অধরোষ্ঠের স্পর্শসুখ। তেসার দুটো বাহু তাকে কাছে টেনে নিল। লুই আবেশে চোখ বুজলো। তার যুক্তি কোথায় ভেসে গেল, ভাবনা রইল পড়ে।

প্রতি অঙ্গ জুড়ে শুধু পুঞ্জিত কামনার প্রত্যাশা। আত্মবিস্মৃত লুই নিজেকে তার কাছে বিলিয়ে দিল।

কিন্তু ত্বরিতে সংবিৎ ফিরে পেয়ে উঠে বসলো। সর্বনাশের আশঙ্কায় মন তার আচ্ছন্ন। অনুশোচনায় হৃদয় ব্যথিত। হাতে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

ফ্রাঁজোয়া সান্ত্বনা দিল। কিন্তু সে তক্ষুণি বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে বলতে থাকলো: 'হায় ভগবান! হায় ভগবান!'

ফ্রাঁজোয়া বললো: 'লুই! লুই! লক্ষীটি, এখানে একটু দাঁড়াও।'

কিন্তু লুই-এর রক্তিম কপোল, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। গাড়ি প্যারিস স্টেশনে আসতেই সে নেমে চলে গেল। বিদায় সম্ভাষণ পর্যন্ত জানালো না।

৩

পরদিন বাসে দেখা হতে ফ্রাঁজোয়ার মনে হোলো লুই-এর পরিবর্তন হয়েছে। ওকে বেশ রোগা দেখাচ্ছে। লুই বললো: 'কয়েকটা কথা বলবার আছে। বুলভার্দে* নামবো।'

পথে নেমেই বললে: 'এবার আমাদের দূরে সরে যাওয়া উচিত। যা ঘটে গেছে তারপর আর আমাদের দেখা সাক্ষাৎ করা চলে না।'

ফ্রাঁজোয়া: 'কিন্তু কেন?'

'কারণ আমি পারি না। দোষ আমারই। আর এমন হতে চাই না।'

কামনা বিক্ষত ফ্রাঁজোয়া মিনতি জানালো। সম্পূর্ণ পাবার বাসনায় সে তখন উন্মত্ত। মধু যামিনীতে অবাধ বিহারের প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব। বার বার অনুরোধ করলো। কিন্তু তাকে টলানো গেল না। লুই-এর একই উত্তর: 'আমি তা পারি না। না, পারবো না।'

* তরুবীথিকা। দু'পাশে তরু ছাওয়া প্রশস্ত পথ।

বাধা পেয়ে ফ্রাঁজোয়া দুর্বার হোলো। বিয়ে করবে বলে প্রতিজ্ঞা করলো। কিন্তু জবাব শুনলো: 'না।' লুই চলে গেল।

এক সপ্তাহের মধ্যে আর দেখা নেই। ঠিকানা জানা না থাকায় তার সঙ্গে দেখা করার উপায় নেই। ফ্রাঁজোয়া তাকে পাবার আশা ছেড়ে দিল। ন' দিনের দিন দরজায় কলিং বেল বাজতে সে খুলে দিল। দরজায় দাঁড়িয়ে লুই। ফ্রাঁজোয়ার দুই বাহুর মধ্যে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো। নিজেকে আর ঠেকাতে পারলো না। তারপর থেকে তিন মাস সে সেখানে মিস্ট্রেস হয়ে রইল। কিন্তু ফ্রাঁজোয়া ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠছিল। নারীর পরম দুর্লভ গোপন মাধুর্যের খবর পেয়ে তার সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হোলো। এখন তার একমাত্র চিন্তা সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু কি করে সম্ভব? কি করবে, কি বলবে কিছু ঠিক করতে না পেরে উৎকণ্ঠা বেড়েই যাচ্ছিল। একদিন তাই বেপরোয়া হয়ে বাসা বদলে উধাও।

এই প্রচণ্ড আঘাতে লুই একেবারে ভেঙে পড়লো। পলাতকের সন্ধানে তার মন সায় দিল না। মায়ের পায়ে পড়ে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা সব স্বীকার করলো। তার ক'মাস পরই লুই মা হোলো।

৪

বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়। ফ্রাঁজোয়া তেসার বয়স বেড়ে চলে। একই নিয়মে দিনগুলো বয়ে যায়। সেই অন্ধভাবে অফিসের কানুন মেনে চলা। সেই নিরানন্দ একঘেয়ে জীবন যাত্রা। কোন পরিবর্তন নেই। প্রতিদিন এক সময় ওঠা, এক পথ ধরে চলা, একই দরজায় সেই একই দারোয়ানকে টপ্‌কে অফিসে ঢোকা। নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে একই ধরনের কাজ করে যাওয়া। পৃথিবীতে তার কেউ নেই। সে একা। দিনে সহকর্মীদের মধ্যে, আর রাতে তার অবিবাহিত আস্তানায় সে ভীষণ একা। বুড়ো বয়সের জন্য তাই সে মাসে মাসে একশ' ফ্রাঁ জমাতো।

বড় ঘরের লোকজন গাড়ি আর সুন্দর মেয়েদের দেখতে পাবে বলে সে প্রত্যেক রোববার জঁাপেলিজেতে বেড়াতে যেত। তারপর দিন অফিসে গিয়ে কোন সঙ্গীকে শুনিয়ে বলতো : 'ব্যো স্ব ব্যুলোগঁ থেকে ফিরতি গাড়িগুলো কাল খুব চমৎকার ছিল।'

রবিবারের এক প্রসন্ন সকাল। সেদিন সে বেড়াতে গেল পার মোজ্যোঁ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলছে, ছুটছে। তাদের মায়েরা আর আয়ারা পথের ধারে বসে তাদের খেলা দেখছে। হঠাৎ ফ্রাঁজোয়া তেসা চমকে উঠলো। একজন মহিলা তার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। দু'টি শিশু তার হাতে ধরা। বছর দশেকের একটি ছেলে আর বছর চারেকের একটি মেয়ে। এ সেই, কোন সন্দেহ নেই!

ফ্রাঁজোয়া আরও একশ' গজ এগিয়ে গেল। তারপর আবেগে অভিভূত হয়ে একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়লো। মহিলা তাকে চিনতে পারেনি। তাই তাকে আর একবার দেখবার বাসনায় সে ফিরে এলো। মহিলা বসে। ছেলেটি শান্ত হয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে। আর মেয়েটি বালি দিয়ে ঘর গড়ায় ব্যস্ত। এ সে না হয়ে যায় না! এ নিঃসন্দেহে সে, কিন্তু দৃষ্টিতে সম্ভ্রান্ত রমণীর গাম্ভীর্য। সাজ পোশাক সাদাসিধে। কিন্তু চেহারায় মর্যাদাবোধ আর আত্মবিশ্বাস সুস্পষ্ট।

কাছে আসবার মুখ ছিল না। ফ্রাঁজোয়া তেসা দূর থেকেই দেখছিল। কিন্তু ছেলেটি মাথা তুলতেই তার শরীরে শিহরণ বয়ে গেল। এ তার ছেলে, সন্দেহ নেই। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে মনে হোলো যেন অনেক বছর আগে তোলা নিজের পুরোন ছবি দেখছে। ওদের যাবার সময় পিছু নেবে বলে সে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

সে-রাতে চোখে ঘুম নেই। বিশেষ করে ছেলেটির চিন্তায় সে ব্যাকুল হোলো। তার ছেলে। ও! যদি সত্যি করে জানতো! যদি নিশ্চিত হতে পারতো। কিন্তু তাহলেই বা কি করতো? তবু লুই-এর পুরোন বাড়িতে একবার খোঁজ নিতে গেল। সেখানে গিয়ে

শুনলে, পাড়ারই এক মানী ভদ্রলোক তাকে বিয়ে করেছেন। ভদ্রলোক স্থায়পরায়ণ। মেয়েটির দুর্দশা তাঁর হৃদয় স্পর্শ করে। তিনি সব জেনেশুনেই তাকে গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, অবাঞ্ছিত সন্তান—ফ্রাঁজোয়া তেসার ছেলেকে নিজের বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ওদের দেখতে পাবে বলে এরপর প্রতি রবিবার সে পার মোজ্যোঁতে যেতো। আর সব সময়ই ছেলেকে কোলে করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় পাগল হয়ে উঠতো। ওকে অজস্র চুমোয় ভরে দিতে চাইতো। ওকে চুরি করে সরে পড়ার কথা মনে হোতো।

হতভাগ্য চিরকুমার! একাকীত্বের বিভীষিকায় নির্যাতিত। যত্ন নেবার কেউ নেই। সন্তান স্নেহ প্রকৃতির দান। নিভৃত অন্তর থেকে উৎসারিত সেই স্নেহধারা তার পিতৃহৃদয় উদ্‌বেল করে তুলতো। আকাঙ্ক্ষা, ঈর্ষা, অনুশোচনায় মনে আগুন জ্বলতো।

এরপর শেষ চেষ্টা করবে বলে সে মরিয়া হয়ে উঠলো। একদিন লুই পার্কে ঢুকেছে। সে পথ আগলে দাঁড়ালো। মলিন মুখ, কম্পিত অধর। কোনক্রমে উচ্চারণ করলে: 'আমায় চিনতে পারছ না?' লুই চোখ তুললো। তাকে দেখেই ভয়ে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলো। তক্ষুনি দুই ছেলেমেয়েকে হাত ধরে টানতে টানতে প্রায় দৌড়ে পালালো। আর সে ঘরে ফিরে এলো। কোন সান্ত্বনা রইল না। কান্না এলো।

মাসের পর মাস গেল। তাকে দেখা গেল না। পিতৃস্নেহ লাভের দুর্বার বাসনায় ফ্রাঁজোয়া দিনরাত যন্ত্রণাকাতর। আদর করে তার ছেলেকে চুমু খেতে পারলে সে মরেও সুখ পেত। এজন্য সে কিনা করতে পারে! খুন করতে পারে! যে কোন বিপদে বুক পেতে দিতে পারে।

সে চিঠি লিখলো। জবাব এলো না। বার কুড়ি লিখবার পর বুঝলো তাকে টলানো যাবে না। তখন তার স্বামীকে লিখবার দুঃসাহস এলো। অবশ্য দরকার পড়লে পিস্তলের একটি গুলি

বরণ করে নেবার জন্য তৈরী থাকলো। চিঠিতে ছিল সামান্য ক'টি কথা।

'মসিয়ো,

আপনার কাছে আমার নাম অত্যন্ত ঘৃণ্য। কিন্তু আমি এখন হতভাগ্য, চরম দুর্দশাগ্রস্ত। আপনিই আমার একমাত্র ভরসা। তাই, মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী।

শ্রদ্ধা নেবেন। ইত্যাদি।'

পরদিনই উত্তর এলো :

'মসিয়ো,

আসছে কাল, মঙ্গলবার, বিকেল পাঁচটায় আপনার আগমন প্রত্যাশা করি।'

৫

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে, ফ্রাঁজোয়া তেসার হৃৎস্পন্দন এত বেড়ে গেল যাতে তাকে বার বার থেমে জিরিয়ে নিতে হোলো। বুকের মধ্যে কিসের অস্বস্তিকর অশান্ত হট্টগোল, যেন কোন জন্তুর দাপাদাপি। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। পড়ে যেতে যেতে কোন রকমে রেলিং ধরে সামলে নিল।

চারতলায় উঠে দরজায় বোতাম টিপল। ঝি দরজা খুলে দিল। সে শুধালো :

'মসিয়ো ফ্লঁ। এখানে থাকেন ?'

'হ্যাঁ থাকেন, মসিয়ো। ভেতরে আসুন।'

সে ভেতরে এলো। বসবার ঘর। ফ্রাঁজোয়া একা অপেক্ষা করতে লাগলো। বিপদে মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তারও সেই দশা। ভেতরের দিকে দরজা খুলে এক ভদ্রলোক এলেন। লোকটি লম্বা, গম্ভীর, এবং বলতে গেলে বলিষ্ঠ। পোশাকী কোট পরনে। একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। ফ্রাঁজোয়া বসতে বসতে ধরা গলায় বললো :

'মসিয়ো—মসিয়ো—আমার নাম জানেন কিনা জানি না, জানেন কি না—'

বাধা দিয়ে ফ্লঁা বললেন :

'আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না মসিয়ো, আমি জানি। আমার স্ত্রী আপনার কথা সব আমাকে বলেছেন।'

তাঁর আপাতত কঠোর কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে উঁকি দিল এক মহৎ ব্যক্তিত্ব। একজন সম্মানিত ব্যক্তির স্বাভাবিক মর্যাদাবোধ যেন প্রকাশ পেল। ফ্রাঁজোয়া তেসা বলে চললো :

'মসিয়ো, আমি বলতে চাই, দেখুন—আমি লজ্জায়, দুঃখে, অনুশোচনায় মরে যাচ্ছি! একবার, শুধু একবার ছেলেটাকে একটু আদর করতে চাই।'

ফ্লঁা উঠে কলিং বেল বাজালেন। ঝি এলো। বললেন : 'ল্যুইকে এখানে নিয়ে এসো তো।' ঝি চলে যেতে তারা মুখোমুখি বসে রইল। কথা নেই। কারও কিছু বলার নেই। সব চুপ। শুধু প্রতীক্ষা।

হঠাৎ বছর দশেকের একটি ছেলে দৌড়ে ঘরে এলো। তার বাবা বলে যাকে জানে, তার দিকে দৌড়ে যেতে যেতে অচেনা লোক দেখে থমকে দাঁড়ালো। ফ্লঁা তার কপালে চুমু খেয়ে বললেন : 'এবার গিয়ে ওই ভদ্রলোকটিকে চুমু দাওতো সোনামণি।'

ছেলেটি শান্তভাবে এগিয়ে গিয়ে তেসার দিকে চেয়ে রইল।

ফ্রাঁজোয়া তেসা উঠে দাঁড়ালো। তার মাথা থেকে টুপিটি গেল পড়ে। ছেলেকে দেখতে দেখতে নিজেও পড়ে যাচ্ছিল। ফ্লঁা সংকোচ বোধ করলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

ছেলেটি বিস্ময়াবিষ্ট। টুপিটি কুড়িয়ে অপরিচিত লোকটির দিকে বাড়িয়ে দিতেই, তাকে টেনে কোলে তুলে নিল। মুখে, চোখে, গালে, ঠোঁটে, চুলে চুমোয় ভরে দিল। এই অযাচিত চুম্বন বর্ষণে শিশু ভয় পেয়ে গেল। এর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে মাথা

ঝাঁকিয়ে সরিয়ে নিল। ছোট্ট দু'টি হাতে লোকটির মুখ ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইল।

সেই মুহূর্তে ফ্রাঁজোয়া তেসা তাকে নিচে নামিয়ে দিল। 'বিদায়! বিদায়!' চিৎকার করে বলে উঠে চোরের মতো দৌড়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

মিঃ সিমঁ লেক্রমেঁতের সঙ্গে মিস জাঁ কর্দিয়েরের বিয়েতে কেউ অবাক হয়নি। কেননা, লেক্রমেঁত এসেছিল মিঃ পপিলঁর কারবারটি কিনে নেবে বলে, আর এতে যে টাকার দরকার হবে তা তো জানা কথাই ; এবং নগদ ও শেয়ার মিলিয়ে মিস জাঁ কর্দিয়ের পাক্কা তিন লক্ষ ফ্রাঁ-র মালিক।

অবিবাহিত লেক্রমেঁত দেখতে সুন্দর, চাল-চলন কেতা-দুরস্ত, সেরেস্তাদারী এবং একটু গেঁয়ো হলেও সে ফ্যাশনে একটা বিশেষত্ব ছিল যা ব্যতনি-ল্যা-রেব্যোয় সহসা চোখে পড়ে না।

মিস কর্দিয়েরের চেহারায় মাধুর্য এবং সজীবতা রয়েছে, যদিও একটু যেন ভোঁতা মাধুর্য এবং বোকাটে সজীবতা ; তবু তাকে সুন্দরী বলতেই হবে, মনোহারিণী, সকলেই তাকে পছন্দ করবে।

গোটা ব্যতনি তাদের বিয়ের উৎসবে মেতে উঠেছিল। কয়েকটা দিন একত্রে কাটাবার পর আনন্দোচ্ছ্বাস সংযত করে নবীন দম্পতি যখন তাদের স্থায়ী দাম্পত্য-সংসারে ফিরে এল, সকলেই একবাক্যে তাদের প্রশংসা করতে লাগল। ঠিক হোলো, দিন কতক তারা প্যারিসে গিয়ে অনাড়ম্বর ভ্রমণ সেরে আসবে।

প্রথম পরিচয়ের দিনগুলো মধুর হয়ে উঠেছিল। কারণ নম্র, জড়তাহীন এবং অসাধারণ সুরুচি দিয়ে কি করে নবোঢ়া বধূর মন জয় করতে হয়, লেক্রমেঁতের তা ভালই জানা ছিল।

'সবুরে মেওয়া ফলে,'—এই নীতি সে মেনে চলতো। একই সঙ্গে কি করে উদ্যম এবং ধৈর্য বজায় রাখতে হয়—সে তা জানতো। তাই তার উদ্দেশ্য সফল হতে দেরি হয়নি। চারদিনের মাথায় মিসেস লেক্রমেঁত পতি দেবতাটিকে পূজো করতে লাগল। মুহূর্তের অদর্শন অসহ্য। স্বামীটিকে সারাদিন কাছে রাখা চাই, যাতে তার

হাত, নাক, গোঁফ ইত্যাদি সবকিছুকে সে আদর করতে পারে। স্বামীর কোলে বসে সোহাগিনী দুহাতে তার কান দুটি ধরে কানে কানে বলতো, 'চোখ বুজে হাঁ করতো দেখি।' সেও নির্দ্বিধায় হাঁ করতো, চোখ আধবোজা করে পিট্ পিট্ করতো; আর ঠিক তখনই একটি সুদীর্ঘ, সুমিষ্ট চুম্বন লাভ করতো—যার ফলে তার শিরদাঁড়া সির্‌সির্ করে উঠতো। এবং তার নিজের কথা বলতে গেলে, সকাল থেকে সন্ধ্যা—আবার সন্ধ্যা থেকে সকাল—এই চব্বিশ ঘণ্টা বৌ-কে উপভোগ করার মতো অঢেল আলিঙ্গন, আর প্রচুর সংখ্যক ঠোঁট ও হাত তার ছিল না!

এক সপ্তাহ কাবার হতেই সে তার তরুণী সঙ্গীকে বলল: 'যদি চাও, আসছে সপ্তাহের মঙ্গলবার আমরা প্যারিসে যেতে পারি! সেখানে আমরা কিন্তু অবিবাহিত প্রেমিক প্রেমিকার মতো থাকবো; থিয়েটারে যাবো, রেস্তোরাঁয় খাবো, কাফে-তে জলসা দেখবো, সব জায়গা চষে বেড়াবো।'

স্ত্রী আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

'ওঃ, দারুণ মজা হবে!' সে বলে চলল:

'চল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়ি।'

'কোন কাজে যাতে আমাদের ভুল না হয়, তাই বলছি, তোমার বাবার কাছ থেকে তোমার যৌতুকের টাকাটা চেয়ে নিও; টাকাটা সঙ্গে নিয়ে যাব—যাতে এবারেই পপিলঁকে দিয়ে আসতে পারি।' স্ত্রী জবাব দিল: 'কাল সকালেই বাবার কাছে কথাটা পাড়বো।'

তখন সে স্ত্রীকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে আলগোছে নরম করে আদর করতে লাগল, কেননা এই আট দিনের সাহচর্যে সে বুঝেছে এই ধরনের আদরই তার সব চেয়ে বেশি পছন্দ।

পরের মঙ্গলবারে ঠিক সময়ে তারা রাজধানীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। মেয়ে জামাইকে তুলে দিতে শ্বশুর শাশুড়ী স্টেশনে এসেছেন। শ্বশুর সাবধান করে দিলেন: 'অতগুলো টাকা এভাবে

হাত-ব্যাগে নেওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না।' ছোকরা সেরেস্তাদার হেসে জবাব দিল :

'ভাববেন না বাবা, এ কাজে আমি অভ্যস্ত। আপনি তো জানেন, আমাদের কাজে অনেক সময় লাখ লাখ টাকা সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হয়। আইনের ঘোরপ্যাঁচ আর অযথা ঝামেলা এড়াবার জন্যই আমাকে সঙ্গে টাকা রাখতে হয়। আপনি কোন দুশ্চিন্তা করবেন না।' 'সকলে উঠে পড়ুন'—বলে চালক হাঁক পাড়তেই ওরা হুড়মুড় করে একটা কামরায় উঠে বসল। আরও দুজন বৃদ্ধা সে কামরায় ছিল।

লেক্রুমেঁত স্ত্রীর কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বলল : 'কি জ্বালা! একটা সিগারেটও খেতে পারবো না।'

স্ত্রীও নিচু গলায় জবাব দিল : 'আমারও বিচ্ছিরি লাগছে, তবে তোমার সিগারেটের জন্য নয়।'

ধোঁয়া ছেড়ে ইঞ্জিন চলতে শুরু করল। পুরো এক ঘণ্টা গাড়িতে থাকতে হোলো, কিন্তু দুই বুড়ি একটুও চোখ বুজল না বলে তারাও কোন জরুরী বিষয়ে আলোচনা করতে পারল না।

প্যারিসের সাঁ-লাজারে স্টেশনে গাড়ি থামলে লেক্রুমেঁত স্ত্রীকে বলল : 'প্রিয়ে, তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে চল, বুলভার্দে গিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিই। তারপর ধীরে সুস্থে ফিরে এসে আমাদের ট্রাঙ্কটা কোন হোটেলের একজন আরদালির জিম্মায় রেখে দেব।

স্ত্রীও সঙ্গে সঙ্গে রাজী। 'ওঃ! সেই ভাল; চল, কোন রেস্তোরাঁয় গিয়ে ব্রেকফাস্ট খাই। এখান থেকে খুব দূর হবে কি?'

'হ্যাঁ, কিছুটা দূর তো বটেই। তবে আমরা ভাড়া বাসে চড়ে যাব।'

স্ত্রী একটু অবাক হোলো। জিজ্ঞেস করল : 'ঘোড়ার গাড়ি নিলে হয় না?'

স্বামী আঁতকে উঠে মুখে হাসি টেনে বলল: 'এই তোমার হিসেবী বুদ্ধি! পাঁচ মিনিটের পথ যেতে ঘোড়ার গাড়ি, প্রতি মিনিটে ছয় সু করে ভাড়া! রেখে খেতে জানলে মেগে খেতে হয় না, বুঝলে!'

"তা অবশ্য' একটু বিব্রত হয়ে পত্নী সায় দিল। তিন ঘোড়ায় টানা প্রকাণ্ড এক বাস যাচ্ছিল, লেক্রমেঁত চেঁচিয়ে ডাকল: 'কণ্ডাক্টর! এই কণ্ডাক্টর!' ভারী গাড়িটা থামল। যুবক সেরেস্তাদার তার তরুণী ভার্যাকে গাড়ির ভেতরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিতে দিতে ফিস্ ফিস্ করে বলল: 'তুমি ভেতরে গিয়ে বস। আমি পাদানিতে দাঁড়িয়ে জলযোগের আগে অন্তত একটা সিগারেট খেয়ে নিই।'

তরুণী জবাব দেবার ফুরসৎ পেল না। যাতে পড়ে না যায়, তার জন্য কণ্ডাক্টর তার হাত ধরে টেনে তুলে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ভয়ে জড়সড় হয়ে কোনমতে একটা আসনে বসে সে পেছনের জানালা দিয়ে বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকল। পা-দানীর মাথায় উঠে দাঁড়ানোয় তার পা-দুটো ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

একধারে বিশাল-বপু এক ভদ্রলোক, আর একধারে এক বৃদ্ধা মহিলার মাঝখানে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে সে অনড় হয়ে বসে থাকল। ভদ্রলোকের গা থেকে কুকুরের গায়ের গন্ধ আসছিল।

অন্যান্য যাত্রীরা দুধারে সার বেঁধে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে—এদের মধ্যে মুদিখানার এক কর্মচারী, এক শ্রমিক, পদাতিক বাহিনীর একজন সার্জেন্ট—এ রকম পাঁচ মিশেলী লোকজন রয়েছে। এক ভদ্রলোকের চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, মাথার সিল্কের কাপড়ের টুপি থেকে লম্বা লম্বা ঝালর ঝুলছে—যেন ছাদ থেকে নেমে আসা নর্দমার নল। দুজন মহিলাও আছেন এই দলে, যাঁদের পোশাক-আসাক হাবভাবে একটা জাহির করার মনোভাব ফুটে উঠেছে, যেন জানিয়ে দিচ্ছে—এই বাসে চড়েছি বটে, তবে এখানে আমাদের খাপ

খায় না। এ ছাড়া আছে শান্ত শিষ্ট ছুটি বোন, ঝাঁকড়া চুলো একটি ছোট মেয়ে এবং এক ঠিকাদার। ভিড়ের চেহারাটা হয়েছে যেন মজাদার এক খেলনা যাত্রঘর, সারি বদ্ধ বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র মুখভাব, ঠিক যেন কোন মেলায় সাজানো অদ্ভুত চেহারার পুতুলের মিছিল।

গাড়ির ঝাঁকুনিতে সকলের মাথাই একটু একটু ঢুলছিল, সেই ঢুলুনিতে গালের চামড়া তিরতির করে কাঁপছিল, এবং চাকার একঘেয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজে বিরক্তিতে অথবা ঘুমে সকলের চোখেই ঘোলা ঘোলা বোকাটে ভাব ফুটে উঠেছিল।

তরুণী স্ত্রী জড়সড় হয়ে বসে ভাবতে লাগল—'ও কেন আমার সঙ্গে ভেতরে এল না?'—নিজেকেই প্রশ্ন করল। অজানা বিষাদে মন আচ্ছন্ন হয়ে রইল। একটা সিগারেট না খেলে এমন কি ক্ষতি হত!

শান্ত শিষ্ট বোন ছুটি গাড়ি থামাতে বলল। তারপর পুরোন রঙ-ওঠা জামার গন্ধ ছড়িয়ে একের পর এক নেমে গেল।

এরপর আরও একজন বাস থামালে এক রাঁধুনি উঠে পড়ল। পরিশ্রমে তার চোখমুখ লাল, প্রাণ বেরিয়ে যাবার যোগাড়। সে তার হাতা-খুন্তি রাখার বাস্কেটটা কোলে নিয়ে বসে পড়ল। এঁটো বাসনের ঝাঁঝাল গন্ধে সমস্ত বাস ভরে গেল।

'যতটা ভেবেছিলাম, দেখছি, তার চেয়েও অনেক দূর,'—যুবতী মনে মনে বলল।

ঠিকাদার নেমে গেলে তার জায়গায় উঠল এক গাড়োয়ান, গা থেকে আস্তাবলের গন্ধ বেরোচ্ছে। ঝাঁকড়া চুলো মেয়েটি নেমে যেতেই এক পিওন উঠে এল, সে তার চাকরির গন্ধ বয়ে আনল।

সেরেস্তাদারের স্ত্রী এ সব দেখতে দেখতে হাঁপিয়ে পড়ল। হতাশায় চোখ ফেটে কান্না আসতে চাইছে, কিন্তু কেন—তা সে জানে না!

আরও কত লোক উঠল, নামল ; বাস কত অলি গলি বড় রাস্তা পেরিয়ে গেল, কত জায়গায় থামল আবার চলতে লাগল।

জাঁ ভাবছিল : 'আরও কতদূর যেতে হবে, কে জানে! বিশেষ করে এই একঠাঁইয়ে বসে থাকা কাঁহাতক ভাল লাগে! একটু ঘুমিয়ে নেবারও উপায় নেই।' এত ক্লান্ত এর আগে সে কোনদিন হয়নি।

একে একে সবাই নেমে গেল। বাসে এখন একমাত্র সে-ই যাত্রী, কেবলমাত্র সে একা। কণ্ডাক্টার চেঁচিয়ে বলল : 'ভ্যোগরাদ!' কথাটা তাকেই বলা হচ্ছে কিনা, সে বুঝে উঠতে পারল না—কেননা অন্য সবাই আগেই নেমে গেছে।

কণ্ডাক্টার তখন আবার চেঁচিয়ে বলল : 'ভ্যোগরাদ!' সে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। কণ্ডাক্টার তৃতীয়বার ঘোষণা করল : 'ভ্যোগরাদ!'

রুক্ষস্বরে কণ্ডাক্টার জবাব দিল! 'মিস্. আমরা ভ্যোগরাদে এসেছি। আপনাকে এর মধ্যেই অন্তত বিশবার বলেছি সে কথা।'

'বুলভার্দ এখান থেকে অনেক দূর?'

'কোন বুলভার্দ?'

'ইতালীয় বুলভার্দ।'

'অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছি।'

'ওঃ! দয়া করে আমার স্বামীকে একটু ডেকে দেবেন?

'আপনার স্বামী? কোথায় তিনি?'

'বাইরে, পাদানেতে দাঁড়িয়ে আছেন।'

'বাইরে, পাদানেতে! বহুক্ষণ থেকে ওখানে কেউই নেই!'

ভয়ে তার মুখের চেহারা পাল্টে গেল। বলল : 'তা কি করে হবে? তা হতেই পারে না। বাসে ওঠার সময় উনি ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন। আর একবার দেখুন না! নিশ্চয়ই ওখানে আছেন।'

কণ্ডাক্টার রেগে উঠে বলল : 'ঢের হয়েছে, সুন্দরী, এবারে

দয়া করে নেমে পড়ুন। একজন গিয়েছে তো কি হয়েছে, আরও দশজন জুটে যাবে। ভালোয় ভালোয় নেমে যান তো, রাস্তায় লোকের অভাব হবে না।'

চোখ ছাপিয়ে জল এল। বার বার মিনতি করে বলতে থাকল : 'কিন্তু স্যার, আপনি ভুল করছেন। নিশ্চয়ই ভুল করছেন! দেখবেন, তাঁর হাতে একটা মস্ত হাত-ব্যাগ রয়েছে।'

বাস-কর্মী হেসে ফেলল। বলল : 'মস্ত হাত-ব্যাগ,' না? ঠিক ঠিক, মনে পড়েছে। কিন্তু তিনি তো মাদেল্যঁ-তে নেমে গেছেন? হ্যাঁ, ওখানেই নেমেছেন! আপনাকে ফেলে গেছেন। হাঃ হাঃ।'

গাড়িটা চুপচাপ থেমে আছে। মেয়েটি নেমে এল। ইচ্ছে না থাকলেও তার দৃষ্টি ঘুরে গেল গাড়ির ছাদের দিকে সারাটা ছাদ খাঁ খাঁ করছে—কেউ নেই।

এতক্ষণে সে হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল। কেউ দেখছে বা শুনছে কিনা ভেবে দেখল না। অবশেষে বলল : 'এখন আমার কি উপায় হবে?'

ইনস্‌পেক্টর এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন : ,'কি হয়েছে?'

কণ্ডাক্টার বিদ্রূপ করে বলে উঠল : 'এনার স্বামী এঁকে পথে বসিয়ে গেছেন।'

'আরে, আরে তাতে কি হয়েছে; এই বান্দা আপনার সেবার জন্য হাজির আছে।'—এই বলে দ্বিতীয় লোকটি তার পায়ে পায়ে চলতে লাগল।

দারুণ ভয়ে আর উত্তেজনায় হতবুদ্ধি হয়ে তরুণী সোজা হেঁটে চলল, কোথায় যাবে, কি করবে কিছুই ভেবে পেল না। এ রকম ভুল কি করে সম্ভব? এমন অমনোযোগ, অসম্মান, এতদূর বিভ্রান্তি কে কবে শুনেছে!

পকেটে দুটো ফ্রাঁ আছে। কিন্তু কার কাছে যাবে? হঠাৎ মনে পড়ল খুড়তুতো ভাই ব্যারেলের কথা, সে এখানকার নৌ-বিভাগীয় অফিসে কেরানীর কাজ করে।

একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া নেওয়া চলে ; হাঁ, ভাইয়ের কাছেই সে যাবে। ভাই সবে অফিস যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে—এমন সময় সে গিয়ে হাজির। লেক্রুঁমেতের মত ভাইয়েরও বগলের তলে একটি বড়সড় হাত-ব্যাগ। গাড়ি থেকে মুখ বার করে সে ডাকল :

"আঁরি !"

ভাই অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলল : 'আরে জিনি যে, এখানে কখন এলে ? একাই এসেছো নাকি ? কোত্থেকে আসছো ? কি খবর তোমার ?'

ছল ছল চোখে মেয়েটি ঠেকে ঠেকে কোনমতে বলল : 'আমার স্বামীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কোথা থেকে হারাল ?'

'বাস থেকে।'

'বাস থেকে ! কেমন করে ?'

কাঁদতে কাঁদতে সে তখন এ্যাডভেন্‌চারের কাহিনী আদ্যোপান্ত বলে গেল।

সব শুনে চিন্তিত মুখে ভাই জিজ্ঞেস করল :

'আজই সকালে ? ওর মাথা ঠিক ছিল তো ?

'হ্যাঁ, মাথা ঠিকই ছিল। তাছাড়া বিয়ের যৌতুকের টাকাটাও ওর কাছে ছিল।'

'তোমার বিয়ের যৌতুক ? সবটাই ওর কাছে ছিল ?'

'হ্যাঁ, সবটাই। ওর কেনা কারবারটার দাম দেবার কথা ছিল।'

'শোন বোনটি, তোমার স্বামী, তিনি যেই হোন না কেন—বোধ হয় এই মওকাই খুঁজছিলেন।'

তবুও মেয়েটির যেন আসল কথা মাথায় ঢুকছে না। সে আমতা আমতা করে বলল : 'আমার স্বামী—তুমি বলছ—'

'আমি বলছি, ভদ্রলোক তোমার—হ্যাঁ তোমার সমস্ত মূলধন নিয়ে সরে পড়েছেন। এতে আর কোন কিন্তু নেই।'

ক্ষোভে দুঃখে তার দম আটকে এল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে

সে বিড় বিড় করল: 'তাহলে—তাহলে—ও একটা জোচ্চোর।' তারপর আবেগ সামলাতে না পেরে ভাইয়ের ঘাড়ে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

পথের লোকজন তাদের দেখে থম্‌কে দাঁড়াচ্ছিল বলে ব্যারেল বোনকে ধরে আস্তে আস্তে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এল। ওদের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখে ঝি এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিলে ব্যারেল তাকে বলল: 'সফি, এক দৌড়ে গিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে দুজনের মতো জল-খাবার নিয়ে এসো তো। আজ আর অফিস যাব না।'

## মণিমুক্তো

মসিয়ো লাঁতিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একজন বড়বাবু। অফিসের ছোট সাহেবের বাড়িতে এক সান্ধ্য চায়ের আসরে মেয়েটির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। আর প্রথম দর্শনেই যাকে বলে প্রেম। মেয়েটির বাবা ছিলেন গাঁয়ের কালেক্টর। কয়েক বছর হোলো মারা গেছেন। তারপর থেকে মায়ের সঙ্গে বসবাস করছে প্যারিসে। অবস্থা ভাল নয়, কিন্তু স্বভাবটি ভারি মিষ্টি, ভদ্র ও বিনয়ী।

ধর্মভীরু হলে যা হয়, মেয়েটি তাই। তার চেহারা সাধারণ হয়েও যেন অসাধারণের ছাপ। সদা-প্রফুল্ল মুখটিতে অদৃশ্য হৃদয়ের প্রভা। অঙ্গে অপ্সরীর স্বর্গীয় রূপলাবণ্য। এমন মেয়ের কাছেই রুচিবান পুরুষ নিজেকে উৎসর্গ করে ধন্য হবার স্বপ্ন দেখে। সকলে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। লোকে বলতো: "এমন মেয়েকে বউ হিসাবে পাওয়া ভাগ্যের কথা। এ মেয়ে মেলে কোটিতে গুটি।"

লাঁতিন করলো বিয়ের প্রস্তাব। তারপর এক শুভদিনে কাজটি সুসম্পন্নও হোলো।

জীবনে বইল সুখের নির্ঝর। বাৎসরিক আয় তার মোটে তিন হাজার পাঁচ শ ফ্রাঁ-এর মতো। কিন্তু তার হিসেবী স্ত্রী পরিপাটি ভাবে সংসার সাজালো, কোন রকম অভাব থাকতে দিলো না বরং যথেষ্ট বিলাস সুখে দিন কাটতে লাগলো। স্বামীর প্রতি তার ভীষণ টান। আদর যত্নের বিরাম নেই। তার সুন্দর ব্যক্তিত্বের প্রতি অনুরাগ দিন দিন বেড়েই চললো। বিয়ের পর ছ বছর কেটে গেল কিন্তু মসিয়ো লাঁতিনের মনে হোলো প্রথম মধুমাস কালেও প্রেমের গভীরতা এত হয়নি।

স্ত্রীর স্বভাবে কেবল দুটো খুঁত। তার থিয়েটারের বাতিক, আর নকল মুক্তোর প্রতি আসক্তি। ছোটখাট অফিসার গিন্নী কয়েকজন

তার সখী জুটেছিল। তারা প্রায়ই নামী অপেরার দামী টিকিট করতো তার জন্য। অভিনয়ের প্রথম রজনীতেও কখনও কখনও আমন্ত্রণ আসতো। স্বামী বেচারা পছন্দ করুক আর নাই করুক, সঙ্গে না গিয়ে উপায় থাকত না। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর এই আমোদফুর্তি তার ভাল লাগতো না, সে হাঁপিয়ে উঠতো। চেনাজানা কোন মহিলাকে নিয়ে যাবার জন্য স্ত্রীকে অনুরোধ করতো, তাহলে নাটক শেষে নিজেরাই ফিরে আসতে পারে। স্বামী থাকতে অন্য মেয়ের সঙ্গে অপেরায় গেলে মান থাকে না বলে স্ত্রী যেতে আপত্তি করতো। কিন্তু পতি দেবতাটিকে চটে যেতে দেখে শেষ অবধি রাজী হোলো, আর হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো মসিয়ো লাঁতিন।

অতিরিক্ত নাটকের নেশার কুফল ফললো। সাজগোজের প্রতি ঘরণীটির ঝোঁক অসম্ভব বেড়ে গেল। তা বলে জামাকাপড়ের পরিবর্তন হোলো না। সেই আদ্দিকালের অকৃত্রিম রুচিসম্মত সাদাসিধে পোশাক। এই বেশেই তার লাবণ্য, অফুরাণ হাস্যময় রূপটি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠতো। কিন্তু ক্রমশই তার কানে ঝলমল করে উঠলো নকল হীরের মস্ত দুল, তা থেকে বিচ্ছুরিত হোলো আসল হীরের দ্যুতি। একে একে ঠুনকো মুক্তোর মালা, ঝুটো সোনার ব্রেসলেট, মূল্যবান পাথরের মতো হালকা কাচ বসানো চিরুনি তার অঙ্গের শোভাবর্ধন করলো।

এই জাহির করবার প্রবৃত্তি দেখে স্বামী ক্ষুণ্ণ হোতো আর প্রায়ই বলতো: "প্রিয়ে, যখন সত্যিকারের মুক্তো কেনার সামর্থ্য তোমার নেই, ঈশ্বরদত্ত রূপ লাবণ্যই তোমার অলঙ্কার হওয়া উচিত। নারীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার তো তাই।"

মিষ্টি হেসে স্ত্রী জবাব দিত: "কি করবো বলো, আমার ভাল লাগে যে। আমার একমাত্র দুর্বলতা ওখানেই। তোমার কথা ঠিক জানি, কিন্তু স্বভাব কি করে পালটাই বলো? গয়না যে আমার খুব প্রিয়।"

হীরের নেকলেশটি আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললো: "দেখ,

চেয়ে দেখ, কি অপূর্ব না ? লোকে ভাববে এটা বুঝি সত্যিকারের।” গিল্‌টি গয়নাটি থেকে আলো ঠিকরে পড়লো।

স্বামী সহাস্যে বললো : “যাই বলো প্রিয়ে, তোমার রুচি কিন্তু জিপসীদের মতো।”

কোন কোন দিন সন্ধ্যায় আগুনের আঁচে বসে গল্প গুজবের মাঝখানে টি-টেবিলের ওপর তার অলঙ্কারের চামড়ার বাক্সটি এনে রাখতো। মসিয়ো লাঁতিনের ভাষায় ছাই ভস্ম। গভীর আগ্রহে সেই নকল মুক্তো পরখ করে দেখতে দেখতে গোপন এক গভীর আনন্দে সে যেন অভিভূত হয়ে যেত। কখনও স্বামীর গলায় একটি নেকলেশ পরিয়ে দিয়ে প্রাণখোলা হাসি হেসে বলতো : “আহা, তোমায় কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে!” তারপর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাত্রাহীন চুম্বনে তাকে বিপর্যস্ত করে তুলতো।

একদিন সন্ধ্যায় থিয়েটার দেখে ফিরবার সময় তার ভীষণ-ঠাণ্ডা লেগে গেল। পরদিন সকাল থেকে শুরু হোলো কাশি। আর আটদিন যেতে না যেতে বুকে সর্দি বসে গিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

লাঁতিনের অবস্থা হোলো অবর্ণনীয়। জীবন সম্বন্ধে সে এমন নিরাশ হয়ে পড়লো যে একমাসের মধ্যে তার মাথার সমস্ত চুল সাদা হয়ে গেল। গভীর দুঃখে হৃদয় হোলো ক্ষতবিক্ষত, দিবারাত্র চোখে বইলো শ্রাবণের ধারা। পরলোকগতা স্ত্রীর স্মৃতি সারাক্ষণ তাকে তাড়া করে বেড়ালো—তার হাসি, গলার স্বর—কত সব কথা।

সময়ের ব্যবধান তার দুঃখ মুছে দিতে পারলো না। কখনও কখনও অফিসে সহকর্মীরা যখন সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠতো, হঠাৎ অশ্রুসজল হয়ে উঠতো তার চোখ, মুখে পড়তো বেদনার কুঞ্চনরেখা, আর টুকরো টুকরো স্মৃতির ভারে কান্না উঠতো উদ্‌গত হয়ে। স্ত্রীর ঘরটির কোন পরিবর্তন সে করেনি। তার পোশাক, আসবাব পত্র, তার বেঁচে থাকার শেষ দিনটিতে যেমন

ছিল, সব তেমনি আছে। ওই ঘরে বসে প্রত্যেক দিন নির্জনে সে স্ত্রীর কথা ভাবতো।

কিন্তু জীবনযাত্রা ক্রমে জটিল হয়ে উঠলো। নিজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোও তার সামান্য আয়ে কুলিয়ে উঠতে পারলো না। অথচ এই আয়ের মধ্যেই সংসারের যাবতীয় খরচ চালিয়ে তার স্ত্রী দামী মদ, অন্যান্য টুকিটাকি বিলাসদ্রব্য কি করে কিনতো সে ভেবে পেল না।

তার ঋণ হয়ে পড়লো তাই সে ছন্নছাড়ার মতো টাকার পেছনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। মাস শেষ হতে তখনও এক সপ্তাহ বাকী। পকেটে একটিও সু নেই। ভাবলো কিছু একটা বেচে দিলে মন্দ হয় না। স্ত্রীর গিল্‌টি করা গয়নাগুলোর কথা মনে পড়লো। ওগুলোর প্রতি তার বরাবরের বিরক্তি। ওই গয়না তার বধূর সুন্দর মুখটির স্মৃতি কলঙ্কিত করতো।

উজ্জ্বল ঝকঝকে অলঙ্কারের স্তূপের দিকে সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তার স্ত্রী ওগুলো সঞ্চয় করে গেছে পরম আগ্রহে। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় একটি করে নতুন অলঙ্কার এনে রেখেছে। স্ত্রীর সাধের ভারি নেকলেশটাই সে বিক্রি করবে ভাবলো। দাম আর যা হোক, ছ-সাত ফ্রাঁর কম হবে না, কেননা নকল হীরে হলেও এর কারুকার্য তাকিয়ে দেখবার মতো।

হারটি পকেটে নিয়ে অফিসে যাবার পথে গহনার দোকান হয়ে যাবে মনে করে বুলভার্দের দিকে রওনা হোলো। প্রথম যে দোকানটি পড়লো তাতে ঢুকে পড়ে তার ভারি লজ্জা আর সঙ্কোচ হতে লাগলো। একটা বাজে জিনিস বিক্রি করতে এসে এভাবে নিজের দারিদ্র্য প্রকাশ করছে। দোকানদারকে বললো "মশাই, এটার দাম কত হবে বলুন তো ?"

নেকলেশটি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ধরে নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করার পর লোকটি নিক্তিতে ওজন করলো। আতস কাচ দিয়ে পরীক্ষা করলো। একজন কর্মচারীকে ডেকে নিচু গলায় কি কথাবার্তা বলার

পর কাউন্টারে ফিরিয়ে দিয়ে ফল লক্ষ্য করার জন্য দূর থেকে নীরবে তাকিয়ে থাকলো।

ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে মসিয়ো লাঁতিন বিব্রত বোধ করলো। তার বলতে ইচ্ছে হোলো, "ওটার দাম যে বেশি হবে না সে আমি ভাল করেই জানি।" এমন সময় দোকানদার বললো—"দেখুন, এই নেকলেশটার দাম বার থেকে পনেরো হাজার ফ্রাঁএর মধ্যে হবে। কিন্তু কোথা থেকে পেয়েছেন না জানলে তো আমরা কিনতে পারছি না।"

বিস্ময়ে মৃতদার ভদ্রলোকটির চক্ষু স্থির, দোকানদারের কথা মরমে পৌঁছলো না। জড়িয়ে জড়িয়ে কোন রকমে উচ্চারণ করলো: "যা বললেন ঠিক বললেন তো?" অপরপক্ষ শুষ্ককণ্ঠে বললো: "অন্য জায়গায় যাচাই করে দেখতে পারেন, বেশি পান কিনা। আমার মনে হয় এর দাম পনেরো হাজার ফ্রাঁর বেশি হবে না। এর চেয়ে বেশি না পেলে এখানে আসবেন।"

ব্যাপারটা ভেবে দেখবার জন্য মসিয়ো লাঁতিন নিরালায় যাবার তাগিদ অনুভব করছিলো। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে নেকলেশটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো।

বাইরে এসে প্রাণখুলে হাসতে ইচ্ছা হোলো। মনে মনে ভাবলো: "কি আহাম্মক, যদি ওর কথামতো বিক্রি করে দিতাম বেশ হোতো। ওই স্বর্ণকার এখনও আসল আর নকল মুক্তোর পার্থক্য জানে না।"

কিছুক্ষণ পর রুঁ দ্যলা প্যাই-এর একটি দোকানে প্রবেশ করলো। নেকলেশটি দেখেই মালিক চেঁচিয়ে উঠলো: "দ্যাখো কাণ্ড। এটা আমি খুব চিনি, এখান থেকেই কেনা হয়েছিল!"

বিব্রত হয়ে মসিয়ো লাঁতিন জিজ্ঞেস করলো: "এর দাম কত?"

"আমরা তো পঁচিশ হাজার ফ্রাঁতে বিক্রি করেছিলাম। তবে দেখুন আমাদের কিছু আইনের ব্যাপার আছে। আপনার কাছে

এটা কি করে এলো জানলে পর আমরা আঠারো হাজার ফ্রাঁতে কিনতে রাজী আছি।"

এবার সত্যি সত্যি বিস্ময়ে অঙ্গ অবশ হয়ে গেল। মসিয়ো লাঁতিন বসে পড়ে জিজ্ঞেস করলো :

"কিন্তু—কিন্তু ভালো করে পরীক্ষা করে দেখুন। এক মুহূর্ত আগেও আমার ধারণা ছিল ওটা নকল।"

স্বর্ণকার বললো : "আপনার নাম কি স্যার ?"

"আমার নাম লাঁতিন। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আমি একজন কেরানী। থাকি ১৬ নম্বর রূ ত্য মারতারস্-এ।"

দোকানী তার প্রকাণ্ড খাতার পৃষ্ঠা উল্‌টিয়ে গেল।

"এই নেকলেশটি ১৬ নং রূ ত্য মারতারস্-এ মাদাম লাঁতিনের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল, ১৮৭৬ সনের ২০শে জুলাই।"

পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে তু'জনে দাঁড়িয়ে রইল। বিস্ময়ে বিপত্নীক লোকটির মুখে কথা নেই, দ্বিতীয় জনের চোখে সন্দেহের ভ্রূকুটি। অবশেষে দোকানদারই নীরবতা ভঙ্গ করলো।

"চব্বিশ ঘণ্টার জন্য নেকলেশটা আমাদের কাছে রেখে যাবেন ? আপনাকে তার জন্য একটি রসিদ দেব।"

"নিশ্চয়ই", নির্দ্বিধায় বললো মসিয়ো লাঁতিন এবং রসিদটি পকেটস্থ করে দোকান থেকে বেরিয়ে এলো।

রাস্তা অতিক্রম করে হাঁটতে হাঁটতে খেয়াল হোলো পথ ভুল হয়েছে। আবার তুলারি গার্ডেনের দিকে গেল, সেন নদী অতিক্রম করলো। কিন্তু আবার সেই ভুল।

এবার ফিরলো সাঁজে লিজেতে, মন তখন শূন্য। ব্যাপারটা বুঝবার জন্য মনে মনে যুক্তির জাল বিস্তার করলো। এত দামী গয়না কিনবার সামর্থ্য তার স্ত্রীর থাকবার কথা নয়। কোন মতেই নয়। তবে—তবে এ নির্ঘাত উপহার। উপহার ছাড়া আর কিছু নয়—কিন্তু পেল কার কাছ থেকে ? কেনই বা সে দিল ?

চলতে চলতে পথের মোড়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। কুটিল এক

সন্দেহ ঘনিয়ে এলো মনে। তার স্ত্রী? তবে অন্য গহনাগুলোও নিশ্চয়ই প্রীতি উপহার। পায়ের তলার মাটি দুলে উঠলো, সামনের গাছটি যেন ঘাড়ে এসে পড়তে লাগলো। হাত ছড়িয়ে পথের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লো মসিয়ো লঁাতিন। জ্ঞান হতে দেখলো এক ডাক্তারখানায় শুয়ে রয়েছে। পথের লোকেরা ধরাধরি করে তাকে সেখানে পৌঁছে দিয়েছিল।

তার অনুরোধে দোকানের লোকেরা তাকে বাড়িতে পেঁৗছে দিল। নিজের ঘরে ঢুকে সে অর্গল বন্ধ করে দিল। যাতে গলা দিয়ে আওয়াজ না বেরোয়, সে জন্য মুখে রুমাল পুরে অঝোর ধারে কাঁদলো। শেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহটিকে লুটিয়ে দিল শয্যায়। আর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

ঘরে সূর্যের আলো প্রবেশ করাতে ঘুম ভাঙলো। অফিসে যাবার সময় হয়েছে। এই আঘাতের পর কাজ করা সম্ভব নয়। তার উর্ধ্বতন অফিসারের কাছে ছুটি চেয়ে চিঠি পাঠালো। স্বর্ণকারের দোকানে যাবার কথা মনে পড়লো। লজ্জায় তার মাথা নুয়ে পড়লো, নীরব ভাবনায় অতিবাহিত হোলো দীর্ঘ সময়। কিন্তু ওই দোকানদারের কাছে নেকলেশটা ফেলে রাখা যায় না। তাই পোশাক পরে সে বেরিয়ে পড়লো।

সুন্দর সকাল। হাস্যোজ্জ্বল নগরীর মাথার ওপর সুনীল নির্মল আকাশ। বেকার পথচারীরা পকেটে হাত রেখে নির্ভাবনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের দেখে লঁাতিনের মনে হোলো: ধনীরাই সুখী। টাকা থাকলে গভীরতম দুঃখও ভোলা যায়। যেখানে খুশি যাওয়া যায়, ভ্রমণ করা যায় ও সবকিছু ভুলে থাকা সম্ভব। ওঃ! যদি ধনী হতাম!"

খুব ক্ষিদে পেল, কিন্তু পকেটে ফুটো আধলাও নেই। নেকলশটার কথা মনে পড়লো। আঠারো হাজার ফ্রাঁ। এত টাকা!

আর দেরি না করে সে রু দ্য লা পাইতে গিয়ে উপস্থিত হোলো। দোকানের বিপরীত দিকের রাস্তায় কিছুক্ষণ পায়চারি করলো।

আঠারো সহস্র ফ্রাঁ। প্রায় কুড়িবার চেষ্টা করেও লজ্জায় দোকানে প্রবেশ করতে পারলো না। যথার্থই তার ক্ষিদে পেয়েছে, প্রচণ্ড ক্ষিদে। কিন্তু পকেটে একটি সেঁতও নেই। তাই মনকে আর কিছু ভাববার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত পদে রাস্তা অতিক্রম করে দোকানে প্রবেশ করলো।

তাকে দেখা মাত্র দোকানের মালিক ব্যস্তসমস্ত ভাবে এগিয়ে এসে বিনীত ভাবে একটি চেয়ার এগিয়ে দিল। অন্যান্য কর্মচারীরাও মুখে চোখে হাসি নিয়ে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে তাকে আপ্যায়িত করলো।

দোকানদার বললো : "দেখুন, গহনাটার সম্বন্ধে আমি খোঁজ নিয়েছি। ওটা বিক্রি করাই যদি স্থির করে থাকেন, তবে আমি নিতে রাজী আছি। যে দাম বলেছি সে দামেই।"

"নিশ্চয়ই," মসিয়ো লাঁতিনের জড়ানো উত্তর।

ড্রয়ার থেকে মালিক দীর্ঘাকার এক তাড়া নোট বের করলো। একটি একটি করে গুনে আঠারোটি নোট লাঁতিনের হাতে দিল একটি রসিদে দস্তখত বসিয়ে কাঁপা হাতে লাঁতিন নোটগুলো পকেটে পুরলো।

বেরিয়ে যেতে যেতে আবার একবার ঘুরে দাঁড়ালো। জহুরীর মুখে তখনও হাসিটি লেগে রয়েছে। মাটির দিকে তাকিয়ে লাঁতিন বললো :

"দেখুন—আমার আরও কিছু মণিমুক্তো রয়েছে—একই ভাবে সেগুলো আমার অধিকারে এসেছে। কিনবেন সেগুলো ?"

দোকানের মালিক বিনীতভাবে বললো :

"নিশ্চয়ই, স্যার।"

কর্মচারীদের একজন হাসি সংবরণ করতে পারলো না, অপর জন শব্দ করে নাক ঝাড়তে লাগলো।

রাগে দুঃখে লজ্জায় লাঁতিন গম্ভীরভাবে বললো : "ঠিক আছে, সবগুলো নিয়ে আসবো।"

গয়নাগুলো আনবার জন্য একটা গাড়ী ভাড়া করলো। আবার দোকানে ফিরে আসতে এক ঘণ্টাও লাগলো না। তখনও বরাতে প্রাতরাশ জোটেনি। দোকানের সব ক'জন কর্মচারী কাছাকাছি জমায়েত হোলো। প্রত্যেকটি গহনা ওরা পরীক্ষা করে দেখলো, কত দাম হতে পারে আলোচনা করলো। দাম দিয়ে লাঁতিন তর্ক জুড়ে দিল, রাগারাগি করলো, আগের রেকর্ড দেখবার জন্য পীড়াপীড়ি করলো। মূল্যমানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার মেজাজও উর্ধ্বগতি হোলো।

বড় হীরের দুল দুটির দাম হোলো কুড়ি হাজার ফ্রাঁ, ব্রেসলেট পঁয়তিরিশ হাজার, আঙটি, ব্রোচ আর নক্সাদার হীরের মেডেলগুলোর দাম হোলো ষোল হাজার। এক সেট পান্না ও নীলমণি পাথরের দাম চোদ্দ হাজার, একটি সোনার চেনে নেকলেশের ধরনের মুক্তোখচিত লকেটের দাম চল্লিশ হাজার—সব সুদ্ধ দাঁড়ালো একশ ছিয়ানব্বই হাজার ফ্রাঁ।

জহুরী কৌতুকপূর্ণ উক্তি করলো :

"এ নিশ্চয়ই এমন কোন মহিলার সম্পত্তি যে তার সমস্ত সঞ্চয় এই মূল্যবান মণিমুক্তোর পেছনে ব্যয় করেছে।"

মসিয়ো লাঁতিন গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল : "সঞ্চয়ের সদ্ব্যবহার করতে এ পন্থাটাও কম উৎকৃষ্ট নয়।"

পরদিন আরও একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া হবে—এই কথা ঠিক করে সে বেরিয়ে পড়লো।

পথে বেরিয়ে মনে যেন আনন্দ আর ধরে না। কর্নেল ভেঁদমের মূর্তির ওপর উঠে শিশুর মতো গড়িয়ে গড়িয়ে নামবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হোলো। মুক্ত অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত সম্রাটের প্রতিমূর্তির ওপর দিয়ে ব্যাঙের মতো লাফিয়ে যেতে ইচ্ছা হোলো।

ভোয়াসিনে লাঞ্চ খেল, সঙ্গে কুড়ি ফ্রাঁ দামের এক বোতল মদ। একটা গাড়ি ভাড়া করে বয়ের চারিদিকে ঘুরে বেড়ালো। পথের প্রতিটি মোড়ে পথচারীদের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছা গেল :

"চেয়ে দেখ আমিও একজন বড়লোক। আমার মূল্য ছ'শো হাজার ফ্রাঁ।"

হঠাৎ তার চাকুরির কথা মনে পড়লো। অফিসে সরাসরি বড়সাহেবের ঘরে প্রবেশ করে বললো :

"স্যার, উত্তরাধিকারসূত্রে এইমাত্র তিন লক্ষ ফ্রাঁর মালিক হয়ে গেছি, তাই চাকরিটি ছাড়তে এলাম।"

পুরানো সহকর্মীদের সঙ্গে করমর্দন করলো, ভবিষ্যতে সে কি করবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করলো। তারপর কাফে আঁগলাই-তে ডিনার খেতে গেল।

একজন উচ্চকুলশীল ধোপদুরস্ত ভদ্রলোককে পাশে দেখে নিজেকে জাহির করবার লোভ সংবরণ করতে পারলো না। সগর্বে ঘোষণা করে বসলো—সে এইমাত্র চার লক্ষ ফ্রাঁর একটি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছে।

জীবনে এই প্রথম থিয়েটার দেখতে বিরক্তি এলো না। তারপর বাকী রাত কয়েকজন মেয়েমানুষের সঙ্গে কাটিয়ে দিল।

ছ'মাস যেতে না যেতে আবার বিয়ে করলো। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী স্বভাবে বড় সৎ, কিন্তু মেজাজটি বড় খিটখিটে। আর তার জন্য মসিয়ো লাঁতিনকে দুর্ভোগও পোয়াতে হোলো যথেষ্ট।

## বিক্রয় হইবে

শান্ত সমুদ্রের ওপার থেকে সূর্যদেব যখন ধীরে ধীরে মাথা তুলতে থাকেন, সেই সময় শিশিরসিক্ত সবুজ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে হেঁটে বেড়ানোয়— আহা কি সুখ! পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে এ স্থানের মহিমা যেন হৃদয় স্পর্শ করে। সে এক কল্পলোক। চোখের সম্মুখে আবীর গোলানো সূর্যালোক, মনমাতানো বাতাসের ঘ্রাণ, মৃদু পবনের আলতো স্পর্শ। প্রকৃতি দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে-আসা কয়েকটি মুহূর্ত এত উজ্জ্বল ও পবিত্র হয়ে আমাদের স্মৃতিপটে বিরাজ করে কেন? সোজা পথটি চলতে চলতে গ্রামের প্রান্তে যেখানে হঠাৎ বাঁক নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়, অথবা কোন উপত্যকার প্রবেশ পথ, কোন নদীর সীমানার স্মৃতি কেন আমাদের মনে প্রেমাবেগ জাগায়, কেন দরদী সুন্দরী বধূর মতো স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত করে?

একটি দিনের কথা কখনও ভুলবো না। ব্রিতানির উপকূল অনেকটা লম্বা ভাবে ফিনিস্তারের দিকে এগিয়ে গেছে। কুইম্পার্লের কাছাকাছি ব্রিতানির এই অঞ্চলটি সবচেয়ে সুন্দর ও মনোরম। কোন চিন্তা ভাবনার বালাই নেই। জলের ধার বরাবর হাঁটছিলাম, কিছুটা দ্রুতবেগেই।

বসন্তের একটি সকাল। এমন দিনে মনেও বিশ বছরের সজীবতা ফিরে আসে, অতীতের আশা আর প্রথম যৌবনের স্বপ্ন দোলা দেয়।

এক দিকে সমুদ্র আর অন্য দিকে শস্য ক্ষেত। মাঝখান দিয়ে সিঁথির মতো অপরিসর পথ। শস্যক্ষেতে আন্দোলন নেই, সমুদ্রে মৃদু ঢেউ। সাগরের লবণাক্ত বাতাসে পাকা ফসলের সুমিষ্ট ঘ্রাণ। ব্রিতানির উপকূল জুড়ে পনেরো দিন আগে শুরু করা

আমার নির্ভাবনার পদযাত্রা। দেহে এক উদ্দাম সজীবতা, প্রাণে খুশীর জোয়ার, পদযুগল যেন হালকা মেঘ— হৃদয় পাখীর পালক। হেঁটেই চলেছি, হেঁটেই চলেছি। স্থলচর জন্তুদের মতো অথবা মহাশূন্যের অসীম নীলিমায় সূর্যের আলোয় ডানা ভাসিয়ে-দেওয়া পক্ষিকুলের আনন্দ তখন আমার মনে। দেহ মনের এখন স্বতঃস্ফূর্ত নিবিড় আনন্দের জোয়ারে কোথায় ভেসে গেল ভাবনারাশি। দূর থেকে ভেসে এলো স্তোত্র পাঠ। দূরে কোথায় এক মিছিল গেল, সম্ভবত রবিবাসরীয়। কিছুটা এগিয়ে মোড় ফিরতেই বিস্ময়ানন্দে থমকে দাঁড়ালাম। প্লুনোভিনের দিকে ভেসে চলেছে পাঁচটা মাছধরা নৌকো, পালে তাদের খুশীর হাওয়া। ছেলে মেয়ে শিশুর ভিড়ে উচ্ছল চঞ্চল।

আলতো বাতাসে ধূসর রঙের পাল কখনও একটু ফুলে উঠছে আবার কখনও চুপসে ঝুলে পড়ছে। তীর ঘেঁষে ঘেঁষে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে নৌকোগুলো। সরল গ্রাম্য যাত্রীদের নিয়ে নৌকোগুলো ছন্দে ছন্দে দুলে চলেছে এলোপাতাড়ি। সকলের মিলিত কণ্ঠের গানে আসর সরগরম। পুরুষেরা ধারের পাটাতন ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, মাথায় তাদের লম্বা টুপি, গলায় উদাত্ত সুর। মৃদুমন্দ বাতাসে মহিলাদের প্রাণমাতানো কণ্ঠের শিহরণ। নারী পুরুষের সেই সম্মিলিত প্রাণখোলা গান ছাপিয়ে উঠছে ভাঙা বাঁশির মতো শিশুদের সূক্ষ্ম গলার বেসুরো চিৎকার।

সারবাঁধা পাঁচটা নৌকো চলেছে একের পিছে আরেকটি। সকলের মিলিত একটানা সুরে শান্ত আকাশ কানায় কানায় পূর্ণ। আমাদের সামনে দিয়ে যেতে যেতে তাদের সংগীত মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যেতে লাগলো।

প্রথম যৌবনের সুন্দর স্বপ্নগুলো যেন হাতছানি দিতে লাগলো, আজগুবি যত স্বর্গীয় স্বপ্ন।

জীবনের সেই স্বপ্নরঙিন শ্রেষ্ঠ সুখের দিনগুলো কত তাড়াতাড়ি চলে যায়! নিঃসঙ্গ অবস্থায় মনে মনে সেই অতীত দিনের ভাবনায়

বিভোর হয়ে যেতে পারলে আর কোন দুঃখ, বেদনা, নিরাশা, হতাশা থাকে না। ভাবনার এই রূপকথার জগতে কত অসম্ভব ব্যাপার কত সহজে সম্পন্ন হয়। কল্পনার রঙিন আশ্রয়ে জীবনের চরম বাস্তবও কত মধুময় হয়ে দেখা দেয়। হায়, সে সব দিন অতীত হয়ে গেছে!

কিন্তু কল্পনার কখনও মৃত্যু নেই। শস্যক্ষেতের মধ্যে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলেছি আর ভাবরাজ্যে ভিড় করে আসছে কত ধন, মান, নারী। নুয়ে-পড়া শস্যের শীর্ষদেশ আমার হাতে মেঘকন্যার সজীব কেশরাশির রমণীয় স্পর্শ বুলিয়ে দিল।

অন্তরীপটি খুবই ছোট। তার উন্মুক্ত অপরিসর বেলাভূমির এক কোণে একটি বাড়ি, ক্রমান্বয়ে তিনটি ধাপে ঢালু হয়ে সাগরে নেমে গেছে।

বাড়িটি দেখে কেন যে আমার মনে আনন্দের শিহরণ খেলে গেল জানি না। কখনও কখনও এ ধরনের ভ্রমণে এমন অভিজ্ঞতা হয়। কোন অজানা দেশের প্রান্তে এসে মনে হয় এ স্থান পূর্ব পরিচিত। মনে হয়, এ স্থান কখনও দেখিনি, এখানে কোন পূর্ব জন্মে বাস করিনি— এও কি সম্ভব। প্রতিটি দ্রষ্টব্য বস্তু, দিগন্তের মৃদু আন্দোলন, তরুশ্রেণী, মৃত্তিকার বর্ণ— প্রতিটি ধূলিকণাই মনে জাগায় হিন্দোল, প্রাণ আনে বিমল আনন্দ।

সিঁড়ির উঁচু ধাপ থেকে সোজা উঠে এসেছে রম্য এক গৃহ। ধাপে ধাপে জলের দিকে নেমে-যাওয়া প্রকাণ্ড সোপানের দুই দিকে নানা ধরনের সুবিশাল ফলবৃক্ষ। সিঁড়ির ধারে ধারে স্পেনদেশীয় সুপুষ্ট কাশগুচ্ছ স্বর্ণমুকুরের মতো শোভাময়। এই বাস-গৃহটিকে হঠাৎ আমার ভাল লেগে গেল, চলতে চলতে পা দুটো থমকে দাঁড়াল। ওই বাসগৃহের মালিক হয়ে বাকি সময়টা ওখানেই কাটিয়ে দিতে মন গেল।

দুরু দুরু বক্ষে যথেষ্ট শঙ্কা নিয়ে ঘরটির দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রবেশ দ্বারের একদিকের পিলারে বেশ বড়সড় একটি নোটিশের

দিকে আমার চোখ পড়লো, 'বিক্রয় হইবে'। আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে আমার মন নেচে উঠলো। বাড়িটা যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করছে, যেন আমারই হয়ে গেছে। কিন্তু এমন হবার কারণ কি? তা বলতে পারবো না।

'বিক্রয় হইবে'। অর্থাৎ কিনা এখন আর এটা কোন ব্যক্তি-বিশেষের অধিকারে নয়। পৃথিবীর যে কেউ এর মালিক হতে পারে। এমন কি আমিও পারি। আমিও। কিন্তু তা বলে এত আনন্দের কি আছে, এমন হৃদয়-দোলানো আনন্দ, এমন অবুঝ অবাধ আনন্দানুভূতি? ভাল করেই জানতাম এ বাড়ি কেনার ক্ষমতা আমার নেই। কোথা থেকে দাম দেব? কিন্তু 'বিক্রয় হইবে' এটাই বড় কথা। খাঁচার পাখি মালিকের সম্পত্তি, কিন্তু আকাশের পাখির কোন মালিক নেই— তাই সে আমার।

বাগানে প্রবেশ করলাম। চমৎকার উদ্যান। ধাপে ধাপে উঠে গেছে বাঁধানো সিঁড়ি। মাঝে মাঝে প্রস্তর মূর্তি, ক্রুশবিদ্ধ বিপ্লবীর মত দুই হস্ত প্রসারিত। থরে থরে পুষ্পসহ সোনালী কাশগুচ্ছ। প্রতিটি ধাপের পাশে দুটো করে প্রাচীন ডুমুর গাছ।

শেষ ধাপে পৌঁছে চতুষ্পার্শে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। পদতলে অপ্রশস্ত বালুকাবেলা। সম্মুখে অতিবৃহৎ তিনটি ধূসর প্রস্তর খণ্ড সমুদ্রের জল থেকে স্থানটিকে আড়াল রেখেছে। বুঝলাম ঝড়ের দিনে ওগুলোই প্রচণ্ড জলোচ্ছাস থেকে এই অন্তরীপকে রক্ষা করে।

বিপরীত দিকের তৃণশয্যায় অদ্ভুত-দর্শন দুটো প্রকাণ্ড প্রস্তর। একটি মাটিতে শুয়ে, অপরটি দাঁড়ানো। কোন অভিশাপের জাদুমন্ত্রে শিলীভূত কোন স্বামী-স্ত্রী, মহাকালের সাক্ষী হয়ে ছোট ঘরটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। অন্তরীপটির সুদীর্ঘ শতাব্দীর নির্জনতার একমাত্র সাক্ষী। বিক্রির জন্য তৈরী এই ছোট ঘরটিকে তারা চোখের সামনে গড়ে উঠতে দেখেছে, আবার একদিন একটু একটু করে ধসে ধসে অতলান্ত মহাকালের গর্ভে তলিয়ে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যাবে— তাও দেখবে।

হায় বৃদ্ধ ভোলমেন আর বৃদ্ধা মেনহির, তোমাদের আমি কত ভালবাসি।

এমন ভাবে দরজায় কড়া নাড়লাম যেন এ বাড়ি আমার। কালো গাউন পরা এক বৃদ্ধা এসে দরজা খুললো। দেখতে কর্মরত সন্ন্যাসিনী, শুভ্র জিরজিরে চেহারার বেচারা দাসী। মনে হোলো এই মহিলাও আমার পূর্ব পরিচিত।

বললাম : "তুমি নিশ্চয় ব্রিতানির লোক নও, তাই নয় ?"

"না স্যার," সে বললো, "আমি লোরেঁ থেকে এসেছি।" একটু থেমে বললো : "আপনি বোধহয় ঘরটা দেখতে এসেছেন ?"

"হ্যাঁ তাইতো এসেছি।"

ভেতরে প্রবেশ করলাম। মনে হোলো সবই আমার চেনা, এই দেওয়াল, আসবাবপত্র। বরং বড় ঘরে আমার ছড়িটি না দেখতে পেয়ে আশ্চর্য লাগলো।

এরপর গেলাম বসবার ঘরে। চমৎকার ঘর। মেঝেয় নরম মাদুরের কার্পেট। তিনটি প্রশস্ত বাতায়ন পথে উন্মুক্ত সমুদ্রের দৃশ্য। চুল্লির ওপর দিকের তাকে চীন দেশীয় কতকগুলো ফুলদানী ও একটি রমণীর মস্ত ওক বাঁধানো ছবি। কাছে গিয়ে প্রত্যয় হোলো সেও আমার পরিচিত। কোন দিন চাক্ষুষ না দেখলেও তাকে চিনতে পারলাম। কামনার ধন, সুদীর্ঘকাল যার প্রতীক্ষায় অতিবাহিত করেছি, এই নিঃসন্দেহে আমার সেই স্বপ্নসুন্দরী। এই মেয়েকেই লোকে সর্বদা সর্বত্র খুঁজে বেড়ায়, পথে বেরিয়ে একেই দেখতে চায়, গোধূলির আলোয় বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে এমন বালার সন্ধানে চোখ ছুটে যায় মেঠো পথে ; ভ্রমণকালে কোন হোটেলে, রেলের কামরায় অথবা সদ্য উন্মুক্ত এই ড্রইংরুমে এমন একজন মেয়ের প্রত্যাশাই মন করে থাকে।

এ যে সেই, কোন সন্দেহ নেই। এ সেই। এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ ইংরেজ মহিলার আদলে আঁচড়ানো

তার চুল, সর্বোপরি তার মুখ দেখে চিনতে ভুল হোলো না। তার হাসিটি বহুপূর্বেই হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছি।

জিজ্ঞেস করলাম :

"কে এই মহিলা ?"

সন্ন্যাসিনীর মতো দাসীটির নিরুত্তাপ কণ্ঠের উত্তর : "ও মাদাম।"

আমার প্রশ্ন : "তোমার মালিক ?"

যথারীতি নির্বিকার জবাব : "আজ্ঞে না, স্যার।"

একটি আসনে বসে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললাম : "ওর কথা কিছু বল।"

ও আশ্চর্য হয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো। তখনকার নীরবতা যেন দুর্বিনীত ঠেকলো। তা বলে অত সহজে ছাড়বার পাত্র আমি নই। বললাম :

"ওই তবে এ বাড়ির মালিক।"

"আজ্ঞে না, স্যার।"

"তবে এ বাড়ি কার ?"

"আমার প্রভু, মসিয়ো ভুরনেলের।"

ফটো নির্দেশ করে বললাম :

"আর এই মহিলাটি কে ?"

"ও হচ্ছে মাদাম।"

"তোমার মালিকের স্ত্রী ?"

"আজ্ঞে না, স্যার।"

"তবে তার রক্ষিতা ?"

সন্ন্যাসিনীর মুখে কথা নেই। কিন্তু তা বলে আমার নীরব থাকা চলে না। আমার আগে যে ভাগ্যবান এ মেয়ের হদিস পেয়েছে, তার ওপর আমার প্রচণ্ড ঈর্ষা, দুর্দমনীয় ক্রোধ।

"ওরা এখন কোথায় ?"

দাসীর মুখে স্বগতোক্তির মতো অস্পষ্ট কথা :

"ভদ্রলোকটি এখন প্যারিসে, আর মহিলাটি যে কোথায় আছে আমি জানি না, মসিয়ো।"

চমকে উঠলাম।

"আচ্ছা! তবে এখন আর তারা একসঙ্গে নেই?"

"না, স্যার।"

কৌতূহল বেড়ে গেল। কিন্তু শান্তভাবে বললাম :

"কি হয়েছিল বল দেখি, তোমার প্রভুর কিছু উপকারে আসতে পারি। মহিলাটিকে আমি চিনি, স্বভাবটি বিশেষ সুবিধার নয়।"

বুড়ি দাসীটি ভালভাবে নজর করে দেখলো। আমার সততায় যেন আস্থা হোলো। বললো :

"কি বলবো, স্যার, ওই আমার প্রভুর মাথাটি খেয়েছে। দুজনের প্রথম সাক্ষাত হয় ইতালীতে। তার পর থেকে বিবাহিত স্ত্রীর মত তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। মেয়েটির গানের গলা ছিল চমৎকার। ওর ভালবাসায় বাবুটি এমন পাগলের মতো হয়ে গেলেন, তাঁকে দেখলে কষ্ট হোতো। গত বছর একসঙ্গে এ জেলায় বেড়াতে এসে এ বাড়িটা আবিষ্কার করেন। এ বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন এক নির্বোধ, বোকা বুড়ো। গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে নির্জনে থাকবার তার সাধ হয়েছিল। আর বাড়িটা দেখামাত্রই কিনে ফেলবার জন্য সাধ হোলো মাদামের। আমার প্রভুর সঙ্গে নিরালায় থাকতে পাবে তাই। আর তাকে খুশী করতে প্রভুর অসাধ্য কিছুই ছিল না।

"সারাটা গ্রীষ্ম এবং সারাটা শীত তাঁরা এখানে কাটালেন। তারপর একদিন সকালে জলখাবার সময় মসিয়ো আমাকে ডেকে পাঠালেন।

" 'সিজারে, মাদাম ফিরেছে কি?'

" 'না তো স্যার।'

"সারাদিন অপেক্ষায় কাটালাম। প্রভুটি আমার পাগলের মতো হয়ে গেল। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ করা হোলো। কিন্তু

কোথায় এবং কিভাবে গেল, একটা রহস্যের মতো হয়ে রইল চিরকাল।"

সহসা আমার মনে যেন আনন্দের সহস্র রোশনাই ঝলসে উঠলো। এই সন্ন্যাসিনীকে কোমর জড়িয়ে ধরে বৈঠকখানা ঘরে নাচতে ইচ্ছা গেল।

ওঃ, সে চলে গেছে! এই লোকটির ওপর বিরক্ত ও কুপিত হয়ে ও ছেড়ে গেছে জন্মের মতো। আমি কত সুখী!

বৃদ্ধা দাসী বলে চললো :

"সেই থেকে শোকে মৃতপ্রায় হয়ে মসিয়ো প্যারিসে চলে গেছেন। এখানে আমাকে আর আমার স্বামীর ওপর বাড়ি বিক্রির দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। কুড়ি হাজার ফ্রাঁ পেলে বাড়িটি ছেড়ে দেবেন।"

আমার কানে কথা প্রবেশ করছিল না। শুধু তার কথা ভাবছিলাম। মনে হোলো এবার বেরিয়ে পড়লে নির্ঘাত তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। বাড়িটিকে সে নিশ্চয়ই ভালবেসে থাকবে আর ওই লোকটি চলে গেছে জেনে নিশ্চয়ই এমন বসন্তের দিনে সুন্দর বাড়িটি একবার দেখতে আসবে।

বৃদ্ধার হাতে দশ ফ্রাঁ গুঁজে দিয়েই এক ঝটকায় ফটোটিকে নামিয়ে এনে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এলাম। আর ওই ফ্রেমের মধ্যে থেকে তাকিয়ে-থাকা সুন্দর মুখখানার ওপর অজস্র চুমো ঢেলে দিলাম।

পথে নেমেই আমার চলা শুরু। চোখ তার দিকে, তার সজীব দেহবল্লরীর প্রতি স্থির নিবদ্ধ। ওর ওভাবে বেরিয়ে আসা, এই মুক্তি পাওয়া যেন এক গৌরবজনক ঘটনা। আজ হোক কাল হোক, আগামী এক অথবা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নির্ঘাত ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে। কেননা ওই লোকটিকে ও ছেড়ে দিয়েছে। আর ওকে ছেড়েছে কেননা এখন আমার সময় সমাগত।

এই পৃথিবীরই কোন অংশে এখন সে মুক্ত বিহঙ্গ। চিনতাম, এখন শুধু খুঁজে বের করা।

চলার পথে ফলভারে অবনত শস্যক্ষেত্র অঙ্গে বুলিয়েছিল স্নেহ-স্পর্শ, পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে বুকভরে পান করলাম সমুদ্রের বাতাস, আর মুখে পেলাম সূর্যের আলোর প্রসাদচুম্বন। গতি আমার সম্মুখে, মনে স্থির প্রত্যয়— তার সঙ্গে শীঘ্রই দেখা হবে এবং আবার ফিরে আসবো। 'বিক্রয় হইবে' বিজ্ঞাপন-ঝোলানো বাড়িটিতে। এবার আমাদের পালা। আর এবারের প্রমোদ বন্যায় সে কি ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে সেটাই দ্রষ্টব্য।

কম্‌পারদি এদেন ক্ল্যনা থিয়েটারের 'ধুরন্ধর' ম্যানেজার, নাট্য সমালোচকেরা একবাক্যে সবাই তাকে ঐ নামই দিয়েছে, সেই কম্‌পারদি ভবিষ্যৎ বা দুর্দিনের পরোয়া না করেই তার শেষ কপর্দক পর্যন্ত থিয়েটারে ঢেলেছে। অতীতে মাসের পর মাস কেটেছে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে, কিন্তু এখন তার কপাল ফিরেছে। সারা সপ্তাহ ধরে রাস্তার দেওয়ালে দেওয়ালে, দোকানে দোকানে কারখানার গায়ে, এমনকি গাছে গাছে পর্যন্ত বর্ণাঢ্য প্রাচীরপত্রে বিজ্ঞাপন বেরোল, এবং প্যারিসের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি সমস্ত গাড়ি ঘোড়ার গায়ে দেখা গেল শেরেত-এর আঁকা ছবি,—প্রাচীন মল্লবীরদের মতো দুটি শক্ত সমর্থ, সুঠাম চেহারার পুরুষ। দুজনের মধ্যে ছোটজন হাত গুটিয়ে ভবঘুরে সঙ্ সেজে বোকার মতো ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে আছে, অন্যজন যার পোশাক মেক্সিকান শিকারীর মতো, হাতে একটা রিভলভার নিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত পত্র পত্রিকায় বড় করে বিজ্ঞাপন ছাপা হোলো যে, আসছে সোমবার 'এদেন ক্ল্যনা' থিয়েটারে মতেঁফিওরে ভাইদের অবশ্যই দেখতে পাবেন।

বিজ্ঞাপন প্রচারের কারসাজিতে লোক আকৃষ্ট হোলো, সকলের মুখে ঐ এক কথা। খামখেয়ালী মেয়েছেলে রোজ পেশে, যে সন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে পা-বাড়ানো এক সতেরো বছরের কিশোরের প্রেম চোখে দেখার জন্য গত শরৎকালে কৌতুক নাটক 'ওসকা ইসকার' অভিনয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের মাঝপথেই উধাও হয়েছে, মতেঁফিওরে ভাই দুটি শৌখিন গয়নার মতো সেই রোজের ফাঁকা জায়গায় খাপ খেয়ে গেল। তাদের অভিনব এবং দুরূহ অভিনয়ের গুণে দর্শকের কৌতূহল তীব্র হয়ে উঠলো, কারণ তাদের অভিনয়ের মধ্যে

যেন মৃত্যুর হাতছানি, প্রচণ্ড আঘাত বা রক্তপাতের একটা আশঙ্কা ফুটে ওঠে এবং ওরা যেন তুড়ি মেরে সেই আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়। এই বেপরোয়া ভাবে মেয়েরা খুব খুশী হয়; এই ভাব তাদের আকর্ষণ করে, নিষ্ঠুর আনন্দ ও ভাবাবেগের আতিশয্যে তারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ফলে বিরাট থিয়েটার হলের সবগুলো আসন দেখতে না দেখতেই ভরতি হয়ে যেতে লাগলো এবং আগে থেকেই বেশ কয়েক-দিনের অগ্রিম টিকিট'ও বিক্রি হতে থাকলো। আর জবরদস্ত কম্‌পারদি (তাসের একটি খেলায় যার হাত থেকে মদের গ্লাস খসে পড়তে বসেছিল), এখন রঙিন পানীয়ের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলে ফেললো :

"আর যাবে কোথায়। ঈশ্বরেচ্ছায় তুরুপ করে এবার আমি বাজিমাত করেছি।"

* * *

কাউন্টেস রেজিনা দ্য ভিলেবি তাঁর একান্ত নিজস্ব ঘরটিতে সোফায় গা এলিয়ে বসে আয়েস করে হাওয়া খাচ্ছিলেন। সাঁ মারস মঁতালভিঁ, টম শেফিল্ড ও তার মাসতুতো বোন মাদাম দ্য রায়েল, একজন ক্রেয়ল* যে পাখীর গানের মতো কলকল করে অবিরাম হেসে যাচ্ছিলো এমনি দু'চারজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া সেদিন আর কেউ আসেনি। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, সাঁজে-লিজের পথ ধরে ধাবমান গাড়িগুলোর ঘর্ঘর শব্দ দূর থেকে যেন ঘুমের আবেশ আনে। ঘরময় ফুলের নরম গন্ধ; তখনও বাতি জ্বালা হয়নি, গল্প গুজব এবং হাসি মস্করায় মেশা এলোমেলো শব্দে ঘর ভরে আছে।

সাঁ মারস তাঁর ভক্তের সঙ্গে নিচু গলায় প্রেমালাপ জুড়ে দিলেন, কাউন্টেস হঠাৎ তাঁর আঙুলে টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি চা-টা ঢালবে?" ছোট চীনা পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে তিনি প্রশ্ন করলেন: "আচ্ছা, খবরের কাগজে যে রকম লিখছে, মঁতে-ফিওরেরা সত্যিই কি তত ভাল করছে?"

* পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী, যাদের পূর্বপুরুষ ইউরোপীয়।

এবার টম্‌ শেফিল্ড এবং অন্যান্যরাও এই মুখরোচক আলোচনায় যোগ দিলেন। সকলেই ঘোষণা করলেন যে এমনটি তাঁরা এর আগে আর কখনও দেখেননি; ষাঁড়ের লড়াই দেখাতে গিয়ে ষণ্ডা ছুটো যখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গোঁয়ারের মতো রাগে ফুঁসতে থাকে, আতঙ্কে গায়ে কাঁটা দেয়, সে দৃশ্য দারুণ রোমাঞ্চকর।

কাউন্টেস রেজিনা নীরবে শুনতে শুনতে পেয়ালা থেকে চা পাতার টুকরো খুঁটে ফেলছিলেন।

চঞ্চল মাদাম দ্য রুয়েল উত্তেজনায় বলে বসলেন: "ইস্‌, দেখতে পেলে কী মজাই না হোতো!"

"কিন্তু বোন, একজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে কোন অনুচিত জায়গায় দেখতে পাওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক।"— গুরুমশাইয়ের মতো ভারিক্কি গলায় কাউন্টেস রায় দিলেন।

সকলেই তাঁর সঙ্গে একমত হলেন। তবু দেখা গেল, দু'দিন পর মাদাম দ্য ভিলেবি নিজেই কালো পোশাকে গা ঢেকে, মোটা কাপড়ের ওড়না দিয়ে মুখ আড়াল করে একটা স্টেজ বাক্সের পেছনে বসে মঁতেফিওরেদের অভিনয় দেখছেন।

মাদাম দ্য ভিলেবি ছিলেন একটা ইস্পাতের ঢালের মতো ঠাণ্ডা। মাদাম পড়াশুনো করেছেন কনভেন্ট স্কুলে, যেখানে স্নেহ-মমতা বা স্বামীকে ভালবাসার কোন শিক্ষাই পাননি। তারপর স্কুল ছাড়তে না ছাড়তেই বিয়ে হয়ে গিয়েছে; প্রতি রবিবার প্রার্থনা সঙ্গীতের শেষে তিনি যখন মাদেলাঁ্য গির্জার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসেন, তাঁর প্রশান্ত মুখমণ্ডলে এমন স্বর্গীয় পবিত্রতার ভাব ফুটে ওঠে যে অতি বড় নিন্দুকেও তাঁকে সন্ন্যাসিনী ভেবে শ্রদ্ধা না করে পারে না।

কাউন্টেস রেজিনা স্নায়বিক উত্তেজনায় টান টান হয়ে বসলেন, মুখের রক্তকে যেন শুষে নিয়েছে, একটি বেহালার তারের মতো এমন থরথর করে কাঁপতে লাগলেন যেন কোন যন্ত্রশিল্পী সেই বেহালায় উন্মাদনাময় সুরের ঐকতান বাজাচ্ছে। নোংরা কাঠগুঁড়োর গন্ধ

তিনি প্রাণভরে টেনে নিলেন, যেন অজানা কোন ফুলের তোড়ার সুগন্ধ শুঁকছেন, হাত দুটি শক্তভাবে মুঠো করে ধরে সঙের দিকে লোভীর মতো একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন—এরাই সেই ব্যক্তি, যাদের প্রতিটি অভিনয়ের কৃতিত্ব অগণিত দর্শকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছে। মুক্ত আলো হাওয়ায় বেড়ে-ওঠা বন্য জন্তুর মতো প্রাণবন্ত এই দুটি পুরুষের সঙ্গে তিনি ইংরেজ বরের সাজে সজ্জিত জবুথবু রিকেট রোগীর মতো দুর্বল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তুলনা করে অদম্য ঘৃণায় শিউরে উঠলেন।

*　　　*　　　*

কাউণ্ট দ্য ভিলেবি এবার কাউন্সিলার জেনারেল পদে প্রার্থী হবেন, তাই নির্বাচনী প্রচারের জন্য তিনি শহরতলীতে গেছেন; যে দিন তিনি রওনা হয়ে গেলেন, ঠিক সেই দিনই সন্ধ্যায় রেজিনা আবার গিয়ে 'এদেন র‍্যানা' থিয়েটারের স্টেজ বাক্স দখল করে বসলেন। যেন কোন প্রণয়োদ্দীপক পানীয় খেয়ে মাতাল হয়ে গেছেন, দেহজ কামনায় এমনি বেসামাল হয়ে তিনি এক টুকরো কাগজে কয়েকটি শব্দ লিখে দিলেন— সেই শাশ্বত রীতি, এমন অবস্থায় পড়লে মেয়েরা যে রীতি অনুসরণ করে।

"অভিনয় শেষে মঞ্চের দরজায় তোমার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করবে— এক অপরিচিতা— যে তোমায় ভালবাসে।"

একজন বেয়ারার হাত দিয়ে তিনি চিরকুটখানি পিস্তল খেলায় বিজয়ী মঁতেফিওরে ছোকরার হাতে পৌঁছে দিলেন।

ওঃ! দুর্গন্ধে ভরা গাড়ির মধ্যে সেই প্রতীক্ষা যেন আর ফুরোতে চায় না, অদম্য আবেগ, নিদারুণ বিরক্তিতে গা গুলান ভাব, ভয়— নানা ধরনের মিশ্র ভাবাবেগে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। একবার ইচ্ছে হোলো, কোচ-বাক্সে বসে ঘুমে ঢুলছে যে গাড়োয়ান, তাকে জাগিয়ে নিজের ঠিকানা দিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিতে বলবেন। কিন্তু তিনি জানালায় মুখ রেখে এক ঠায় বসে বসে অন্ধকার যাতায়াত পথ— যেখানে গ্যাসের আলোয় 'অভিনেতাদের প্রবেশ পথ'

লেখাটা জ্বল জ্বল করছে, তার দিকে যন্ত্রের মতো তাকিয়ে থাকলেন ; মাঝে মাঝে লোকজন ব্যস্ত পায়ে ছুটে যাচ্ছে, চেঁচিয়ে কথা বলাবলি করছে এবং ফুরিয়ে-আসা সিগারেটে শেষ টান দিয়ে নিচ্ছে। তিনি এমন ভাবে বসে আছেন যেন গাড়ির কুশনের সঙ্গে কেউ তাঁকে আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়েছে, অধৈর্য হয়ে গাড়ির পাটাতনে ঠুক্ ঠুক্ করে পা ঠুকছিলেন।

অভিনেতাটি, যে ব্যাপারটাকে একটা রঙ্গ বলেই ধরে নিয়েছিল, যখন এল, মহিলার মুখ দিয়ে কথা সরলো না ; কারণ ভেজাল মদের মতোই দুষ্ট আনন্দ নেশায় মাতাল করে। সামনাসামনি এমন সরাসরি আত্মসমর্পণ, এবং এই দুর্বার অশালীনতা দেখে লোকটি ভাবল যে সে একটা বাজারে মেয়ের পাল্লায় পড়েছে।

রেজিনার সারা অঙ্গ জুড়ে নিষিদ্ধ আনন্দ আর নানা অনুভূতির ঢেউ খেলতে-লাগলো। তিনি অভিনেতার কাছ ঘেঁষে এলেন, এবং তাঁর কাঁচা বয়স, ও অসাধারণ রূপ দেখাবার জন্য ওড়না তুলে ধরলেন। তাদের মধ্যে একটিও কথা হল না, যেন লড়াইয়ের আগে মুখোমুখি দুই মল্ল যোদ্ধা। অভিনেতার গাঢ় আলিঙ্গনে ধরা দেবার আকাঙ্ক্ষায়, তার কাছে নিজেকে সঁপে দেবার বাসনায় এবং পরিশেষে সেই নৈতিক অশুচিতা— সাধ্বী স্ত্রী হিসেবে যার স্বাদ তিনি কোনদিনই পাননি— সেই অজানা আনন্দ লাভের প্রত্যাশায় তিনি উদ্গ্রীব হয়েছিলেন। যখন তাঁরা একত্রে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, যে হোটেলে বেশ কয়েক ঘণ্টা তাঁদের কেটেছে প্রেমাসক্ত হরিণের মতো, লোকটি তখন অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে টলতে টলতে কোনক্রমে দেহটাকে টেনে নিয়ে চলেছে, আর রেজিনার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত, যদিও শুচি-শুভ্র কুমারীর সরল স্বর্গীয় সৌন্দর্য— রবিবারের প্রার্থনা শেষে তার মুখে যে সৌন্দর্যের ছায়া পড়ে, সেই সৌন্দর্য ভাণ্ডার তিনি প্রদর্শন করেছিলেন।

এরপর তিনি দ্বিতীয় জনকে আমন্ত্রণ করলেন। ছেলেটি ভারী আবেগপ্রবণ এবং তার মাথাটা নানা রঙীন কল্পনায় ঠাসা। এই

অপরিচিতা নারী যে তাকে নিয়ে খেলনার মতো খেলছে, একথা কিছুতেই তার মাথায় ঢুকতো না। সে ভাবতো মহিলা বোধহয় তাকে সত্যিই ভালবাসে, তা এই গোপন মিলনে তার তৃপ্তি হোতো না। সে তার পরিচয় জানবার জন্য কাকুতি মিনতি করতো, আর মহিলা তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেন। এরপর কাউণ্টেস দুই সঙকে পালা করে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু দুজনের কেউই তা জানত না, কারণ মহিলার বারণ ছিল তার সম্বন্ধে কোন কথা অন্যকে জানানো চলবে না, জানালে তাকে চিরতরে হারাতে হবে। একদিন ছোটভাই প্রেমিকার পায়েব কাছে হাঁটু গেড়ে বসে সরল আদরমাখা স্বরে বললো :

"তুমি কত দয়ালু, আমাব মতো লোককেও ভালবেসে কাছে টেনে নিয়েছো! আমি ভাবতাম কেবল মাত্র উপন্যাসেই এমন ঘটনা ঘটে, এবং সম্ভ্রান্ত মহিলারা আমাদের মতো গরীব, বাউণ্ডুলে সঙদেব নিয়ে কেবল মাত্র হাসি তামাশাই করে!"

রেজিনার সোনালী ভুরু কুঁচকে উঠলো।

অভিনেতা বলে চললো : "রাগ করো না লক্ষ্মীটি, পিছু ধাওয়া করে তোমার বাসা কোথায় এবং তোমার আসল নাম কি সব জেনে নিয়েছি। তুমি আসলে একজন কাউণ্টেস, ধনী, বিরাট ধনী।

"তুমি একটা আস্ত গাড়ল।" রাগে কাঁপতে কাঁপতে কাউণ্টেস জবাব দিলেন : "লোকে যেভাবে একটা বাচ্চা ছেলেকে ভোলায়, তোমাকেও সেইভাবে ঠকিয়েছি।"

তিনি ভাবলেন, এই বেকুবটাকে নিয়ে আর নয়, ও নামধাম জেনে ফেলেছে, কাজেই হয়ত বদনাম রটতে পারে। কাউণ্ট হয়ত ভোরের আগেই গ্রাম থেকে ফিরবেন আর এখনই সঙ তাকে ভালবাসতে শুরু করেছে। তাঁর কোমল চাঁপার মতো আঙুলে একটু টোকা দিলে যারা তাঁর গায়ে লুটিয়ে পড়তে পারে, সেই দুই অনুগত প্রেমিকের জন্য তাঁর মনে এখন আর কোন অনুভূতি নেই। এবার পরবর্তী অধ্যায়ে পা বাড়াতে হবে, অন্য কোথাও নতুন আমোদের খবর নিতে হবে।

পরদিন রাত্রে পিস্তল খেলায় বিজয়ী ভাইকে রেজিনা বললেন : "শোন, তোমার কাছে কিছু লুকোতে চাই না। তোমার সঙ্গীকে আমি পছন্দ করি ; তার কাছে আমি— আমি আত্মসমর্পণ করেছি, কাজেই তোমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না।"

"আমার সঙ্গী!" লোকটি উচ্চারণ করলো।

"কেন, তাতে দোষ কি! এই মুখ বদলানোয় আমার মজাই লাগে।"

লোকটি ক্রুদ্ধ গর্জন করে ঘুষি পাকিয়ে রেজিনার দিকে ছুটে গেল। তিনি ভাবলেন লোকটা বোধহয় তাকে খুন করবে, তাই ভয়ে চোখ বুজে রইলেন ; কিন্তু এই কোমল দেহ— যে দেহ সে কত অসংখ্য বার আদরে আলিঙ্গনে ঢেকে দিয়েছে, তাতে আঘাত করার সাহস তার ছিল না। হতাশায় তার মাথা নুয়ে পড়ল, খরখরে নীরস গলায় সে বললো : "উত্তম, তোমার যখন ইচ্ছে নয়, আমাদের আর দেখা হবে না।"

'এদেন র‍্যানা' থিয়েটারে তিল ধারণের জায়গা নেই, বেহালায় কোমল এবং মনমাতানো গাঙ্গল-এর ওয়ালস্* বাজনার সুর বাজছে, যে সুরে রিভলভার তাক করবার ইঙ্গিত রয়েছে।

শেরেত-এর আঁকা ছবিতে যেমন দেখা গেছে, ঠিক সেইভাবে দুই মঁতেফিওরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানে বারো চোদ্দ গজের ব্যবধান। ছোটজনের ওপর বিজলী আলোর ফোকাস ফেলা হয়েছে, একটা বড় কাঠ-বোর্ডের নিশানার গায়ে ঠেস দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে, এবং অন্যজন অতি ধীরে ধীরে একটির পর একটি গুলি ছুঁড়ে তার জীবন্ত দেহের চারধারে একটা রেখা চিত্র এঁকে দিচ্ছে। বিস্ময়কর দক্ষতায় একজন গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছে আর কাঠ-বোর্ডের গায়ে কালো কালো বিন্দু দিয়ে আর একজনের দেহের ছবি আঁকা হয়ে যাচ্ছে। বাজনার সুর ডুবিয়ে দিয়ে মুহুর্মুহু শোনা যাচ্ছে দর্শকের সপ্রশংস হাততালি, ঠিক এমনি সময় একটা তীক্ষ্ণ ভয়ার্ত

* এক ধরনের নাচের বাজনা

চিৎকার হল ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হোলো। মেয়েরা মূর্চ্ছা গেল, বেহালা থেমে গেল, দর্শকদের মধ্যে ধাকাধাকি শুরু হোলো। নবম গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ভাই মাংস পিণ্ড হয়ে ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়েছিল, তার কপালে একটা ফুটো হয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছিল। তার ভাই স্থাণুর মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল, চোখে মুখে উন্মত্ততার ছাপ। কাউন্টেস দ্য ভিলেবি তখনও তাঁর স্টেজ বাক্সের আসনে বসে শান্ত মনে আরাম করে হাতপাখা ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছেন, এত প্রশান্ত যেন প্রাচীন পুরাণে বর্ণিত কোন নিষ্ঠুর দেবী।

পরদিন বিকেলে চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে, তাঁর ছোট আরামদায়ক জাপানী বৈঠকখানায় যখন রোজকার বন্ধু বান্ধবেরা তাঁকে ঘিরে ধরেছে, শুনে হতবাক হতে হবে যে কত অনায়াসে, নিরুত্তাপ এবং উদাসীন গলায় রেজিনা ঘোষণা করলো :

"লোকে বলাবলি করছে ঐ দুজন নামকরা সঙের একজনের নাকি কি একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, কি যেন নাম ওদের মঁতামঁতে—নামটা কি, টম্?"

"মঁতেফিওরে, মাদাম!"

এরপর আনজেল ভেলোর যিনি প্রিন্স স্টোরবেককে বিয়ে করার আগে ভ্র্যোত হোটেলে ফ্ল্যাট ( Folies ) কিনতে যাচ্ছেন, তাকে নিয়ে তাদের কথাবার্তা শুরু হোলো।

# যখন মোরগ ডাকলো

ব্যারন জোসেপ দ্য ক্রোসার্দ একজন হতাশ প্রেমিক। মাদাম বার্থা দ্য এভঁাসেলেসকে সে ভালবাসে, কিন্তু কিছুতেই যেন তার মন পায় না। মাদামকে খুশী করবার জন্য শীতকালে প্যারিসে অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে তার সঙ্গী হয়েছিল, এখন আবার প্রেমিকার সম্মানে নরমান্দির কারাভিলে পল্লী নিবাসে শিকার ও পান ভোজনের ঢালাও আয়োজন করেছে, কিন্তু মাদাম ব্যারনকে ঠেকিয়ে রেখেছে।

মসিয়ো দ্য এভঁাসেলেস এসব ব্যাপারে নাক গলাতো না। লোকে বলতো শারীরিক অক্ষমতার জন্য সে স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতো। মাদাম এজন্য স্বামীকে কোনদিনই ক্ষমা করতে পারে নি। মসিয়ো ছিল অত্যন্ত কদাকার, বেঁটে, মোটা, মাথায় টাক। খাটো হাত পা, খাটো ঘাড়, মোটা নাক। মাদাম ঠিক তার উল্টো। গায়ের রং ময়লা। টান টান লম্বা, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মহিলা। স্বামী যখন সরাসরি তাকে 'গৃহিণী ভদ্রমহিলা' বলে ডাকতো, সে মুখের ওপর গম্ভীর উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠতো। নামী প্রেমিক ব্যারন দ্য ক্রোসার্দের চওড়া কাঁধ, সুগঠিত দেহ, গোঁফের কথা মনে হলেই মাদামের মন কোমল হয়ে আসতো।

তবু ভক্ত এখনও তার কাছ থেকে কোন দাক্ষিণ্য পায় নি। ব্যারন তার জন্য নিঃশেষ হতে বসেছে। ভোজ, শিকার লেগেই আছে। সম্ভ্রান্ত পাড়াপড়শীর আপ্যায়নে আনন্দের স্রোত বইছে। সারা দিনমান কুকুরগুলো শিকার-করা বুনো শুয়োর, শেয়াল কুড়িয়ে বেড়ায়, আর রাতে পোড়া ছালের গন্ধে মিশে উজ্জ্বল আতসবাজি আকাশের তারার মালায় মিলিয়ে যায়। সুসজ্জিত বৈঠকখানার খোলা জানালা দিয়ে আলো লম্বা হয়ে এসে পড়তো প্রশস্ত বাগানে আর চঞ্চল ছায়া নেচে বেড়াতো এখানে সেখানে।

তখন শরৎ। বছরের খয়েরি ঋতু। ঘাসের ওপর দুরন্ত ঝরা-পাতা, যেন উড়ন্ত পাখি। বাতাসে ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ। নাচ শেষে অগোছালো ললনার অনাবৃত দেহ-সৌরভের মত নগ্ন সিক্ত মৃত্তিকার গায়ের সোঁদা গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত বসন্তে মসিয়ো দ্য ক্রোসার্দ যখন নাছোড়বান্দা হয়ে ক্রমাগত আবেদন জানাচ্ছিল, মাদাম এক উৎসব সন্ধ্যায় তাকে বললো "সখা, পাতাঝরার আগে তো আমি তোমার কাছে ধরা দিতে পারবো না। এবার গ্রীষ্মকালে আমার যে অনেক কাজ। এজন্য একটুও সময় নেই।"

সেই কৌতুককর প্রগল্‌ভতা ক্রোসার্দের বেশ মনে আছে। কিন্তু দিন দিন তার অনুরোধ বেড়েই চললো। অনুনয়ের মধ্যে প্রতিদিন ঘনিষ্ঠতার সুর বাড়তে লাগলো। চলতি কথায় বলতে গেলে লেগে থেকেই সে শেষ পর্যন্ত জিতলো। যে সুন্দরী, গর্বিত নারী কেবল-মাত্র শিষ্টাচারের জন্যই বাধা দিয়ে আসছিল, তাকে হার মানতে হোলো।

একটা মস্ত বড় বুনো শুয়োর শিকারের আগের দিন সন্ধ্যায় শ্রীমতী বার্থা হেসে বললো : "ব্যারন, জন্তুটা যদি তুমি মারতে পার, কিছু পুরস্কার দেব।"

খুব ভোরে উঠে ব্যারন জানোয়ারটার গোপন আস্তানার খোঁজে বেরিয়ে গেল। জয় সুনিশ্চিত করবার জন্য সে নিজে সমস্ত কিছু তদারক করলো। শিকারের সঙ্গীদের নিয়ে ঘোড়া বদলের জায়গা ঠিকঠাক করে রাখলো। বাঁশিতে যাত্রার সংকেত ধ্বনি বেজে উঠতেই দেখা গেল ব্যারন তৈরী, লালে আর সোনালীতে মেশানো একটা আঁটোসাটো কোট গায়ে, কোমর শক্ত বাধনে বাঁধা। বক্ষ স্ফীত, চোখের দৃষ্টি লাল, এত সতেজ আর পরিষ্কার—মনে হয় যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে।

শিকার যাতে গোপন আবাস ছেড়ে বেরিয়ে আসে সেজন্য স্তব্ধ অরণ্যে সোরগোল তোলা হোলো। কিন্তু জন্তুটা বেরিয়ে এসেই আবার

বনের মধ্য দিয়ে ছুটে পালালো। কুকুরগুলো সজোরে ঘেউ ঘেউ করতে করতে ধাওয়া করলো। বনের ভেতরের দিকে পাশের একটা সরু পথ দিয়ে ঘোড়াগুলো জোর কদমে শিকারের পেছু নিল। খানিকটা দূরে কাঁচা পথ ধরে গাড়িগুলো নিঃশব্দে শিকার অনুসরণ করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল।

একঘেয়ে, সোজা, সুদীর্ঘ পথ। দুপাশে চার সারি ওক গাছ। ঠিক যেন একটি তোরণ রচিত হয়েছে। তাদের গাড়ি অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। বিপদ আশঙ্কায় মাদাম দ্য এভাঁসেলেস ব্যারনকে তার পাশে বসিয়েছে। প্রেমের আবেগ এবং উৎকণ্ঠার আতিশয্যে ব্যারনের গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। তার এক কান দিয়ে যুবতী নারীর চটুল বক্‌বকম্ আর অন্য কানে শিকারের শিঙাধ্বনি এবং দূরে পশ্চাদ্ধাবনকারী কুকুরের চিৎকার একই সঙ্গে প্রবেশ করতে লাগলো।

মাদাম বললো: "তাহলে তুমি আর আমায় ভালবাস না?"

"একথা তুমি কি করে বলতে পারলে?"—ব্যারনের জবাব।

মাদাম বলতে থাকলো: "কিন্তু মনে হচ্ছে, আমার চেয়ে শিকারেই তোমার বেশি আগ্রহ।"

ক্ষুব্ধ ব্যারন উত্তর করলো: "কিন্তু জন্তুটা নিজের হাতে মারবার জন্য তুমি কি আমায় আদেশ করনি?"

নারী গম্ভীর গলায় বললো: "নিশ্চয়ই, এবং এখনও এর ওপরেই আমি জোর দিচ্ছি। আমার চোখের সামনেই তুমি ওটা মারবে।"

একথা শুনে ব্যারনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়লো। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে জিনের ওপর চেপে বসে এত জোরে লাগাম টেনে চললো যাতে ঘোড়াটা সামনের পা তুলে দাঁড়িয়ে পড়লো। উচ্চ কণ্ঠে সে বলে উঠলো: "কিন্তু, হা ঈশ্বর, মাদাম, আমরা যদি এখানে থাকি তাহলে কখনও সেটা সম্ভব হবে না।"

বার্থা তখন তাঁর বাহুর মধ্যে নিজের হাত জড়িয়ে নিল। আনমনে ঘোড়ার কেশরে হাত বুলোতে লাগলো। মধুর স্বরে বললো: "কিন্তু তোমাকে করতেই হবে। নইলে তোমার খুব খারাপ হবে।"

ঠিক তখনই গাড়িটা ডানদিকের একটা সরু পথে ঢুকে গেল। পথটা গাছপালায় প্রায় ঢেকে আছে। মাথার ওপর থেকে একটা ডাল সরিয়ে দিতে গিয়ে বার্থা হঠাৎ ব্যারনের গায়ে ঝুঁকে পড়লো। তার কেশরাশি ব্যারনের কাঁধ ছুঁয়ে থাকলো সঙ্গে সঙ্গে। ব্যারন প্রচণ্ড আবেগে ছুটি বাহু দিয়ে বার্থাকে জড়িয়ে ধরলো। তার ঘন গোঁফাবৃত মুখ ওর কপালে চেপে রেখে উন্মত্তের মতো চুমু খেল।

বার্থা অনড়। সেই মত্ত ভালবাসার কাছে সে নিশ্চল হয়ে থাকলো। তারপর ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা সরিয়ে নিতে গিয়ে দৈবাৎই হোক বা কৌশল করেই হোক, তার ঠোঁট ছুটি ব্যারনের চকচকে গোঁফ জোড়ার তলায় গিয়ে মিলিত হোলো। মুহূর্ত পরে হয় লজ্জায় নয় অনুতাপে বার্থা ঘোড়ার পিঠে কশে চাবুক মারলো। ঘোড়া জোর কদমে ছুট দিল। এমনি ভাবে কিছুক্ষণ তারা পাশাপাশি চললো। কেউ কারো দিকে তাকাল না অবধি।

শিকারের শব্দ ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছিল। সেই শব্দে নিবিড় বন যেন কাঁপছে। হঠাৎ রুধিরাপ্লুত বন্য শূকর ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পিছু ধাওয়া-করা কুকুরগুলোকে ভয় দেখাতে লাগলো। আর ব্যারন জয়োল্লাসে চিৎকার করে বলে ফেললো: "যে আমাকে ভালবাসে আমার সঙ্গে আসুক!" সে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হোলো যেন অরণ্য মুহূর্তে তাকে গিলে ফেললো।

কয়েক মিনিট পর বার্থা যখন একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছলো, দেখল কর্দমাক্ত কলেবরে ব্যারন উঠে আসছে। তার কোট ছিন্নভিন্ন, হাত রক্তাক্ত। জানোয়ারটা লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে। ব্যারনের শিকারের ছোরাটা জন্তুটার কাঁধে বাঁট অবধি আমূল বিদ্ধ।

রাত্রে টর্চ লাইট জ্বেলে শিকারটাকে কাটা হোলো। সে রাত ছিল উষ্ণ, বিষণ্ণ। পাণ্ডুর চাঁদের হলুদ আলো টর্চের ওপর এসে পড়ায় রাত্রিকে রজনের ধোঁয়া আর কুয়াশায় আবৃত মনে হচ্ছে। কুকুর-

গুলো বুনো পশুটার নাড়িভুঁড়ির জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে, গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নিতে চাইছে। কশাই আর ভদ্রলোকেরা বিজিত সম্পত্তির চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে শিকারী বাঁশিগুলোকে প্রাণপণে বাজাতে শুরু করলো।

নিঃস্তব্ধ নিশীথিনীর বুক চিরে সেই বাঁশির উচ্চ নিনাদ অরণ্যের ওপারে ছুটে গেল। সেই রব দূরবর্তী উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হল। নিরীহ হরিণেরা জেগে গেল, শেয়ালগুলো ডেকে উঠলো, অশ্বশালার ধারে ছোট্ট খরগোশগুলো চঞ্চল হয়ে ছুটাছুটি শুরু করলো।

লোভী শিকারী কুকুরদলের মাথার ওপর দিয়ে ভীত চকিত নিশাচর পাখীরা উড়ে বেড়াতে লাগলো। স্ত্রীলোকেরা এইসব অদ্ভুত চিত্রোপম দৃশ্যে অভিভূত হয়ে গেল।

কুকুরগুলোর খাওয়া শেষ না হওয়া অবধি মোহাবিষ্ট রমণীরা পুরুষের বাহুর মধ্যে নিঃসাড়ে এলিয়ে থেকে বনের মাঝে গাড়িচলা পথের ধারে ছড়িয়ে পড়লো।

দিনভর পরিশ্রম এবং প্রেমাবেগে অবসন্ন মাদাম দ্য এভাঁসেলেস নরম গলায় ব্যারনকে বললো:

"বন্ধু, পার্ক থেকে একটু ঘুরে আসবে?"

দুর্বল কম্পমান ব্যারন কোন জবাব না দিয়ে তার সঙ্গে এগিয়ে চললো। যেতে যেতে পরস্পর গভীর চুম্বনে মগ্ন হোলো। প্রায় নিষ্পত্র বৃক্ষের ভেতর দিয়ে চন্দ্রালোক সূক্ষ্মরেখায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তার তলায় ভ্রমণরত দুটি নরনারীর প্রেম, বাসনা, গভীরতর আকাঙ্ক্ষা এত প্রচণ্ড উদ্দাম হয়ে উঠলো যে তারা একটি তরুতলে বসে প্রায় আত্মহারা হতে চলেছিল।

শিকারী বাঁশীর উচ্চনাদ আর শোনা যাচ্ছিল না। শ্রান্ত কুকুরগুলো কুকুরশালায় ঘুমিয়ে পড়েছে।

"চল যাই", যুবতী বললো। তারা ফিরে এলো।

পল্লীনিবাসে পৌঁছে ভেতরে ঢোকার আগে বার্থা ক্ষীণস্বরে বললো: "বন্ধু, আমি খুব ক্লান্ত, এখুনি শুতে যাব।"

মসিয়ো যখন শেষ চুম্বন প্রত্যাশায় তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, সে পালিয়ে যেতে যেতে শেষ বিদায় জানিয়ে বলে গেল: "না,— আমি ঘুমুতে যাচ্ছি। যে আমায় ভালবাসে, আমার সঙ্গে আসুক।"

এক ঘণ্টা পর যখন সমস্ত নিস্তব্ধ, পল্লীনিবাস মৃত বলে মনে হোলো, ব্যারন চোরের মতো পা টিপে টিপে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বার্থার ঘরের দরজায় ঠোকা মারলো। জবাব না পেয়ে একটু ঠেলা দিতেই কপাট খুলে গেল।

জানালার গরাদে হাত রেখে বার্থা জাগর স্বপ্নে বিভোর। ব্যারন তার পাশে বসে পোশাকের ওপর দিয়েই জানুর ওপর উন্মত্ত চুম্বন বর্ষণ করে চললো। বার্থা কিছুই বললো না। কিন্তু তার কোমল আঙুল আদর করে ব্যারনের চুলের মধ্যে ডুবিয়ে দিল। মস্ত একটা কিছু যেন সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলেছে, এমনি ভাবে সহসা সোজা তাকিয়ে ফিস ফিস করে বললো: "আমার জন্য অপেক্ষা করো, এখনি আসছি।"

বলেই হাত বাড়িয়ে ঘরের এক কোণে একটা অস্পষ্ট সাদা বস্তুর দিকে আঙুলের ইশারা করলো। ওখানেই তার শয্যা।

তখন কি করছে না বুঝেই কম্পিত হস্তে মসিয়ো ক্রোসার্দ তার পোশাক খুলে ফেললো। আরাম করে শীতল বিছানার চাদরের ওপর হাত পা ছড়িয়ে দিল। নরম, মসৃণ শয্যার সুখস্পর্শে, পরিশ্রান্ত দেহের স্বাচ্ছন্দ্যে সে প্রায় তার ভালবাসার কথা ভুলেই গেল।

বার্থা তবুও এল না। বোধহয় তাকে অবসন্ন করে মজা দেখছিল। অতীব আরামে তার চোখ বুজে এল। এতক্ষণ পরম আগ্রহে যার প্রতীক্ষা করে আছে, প্রশান্ত মনে সে বিষয়ে ভাবতে লাগলো। কিন্তু তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্লান্তি চরমে পৌঁছেছে। চিন্তা-রাশি ক্রমশ আবছা হয়ে হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগলো। শেষে অবসাদেরই জয় হোলো। সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সারারাত সে অবসন্ন শিকারীর গভীর অজেয় নিদ্রায় অভিভূত থাকলো। দিনের আলো ফুটে ওঠার আগে আর তার ঘুম ভাঙলো

না। আধখোলা জানালা দিয়ে একটা মোরগের ডাক কানে এসে প্রবেশ করতে সে জেগে উঠলো। চোখ খুলে দেখলো একটি নারীদেহ তাকে জড়িয়ে রয়েছে। অদ্ভুত শয্যায়, এ রকম অবস্থায় নিজেকে আবিষ্কার করে সে খুব বিস্মিত হোলো। মুহূর্তকাল তার কিছুই মনে পড়লো না। সে তোতলাতে শুরু করলো : "একি ? আমি কোথায় ? কি হয়েছে ?"

বার্থা সারারাত একটুও ঘুমোয়নি। ফোলা ঠোঁট, উস্‌কো খুস্‌কো চেহারা এই লোকটার দিকে সে তাকিয়ে থাকলো। তারপর তার স্বামীকে যেমন করে বলে, তেমনি উত্তপ্ত কর্কশ স্বরে বলে উঠলো : "ও কিছু নয়; একটা মোরগ ডাকছে। মসিয়ো আবার ঘুমিয়ে পড়ুন, আপনার দ্বারা আর কিচ্ছু হবে না।"

## লা মরিলন

ভ্রমর কালো চুল আর শরৎকালেব কচি পাতার মতো শ্যামলা গায়ের রং বলেই যে লোকে তাকে লা মরিলন[১] বলতো তা নয়। বরং তার বাঁকানো পুরু ঠোঁট দুটি ঠিক কালো বেরির[২] মতো দেখাতো বলেই তার ঐ নাম হয়েছিল।

ওদের দেশে সবাই ফর্সা। ওর মা বাবার গায়ের রং মাখনের মতো মসৃণ, মাথার চুল শণের মতো উজ্জ্বল। সেই বংশের মেয়ের এই কুচকুচে কালো রং সকলের কাছেই রহস্যজনক ঠেকতো। সেই আদ্যিকাল থেকে যে সব ভবঘুরে বাসন-সারাইওয়ালারা দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়—যাদের গায়ের রং নীল মাছের মতো, মাথায় ঝাঁটার মতো খাড়া খাড়া কয়েকগাছা চুল—তাদের কারো সঙ্গে হয়ত ওর কোন প্রপিতামহীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। সেই পূর্বপুরুষের কাছ থেকে ও কেবল ওই নিকষকালো গায়ের রংই পায়নি, তাদের কালিমাখা অন্তঃকরণ এবং প্রবঞ্চক চক্ষুদুটোও পেয়েছে। ওই চোখের কোটর থেকে সময় সময় সমস্ত রকম দুষ্কর্মের কামনা ঝলসে ওঠে। মনে হয় হিংস্র, অবাধ্য দুটো জানোয়ারের চোখ। সুন্দর? একেবারেই নয়, এমনকি সুশ্রীও বলা চলে না। কুৎসিত, পরিপূর্ণ কুশ্রীতার একটি প্রতিমূর্তি। কী কপট দৃষ্টি। নাক চ্যাপ্টা, মনে হয় যেন ঘুষি মেরে কেউ থ্যাবড়া করেছে। তার কদর্য মুখগহ্বর সর্বদাই হয় লোভে লালাসিক্ত নতুবা কোন নীচ বাক্যে মুখর। মাথায় নোংরা আলুথালু একরাশ চুলের বোঝা, যেন ভারমিন পাখির বাসা। সদা চঞ্চল লিকলিকে শরীর। খুঁড়িয়ে হাঁটে। সংক্ষেপে বলতে গেলে একটি খাঁটি দানবী। তবু পাড়া পড়শী যুবকেরা তার

১। এক ধরনের আঙুর ফল।

২। এক রকম রসালো কালো রং-এর ফল।

প্রেমে পাগল। একবার যে তার সঙ্গ লাভের সম্মান পেয়েছে, সে আবার তার প্রসাদ পাবার কামনায় লালায়িত হয়ে ওঠে।

ওর বয়স যখন বারো, তখন থেকে ও গাঁয়ের বারোয়ারী রক্ষিতা। যে কোন জায়গায় ওর বয়সী ছেলেদের ও সম্ভাব্য সব রকম উপায়ে খারাপ করেছে। ছোক্‌রারা জেলে যাবার ভয় উপেক্ষা করে ওর সান্নিধ্যে ছুটে যেত। বলতে কি, প্রাজ্ঞ, বয়স্ক, সম্ভ্রান্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরাও এই নষ্ট মেয়েটার সঙ্গলাভ করে আনন্দ পেত। এই যেমন এক্সলজিয়াক্সের ধনী জোতদার, ভূতপূর্ব মেয়র মসিয়ো মঁতেন, এমনি আরও সব নামজাদা লোক। আদালতে আসামী হাজির করতে যে গ্রাম্য পুলিশের জুড়ি নেই, সেও কেন এই সব মার্কামারা দোষীদের বেলায় তত শক্ত হতে পারেনা? নিন্দুকেরা বলে ঐ রকম দোষ করতে পেলে সে নিজেও নাকি বর্তে যায়। স্কুলের মাস্টারমশাই বলেন, কোন রকম বাধা না পেয়ে এভাবেই ও বেড়ে উঠেছে। গ্রামের প্রায় প্রতিটি ভদ্রলোক ওকে অন্তরঙ্গভাবে জেনেছে। অবশ্য মাস্টার-মশাই নিজেও সেই ভদ্রলোকদের একজন। কিন্তু সব চেয়ে মজার ব্যাপার মেয়েটির ভক্তরা কেউ কাউকে ঈর্ষা করে না। তার ওপর কারো বিশেষ দাবি নেই। সে কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। মরিলন স্বার্থপর নয়। কখনও নিজে থেকে কারো কাছে কিছু চায় না। তবে কেউ টাকাপয়সা বা জিনিসপত্র উপহার দিলে তা গ্রহণ করে। চুরি করে রোজগার করায় তার নেশা। মরিলনের যা কিছু মনোযোগ ছিঁচ্‌কে চুরির দিকে। চোরাই ধনই ছিল ওর কাছে উপযুক্ত পুরস্কার। একটা আধ পেনি চুরি করতে পেলে ও যে আনন্দ পেত, একটা গোটা সাম্রাজ্য তার হাতে তুলে দিলেও অত খুশী হোতো কিনা সন্দেহ। ওর জীবনে একমাত্র পুরুষ হয়ে বিরাজ করা বা ওর রাতের আস্তানায় ওকে শাসন করার স্বপ্ন দেখে লাভ নেই। কেননা যত তাগড়া জোয়ানই হোক না কেন, কেউ কখনও তা পারে নি। দু' একজন তাকে দমন করতে চেয়েছে, কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম। এই অবস্থায় কি করে ওর ওপর অধিকার ফলানো সম্ভব? ব্যাপার

দাঁড়াবে যেন গ্রামের সর্ব্বসাধারণের বেকারীতে কারও ব্যক্তিগত দখল নেবার বাসনা। যা একেবারে অসম্ভব, উদ্ভট।

রাখাল ছেলে ক্রু এর একমাত্র ব্যতিক্রম। মাঠে ঘাটে অস্থায়ী কুঁড়ে বেঁধে ওর সংসার। নিজের খাবার নিজেই করে নেয়। ময়দার লেচি নরম করে গাঁজিয়ে তোলার সরঞ্জাম নেই। ময়দা মাখার পাত্র বলতে একটা পাথরের বাটি। এখানে ওখানে গর্ত খুঁড়ে শুকনো ডালপাল দিয়ে আগুন জ্বেলে গরম ছাইয়ের মধ্যে রুটি সেঁকে নেয়। এ ছাড়া তার রোজকার খাদ্য তালিকায় থাকে আলু, দুধ, শুকনো পনির, ব্ল্যাকবেরি আর পানীয় বলতে ছোট্ট একটা পিপেয় নিজের হাতে তৈরি খানিকটা জিন।

ভালবাসার ধার সে ধারত না। সব রকম ভয়ঙ্কর ব্যাপারে তার বদ্‌নাম ছিল। কিন্তু মুখের ওপর কেউ তার নিন্দে করতে সাহস পেত না। কারণ ক্রু-র চেহারা ছিল শক্ত, কাঠখোট্টা। তাছাড়া ড্রামবাদকের বাদ্যদণ্ড ধরার মতো করে সে তার পশু-তাড়ানো লাঠিটা বাগিয়ে ধরতো। তার ওপর নেকড়ের মতো ধারালো দাঁতওয়ালা তার তিনটে শিকারী কুকুর ছিল সকলের আতঙ্কের কারণ। সর্বোপরি ক্রু-র দানবীয় চোখ দুটোয় সকলের পিলে চম্‌কে যেত। লোকের বিশ্বাস ঐ দানবীয় দৃষ্টির জাদু দিয়ে সে ফসল নষ্ট করতে পারে, ভেড়ার পালের পা খোঁড়া করে দিতে পারে। তার নজর লাগলে গরু-বাছুরের সংক্রামক রোগ হয়, প্রসবকালে গাভী মারা যায়, শস্যের গোলায়, খড়ের গাদায় আগুন ধরে যায়। এ জন্য কেউ তার ধারে কাছে ঘেঁষতো না।

লা মরিলনের জন্য ক্রু-র কোন আগ্রহ ছিল না। এই জন্য স্বভাবতই লা মরিলন তার সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করলো। সে রটিয়ে বেড়ালো ক্রু-র দানব চক্ষুকে সে থোড়াই পরোয়া করে। একদিন সত্যি সত্যি সে ক্রু-র কাছে এসে হাজির হোলো।

"কি চাই তোমার ?',— ক্রু জিজ্ঞেস করলো।

"কি চাই আমার ? তোমাকেই চাই।"—মরিলনের নির্ভীক জবাব।

"ভাল কথা,"— ক্রু বললে, "কিন্তু তাহলে আর সবাইকে তোমার ছাড়তে হবে।"

"বেশ রাজী। তুমি যদি আমায় খুশী করতে পার, তবে তাই হবে।" মরিলনের সাফ্ কথা।

একগাল হেসে ক্রু তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো। সেই থেকে পুরো এক সপ্তাহ মরিলন গ্রাম থেকে দূরে ক্রু-র কাছেই থাকলো। বলতে গেলে সে ক্রু-র ব্যক্তিগত মালিকানা মেনে নিল।

এই ঘটনায় সারা গাঁয়ে থমথমে উত্তেজনা। এতদিন মরিলনের জন্য কেউ কাউকে ঈর্ষা করতো না। কিন্তু এখন ক্রু-কে সবাই হিংসা করতে লাগলো। কি কাণ্ড! মেয়েটা কি ওকে ঠেকাতে পারছে না! নিশ্চয়ই জগতের সব কিছুর ওপরই ওর জাদুবিদ্যা খাটে। ক্রমশ গ্রামবাসী রাগে জ্বলে উঠলো। ধীরে ধীরে তারা সাহস সঞ্চয় করলো। একটা গাছের আড়াল থেকে ওদের ওপর নজর রাখা হোলো। মরিলন ঠিক আগের মতোই হাসিখুশি, প্রাণবন্ত। কিন্তু হতভাগা ছোঁড়াটাকে যেন ব্যামোয় ধরেছে। নারী হস্তের সেবা প্রয়োজন। কিন্তু হতভাগ্য রাখালের জন্য গ্রামবাসীর অন্তরে এক-ফোঁটা সহানুভূতিও দেখা গেল না। তাদের একজন বন্দুক উঁচিয়ে ক্রু-র কুঁড়ে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

"কুকুরগুলো সামলাও ক্রু,"— লোকটা চেঁচিয়ে বললো:— "ওদের বেঁধে রাখো, নইলে গুলি করে মেরে ফেলবো।"

মরিলন জবাব দিল: "কুকুরগুলোকে ভয় পাবার কিচ্ছু নেই। আমার মাথার দিব্যি, ওরা তোমায় কামড়াবে না।"

সঙ্গীনধারী যুবককে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে মরিলন হাসতে লাগলো।

"কি চাই তোমার?"— রাখাল শুধালো। মরিলন বললো: "আমি হলফ করে বলতে পারি, ও আমাকেই চায়। আর আমারও তাই ইচ্ছে। এই ঐখানে দাঁড়াও।"

ক্রু-র চোখে জল দেখে সে বলে উঠলো: "তুমি একটা অপদার্থ।"

বলেই সে সেই যুবকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো। রাখাল তার লাঠিটা বাগিয়ে ধরতেই যুবক আবার বন্দুক তুললো। ক্রু তখন কুকুরগুলোকে ডেকে চেঁচিয়ে বলে উঠলো :

"ধর, ওকে ধর।"

লোকটা বন্দুক তাক করে বোতাম টিপতে যাবে, মরিলন বন্দুকের নলটা ঠেলে দিয়ে ডেকে বললো : "এদিকে, পির্‌র্‌ পির্‌র্‌, এদিকে এসো। এসো আমার সোনামানিকেরা।"

তিনটে কুকুরই ছুটে গিয়ে তার হাত চাটতে লাগলো, আহ্লাদে লেজ নাড়তে নাড়তে তার পিছে পিছে চললো। লা মরিলন তখন যেতে যেতে দূর থেকে রাখালকে ডেকে বললো : "দেখছো তো, ওরা একটুও হিংসুটে নয়?"

তারপর ডাইনীর মতো এক ঝলক হেসে যোগ করলো : "এখন থেকে ওরা আমার সম্পত্তি।"

"রবিবার,—

"তুমি আমায় আর চিঠি দিচ্ছ না, তোমার দেখাও আজকাল পাই না, তুমি একদিনও আসছ না, সুতরাং ধরে নিতে হচ্ছে তুমি এখন আর আমাকে ভালবাস না। কিন্তু কেন? আমার কি অপরাধ? আমার মাথার দিব্যি, প্রিয়তম, বল আমি কি করেছি? তোমাকে এত ভালবাসি, এত গভীর ভাবে ভালবাসি! সব সময় তোমাকে কাছে পেতে সাধ যায়, ইচ্ছে হয় সারাদিন ধরে তোমায় চুমু খাই আর মনের মতো মিষ্টি নামে প্রাণ ভরে ডাকি। তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে ভালবাসি, ওগো আমার সুন্দর মোরগ। তোমার আদরের মুরগী,"

"সোফি।"

"সোমবার—

"প্রিয় বান্ধবী,

তোমাকে কি বলতে যাচ্ছি তার মাথামুণ্ডু তুমি বুঝবে না জানি, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না, এবং আমার এই চিঠিখানা যদি অন্য কোন স্ত্রীলোকের হাতে পড়ে তারও উপকার হবে। তুমি যদি বোবা কালা হতে, আরও অনেক দিন ধরে তোমাকে ভালবাসতে পারতাম তাতে কোন সন্দেহ নেই, এবং যা ঘটেছে তার জন্য দায়ী একমাত্র তোমার মুখরতা।

"তুমি জানো, প্রেমের ক্ষেত্রে গুঞ্জনের জন্যই স্বপ্ন দেখা; কিন্তু স্বপ্ন বোনায় যাতে কোন বাধা না হয়— তাও দেখা দরকার। দুটি চুম্বনের মাঝের ফাঁকটুকুতে যখন কেউ কথা বলে, সে কথা যদি মহিমান্বিত না হয়, তাহলে তা আমাদের হৃদয়ের অবাধ স্বপ্নের উন্মাদনাকেই বাধা দেয়; এবং সুন্দরী বালিকাদের ক্ষুদ্র মুখ থেকে মহিমান্বিত শব্দ কখনই বেরোয় না।

"আমার কথাগুলো বোধগম্য হয়নি, তাই না? তাতে কিস্স্যু এসে যায় না, আমি বলে যাব। এ যাবৎ যত নারী দেখেছি, তাদের মধ্যে তোমার মতো এমন আকর্ষণীয় এবং বরণীয় আর কাউকে দেখিনি।

"তোমার চোখ দুটির চেয়ে আরও স্বপ্নময়, আরও অজানা অঙ্গীকার-ভরা, আরও গভীর প্রেম পৃথিবীর অন্য কোন চোখে আছে কি? আমার তো মনে হয় নেই। লোকে না বলে পারে না যে বিহ্বল-করা মুখখানি থেকে এমন অনির্বচনীয় সঙ্গীত সুধা ঝরে পড়বে যার কোমলতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, যার গভীর মিষ্টি সুরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

"এর পরই আসছে আমার সঙ্গে তোমার কথা বলার প্রসঙ্গ। ঐ খানেই আমার কষ্ট, তুমি কি দেখতে পাও না, আমার এত কষ্ট হয় যা বলে বোঝানো যায় না! আমাদের বরং আর কখনও দেখা না হওয়াই ভাল।

"তুমি তো সব কিছু না বোঝার ভান করে যাবে, নয় কি? কিন্তু আমি ভেবে চিন্তে এই সিদ্ধান্তই করেছি।

"প্রথম যেদিন তুমি আমার বাড়ি এসেছিলে আমার সঙ্গে দেখা করতে, সেদিনের কথা তোমার মনে আছে? তোমার পদক্ষেপে কেমন খুশীর ছন্দ ছিল, তোমার স্কার্টের ভায়োলেট ফুলের গন্ধ তোমার আগমন ঘোষণা করেছিল, কি ভাবে আমরা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়েছিলাম, অনন্তকাল, একটিও কথা বলিনি, তারপর দুটি নির্বোধের মতো আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছিলাম। সেই থেকে যতক্ষণ একত্র ছিলাম—কারও মুখে কথা ছিল না।

"কিন্তু বিদায়কালে আমাদের কম্পমান হাত, আমাদের চোখ কি এমন অনেক কিছুই বলেনি, যা কোন ভাষাতেই প্রকাশ করা যেত না। অন্ততঃ, আমার তাই মনে হয়; তুমি যেতে যেতে গুণ গুণ করেছিলে:

" 'আবার শীগগিরই আমরা মিলিত হব।'

"শুধু ঐটুকুই বলেছিলে, এবং তুমি কখনও কল্পনাও করতে পারবে না, কি আনন্দময় স্বপ্ন আমার জন্য রেখে গেলে, বলতে কি, আমি যেন এক পলকে তোমার ভাবনাগুলোকে দেখতে পেয়ে তোমার প্রতি আকৃষ্ট হলাম।

"আমার বেচারী বন্ধু, জেনে রেখো, যারা স্থূলবুদ্ধি নয়, বরং সূক্ষ্মরুচি এবং মার্জিত স্বভাব, তাদের কাছে প্রেম এমন একটা জটিল যন্ত্র—সামান্যতম অসাবধানতায় যা বিকল হয়ে পড়ে।

"তোমরা নারী জাতি, প্রেমে পড়লে কতকগুলো বিষয়ের হাস্য-কর দিক কখনও দেখতে পাও না, এবং কিছু কিছু প্রকাশ ভঙ্গীর অদ্ভুত দিকও কিছুতে তোমাদের চোখে পড়ে না।

"ক্ষীণাঙ্গী রহস্যময়ী কোন রমণীর মুখে যে কথা শোভা পায়, স্থূলাঙ্গী বিরল-কেশ মহিলার মুখে সে কথা কেন বেমানান এবং কৌতুককর শোনায়? মিষ্টি কথার ছল চাতুরী কারো ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মনে হয়, অথচ অন্যের ক্ষেত্রে তা একেবারেই খাপ খায় না কেন?

"কারো আলিঙ্গনে আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায় আবার অন্য কারো কাছ থেকে সেই ব্যাপার বিরক্তিকর মনে হতে পারে। কিন্তু কেন? কারণ প্রতিটি বিষয়ে, বিশেষ করে প্রেমের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমন্বয়, চাল-চলনে, কণ্ঠস্বরে, কথাবার্তায় এবং ভালবাসা প্রকাশের ভঙ্গীতে দুটি হৃদয়ের পুরোপুরি মিল থাকা প্রয়োজন; বয়সে উচ্চতায়, চুলের রঙে, সৌন্দর্যের বিশেষ ধরনে, সব কিছুতেই সঙ্গতির দরকার আছে।

"পঁয়ত্রিশ বছর বয়স প্রচণ্ড ঝড়ের মতো, তীব্র আবেগ যে বয়সের ধর্ম, সেই বয়সের এক নারী যদি তার কুড়ি বছরের কিশোর প্রেমের সোহাগমাখা দুষ্টুমির সামান্যতম লক্ষণও পুষে রাখে, তাহলে সে বুঝতে চাইবে না যে তাকে এখন আগেকার হাবভাব বদলাতে হবে, প্রেমিকের দিকে তার চাহনি এবং চুম্বনের ধারা পাল্টাতে হবে; সে যদি বুঝতে না চায় সে জুলিয়েট নয়, তাকে এখন

দিদো[১] হতে হবে, তাহলে নির্ঘাৎ সে দশজন প্রেমিকের মধ্যে নয় জনেরই নিদারুণ বিরক্তির কারণ হবে, এবং এ ক্ষেত্রে ছাড়াছাড়ির জন্য কোনমতেই প্রেমিকদের দায়ী করা চলে না। আমার কথা বুঝতে পেরেছ? না? আমিও তাই ভেবেছিলাম।

"ওগো, আমার প্রিয় বন্ধু, যেদিন থেকে তুমি তোমার আদরের রাশ টানতে ভুলে গেছ, সেদিন থেকেই আমার সব চুকে গেছে। যে চুম্বন সর্বস্ব লুটে নেয়, বিবশ হৃদয়ের ফাঁক দিয়ে পাছে তার কণা মাত্রও ফসকে যায়, তাই প্রেমিক যুগল আঁখি মুদে থাকে। মাঝে মাঝে আমরা তেমনি এক একটি অক্ষয় চুম্বনের ক্ষণে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত আলিঙ্গনে আবদ্ধ থেকেছি, এবং তারপর যেই আমাদের অধর মুক্ত হয়েছে, তুমি বলে উঠেছ :

" 'চমৎকার, তুমি একটি ধুমসো বুড়ো কুত্তা।'

"সেই সব মুহূর্তে, তোমাকে আমি পিটোতেও পারতাম ; কারণ তুমি আমায় একটার পর একটা জন্তুর বা তরকারির নাম দিয়ে গেছ ; যেগুলো তুমি নিঃসন্দেহে রন্ধন প্রণালী বা মালীর বিবরণে পেয়েছ।

"প্রেমালিঙ্গন আসলে পাশবিকতা, কামুকতা, এবং প্রেমের কথা ভাবতে গেলে অদ্ভুত লাগে! আহা! আমার বেচারী খুকুমণি, বলো তো, আমার কাছে লেখা তোমার চিঠিগুলোর উপসংহার কোন্ রসিক পাজী, কোন্ বিকৃত পরী তোমায় বলে দিয়েছে? সেগুলোর একটা তালিকা আমি করেছি, কিন্তু তোমাকে ভালবাসি বলে সে তালিকা আর পাঠালাম না।

"এ ছাড়া মাঝে মাঝে সত্যিই তুমি এমন সব কথা বলেছো যা মোটেই সময়োপযোগী হয়নি। যেমন ধর, যখন তখন খামোকা

১। কার্থেজের রাণী। ট্রয় যুদ্ধের শেষদিকে ট্রোজান বীর ঈনীস জাহাজ-ডুবি হয়ে কার্থেজে আসে। দিদো তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে তাকে আশ্রয় দেয়। কিন্তু দেবতাদের আদেশে ঈনীস কার্থেজ পরিত্যাগ করে। দিদো হতাশায় দুঃখে আত্মহত্যা করে।

তোমার মুখ থেকে নিঃসৃত হোতো মহিমান্বিত বাক্য, 'আমি তোমায় ভালবাসি।' সেই সব বিশেষ ক্ষণে আমাকে অতি কষ্টে হাসি চাপতে হোতো। সময় সময় 'আমি তোমায় ভালবাসি।' কথাটা এতই বেখাপ্পা শোনায় যে রুচিবিকার বলে মনে হয়; এ কথাটা তোমাকে না বলে পারলাম না।

"কিন্তু তুমি আমাকে বোঝ না, এবং আরও অনেক স্ত্রীলোকই আমাকে বুঝতে না পেরে হাবা ভাববে, যদিও তা নিয়ে আমার বেশি মাথা ব্যথা নেই। বুভুক্ষু ব্যক্তি পেটুকের মতো গোগ্রাসে গেলে, কিন্তু রুচিশীল লোক এতে বিরক্ত হয় এবং খাবার থালার সামান্য খুঁতের জন্য প্রায়ই তারা আহারে অদম্য অরুচি বোধ করে। রন্ধন বিদ্যার মতো প্রেমের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা খাটে।

"কোন কোন স্ত্রীলোক যারা সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারী-করা মোজার দুর্বার আকর্ষণ, বর্ণ-বৈচিত্র্যের নিখুঁত সৌন্দর্য, দেহের গভীর অন্তরালে থাকা অন্তর্বাসের দামী লেসের জাদু, গোপন বিলাসদ্রব্যে মাদকতাময় মিশ্রণ এবং নারীসুলভ সুরুচির সমুদয় সূক্ষ্ম কমনীয়তা পুরোপুরি বুঝতে পারে, তারা এটা কেন কিছুতেই বুঝতে পারে না যে বেমক্কা বা বোকাটে আদুরে শব্দ প্রয়োগ আমাদের অপরিসীম রাগ আর বিরক্তির উদ্রেক করে।

"কোন কোন সময় রুক্ষ এবং রূঢ় কথায় আশ্চর্য কাজ হয়, কারণ তাতে ইন্দ্রিয় তেতে ওঠে এবং বুকের স্পন্দন বেড়ে যায়, এবং লড়াইয়ের সময় উত্তেজনা অনুমোদন করা চলে। কামব্রোন-এর মহত্তম[১] বাক্য কি তাই নয়?

"সময়োপযোগী হোলে কোন কিছুই আমাদের মনে ঘা দেয় না;

১। ওয়াটারলু-তে যখন জেনারেল কামব্রোনকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়, শোনা যায় তিনি নাকি বলেছিলেন— "রক্ষী মৃত্যু বরণ করে, কিন্তু আত্মসমর্পণ করে না।" কিন্তু ভিক্টর হুগো 'লা মিজারেবল্'-এ লিখেছেন— তিনি নাকি 'merde!' শব্দটি করেছিলেন। শব্দটি হীনার্থক— যার অর্থ করলে দাঁড়ায় মলত্যাগ বা বিষ্ঠা।

তবে কখন মুখ বন্ধ করতে হবে এবং কখন 'আমার আদরের ধাড়ি মোরগ'— বলার লোভ সামলাতে হবে, তাও আমাদের জানা উচিত।

"তোমার জন্য আমার আবেগভরা আলিঙ্গন পাঠালাম, কিন্তু সর্ত এই যে তুমি একটিও কথা বলতে পারবে না।"

# বিবাহ বিচ্ছেদের পরিণতি

এ্যাডভোকেট গারুলিএ একজন বাঘা উকিল। অত্যন্ত অস্বাভাবিক, অতি বিশিষ্ট, অতি অদ্ভুত এবং দারুন ব্যয়সাপেক্ষ মামলা ছাড়া তিনি অন্য মামলা হাতে নেন না। তুরুপের তাস হাতে না পেলেও তিনি আইনের খেলায় বাজিমাত করতে পারেন। বিবাহ বিচ্ছেদের জটিল আইন তিনি এমন ভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করেন, যেন ক্যালিফোর্নিয়ার সোনার খনি নিয়ে কাজ কবছেন। কাউণ্টেস দ্য বদেমোঁ যখন প্রথমবার তাঁর কাছে নিজের কাহিনী ব্যাখ্যা করলেন, এই স্বনামধন্য বিশিষ্ট উকিল গারুলিএ অবাক ভাব লুকোতে পারলেন না, নিরুৎ-সাহের ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে মুচকি হেসে ফেললেন।

তিনি সবেমাত্র তখন চিঠিপত্রের জবাব দিতে বসেছেন, রোগা হাত দুখানি—যার দিকে তাঁর মনোযোগ সবচেয়ে বেশি, মেয়েদের লেখা চিঠির স্তূপে ডুবে আছে, মৃদু সুগন্ধে ঘরের বাতাস এমন ভরপুব হয়ে আছে যে ওখানে বসে কারো মনে হতে পারে যেন কোন সৌখিন ধর্মযাজকেব সামনে বসে স্বীকারোক্তি করছেন।

কোন কথা বলাব সুযোগ না দিয়ে তিনি ঝানু উকিলের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এমন ভাবে মাদাম দ্য সারপেনোঁ্যার দিকে ছুঁড়ে মারলেন যে সুন্দরী মাদাম আপনমনে বলে ফেললেন: "উনি লোকের হৃদয় নিংড়ে ছিবড়ে কবে দেন!" একথা শোনা মাত্র আইনজীবী এই মহিলাকে তৃতীয় শ্রেণীতে ফেললেন। যারা দুর্ভোগ ভোগে, তাদের তিনি প্রথম শ্রেণীতে রাখেন; যারা ভালবাসে, তারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে আর যারা একঘেয়েমিতে ভোগে, তারা পড়ে শেষ শ্রেণীতে।

এই রমণী যেন একটি সুন্দর বাতচক্র ( windmill ), যার পাখাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে এবং আনন্দের মনোরম শিহরনে কেঁপে

কেঁপে নীল আকাশে ঢেউ তুলে ভেসে বেড়াচ্ছে, মগজটি যেন একটি পাখির মগজ, যাতে চারটি সুস্থ এবং নির্ভুল ভাব পাশাপাশি ঠাঁই পায় না, এবং যাতে একটা বড় ক্যালেডোস্কোপের* মতো যাবতীয় স্বপ্ন এবং সব রকমের আহাম্মুকি তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে গেছে।

মহিলা আবেগপ্রবণ, একটা মাছি মারতেও অক্ষম, দয়ালু, দু'চার পয়সার জন্য যে-সব মেয়েরা রাস্তায় রাস্তায় ফুলের তোড়া বেচে বেড়ায়, তাদের জন্য তাঁর মমতা, গাড়োয়ান ঘোড়াকে বেশি খাটালে, ঘোড়ার দুঃখে তাঁর মায়া হয়, কোন ভিখিরির মৃতদেহ, যার সঙ্গে যাবার জন্য আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কেউ নেই, যখন বারোয়ারি কবরখানায় নিয়ে যাওয়া হয়—তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে ; পাঁচ মিনিটের মজার জন্য এই নারী যে কোন কাজ করতে পারেন, সেজন্য যদি মানুষ চরম দুর্দশায়ও পড়ে, তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই, পুরুষের সমগ্র সত্তা ক্ষয় হয় যে তীব্র কামোচ্ছ্বাসে, তাতেই ওঁর সুখ . তাঁর দৃষ্টিতে জীবন এত ছোট যে হৈ হুল্লোড় এবং আমোদ আহ্লাদের একটি অবাধ পরিমণ্ডল রচনাও সম্ভব নয় ; ও ভাবে, জীবন সায়াহ্নে, যখন আয়নায় পাকা চুলে ঘেরা তোবড়ানো মুখের ছায়া পড়ে, যখন পাহাড়ের একেবারে মূলে গিয়ে পৌঁছয়, তখন লোকে গম্ভীর ও যুক্তিবাদী হওয়ার প্রচুর সময় পাবে।

পুরোদস্তুর প্যারিসীয় ফ্যাশনে মানুষ এই রমণীর পিছে পিছে পুড্‌ল কুকুরের মতো পৃথিবীর শেষপ্রান্ত অবধি যাওয়া যায় ; এই সেই নারী যার বেশবাস এবং চুলের মৃদু সুগন্ধে অথবা দেহের স্পর্শে এবং হাসির শব্দে লোক পাগল হয়ে বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তাকে আদর করে ; এই সেই নারী যার জন্য কোন চিন্তা ভাবনা না করে জীবন বাজি রেখে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নামা যায় ; যার জন্য একজন পুরুষ পাহাড় উপড়ে ফেলতে পারে, শয়তানের কাছে বার

* দূরবীনের মতো একরকম খেলনা, যাতে চোখ দিয়ে দেখলে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল নানা বিচিত্র রঙের দৃশ্য দেখা যায়।

বার আত্মা বিকিয়ে দিতে পারে, অবশ্য এখনও যদি পৃথিবীর কুখ্যাত জায়গায় বার বার আসার অভ্যাস শয়তানের থেকে থাকে।

পাঁচ-টার চা-এর আসরে তিনি এই আইনজীবীর কথা অনেক শুনেছেন, এরপর নিজেই এই উকিলের অঙ্গভঙ্গী এবং কণ্ঠস্বরের কৃত্রিম আবেগ তাঁর মেয়ে বন্ধুদের কাছে যাতে নকল করে দেখাতে পারেন, সেজন্যই বোধহয় তিনি এখানে এসেছেন; নয়তো নতুন রোমাঞ্চের সন্ধানে এসেছেন; বিবাহ বিচ্ছেদ মামলায় কোন মেয়ে যে পোশাকে আদালতে যায়, সেই পোশাকে সাজতে সাধ হয়েছে বলেই এসেছেন; এবং সত্যিই সমস্ত আয়োজনই তাঁর নিখুঁত। কালো পশমী পোশাক পরেছেন, গলার কাছে নীলকান্তমণি আর হীরে-বসানো পিন্ আঁটা, তার ওপরে গায়ে দিয়েছেন জেট* দিয়ে এমব্রয়ডারি করা একটা অতি চমৎকার ক্লোক। ফলে, তাঁর সোনালী চুল, ঈষৎ কম্পিত নাসারন্ধ্র সহ ছোট, সামান্য উঁচু নাক, এবং হেঁয়ালী ও কৌতুক-ভরা আয়ত চোখ দুটিতে বেশ একটা গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে।

এ্যাডভোকেট তাঁকে বাধা দিলেন না, বরং তাঁর উত্তেজনা বাড়তে দিয়ে কাউন্ট দ্য বদেমোঁ-র বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগের ফিরিস্তি —তাঁর অনর্থক বক্‌বকানি শুনতে লাগলেন।, বেচারা কাউন্ট, তিনি নিশ্চয়ই তাঁর স্ত্রীর এই বন্ধন-মুক্তির ইচ্ছার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নি; এবং ক্লাবে তিনি যখন অসি-চালনার তালিম নিচ্ছেন, সেই সময় কেউ গিয়ে তাঁকে একথা জানালে তিনি দারুণ অবাক হয়ে যেতেন।

সমস্ত শুনে তিনি এমন ঠাণ্ডা গলায় বলে উঠলেন, যেন একটা জ্বলন্ত খড়ের গাদায় এক বালতি জল ঢেলে দিলেন:

"কিন্তু মাদাম, আপনি এতক্ষণ ধরে যা বললেন, তার থেকে বিচ্ছেদের সামান্যতম সূত্রও তো খুঁজে পাওয়া গেল না। জজেরা আমায় জিজ্ঞেস করবে, আদালতকে থিয়েটার মনে করে আমি তাদের নিয়ে মস্করা করছি কিনা।"

* কালো রংয়ের খনিজ পদার্থ—যা পালিশ করলে খুব চকচকে হয়।

ছোট ছেলের প্রিয় খেলনা ভেঙে গেলে যেমন করে তাকায়, মাদাম তেমনি করুণ চোখে চেয়ে থাকলেন। তাব ব্যথিত দৃষ্টি এ্যাডভোকেটের মনে লাগল, তাছাড়া মাদাম এত সুন্দরী যে আইনজীবীর ইচ্ছে হোল গভীর অনুরাগে তাঁর হাত দুখানিতে চুমু খায়, এছাড়া শ্রীমতীকে বুদ্ধিমতী বলেই মনে হয়, এবং খুবই আকর্ষণীয়, কাগজপত্র দেখবার সময় কাছাকাছি বসা যাবে, তার ওপর, এ ধরনের দেখা সাক্ষাতের মেয়াদ বাড়াতে বিন্দুমাত্র আপত্তি না থাকায় এ্যাডভোকেট গরুলিএ বিবেচক হলেন। হাতের তালুতে চিবুক রেখে তিনি বললেন :

"যাহোক, এ ব্যাপারে আমি আরো ভেবে দেখবো ; এমন কোন দুর্বলতা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে—যাকে ঘোরালো করে আরও খারাপ করে দেখানো যাবে। চিঠি লিখবেন, আবার এসে দেখা করবেন।"

ঘন ঘন তাঁদের দেখা সাক্ষাতের সময় সেই দুর্বলতার পরিমাণ এত বেড়ে গেল, এবং কাউন্টেস দ্য বদেমোঁ তাঁর উকিলের পরামর্শ এমন অক্ষরে অক্ষরে পালন কবলেন এবং নানা ধরনের তার এত দক্ষতার সঙ্গে বাজালেন যে—বিচ্ছেদ মামলার রায়—লোকে এখনও বলাবলি করে, সেই মকদ্দমার সময় প্রেসিডেণ্টকে নাকি চোখ থেকে চশমা খুলতে এবং পকেট থেকে শব্দ করে রুমাল বার করতে হয়েছিল, সেই মামলার রায় কাউন্টেস মারি আন নিকোল ব্যারনেত দ্য বদেমোঁ, নী দ্য তাঁশার্ত দ্য পিওথাসের স্বপক্ষে গিয়েছে।

এমন একটা উত্তেজনাপূর্ণ মজার ঘটনার এই গুরুতর পরিণতি দেখে কাউন্ট হকচকিয়ে গেলেন, প্রচণ্ড রাগে তিনি প্রথমেই ছুটে গেলেন উকিলের অফিসে, ঐ প্রবঞ্চকের কানদুটো কেটে ফেলবেন বলে শাসালেন। কিন্তু রাগের মাত্রা কমে এলে তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন : "এতে যদি ও মজা পায়, তবে তাই হোক।"

তার পর তিনি ব্যারন শিলবারস্টেনের ইয়ট* কিনে

---

* এক ধরনের হাল্কা ও দ্রুতগতি বাষ্পীয় পোত।

কয়েকজন বন্ধু বান্ধব নিয়ে সিংহল এবং ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন।

ছুটিতে বাড়ি যাবার সময় একটি স্কুলের মেয়ের যেমন আনন্দ হয়, জিতে গিয়ে মারি আন-এর তেমনি আনন্দ হল ; সব রকমের আহাম্মুকি করে খুব শীগ্‌গিরই তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন, ভোগে ক্লান্তি এল, বিরক্ত হয়ে হাই তুলতে লাগলেন এবং তারপর কান্না পেল। তিনি বুঝতে পারলেন কোন কোটিপতি পাগল হয়ে তাঁর ব্যাঙ্কনোটগুলো ছিঁড়ে নদীতে ফেলে দিলে যেমন হয়, তিনিও তেমনি তাঁর সুখ শান্তি বিসর্জন দিয়েছেন, তিনি এখন একটা অক্ষম বেওয়ারিশ সম্পত্তি। শূন্য বাড়িতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি বিষণ্ণ হয়ে থাকেন, কাজেই তিনি আবার বিয়ে করলেন। এর পর তিনি আরও বুঝলেন যে, সমাজে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে এবং থিয়েটারে যেতে হলে একজন স্ত্রীলোকের প্রকাণ্ড বাসভবন থাকা চাই।

স্বভাবতই ইংরাজ পৌর এলাকার মেয়রের কাছে, জনাকয়েক বন্ধুর সামনে তিনি যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করে মারকুইস পত্নী হলেন, ফরুর্গের দুষ্ট লোকেরা ব্যাপারটা নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করল, এবং সত্য মিথ্যা নানা জল্পনা কল্পনা করে, আগের স্বামীর সঙ্গে বর্তমান স্বামীর তুলনা করে এমন পর্যন্ত বলল যে আগের বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য এই লোকটিও কিছুটা দায়ী। এদিকে ভুলে থাকবার জন্য মসিয়ো বদেমোঁ সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু মন পড়ে আছে দেশে, যে ভালবাসা ধীরে ধীরে বিষ প্রয়োগের মতো তাঁর দেহ মনকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে, বৃথাই তিনি সেই ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা দমন করতে চাইছেন।

তিনি অতি কষ্টকর এবং অতি সুন্দর সুন্দর জায়গায় বেড়ালেন, মাসের পর মাস সমুদ্রে কাটালেন, এবং সব রকমের সস্তা আমোদ প্রমোদ ও উচ্ছৃঙ্খলতায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। বিভিন্ন বন্দরের ছিমছাম বা বিলাসবহুল সাজসজ্জা, কেঅলদের* টানা চোখের উদাস

* ক্রেওল এবং নিগ্রোদের সংমিশ্রণে জাত বর্ণসংকর জাতি।

দষ্টি, সদ্য তৈরি আপেল মদের মতো হালকা সোনালী কেশ ইংরেজ ললনাদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি, আকাশে নতুন নক্ষত্রপুঞ্জ দেখতে দেখতে জাগর স্বপ্নে বিভোর হওয়া, মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার মতো ঘোর বিপদ এবং আকাশে ঘন কালো মেঘ, সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ দেখে নিজের অজান্তে বিড়বিড় করে প্রার্থনা বাণী উচ্চারণ করার চরম মুহূর্ত—কোন কিছুই তাঁকে সেই ছোটখাট প্যারিসীয় মেয়েটিকে ভুলিয়ে দিতে পারল না। সেই মেয়েটির দেহে এমন সুমিষ্ট সৌরভ, যেন দুষ্প্রাপ্য একগুচ্ছ ফুলের তোড়া ; সে এত মনোহারিণী, এমন দুর্লভ, এমন রঙ্গময়ী ; কোন ছলাকলা সে একবারের বেশি দুবার করে না, তার হাসি, চাহনি প্রতিবারেই নতুন, এবং আসল কথা অন্য হাজারো পুণ্যবতী বা পাপী, সকলের চেয়ে সে দামী।

বিনিদ্র চোখে তিনি সব সময় তার কথাই ভাবেন। তার একখানি ফটো তিনি পী-জ্যাকেটের বুক পকেটে রেখেছেন। ভারী সুন্দর ছবি ; সে হাসছে, আধখোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে তার মুক্তোর মতো সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। আঁখি দুটির সুখী, সরল চাহনি চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে, এবং কেবলমাত্র কেশবিন্যাসের অনুপম ভঙ্গীই তাকে সুন্দরীদের মধ্যে সেরা সুন্দরী করে তুলেছে।

একদা যে তাঁর স্ত্রী ছিল, সেই নারীর ছবিখানিতে তিনি এমন ভাবে চুমু খান, যেন ঠোঁট দিয়ে ঘষে তুলতে চান, ছবির দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, তারপর দুজনের মাঝে অসীম বিস্তৃত ব্যবধান দেখে খাটিয়ার জালে আছড়ে পড়ে শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। বিশাল সবুজ জলরাশির একঘেয়েমিতে বসে তাঁদের হারিয়ে-যাওয়া সুখ, বিনষ্ট ভালবাসার আনন্দ, তাঁদের যুগল প্রেমের স্বর্গীয় স্মৃতি ফিরে পেতে চান। যা কিছু ঘটেছে, সব কিছুর জন্য তিনি নিজেকেই দোষী করেন, নিজের অভিযোগগুলো কাল্পনিক মনে করে তার ওপর সব রাগ মুছে ফেলে সবকিছু সত্ত্বেও তাকে অনুক্ষণ ভালবাসেন।

এভাবে বাউণ্ডুলের মতো পৃথিবীর যত্র তত্র ঘুরে বেড়িয়ে কিসের

আশায় দুর্ভোগ ভোগ করলেন, তা তিনি নিজেও জানেন না। পুরুষ যেমন প্রেমিকার জন্য লালায়িত হয়, তিনি তেমনি ঘোর বিপদ বরণ করে মৃত্যু কামনা করলেন, মৃত্যু তাঁর পাশ ঘেঁষে চলে গেল কিন্তু তাঁকে স্পর্শ করল না ; সম্ভবত, তাঁর দুঃখ দুর্দশা দেখে মজা পেয়েছে।

তাঁর অবস্থা হল সেই পাথর-ভাঙ্গা মজুরের মতো, যে সারাদিন দুঃসহ রোদে বা প্রবল ঝড়জলে অমানুষিক পরিশ্রম করে শক্ত পাথরে নিজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গে ; এদিকে মারি আনও সুখে ছিলেন না, তাঁদের অতীত প্রেমের কথা মনে করে সেই আগেকার দিনের জন্য হাহাকার করছেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি ফ্রান্সে ফিরে এলেন। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে গায়ের চামড়া এমন তামাটে হয়ে গেছে, মনে হয় যেন কোন ডাইনী বশীকরণ সুরা খাইয়ে রং পাল্টে দিয়েছে।

চওড়া কাঁধ, তামা রং গায়ের চামড়া, টকটকে লাল ঠোঁট, হাঁটার সময় সামনে ঝুঁকে পড়ে, গলাবন্ধ কালো ড্রেস কোটে যার দম আটকে আসছে বলে মনে হয়, এ রকম জলদস্যুর চেহারা দেখে কে বলবে যে এই সেই মার্জিত, কোমল স্বভাব ক্লাবের সভ্য? তবু তাঁর চাল চলন, হাবভাবে এখনও গত শতাব্দীর উচ্চখেতাবধারী রাজ-পুরুষের বিশেষত্ব রয়ে গেছে—যারা ধ্বংস হতে হতেও একটা বেসরকারী জাহাজ পেলে সেণ্ট মিলো থেকে কলকাতা—যেখানেই হোক, ইংরেজের দেখা পেলেই তাকেই আক্রমণ করত। তিনি যেখানেই গেলেন, তাঁর বন্ধুরা তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে বলল : "একি তুমি? তোমাকে আর কখনই বোধহয় চিনতে পারতাম না!"

তিনি ফের দেশ ছাড়তে উদ্যত হলেন ; এমন কি সোজা সমুদ্র যাত্রার জন্য বাষ্পীয় ইয়ট ঠিক করে রাখতে হাভ্যর*এ তারবার্তা পাঠিয়ে দিলেন। ঠিক সেই সময়ই তাঁর কানে এল মারি আন আবার বিয়ে করেছে।

এক মঙ্গলবার ফ্রান্সিস থিয়েটারে দূর থেকে তিনি মারি আনকে

---

* ইংলিশ চ্যানেলের ওপর অবস্থিত উত্তর পশ্চিম ফ্রান্সের সমুদ্র বন্দর।

দেখতে পেলেন; আগে সে কি সুন্দর, কত লোভনীয় ছিল—কিন্তু এখন কেমন বিষণ্ণ, চেহারায় অনুতাপে দগ্ধ অসুখী মনের ছাপ ফুটেছে। ব্যারনের সঙ্কল্প টলে গেল, তিনি তাঁর যাত্রার দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ পিছিয়ে দিতে লাগলেন, কিন্তু কার জন্য, কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন, তা নিজেই জানেন না। ছায়ার মতো মারি আনের পিছে পিছে ঘুরতে ঘুরতে তিনি অনুভব করলেন, এখন ওকে যেমন ভালবাসেন, আগে কোনদিন এত বাসেননি। যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে তাকে একখানি চিঠি লিখলেন, উন্মত্ত আবেগময় সুদীর্ঘ চিঠি—যাতে তার বাসনা লাভা স্রোতের মতো বয়ে গেছে।

স্ত্রীর বিচিত্র খেয়াল এবং চঞ্চল মতির কথা মনে করে তিনি হাতের লেখা বদলালেন। যে ফুল সে সবচেয়ে বেশি ভালবাসত—সেই ফুল তার জন্য পাঠালেন এবং লিখলেন, সে ছিল তাঁর যেন জীবন, তার অভাবে তিনি মরে যাচ্ছেন, তার প্রাণের প্রতিমার জন্য তিনি অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছেন।

চিঠি পেয়ে তিনি কি একেবারে দিশেহারা, বিস্মিত হয়ে গেলেন, না অনুমানে ধরে নিলেন—কে জানে? হৃদয়ের সহজাত স্পন্দন এবং স্বাভাবিক আবেগ থেকে তিনি বুঝতে পারলেন, এ সেই ব্যক্তি, নিরুত্তেজ নিষ্ঠুরতায় যার হৃদয় তিনি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। অতীতের ভুল শুধরে নিয়ে তাঁদের আগেকার প্রেম ফিরিয়ে আনার এই একটা সুযোগ এসেছে দেখে তিনি চিঠির জবাব দিলেন, পত্রে প্রার্থিত সাক্ষাৎকারেরও অনুমতি দিলেন। দেখা হতেই তিনি তাঁর প্রাক্তন স্বামীর দুই বাহুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আনন্দে, উত্তেজনায় দুজনেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। পরস্পরকে হারিয়ে অবশেষে আবার ফিরে পেলে চোখের মিলনে যখন উভয়ে একাত্ম হয়ে যায়: আদর, ভালবাসা ও সঙ্গলাভের তৃষ্ণায় যখন আকুল হয়ে ওঠে, তখন যেমন অধরোষ্ঠ থেকে চুম্বনের ঝরনা নামে, তেমনি চুম্বনে তাঁরা সিক্ত হলেন।

কোন ব্যক্তি বিদেশ থেকে ফিরে এসে জবরদখলকারীকে বার করে দিয়ে যেমন শান্ত মনে নিজের বাড়ির দখল নেয়, গত সপ্তাহে তেমনি শান্ত এবং অনাড়ম্বর ভাবে কাউন্ট দ্য বদেমোঁ মারি আনাকে নিয়ে এলেন, এবং এই অশ্রুতপূর্ব কেলেঙ্কারির কথা যখন এ্যাডভোকেট গরুলিএর কানে এল, তিনি তাঁর দুহাত—কামুক বিশপের হাতের মতো লম্বা ও মসৃণ হাত দুখানি ঘষতে ঘষতে মন্তব্য করলেন :

"খুবই যুক্তি সঙ্গত, ওঁদের মতো করতে পারলে আমিও খুশি হতাম।"

# স্ত্রীর স্বীকারোক্তি

বন্ধু, আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা কি, তুমি জানতে চেয়েছ। আমি এখন আত্মীয় পরিজনহীন, নিঃসন্তান বৃদ্ধা, কাজেই তোমার কাছে সব কিছু খুলে বলায় বাধা নেই। কিন্তু একটা বিষয়ে কথা দিতে হবে—আমার নাম তুমি প্রকাশ করতে পারবে না। তুমি তো জান, আমি ভালবাসার যোগ্য পাত্রীই ছিলাম, অনেক সময়ই আমি আমাকেই ভালবাসতাম। আমি খুব সুন্দরী ছিলাম; এখন সে রূপ আর নেই, তাই সহজেই এ কথা বলতে পারলাম। শরীরের পক্ষে যেমন বাতাস, ভালবাসা ছিল আমার আত্মার তেমনি প্রাণ স্পন্দন। ভালবাসা না পেলে, সব সময় কোন একজনের সযত্ন মনোযোগ না পেলে আমি বরং মৃত্যুকেই বরণ করতে পারতাম। হৃদয়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে একবারই মাত্র ভালবাসা যায় বলে মেয়েরা প্রায়ই জোর দিয়ে বলে; কিন্তু আমার অনুরাগ প্রায়ই এত উত্তাল হয়ে উঠত যে ভাবতাম আমার এই আত্মহারা ভাব বোধহয় কোনদিন শেষ হবে না। যাই হোক, খুব স্বাভাবিক ভাবে, যেমন জ্বালানি না থাকলে আগুন নিভে যায়, তেমনি করে আমার ভাবাবেগ কমে আসত।

আমার জীবনের প্রথম রোমাঞ্চকর অভিযান—যাতে নিতান্ত নির্দোষ হয়েও অন্যের ক্ষতি করেছিলাম, সেই কাহিনী তোমায় শোনাব। পেকের ঐ ভয়ঙ্কর রসায়নবিদের রোমহর্ষক প্রতিহিংসা দেখে—আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেখানে আমাকে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে হয়েছে, সেই করুণ নাটক আমার মনে পড়ে গেল।

তখন সবে এক বছর হয় আমার বিয়ে হয়েছে। স্বামীর নাম কোঁত হারভে দ্য কার, একজন ধনী বনেদি ব্রিটন।* তাকে যে

* ফ্রান্সের অন্তর্গত ব্রিটানীর অধিবাসী।

আমি ভালবাসতে পারিনি, তুমি বোধহয় তা বুঝেছো। আমার বিশ্বাস, যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, সত্যিকার ভালবাসায় একই সঙ্গে স্বাধীনতা এবং বাধা নিষেধ থাকা দরকার। জোর করে গছিয়ে দেওয়া ভালবাসা, আইনানুমোদিত এবং পুরোহিতের আশীর্বাদে পবিত্র ভালবাসাকে কি সত্যিকার প্রেম বলা যায়? একটি বৈধ চুম্বনে কখনই একটি চুরি করা চুম্বনের স্বাদ মেলে না। আমার স্বামী ছিলেন লম্বা, সুঠাম চেহারা—এবং চাল চলনে একজন সত্যিকারের নিখুঁত ভদ্রলোক। কিন্তু তার সূক্ষ্ম বুদ্ধির অভাব ছিল। ঠোঁট কাটার মতো এমন স্পষ্ট করে এক একটা কথা বলে বসতেন যা ধারাল ছুরির ফলার মতো গায়ে বিঁধত। তাঁর সম্বন্ধে এই ধারণাই হোত যে মা বাবার কাছ থেকে পাওয়া মতবাদে, যা তাঁরাও আবার তাঁদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বংশ পরম্পরায় পেয়েছিলেন, তাঁর মগজে ঠাসা ছিল। যে কোন বিষয়ে তিনি নির্দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ সংকীর্ণ-মনা মন্তব্য করতেন, এজন্য একটুও লজ্জা পেতেন না বা একবারও ভেবে দেখতেন না যে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও সব বিষয় ব্যাখ্যা করা চলে। বাড়ির খোলা জানালা দিয়ে নির্মল বাতাস ঢুকে খেলা করার মতো যে ভাবনারাশি মানুষের মনকে নতুনত্ব ও গভীরতা দান করে—সে রকম কোন ভাব তার মাথায় খেলত না, কেননা তার মাথাটা ছিল একেবারে নিরেট।

আমরা যে প্রাসাদে বাস করতাম সেটা ছিল দেশের একটা নির্জন অঞ্চলে। প্রকাণ্ড বাড়িটাকে বিষণ্ণ দেখাত, চারদিক ঘিরে রয়েছে বিশাল বৃক্ষ, যেগুলোর গায়ে গোছা গোছা শেওলা ঝুলত, ঠিক যেন বুড়োদের পাকা দাড়ি।

পার্ক—আসলে যা একটা বন, ঘিরে রয়েছে গভীর পরিখা, যার নাম 'হা-হা'; পার্কের একেবারে শেষ প্রান্তে পতিত জমির কাছাকাছি আমাদের বড় বড় দুটো পুকুর ছিল—কচুরিপানা আর ভাসমান ঘাসে যার জল একেবারে ঢেকে ফেলেছিল। পুকুর দুটোকে যোগ করে মাঝখানে একটা ছোট্ট নদীর মতো ছিল; সেই নদীর

ধারে আমার স্বামী একটা কুঁড়ে ঘর করিয়েছিলেন বুনো হাঁস শিকারের জন্য।

সাধারণ চাকরবাকর ছাড়া আমাদের বাড়ি দেখা শোনা করার জন্য আরও একজন তত্ত্বাবধায়ক ছিল, যার বুদ্ধি মোটা কিন্তু আমার স্বামীর জন্য জান দিতে পারত। এছাড়া ছিল আমার খাস দাসী—আমার বন্ধুর মতো, আমাকে খুবই ভালবাসত। পাঁচ বছর আগে ওকে আমি স্পেন থেকে নিয়ে এসেছিলাম। ওর মা বাবা ওকে ফেলে পালিয়েছিল। ওর যা রূপ ছিল, তাতে ও জিপসী মেয়ে হতে পারত। গায়ের রঙ্ ছিল কালো, চোখ দুটিও কুচকুচে কালো ; বুনো লতাপাতার মতো ঘন চুলের গুচ্ছ সবসময় কপালের ওপর ঝুলে থাকত। সে সময় তার বয়স হয়েছিল ষোল, যদিও দেখাত কুড়ি বছরের মতো।

শরতের শুরু। আমাদের এবং প্রতিবেশী জমিদারের জমিদারিতে তখনই আমরা অনেক শিকার করে ফেলেছি, আমার নজরে পড়ল ব্যারন-দ্য-স-নামে এক ভদ্রলোক আমাদের বাড়ি খুব ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করেছেন। তারপর তিনি আসা বন্ধ করে দিলেন ; এ নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাইনি ; কিন্তু লক্ষ্য করলাম, আমার স্বামীর আমার প্রতি ব্যবহার বদলে গেছে।

মনে হল, কোন একটা বদ্ধমূল ধারণা তাঁর মাথায় ঢুকেছে যার জন্য কথাবার্তা কমিয়ে দিয়েছেন ; আমাকে আর চুমু খান না ; একটু একা থাকব বলে আমি আলাদা শোবার ঘরের বন্দোবস্ত করায় তিনি আমার ঘরে আসতেন না ; তবু রাত্রে প্রায়ই শুনতে পেতাম পা টিপে টিপে কে যেন আমার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়, কয়েক মিনিট পর পায়ের শব্দ আবার দূরে মিলিয়ে যায়।

ঠিক একতলার ওপরেই আমার ঘরের জানালা, মনে হোত, আমি যেন প্রায়ই এও শুনতে পেতাম, ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে কেউ একজন প্রাসাদের চারধারে ঘুরে বেড়ায়। স্বামীকে এ বিষয়ে বললে তিনি

কয়েক সেকেণ্ড আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জবাব দিলেন :

"ও কিছু নয়— ঐ তত্ত্বাবধায়ক হবে।"

এরপর একদিন, সন্ধ্যায় ডিনার খাওয়ার পর হারভে, তাঁকে সেদিন খুব খুশী-খুশী দেখাচ্ছিল, এক ধরনের ধূর্ত খুশীর ভাব, আমায় বললেন :

"যে শেয়ালটা রোজ সন্ধ্যায় আমার মুরগী খেতে আসে, সেটাকে শিকার করবার জন্য বন্দুক নিয়ে ঘণ্টা তিনেক বাইরে কাটাবে নাকি ?"

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। একটু ইতস্তত করলাম ; কিন্তু উনি যে ভাবে জেদীর মতো চেয়ে ছিলেন, তাতে জবাব না দিয়ে উপায় ছিল না—

"নিশ্চয়, কেন নয় বন্ধু ?" তোমাকে বলে রাখা ভাল যে পুরুষের মতোই আমি নেকড়ে এবং বুনো শুয়োর শিকার করতাম। কাজেই উনি আমায় এই শিকারে যেতে বলবেন, এতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

কিন্তু হঠাৎ আমার স্বামীর চাহনিতে এমন বিচলিত ভাব ফুটে উঠল যাতে সন্দেহ হতে পারে ; এবং সারাটা সন্ধ্যা উনি উত্তেজিত হয়ে বিকারগ্রস্তের মতো উঠ্-বস্ করে কাটালেন।

প্রায় রাত দশটার সময় হঠাৎ উনি আমায় বললেন : "তুমি তৈরী তো ?"

আমি উঠলাম ; এবং উনি যখন নিজেই আমার বন্দুক নিয়ে এলেন, আমি প্রশ্ন করলাম :

"আমরা কি টোটা নেব, না ছর্‌রা ?"

উনি যেন কিছুটা অবাক হলেন ; পরে জবাব দিলেন : "ওহোঃ! শুধুই ছর্‌রা ; অত ভেব না। ওতেই যথেষ্ট হবে।"

তারপর কয়েক সেকেণ্ড পর, একটু অদ্ভুত স্বরে বলে

উঠলেন: "তুমি চমৎকার শান্ত মেজাজের বড়াই করতে পার।"

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। "আমি? কেন, বল ত? একটা শেয়াল মারতে যাচ্ছি বলে শান্ত মেজাজ? তুমি কি ভাবছ বন্ধু, বলবে?"

পার্কের মধ্য দিয়ে আমরা চুপচাপ হেঁটে চললাম। বাড়ির সব লোকজনেরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। পরিপূর্ণ চাঁদ যেন প্রাচীন বিষণ্ণ অট্টালিকার ওপর হল্‌দে আভা ছড়িয়ে দিয়েছে, শ্লেট পাথরের ছাদ উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় ঝক্‌মক করছে। ছাদের দুপাশে দুটি মিনারের মাথায় দুটি থালার ওপর বাতি জ্বলছে; স্বচ্ছ, বিষণ্ণ, মধুর ও নিস্তব্ধ এই শান্তি ভঙ্গ করার মতো কোন শব্দ কোথাও নেই, চারদিকে যেন মৃত্যুর আবেশ। বাতাসও যেন থমকে আছে, ব্যাঙের চিৎকার নেই, প্যাঁচার আর্তনাদ নেই, এক বিষণ্ণ অসাড়তা যেন সব কিছুতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। পার্কের মধ্যে গাছতলায় এসে যখন পৌছলাম, ঝরা পাতার গন্ধে আমার মনটা একটু তাজা হল। আমার স্বামী কথা বলছিলেন না; কিন্তু কান খাড়া এবং দৃষ্টি সজাগ রেখেছিলেন, তাঁকে শিকার ধরার নেশায় পেয়ে বসেছিল, মনে হচ্ছিল, যেন বনের ছায়াতে তিনি শিকারের গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছেন।

শীঘ্রই আমরা পুকুরের ধারে এসে গেলাম। পুকুরের আগাছার জঙ্গল অনড়; বাতাসের সামান্যতম আদরের স্পন্দনও তাদের দোলা দিচ্ছে না। তবু, জলের বুকে ক্ষীণ স্পন্দন আছে যা সহজে চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে কোন কিছুর দ্বারা জলের উপরিভাগ চিড় খাচ্ছে, আর লঘুভার ছোট ছোট বৃত্ত রচিত হচ্ছে, যেন আলোকরেখা বড় হতে হতে আবছা হয়ে যাচ্ছে।

কুঁড়ে ঘর, যেখানে আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, তার দুয়ারে যখন পৌছলাম, আমার স্বামী আগে আমায় ভেতরে ঢুকতে বললেন; পরে ধীরে সুস্থে তিনি তাঁর বন্দুকে গুলি ভরে ফাঁকা আওয়াজ করলেন। শুকনো বারুদের গন্ধ ও তীক্ষ্ণ শব্দে আমার

মনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল। আমাকে কাঁপতে দেখে উনি বললেন : "এই মহড়াতেই তোমার এমন অবস্থা ? যদি তাই হয়, তো ফিরে যাও।"

আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। বললাম : "মোটেই না। কোন কিছু না করেই ফিরে যাব বলে আমি আসিনি। আজ রাত্রে তোমাকে অদ্ভুত লাগছে।"

উনি বিড়বিড় করলেন : "যা ইচ্ছে কর।" এরপর আমরা সেখানে অনড় হয়ে বসে রইলাম।

এভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেল। এই উজ্জ্বল শারদ রাত্রির পীড়াদায়ক নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করার মতো কিছুই ঘটছে না দেখে আমি গলা নামিয়ে নিচু স্বরে বললাম : "তুমি ঠিক জানো, ওটা এখান দিয়েই যায় ?"

হারভে এমন ভাবে কুঁকড়ে গেলেন যেন আমি তাঁকে মেরেছি। আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বললেন : "এতে বিন্দুমাত্র ভুল নেই ! আমি ঠিক জানি।"

আবার নিথর নীরবতা। মনে হচ্ছিল ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে, ঠিক তখনই আমার স্বামী আমার হাত চেপে ধরলেন, তাঁর গলার স্বর বদলে গেল, হিস্ হিস্ করে বললেন : "গাছের তলায় ওকে দেখতে পাচ্ছো ?"

আমি বৃথাই তাকিয়ে থাকলাম, আলাদা করে কিছুই দেখতে পেলাম না। হারভে সারাক্ষণ আমায় মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আস্তে আস্তে বন্দুকের ঘোড়া টানতে লাগল।

আমিও গুলি করার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম, সহসা আমাদের থেকে তিরিশ পা তফাতে, পূর্ণ চাঁদের আলোয় একটি মানুষের অবয়ব ভেসে উঠল, সামনে ঝুঁকে দ্রুত পায়ে সামনে এগিয়ে চলেছে, যেন পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

আমি এত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম যে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম ; কিন্তু ঘাড় ফেরানোর আগেই আমার চোখের সামনে এক

ঝলক আগুন ঝল্‌সে উঠল ; একটা কান ফাটা আর্তনাদ শুনলাম ; এবং দেখলাম গুলিবিদ্ধ নেকড়ের মতো লোকটা মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

ভয়ে বিহ্বল হয়ে আমি দারুণ আর্তনাদ করে উঠলাম, যেন পাগল হয়ে যাচ্ছি ; তখন এক জোড়া হাত—হারভের হাত, আমার গলা টিপে ধরল। আমাকে মাটিতে আছড়ে ফেলে তারপর তাঁর শক্ত সবল বাহু দিয়ে জাপ্‌টে ধরলেন। আমাকে কোলে করে উনি দৌড়তে লাগলেন, ঘাসের ওপর যেখানে মৃতদেহটি পড়েছিল, একেবারে সেইখানে এসে তবে থামলেন ; প্রচণ্ড জোরে দড়াম করে আমাকে ঐ প্রাণহীন দেহটার ওপর আছাড় মারলেন, যেন উনি আমার মাথাটা ভেঙে ফেলতে চান।

মনে হয় আমি দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম ; উনি আমায় খুন করতে যাচ্ছিলেন ; ওঁর পায়ের গোড়ালি ঠিক যখন আমার কপালের ওপর, তখনই, আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই, কে যেন এক ঝটকায় মাটিতে ফেলে দিল।

তড়াক করে উঠে পড়লাম, দেখলাম পরকিতা,—আমার খাস দাসী বুনো বেড়ালের মতো তাঁকে আঁকড়ে ধরে মরিয়া হয়ে তাঁর দাড়ি গোঁফ উপ্‌ড়ে ফেলছে, মুখের চামড়া আঁচড়ে কামড়ে ফালা ফালা করছে।

সহসা তার মাথায় যেন অন্য ভাবনা এল, সে উঠে দাঁড়াল ; তারপর মৃতদেহের ওপর লুটিয়ে পড়ে দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে তার চোখে মুখে অজস্র চুমু খেতে লাগল, তার নিজের ঠোঁট দিয়ে মৃতের ঠোঁট দুটি ফাঁক করে যেন প্রেমিকের নিঃশ্বাস এবং দীর্ঘ, সুদীর্ঘ চুম্বন খুঁজতে চাইল।

আমার স্বামী মাটি থেকে উঠে আমার দিকে তাকালেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমার পায়ে পড়ে বললেন : "ওঃ! প্রিয়ে, আমায় ক্ষমা কর, তোমাকে সন্দেহ করে আমি এই মেয়েটির প্রেমিককে খুন করলাম। ওই তত্ত্বাবধায়ক আমায় ভুল বুঝিয়েছিল।"

কিন্তু আমি তখন ঐ মৃত পুরুষ আর জীবিত নারীর অদ্ভুত চুম্বন দেখছিলাম, মেয়েটির ফোঁপানি, তার হৃদয় মোচড়ানো বেদনার্ত ভালবাসা দেখছিলাম। এবং সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

## বেন্যোস

এক রবিবার প্রার্থনার পর তার দিকে নজর পড়ল। গীর্জা থেকে বেরিয়ে সে তার বাড়িমুখো রাস্তার চৌমাথায় পড়েছে, এমন সময় নজরে পড়ল মারতিঁদের মেয়ে তার আগে আগে চলেছে, সেও বাড়ি ফিরছিল।

মেয়ের পাশে পাশে হাঁটছে বাপ, ধনী জোতদারের ভারিক্কি চাল তার প্রতি পদক্ষেপে ফুটে উঠছে। গায়ের কুর্তার পরোয়া না করে ছাই রঙের কাপড় দিয়ে তৈরি এক বিশেষ নমুনার ওয়েস্ট কোট তার ওপর চাপিয়েছে, মাথায় পরেছে চওড়া কানাওয়ালা তরমুজাকৃতি একটা শোলার টুপি। মেয়েটি একটি লেসে-বোনা কাঁচুলি পরেছে, যেটি সে সপ্তাহে একবার মাত্র পরে। সে সোজা হেঁটে যাচ্ছে, সরু কোমর, চওড়া কাঁধ, গুরু নিতম্বে একটু একটু ঢেউ খেলছে। তার টুপিটি আগাগোড়া ফুলের নক্সাকাটা, অভেতত টুপি—নির্মাতার হস্ত-শিল্পের নমুনা; তার সুডোল, সুগঠিত, কমনীয় অনাবৃত গ্রীবা ঘিরে আলো বাতাসে স্নান করে থোকা থোকা অলকগুচ্ছ লতিয়ে পড়েছে।

বেন্যোস তার পেছনটাই দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু মুখখানাও তার খুবই চেনা, সেইজন্যই আরও বেশি করে তার দিকে নজর পড়েছে। আচমকা সে নিজের মনেই বলে ফেললে :

"আমার! কিন্তু ও সুন্দরী, সত্যিই সুন্দরী, ঐ মারতিঁদের মেয়ে!"

তার অমার্জিত সহজাত রসবোধ দিয়ে সে মেয়েটির চলার ছন্দের তারিফ করতে করতে কামনায় জর্জরিত হয়ে উঠল। মুখ দেখার দরকার নেই, মোটেই দরকার নেই। যেন কারো সঙ্গে কথা বলছে, এমনি ভাবে আপন মনেই সে বলে চলল : "মেয়েটি সুন্দর!"

বাবা জন মারতিঁর খামার বাড়ি 'মারতিনের'-এ ঢোকার জন্য

মারতিঁদের মেয়ে ডান দিকে ঘুরল। ঢোকার মুখে পেছনে ফিরে চাইতেই বেন্‌তোসের সঙ্গে চোখাচোখি হোল, সে হাঁ করে তার দিকেই তাকিয়েছিল। মেয়েটি চেঁচিয়ে বলল : "সুপ্রভাত, বেন্‌তোস।" সে জবাব দিল : "সুপ্রভাত, মিস মারতিঁ, সুপ্রভাত মিঃ মারতিঁ।" এর পর সে বাড়িমুখো হাঁটা দিল।

সে বাড়ি ঢুকে দেখল খাবার তৈরী ; মায়ের মুখোমুখি চেয়ারে এসে বসল, তার পাশে বসেছে তাদের খামারের কর্মচারী আর রাখাল। ঝি সাইডারের* বোতল আনতে গেল। কয়েক চামচ খেয়ে সে প্লেট পাশে সরিয়ে রাখল। মা জিজ্ঞেস করলেন, "কি রে, কি হয়েছে, শরীর খারাপ লাগছে ?"

সে উত্তর দিল : "না, পেটের মধ্যে কেমন যেন জ্বালা করছে, একেবারে খিদে নেই।"

সে অন্যদের খাওয়া চেয়ে চেয়ে দেখল, কিছুক্ষণ পর পর তারা গাল ভর্তি রুটি খেয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে, অথচ বহুক্ষণ চিবিয়েও তার মুখের এক টুকরো রুটি ফুরোচ্ছে না। তখনও সে মারতিঁদের মেয়ের কথাই ভাবছে ; "বাস্তবিক, মেয়েটি সুন্দর!"

আর, অবাক কাণ্ড, এই কথাটা এর আগে কখনও তার মনে আসেনি, কিন্তু এখন হঠাৎ এত গভীর ভাবে তাকে নাড়া দিয়েছে যে তার খিদে মরে গেছে। একটু ছুঁয়েই সে স্টু-এর বাটি সরিয়ে রাখল।

মা বললেন : "বেন্‌তোস শোন, একটু খা ; এটা ভেড়ার এক পাশের খুব ভাল মাংস। খিদে না থাকলে মাঝে মাঝে একটু জোর করে খেলে ভাল হয়।"

খানিকটা মুখে দিয়ে সে গিলে ফেলল, তারপর থালা ঠেলে দিয়ে বলল : "না, আর পারছি না, কিছুতেই না।"

খেয়ে উঠে সে খামার বাড়িটা চক্কর দিয়ে এল ; নিজেই গরু-বাছুর গোয়ালে তুলবে বলে রাখালকে হাফ-ছুটি দিয়ে দিল। ছুটির দিন বলে সারা গ্রাম যেন খাঁ খাঁ করছে। গোচারণের মাঠে গরুগুলো

* আঙুর থেকে তৈরি এক প্রকার অম্লুগ্র মদ।

গা এলিয়ে দিয়ে এখানে ওখানে বসে জাবর কাটছে আর রোদ পোহাচ্ছে, কোনটা বা অলস পায়ে ধীরে ধীরে হাঁটছে। একটা হাল দেওয়া জমির এক কোণে কয়েকটা লাঙল জোয়াল থেকে খোলা অবস্থায় পড়ে আছে; এবং বীজ বোনার উপযুক্ত চষা জমির দীর্ঘ বাদামী আলবাল রেখা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তার মাঝে মাঝে বিলম্বে কেটে নেওয়া গম ও ভুট্টার হলদে খড় পচানোর জন্য এখানে ওখানে গাদা করে রাখা হয়েছে।

মাঠের ওপর দিয়ে শরতের শুকনো বাতাস বইছে, সূর্যাস্তের পর ঠাণ্ডা পড়বে, তারই পূর্বাভাস। বেন্‌স্নোস একটা ডোবার ধারে বসে পড়ল, মাথা থেকে টুপিটা খুলে কোলের ওপর রাখল যেন মাথায় হাওয়া লাগানো দরকার; তারপর নিস্তব্ধ মাঠের মধ্যে চেঁচিয়ে বলল: "সুন্দরী মেয়েদের কথা উঠলে বলা যায়, এখানে একটি সুন্দরী মেয়ে আছে!"

রাত্রে শুয়ে শুয়ে সে মেয়েটির কথাই ভাবল, ভোরে উঠেই আবার তার কথা মনে পড়ল। তার কোন দুঃখ নেই, বিরক্তিও নেই; তার যে কি হয়েছে সে বলতে পারবে না। কিন্তু কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে, এমন কিছু যা তার হৃদয়ে ঘা দিয়েছে, এমন একটা ভাব যা সে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছে না, যাতে তার হিয়া শিহরিত হচ্ছে।

কখনও আমাদের চোখে পড়ে একটা মাছি ঘরে আটকে পড়ল। মাছিটা ভন ভন করে উড়তে থাকে যতক্ষণ না আমরা বিরক্ত হয়ে রেগে উঠি—সে দিকে মন দিই না। হঠাৎ মাছিটা চুপ করে থেমে যায়; আমরাও ওর কথা ভুলে যাই; কিন্তু ফের ওটা ভন্ ভন্ করে, আমাদের নজর জোর করে ওর দিকে ফেরায়। আমরা না পারি মাছিটাকে ধরতে, না পারি মারতে, না পারি এক জায়গায় বসিয়ে রাখতে। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে ওর ঘ্যানঘ্যানানির কাছে আমরা হার মানি। মারতিঁদের মেয়ের স্মৃতি বেন্‌স্নোসের মনে ঠিক সেই রকম অস্বস্তি এনেছিল; এই স্মৃতি যেন একটা বন্দী মাছি।

তাকে আর একবার দেখবার বাসনায় অস্থির হয়ে সে মারতিঁদের খামার বাড়ির সামনে দিয়ে বার বার যাতায়াত করতে লাগল। অবশেষে তার দেখা মিলল, ছুটো আপেল গাছের মাঝখানে একটা তারে সে জামা কাপড় রোদে দিচ্ছিল।

গরম পড়েছিল বলে তার পরনে ছিল কেবল একটা শেমিজ আর একটা খাটো স্কার্ট, ফলে হাত উঁচু করে যখন সে রুমাল গুলোয় পিন্ লাগাচ্ছিল, তার বাহু দিয়ে তৈরি শুভ্র খিলান দেখার সুযোগ হয়ে গেল। মেয়েটি চলে যাবার পরও এক ঘণ্টার ওপরে সে ওই ডোবার ধারে শুয়ে পড়ে থাকল। তারপর হৃদয় আরও জখম করে সে ফিরে এল।

মাসখানেক মেয়েটির চিন্তায় তার মন এত বিভোর হয়ে রইল যে কেউ তার নাম করলে সে কেঁপে উঠত। আহারে রুচি নেই, ঘুম আসে না, রাত কাটে ছটফটিয়ে। এক রবিবার, প্রার্থনা সভায় সে মেয়েটির ওপর থেকে কিছুতেই চোখ সরাতে পারল না। মেয়েটি লক্ষ্য করল এবং প্রশংসায় খুশী হয়ে তার দিকে চেয়ে একটু হাসল।

এরপর একদিন সন্ধ্যাবেলা বেন্তোস রাস্তায় মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল। তাকে আসতে দেখে মেয়েটিও দাঁড়িয়ে পড়ল। বেন্তোস সোজা তার দিকে হেঁটে গেল, ভয়ে তার দম আটকে আসছিল, তবু সে ঠিক করল আজ কথা বলবেই। সে ঘাবড়ে গিয়ে তোতলাতে আরম্ভ করল : "এই যে মিস মারতিঁ, আমি আর সইতে পারছি না।"

মেয়েটি বিদ্রূপ করে জবাব দিল : "বেন্তোস, কি সে বস্তু—যা তুমি সইতে পারছ না?"

"দিনের সবটুকু সময় আমি শুধু তোমার কথাই ভাবি"—বেন্তোস বলল।

ঠোঁটে আঙুল রেখে মেয়েটি জবাব দিল : "কিন্তু এ জন্য আমি তো তোমাকে মাথার দিব্যি দিই নি।"

বেন্তোস বিড় বিড় করল : "হাঁ, তুমিই এ জন্য দায়ী ; আমি শুতে পারি না, খেতে পারি না, জিরোতে পারি না, কোন কিছুতেই মন দিতে পারি না।"

খুব নিচু গলায় মেয়েটি জিজ্ঞেস করল : "তোমার এই ব্যামো কিসে সারবে বলে মনে হয় ?"

বেন্তোস থ হয়ে গেল। কে যেন তার হাত দুটো ধরে প্রচণ্ড হ্যাঁচ্‌কা টান দিয়েছে, চোখ দুটো গোল হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

মারতিঁদের মেয়ে যেন একখানা ধারাল ছুরি তার বুকে আমূল বসিয়ে দিয়ে ছুটে পালিয়েছে।

এরপর প্রায়ই তাদের দেখা হত, কখনও ডোবার ধারে, কখনও বা চৌরাস্তার মোড়ে ; সাধারণতঃ দিনের শেষে, যখন বেন্তোস তার ঘোড়াগুলোকে বাড়ি নিয়ে যেত আর মেয়েটি গরুর পাল গোয়ালের দিকে তাড়িয়ে নিত। দেহ মনের দুর্বার আবেগ তাকে মেয়েটির দিকে টেনে নিয়ে যেত, সে কিছুতেই রোধ করতে পারত না। তাকে বুকে চেপে ধরে পিষে মারবার কামনায় বেন্তোস জ্বলতে লাগল, ইচ্ছে হোল তাকে খেয়ে হজম করে নিজের সত্তার অঙ্গীভূত করে নেয়। ঐ মেয়েই তার পরিপূরক, তারা দুইয়ে মিলে এক হতে পারে।—অক্ষমতা, অধৈর্য এবং উত্তেজনায় সে কাঁপতে লাগল।

গাঁয়ে ওদের নিয়ে কানাকানি শুরু হয়ে গেল। গুজব রটল ওরা নাকি পরস্পরকে কথা দিয়েছে। আসলে বেন্তোস ওকে জিজ্ঞেস করেছে ও বিয়ে করতে রাজী কি না, এবং ও উত্তর দিয়েছে : "রাজী।" মা বাবাদের কাছে কি ভাবে কথাটা পাড়া যায়, এখন ওরা সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

এরপর হঠাৎ এক সময় বেন্তোস আর নির্দিষ্ট সময়ে মেয়েটির দেখা পেলনা। রবিবার প্রার্থনার সময় এক পলকের একটু দেখা হোত। এক রবিবার, ধর্মোপদেশ পাঠ করার পর উঁচু মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যাজকমশাই ঘোষণা করলেন : "একটি সুসংবাদ আছে,

ভিক্তুর আদেল্যো মারতিঁ ও জোসেপ ইসিদোর ভাঁলি পরস্পর পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবেন।"

বেন্তোসের মনে হোল যেন তার সমস্ত রক্ত মাথায় ওঠে এসেছে। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে; আর কোন কথাই তার কানে ঢুকল না, খানিকক্ষণ পর সে দেখল তার চোখের জলে প্রার্থনা পুস্তক ভিজে গেছে।

মাসখানেক সে ঘর থেকে বেরোল না। পরে আবার আগের মতোই কাজকর্ম করতে লাগল। কিন্তু তখনও সে সামলে উঠতে পারে নি, মনে মনে দিন রাত মেয়েটির কথাই ভাবে। যাতে কোন মতেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়ে না যায়, এমনকি ওব বাগানের একটা গাছও যাতে চোখে না পড়ে সেজন্য বেন্তোস মেয়েটির বাড়ির আশ পাশের রাস্তাগুলো এড়িয়ে চলতে লাগল। ফলে সকাল সন্ধ্যায় ঘুরপথে তাকে অনেকটা হাঁটতে হোত।

এখন ও জেলার সবচেয়ে ধনী জোতদার ভালিঁর বৌ। বেন্তোস এখন আর ভালিঁর সঙ্গে কথা বলে না, অথচ সেই শিশুকাল থেকে ওদের বন্ধুত্ব।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বেন্তোস যখন গোচারণের মাঠ পার হচ্ছে, অন্যের কাছে শুনল, মেয়েটি মা হতে চলেছে। উতলা হওয়া বা গভীর দুঃখ পাওয়ার পরিবর্তে সে যেন এর মধ্যে এক ধরনের সান্ত্বনা খুঁজে পেল। এতদিনে পুরোপুরি শেষ হোল, সব কিছু চুকে গেল। বিয়ের পরেও যেটুকু অবশিষ্ট ছিল. এবার সেই শেষ [illegible] গেল। সত্যিই, এই বেশ হোল।

কয়েক মাস কেটে গেল, তারপর আরও কয়েক মাস। মাঝে মধ্যে সে দেখে মেয়েটি শ্লথ গমনে গাঁয়ের পথে হাঁটছে। চোখাচোখি হলে ভালিঁর বৌ লাল হয়ে মাথা নুইয়ে তাড়াতাড়ি পা চালায়। যাতে সামনাসামনি না পড়ে এবং চোখাচোখি না হয়, সেজন্য বেন্তোস ঐ পথে চলাও ছেড়ে দিল।

তবু সে ভাবত, সেই প্রথম যেদিন সে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা

বলতে গিয়ে ভয় পেয়ে কাঁপছিল, ঠিক সেই শিহরণ সে অনুভব করত। আচ্ছা, সেই তখন, আদৌ যদি সে ওর হাত দুখানি ধরে, কাঁধের ওপর লুটিয়ে পড়া চুলের গুচ্ছে চুমু খেয়ে ওর সঙ্গে কথা বলত —কি বলত ওকে ? ডোবার ধারে তাদের সেই মিলন স্থানের কথা এখনও তার মনে ভাসে। এত সব অঙ্গীকারের পর এরকম প্রত্যাখ্যান—যা ও করেছে, অতি জঘন্য কাজ।

আস্তে আস্তে রাগ কমে এল ; এখন বেন্তোসের মনে রাগ বা অন্য কিছুই নেই, শুধুই একটা বিষাদ। একদিন সে তার পুরনো পথ—মেয়েটির বাড়ির পাশের রাস্তা ধরে রওনা দিল। দূর থেকে ওদের বাড়ির ছাদ দেখা গেল। ও ওখানেই আছে। অন্য আর একজনের সঙ্গে রয়েছে। আপেল গাছগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। গোলাবাড়ির উঠোন থেকে হাঁসমুরগীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে একটা শূন্যতা বিরাজ করছে, কারণ লোকজন সবাই বসন্তের ফসল বোনার কাজে মাঠে বেরিয়ে গিয়েছে। সে বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকাল। কুকুরশালার কাছে কুকুরটা শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। তিনটি বাছুর সার বেঁধে একের পর এক অলস পায়ে পুকুরের দিকে যাচ্ছে জল খেতে, পোলট্রির দরজার সামনে একটা তুর্কী-মোরগ মঞ্চ গায়কের ভঙ্গীতে এ মাথা ও মাথায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

বেন্তোস একটা খুঁটির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, হঠাৎ তার কান্না পেয়ে গেল। কিন্তু ঠিক তখনই সে একটা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল, ঐ বাড়ির ভেতর থেকে গভীর করুণ কান্না ভেসে আসছে। সে দিশেহারা হয়ে দু হাতে রেলিং আঁকড়ে ধরে শুনতেই থাকল। দীর্ঘস্থায়ী, মর্মভেদী আর একটি চিৎকার তার কানের ভেতর দিয়ে শরীর এবং মনে প্রবেশ করল। ও বিপদে পড়েছে। নির্ঘাৎ ও!

শেষ অবধি বেন্তোস তাড়াতাড়ি বেড়া টপকে পার হয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। দেখল ও হাত পা ছড়িয়ে মেঝেতে পড়ে আছে, মুখখানা ফ্যাকাশে, চোখ বসে গেছে, প্রসব বেদনায় ও কাতরাচ্ছে।

বেন্তোস মেয়েটির চেয়ে বেশি ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বিড় বিড় করে বলল: "এই যে আমি এসেছি, বন্ধু, আমি এসেছি।"

মেয়েটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল: "ওঃ, আমায় ছেড়ে যেও না, বেন্তোস, আমায় ছেড়ে যেও না!"

কি বলবে, কি করবে কিছুই বুঝতে না পেরে বেন্তোস তার দিকে চেয়ে রইল। সে আবার কাঁদতে শুরু করল: "ওঃ! ওঃ! আমাকে দু টুকরো করে ফেলবে! ওঃ! বেন্তোস!"

মনে হল যন্ত্রণায় ও মরে যাবে। ওকে সাহায্য করার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা বেন্তোসকে পেয়ে বসল; সে ওকে দুর্ভোগ থেকে রেহাই দেবে, যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে। ঝুঁকে পড়ে সে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। এবং যদিও থেকে থেকে সে তখনও গোঙাচ্ছে, তবু তার পোশাক খুলে দিল, মাথায় বাঁধা রুমাল, গায়ের ফ্রক ও স্কার্ট খুলে ফেলল। কান্না রোধ করতে গিয়ে মেয়েটি নিজের হাত-কামড়াচ্ছে। এরপর নিজের পোষা জন্তু গরু, ভেড়া এবং ঘোটকীর ক্ষেত্রে যা করে, সে ভাবেই বেন্তোস তাকে সন্তান প্রসব করতে সাহায্য করল এবং দুহাতে একটি বড় সড় শিশুকে ধরে ফেলল—শিশুটি তখন গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে।

সে শিশুটিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে আগুনের কাছে মেলে দেওয়া একটা কাপড় নিয়ে এসে জড়িয়ে নিল, তারপর টেবিলের ওপর পাতা একটা পশমী কাপড়ের ওপর তাকে শুইয়ে দিল। মাকে আবার মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে বিছানা পাল্টে পরিষ্কার করে ফের তাকে বিছানায় তুলে দিল। ভালিঁর বৌ ফিসফিসিয়ে বলল: "ধন্যবাদ, বেন্তোস, তুমি সত্যিই মহান হৃদয়ের অধিকারী।"—বলে সে একটু কাঁদল, যেন কোন কিছু মনে পড়ায় অনুতাপ হচ্ছে।

বেন্তোসের কথা বলতে গেলে, তার ভালবাসা মরে গেছে, একেবারেই মরে গেছে। সব কিছু চুকে গেছে। কেন? কি করে? সে এর জবাব দিতে পারবে না। দশ বছরের অদর্শনে যা সম্ভব

হোত না, এই ঘটনায় তাই হয়েছে। সে প্রেম যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে।

দুর্বল কাঁপা গলায় মেয়েটি শুধাল : "কি হয়েছে?"

শান্ত স্বরে সে জবাব দিল : "মেয়ে হয়েছে, সুন্দরী মেয়ে।"

আবার দুজনেই চুপচাপ। কয়েক সেকেণ্ড পর মা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল : "বেন্তোস, আমাকে এনে দেখাও।"

বেন্তোস গিয়ে সেই ক্ষুদে জীবটিকে তুলে নিয়ে এল, তারপর এমন ভাবে তাকে মায়ের দিকে এগিয়ে ধরল যেন প্রসাদী এক টুকরো রুটি। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল ইসিদো ভালিঁ। প্রথম সে কিছুই বুঝতে পারলো না, কিন্তু একটু পরেই সব তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

বেন্তোস কিছুটা থতমত খেয়ে আমতা আমতা করে বলল : "আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম—যেতে যেতে একটা চিৎকার শুনলাম —তখন আমি এলাম—এই নাও তোমার সন্তান, ভালিঁ!"

স্বামীটি ছলছল চোখে, তার দিকে বাড়িয়ে ধরা পলকা ক্ষুদে জীবটিকে, কোলে তুলে বুকে চেপে ধরল; কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল ভাবাবেগ কাটিয়ে উঠতে; তারপর সে শিশুকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, বেন্তোসের দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল : "বেন্তোস, যা হবার হয়ে গেছে; দেখ আমরা সবাই সব কিছুই জানি। তুমি যদি ইচ্ছা কর, এখন থেকে আমরা বন্ধু হতে পারি; ঠিক সেই রকম এক জোড়া বন্ধু—"

এবং বেন্তোসের জবাব : "আমার ইচ্ছে আছে, নিশ্চয়ই—আমার ইচ্ছে আছে।"

ভিয়েনার অভিজাত সমাজের সুদর্শনা যুবতী। অন্যান্য অভিজাত সুন্দরী ললনাদের মতো সেও গত গ্রীষ্মে স্বামী ছাড়াই জলবিহারে বেরিয়ে পড়ল অষ্ট্রিয়ার ফ্যাশন দুরস্ত ক্রীড়াভূমি কার্লস্‌বাদের উদ্দেশ্যে। ওখানে বিদেশী পর্যটকদের মেলা।

তার সমাজের নিয়মমাফিক সম্মান আর অর্থকৌলিন্য দেখে তার বিয়ে। তাই প্রথম মিলনের ক্ষণিক চকিত মোহ বিবাহিত জীবনে হৃদয় গভীরে ভালবাসার আলো জ্বালতে সক্ষম হোল না। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একটি পুত্রের জন্ম দিয়ে সে তার স্বামীর বাসনা আর পরিবারের ঐতিহ্য বজায় রাখল। এবার তার দায়মুক্তি। স্বামী-স্ত্রী যে যার নিজের পথ বেছে নিল। তরুণ সুপুরুষ স্বামীটি ক্লাব, ঘোড়দৌড়ের মাঠ আর রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে আশ্রয় খুঁজলো! আর অপেরার উচ্চমূল্যের সংরক্ষিত আসন, শীতে দক্ষিণ দেশ এবং গরমে রমণীয় কোন জলকেলির ক্ষেত্র হোল ছলনাময়ী রূপসী স্ত্রীর আনন্দ নিকেতন।

সেবার সে ভ্রমণকেন্দ্র থেকে এক উঁচুদরের পোল যুবককে সঙ্গে নিয়ে ফিরল। বেচারী অন্তরঙ্গ বন্ধুর সব অধিকার পেল, পরিবর্তে শুধু দাসখত লিখে দিতে হল।

এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, মহিলাটি শহরতলীতে একটি ছোট বাড়ি ভাড়া নিল। ঘর-দোর সাজিয়ে গুছিয়ে প্রেমিক-প্রবরকে সেখানে নিয়ে তুললো। ভদ্রমহিলার পোশাক-আশাকে বৈচিত্র্য ছিল। নানা ধরনের বাহারে সাজ সজ্জায় তিনি সদা সর্বদা সেজে-গুজে থকেতেন। কখনও অফেঁবাসের অপেরার 'লা বেল হেলেনে'র মতো কেবল তার ওপর আরও এক পোঁচ প্রাচীন গ্রীসীয় ভঙ্গী, কখনও বা সুলতান হারেমের অদালিস্‌কের মতো, আবার কখনও

তাকে দেখা যেত চটুল স্বভাব সুয়াবিয়া মেয়ের মতো। এমনি ধারা আরও অনেক। শীতকালে এইভাবে অভিসারে তার ক্লান্তি। এ ব্যবস্থা মনঃপূত হল না। ব্যাপারটা আরও স্বচ্ছন্দে হলে ভাল হয়। নিজের বাড়িতেই বাঞ্ছিত মিলনের সাধ জাগলো। কিন্তু উপায় কি ?

মেয়েদের মাথায় যখন কোন সমস্যা ঢোকে, সমাধান না হওয়া পর্যন্ত নিস্তার নেই। এ বিষয়ে সেও ব্যতিক্রম নয়। জোর একদিন কি দু'দিন সে চুপচাপ ভাবলো, তারপর যুদ্ধের একটা পুরোদস্তুর ছক তৈরি করে নিয়ে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হল।

পোল যুবকটির দেহে ছিল দুর্লভ সৌন্দর্য। ক্বচিৎ এ রকম ছেলে চোখে পড়ে। মাঝারি লম্বা, ছিপছিপে, সুগঠিত তনু। সব মিলিয়ে তার দেহে ছিল মেয়েলি লাবণ্য। যেন তরুণ বেকাস্[১]। পরচুলো লাগিয়ে তাকে সহজেই ভেনাস[২] করে দেওয়া যায়। বিশেষ করে ঠোঁটের ওপর গোঁফের সামান্য চিহ্নও যখন নেই।

উপস্থিত বুদ্ধিতে মহিলার জুড়ি নেই। সে প্রেমিককে একটি সুন্দরী পোল রমণীর ছদ্মবেশ ধারণ করতে পরামর্শ দিল। তাহলে অবাধে মিলন হতে পারবে। পুরু ভারী জোব্বা শীতের পোশাক এই রূপান্তরে সহায় হোল।

এই মনের মানুষটির জন্য একগাদা সুন্দর মেয়েলি পোশাক কেনা হোল। দু'চার দিন পর মহিলা স্বামীকে জানালো—গতবার কার্লস্‌বাদে একজন পোল ভদ্র মহিলার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। এবার শীতে তিনি ভিয়েনায় আসছেন আর আগের পরিচয় সুবাদে তিনি মাঝে মাঝে এবাড়ি আসবেন বলে জানিয়েছেন। পতি দেবতাটি নির্বিকার চিত্তে শুনে গেল। বিন্দুমাত্র আগ্রহবোধ করল না। কারণ তার জীবনের মূল আদর্শগুলোর একটি হচ্ছে স্ত্রীর বান্ধবীদের সঙ্গে কখনো প্রেম নয়। রাতে যথারীতি ক্লাবে গমন, আর পরদিন সেই পোলিস্ সুন্দরীর কথা বেমালুম বিস্মরণ।

---

১। সুরার দেবতা।

২। সৌন্দর্যের রাণী।

বাড়ির কর্তা বেরিয়ে যাবার আধঘণ্টার মধ্যেই ছোট্ট একটা ঘোড়ার গাড়ি এই বাড়ির দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াল। আপাদ-মস্তক শীত বস্ত্রে পরিবৃতা দীর্ঘাঙ্গী ছিপছিপে এক যুবতী গাড়ি থেকে নেমে সোজা পুরু কার্পেট মোড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যান। আসলে গৃহকর্ত্রীর খাস কামরায় এই অতিথিই প্রেমিক নাগরে রূপান্তরিত হবেন।

যুবকটি বেশ তাড়াতাড়ি তার ছদ্মবেশ রপ্ত করে নিল। মাঝে মাঝে ওই নারীবেশে প্রকাশ্য লোকালয়ে বেরিয়ে পড়বার দুঃসাহস হোল এবং এই অভিযানে সে উৎরে গেল। এমনকি দু'একজন অভিজাত ভদ্রলোক বা শেয়ার বাজারের নামজাদা দালাল বেশ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে শুরু করল। কেউ কেউ তার আশে পাশে ঘুরঘুর করতে আরম্ভ করল। এই বিশেষ ভূমিকার অভিনয়ে ছেলেটি মজা পেল। পুরুষচিত্ত দলিত মথিত করে রহস্য-ময়ীরা কি সুখ পায় সে প্রাণভরে উপভোগ করতে লাগল। এই তরুণের সাহস দিন দিন বেড়েই চলল। একদিন অপেরার সংরক্ষিত আসনে গিয়ে বসেছে। গায়ে আরমিন্ পশমের নরম ক্লোক। কাঁধ ছাপিয়ে ভেঙে পড়েছে রাশি রাশি কুঞ্চিত নকল অলকগুচ্ছ।

প্রথম থেকেই উল্টোদিকের আসনে উপবিষ্ট এক সুদর্শন যুবক অনবরত তার দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টি ছুঁড়ে দিচ্ছিল। ছদ্মবেশী রূপসীর চোখে সুস্পষ্ট প্রশ্রয়। আর তাই লোকটির উৎসাহে জোয়ার এল। তৃতীয় অঙ্কের শেষে অপেরার চাপরাসী এই অলীক রূপরাণীর কাছে একটি ফুলের তোড়া নিয়ে এল। তার ভেতরে লুকোন ছোট এক চিরকুট। পেনসিলে ক'টি কথা লেখা "এ বিশ্বে তুমি অনন্যা। শুধু বারেকের তরে তোমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছি নতজানু হয়ে।"

চিঠির ওপরের নাম পড়লো—এত সহজেই ঘায়েল। মুখে বিচিত্র হাসি খেলে গেল। ভালেস্কা নাম ছাপানো একটা কার্ড বার করে লিখল : "থিয়েটারের পরে।" সেই মদনদূত জবাব বহন করে নিয়ে গেল।

একগাদা কাপড় আর আরমিনের ক্লোকধারিণী এই ভেনাস যখন থিয়েটার শেষে গাড়িতে উঠতে যাবে, তার রূপমুগ্ধ প্রেমিকটিকে নজরে পড়ল। টুপি হাতে নিয়ে গাড়ির দরজা খুলে নতুন প্রেমিকার জন্য অপেক্ষা করছে। ভালেস্‌কা মধুমাখা কথায় ভদ্রলোককে মাতিয়ে রাখল। কিন্তু বাসায় পোঁছবার আগেই নিতান্ত নিষ্ঠুরের মতো সে প্রেমিকটিকে বিদেয় করে দিল। এরপর ভালেসকার এক রাতও থিয়েটার বাদ গেল না। আর প্রেমিকের আকুল প্রার্থনাও প্রতিদিনই তার কাছে পোঁছল। প্রতিদিনের প্রার্থনাই মঞ্জুর হোল। সে রোজই ফেরার পথে বাড়ি অবধি যুবকটিকে সঙ্গে নিত। ভদ্রলোকের এই দুর্জয় সাফল্যে অনেক লোকই তাকে ঈর্ষার চোখে দেখতে শুরু করল। একদিন ঘটল সেই অঘটন। পরিচিত মহল বিস্মিত হতচকিত।

মহিলার স্বামী তার স্ত্রীর বান্ধবী সেই পোল রমণীকে সাদর অভিনন্দন জানিয়েছিল। তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু একদিন অসময়ে স্ত্রী ঘরে ঢুকে তার চক্ষুস্থির। যুগল মূর্তি এমন সোহাগে মগ্ন, যাতে সব যুক্তিই অচল। ঈর্ষায় ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে সে দেওয়ালে ঝোলান সারকাসিয়ান ছোরাটা খাপ থেকে খুলে আনতে দৌড়ে গেল। তাই দেখে স্ত্রী বেচারি অর্ধচেতন অবস্থায় খাটের ওপর নেতিয়ে পড়ল। এই অবসরে পোল যুবক ক্ষিপ্র হাতে পরচুলো পরল, সিল্কের মেয়েলি গাউনটার মধ্যে সুড়ুৎ করে মাথা গলিয়ে দিল, তার ওপর চাপালো সেই বিখ্যাত ক্লোক,—যেটি তার নারীর অন্দরমহলে প্রবেশের ছাড়পত্র।

এবার স্বামীটির অবাক হবার পালা। তার তোতলামো শুরু হল: "এসবের অর্থ কি? ভালেস্‌কা?"

ভালেস্‌কার জবাব: "হ্যাঁ মশায়, আপনার স্ত্রীকে একগুচ্ছ প্রেমপত্র দেখাবার জন্যেই ভালেস্‌কার এখানে আগমন। যেগুলো—"

"না না," নিরপরাধ অথচ প্রতারিত স্বামী বেচারা তার কথায়

বাধা দিল। মিনতির স্বরে বলল: "থাক, তার আর দরকার নেই।" ছোরাটা আবার খাপে আশ্রয় পেল।

নিরুত্তেজ গলায় পোল যুবকটি বলল: "ঠিক আছে, আমাদের মধ্যে সাময়িক সন্ধি হোল। কিন্তু ভুলবেন না আমার হেপাজতে কি বিষম অস্ত্র রইল। সম্ভাব্য সব ঘটনার জন্য সেগুলো সর্বদাই তৈরী থাকবে।

ভদ্রলোক দু'জন দু'জনকে অভিবাদন জানাল—তাদের অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকারের ওখানেই ইতি।

তখন থেকে এই তরুণ দম্পতির জীবন এমন এক চিরন্তন সুখের খাতে বয়ে চলল, যা প্রেসিডেন্ট গ্রাঁত একসময়ে জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছিলেন।

এরপর অভিজাত স্ত্রীটি তার প্রেমাস্পদকে আর স্কার্ট-গাউনে সাজাবার প্রয়োজন বোধ করল না। সুদর্শন স্বামীটিও সেই স্মরণীয় দিনগুলোয় নকল ভালেস্কাকে যতটুকু সঙ্গ দিয়েছিল, এখন আসলটিকে তার চেয়েও বেশি চোখে চোখে রাখল।

জাহাজে লোক ধরে না। পথটি উপভোগ্য ; তাই দলে দলে লোক বেড়াতে যাচ্ছে আঁভর থেকে ব্রূভাইল। নোঙর তুলে ফেলা হোল ; শেষ বারের মতো বাঁশী বেজে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের সারা দেহ থর থর কেঁপে উঠল, চারধার থেকে জলের তোলপাড় শব্দ ভেসে এল। কয়েক মুহূর্ত চাকাগুলো ঘুরল, তারপর আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল। উঁচু মঞ্চের ওপর থেকে চোঙায় মুখ রেখে ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে বলল : "সামনে চল।" চোঙাটা নেমে এসেছে একেবারে ইঞ্জিন ঘর অবধি। চাকাগুলো এবার আরও দ্রুতগতিতে ঢেউ কেটে এগিয়ে চলল। জনারণ্যে ভরা জেটির ধার ঘেঁষে আমরা এগিয়ে চলেছি। জাহাজের ওপর থেকে যাত্রীরা এমন ভাবে রুমাল নাড়ছে, —যেন সুদূর আমেরিকায় পাড়ি দিচ্ছে। তাদের বন্ধুবান্ধবেরাও ডাঙা থেকে ঠিক তেমনি ঢঙে তাদের বিদায় জানাচ্ছে।

জুলাই মাসের প্রখর সূর্য ছড়িয়ে পড়েছে লাল ছাতাগুলোর ওপর, ঠিকরে পড়েছে ঝকমকে পোশাকে, খুশী-ভরা মুখগুলোয় আর সমুদ্রে—কোন তরঙ্গই যাকে পুরোপুরি দোলা দিতে পারে না। বন্দর ছেড়ে বেরিয়ে আসা মাত্র জাহাজটা আচমকা ঘুরে গিয়ে ফেনার সঙ্গে লড়তে লড়তে দূরের উপকূলের দিকে নাক বরাবর চলতে লাগল।

আমাদের বাঁ দিকে বারো মাইলেরও বেশি চওড়া স্কেন নদীর মোহনা। এখানে সেখানে ছড়ানো বড় বড় বয়াগুলো বালুর চড়ার নির্দেশ দিচ্ছে। দূরে দেখা যাচ্ছে বিশুদ্ধ কর্দমাক্ত নদীর জল—মোটা হলদে রঙের সীমারেখায় ঘেরা বিশাল খাঁটি অবাধ সমুদ্রের লোনা জলের সঙ্গে তা এখনও মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়নি।

জাহাজে পা দিতেই আমার ইচ্ছে হোল পাহারারত নাবিকের

মতো ওপর নীচ করে বেড়াই। কেন? বলতে পারব না। কিন্তু যাত্রীদের ভিড় ঠেলে ডেকের ওপর আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

হঠাৎ কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি আঁরি সিদ্যো, যার সঙ্গে গত দশ বছর আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।

করমর্দনের পালা শেষ হলে খাঁচায় আবদ্ধ ভালুকের মতো আমরা আবার পায়চারি শুরু করলাম। এতক্ষণ আমি একা হাঁটাছিলাম, এবার দুজনে মিলে হাঁটতে হাঁটতে লোকজন, এটা সেটা নিয়ে কথা বলতে লাগলাম। আমরা তাকিয়ে দেখলাম জাহাজের দুধারে সার বেঁধে বসা যাত্রীরা সারাক্ষণ বক্ বক্ করে চলেছে।

হুম্ করে সিন্দ্যো বলে বসল: "এখানে দেখছি ইংরেজদের ভিড়! জঘন্য জীব।" সত্যিকারের রাগের চিহ্ন তার মুখে।

সত্যিই জাহাজে ইংরেজদের ভিড় ছিল। পুরুষেরা দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দিগন্ত দেখছে, তাদের হাবভাবে এমন একটা দেমাক ফুটে উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন বলছে: "ইংরেজরাই হোল সমুদ্রের প্রভু! বুম্! বুম্! এই যে আমরা এখানে।"

তাদের সাদা টুপির ওপর সাদা আবরণ নিশানের মতো তাদের আত্মনির্ভরতা জাহির করছে।

রোগা ছিপছিপে গড়নের অল্পবয়সী মেয়েরা নানারঙের রঙীন শালে তাদের ঢ্যাঙা চেহারা আর রোগা বাহুগুলো জড়িয়ে নিয়েছে, তারা যে জলের দেশের লোক, তাদের পায়ের জুতো দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রকৃতির দিকে তারা আনমনে তাকিয়ে দেখছে। লম্বা শরীরের শেষ প্রান্তে উঁচু আসনে বসানো তাদের ছোট ছোট মাথায় অদ্ভুত ধরনের ইংরেজী টুপি ঘাড়ে এসে ঠেকেছে, টুপির তলা দিয়ে পাতলা চুল এমন ভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে, মনে হয় যেন ঘুমন্ত সাপ।

বুড়ী চিরকুমারীরা—মাথায় যারা আরও ঢ্যাঙা, বাতাসের সঙ্গে তাদের জাতিগত বকবকানি জুড়ে দিয়েছে; মনে হচ্ছে যেন তাদের

মস্ত মস্ত হলদে দাঁতের পাটি দিয়ে হেঁটে গেলে রবারের গন্ধ বা এক ধরনের দাঁতের মাজনের গন্ধ পাওয়া যায়।

সিছোঁ আরও রেগে গিয়ে বলল: "নোংরা জাত! এদের ফ্রান্সে আসা বন্ধ করে না কেন?"

আমি হেসে জানতে চাইলাম: "কেন, তোমার তাতে কি? আমার কথা ধর, ওদের নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাই না।"

যে জবাব দিল: "হ্যাঁ, তুমি তা পারো। কিন্তু আমি—আমি একটি ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করেছি। এবারে বুঝেছ?"

আমি থেমে গেলাম। তারপর তার কথা উড়িয়ে দেবার জন্য বললাম: "যত্ত সব! খুলে বলত দেখি। সে কি তোমায় খুবই দুঃখ দিয়েছে?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে জবাবে জানাল: "না, ঠিক তা নয়!"

"তাহলে সে—সে কি তোমায় ঠকিয়েছে?"

"আমার দুর্ভাগ্য যে, তাও নয়। সে রকম হলে বিবাহ বিচ্ছেদের একটা ছুতো পাওয়া যেত, আর আমিও মুক্তি পেতাম।"

"কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"তুমি বুঝতে পারছ না? এতে অবাক হবার কিছু নেই। বেশ, সে শুধুমাত্র ফরাসী ভাষা শিখেছে, আর কিছুই নয়! শোনো:

"দুবছর আগে যখন এত্রেতাতে গরম কাটাতে গিয়েছিলাম, বিয়ে করার তিলমাত্র ইচ্ছা আমার মনে ছিল না। কিন্তু জলবিহারের জায়গাগুলোর মতো মারাত্মক আর কিছুই নেই। কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে অল্পবয়সী ছুকরিগুলো সেখানে কি রকম সুবিধা পায়। প্যারিস হতে পারে যুবতী রমণীর, কিন্তু শহরতলীতে ছুকরিদের দাপট।

"বোকার মতো এখানে সেখানে বেড়িয়ে বেড়ানো, প্রাতঃস্নান, ঘাসের ওপর বসে লাঞ্চ খাওয়া, এ সবই হচ্ছে বিয়ের এক একটি ফাঁদ। এবং সত্যি বলতে কি, কোন অষ্টাদশী মাঠের মাঝে ছুটোছুটি

করছে বা পথের ধার থেকে ফুল তুলছে—এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর কিছু নেই।

আমি যে হোটেলে ছিলাম, সেখানে এক ইংরেজ পরিবারও উঠেছিল। ওদের সঙ্গে পরিচয় হোল। এই লোকগুলোকে যেমন দেখছো, বাবাটি হুবহু তাদের মতো, আর মা আর দশটা ইংরেজ মহিলার মতো। তাদের দুটি ছেলে ছিল—হাড্ডিসার দুটো বালক; বল, লাঠিসোঁটা, র‍্যাকেট ইত্যাদি নিয়ে তারা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খেলার হুল্লোড়ে মেতে থাকত। এছাড়া ছিল দুটি মেয়ে; বড়টি রোগা, সুসংযত পূর্ণবয়স্ক একটি ইংরেজ যুবতী; ছোটটি একটি বিস্ময়। সোনার মতো গায়ের রং, বরং বলা ভাল সোনালী চুলের মেয়ে, মাথাখানি যেন আকাশ থেকে নেমে এসেছে। এই সব মেয়েরা সুন্দর হলে একেবারে স্বর্গীয় হয়। ওর চোখদুটো নীল—সেই নীল, যাতে রয়েছে পৃথিবীর সকল কবিতা, স্বপ্ন, আশা এবং সুখ!

"এমন ললনার ঐ দুটি আঁখির দিকে চেয়ে কী অসীম চিন্তার দিগন্তই না উন্মোচিত হয়! হৃদয়ের শাশ্বত, অস্পষ্ট প্রত্যাশায় সে কত সুন্দর করেই না সাড়া দেয়!

"কেবল এটুকু মনে রাখলেই চলবে যে ফরাসীরা বিদেশীদের ভালবাসে। যেই আমরা কোন রুশ বা ইতালীয় অথবা সুদানীয় কিংবা স্প্যানীশ বা ইংরেজ রূপসীর দেখা পাই, তৎক্ষণাৎ তার প্রেমে পড়ে যাই। বিদেশ থেকে যা কিছু আসুক, আমাদের তাতেই আগ্রহ, সে ট্রাউজারের কাপড় থেকে শুরু করে টুপি দস্তানা বন্দুক অথবা—মেয়ে, যাই হোক না কেন। তবু বলব, আমরা ভুল করি।

"কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমাদের ভাষা ভুল উচ্চারণ করেই এইসব বিদেশীরা আমাদের সবচেয়ে বেশি সম্মোহিত করে। বিকৃত করে ফরাসী বললেই একটি মেয়েকে ভাল লাগে। সে যখন কোন শব্দ ভুল বলে, চমৎকার লাগে, এবং যখন দুর্বোধ্য ভাষায় বিড় বিড় করে যায়—তার আকর্ষণ দুর্বার হয়ে ওঠে।

"কল্পনাও করতে পারবে না, কী দারুণ মিষ্টিই না শোনায়, যখন কোন রাঙা মুখ বলে Jaine beaucoup la gigotte' [ আমি মাংস এত ভালবাসি ! ]।

"আমার আদুরে ইংরেজ বেটি একেবারে অসাধারণ ভাষায় কথা বলত। এমন সব আজগুবি শব্দ সে আবিষ্কার করত যে প্রথমদিকে আমি তার এক বর্ণও বুঝতাম না। তখনই আমি সেই মজার ছোট্ট বাঁদরের প্রেমে একেবারে মজে গেলাম। নানা ধরনের ভাঙা ভাঙা, কৌতুককর, অদ্ভুত শব্দগুলো তার ঠোঁটে অতি উপাদেয় হয়ে উঠত ; এবং সাধারণ নৃত্যশালার খোলা ছাদে সন্ধ্যেবেলা আমাদের দুজনের মধ্যে এমন সুদীর্ঘ আলাপন চলত, যা দুর্বোধ্য হেঁয়ালির নামান্তর মাত্র।

"তাকে বিয়ে করলাম। লোকে যেমন স্বপ্নকে ভালবাসে, আমি তেমনি নির্বোধের মতো তাকে ভালবাসলাম। খাঁটি প্রেমিকেরা শূন্যের স্বপ্নকেই ভালবাসে, সেই স্বপ্নই নারীর রূপ নেয়। লুই ব্যুলেতের সেই সুন্দর কবিতাটা মনে করে দেখো :

'সেইসব দুর্লভ দিনে, আমার শিল্পীসত্তায়,
তুমি ছিলে সাধারণ এক যন্ত্রবিশেষ,
উদ্দাম প্রেমের বুকে যা খেলে বেড়াত
বেহালার ছড়ের মতো, আর
তোমার শূন্য হৃদয়ে আমি রচেছিলাম
স্বপ্নের অমরাবতী।'

"বেশ, এবার শোনো ; প্রিয় বন্ধু, আমার স্ত্রীর জন্য একজন ফরাসী শিক্ষার মাষ্টার রেখে দিয়ে আমি সবচেয়ে ভুল করেছিলাম। যতদিন অবধি সে অভিধানকে শহীদ বানিয়ে আর ব্যাকরণকে চরম শাস্তি দিয়ে যাচ্ছিল, আমার তাকে ভাল লাগত। আমাদের কথাবার্তা খুব সহজ সরল ছিল। তখন ওর হাবভাবে মনের আশ্চর্য মহানুভবতা, অনুপম সৌন্দর্য প্রকাশ পেত। তখন ওকে একটা

বিস্ময়কর সবাক রত্ন বলে মনে হোত, যেন একটা জীবন্ত পুতুল—চুমু খাবার জন্য তৈরি হয়েছে। কেমন করে নিজেকে জানাতে হয়, ও জানত; অন্ততঃ ওর কি চাই, সে তা বোঝাতে পারত। মোহিনীর মতো ভঙ্গী করে সে থেকে থেকে এমন জোর দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করত এবং জটিল ইন্দ্রিয়ানুভূতি আর আবেগ প্রকাশ করত—যার একটি শব্দও বোঝা যেত না, আর এমন ভঙ্গী কেউ কখনও দেখেনি। যে সব সুন্দর খেলনা পুতুল 'বাবা' আর 'মা' বলতে গিয়ে 'বাম্বা' আর 'মাম্মা' বলে—তাকে সেই পুতুলের মতো দেখাত।

"আমিও তাই বিশ্বাস করেছিলাম—

"সে এখন কথা বলে—কত কথা—বিশ্রী করে বলে—খুবই বিশ্রী—আগের মতোই গাদা গাদা ভুল করে—কিন্তু আমি এখন তার সব কথা বুঝতে পারি—হ্যাঁ, বুঝতে পারি—ওকে জেনে গেছি—হ্যাঁ, এখন ওকে জেনেছি—

"ভেতরে কি আছে দেখব বলে আমার পুতুলটাকে ভেঙে ফেলেছি। আমি দেখেছি। এবং বন্ধু, সে কথা কবুল না করে উপায় নেই।

"হায়! একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ তরুণীর ধ্যান ধারণা, চিন্তা ভাবনা, মতামত তুমি জান না, কখন কল্পনাও করতে পারবে না। ওর মধ্যে নিন্দনীয় কিছুই নেই, ছোটদের স্কুলে শেখাবার জন্য যে কথোপকথনের অভিধান আছে, তার সবগুলো বাগ্‌ধারা আমায় সকাল সন্ধ্যা শুনতে হয়।

"লোকনৃত্যের বাহারে সাজ কিংবা জঘন্য বনবনের* ওপরের গিলটি-করা সুন্দর কাগজের মোড়ক দেখেছো তো? ঐ রকম একটা আমার ছিল। আমি সেটা ছিঁড়ে ফেলেছি। ভেতরে কি আছে, চোখে দেখতে চেয়েছিলাম, দেখে এত বিরক্ত হয়েছি যে, আমি না হয়ে ওর কোন স্বদেশবাসী হলে এমন অবস্থায় নির্ঘাত বিদ্রোহ করত।

---

* এক ধরণের মিষ্টি

"আমি একটি চন্দনা টিয়াকে বিয়ে করেছিলাম, যাকে এক সেকেলে শিক্ষিকা ফরাসী শিখিয়েছে। এবারে বুঝেছো?"

ক্রভাইল বন্দরের কাঠের পাটাতন এখন দেখা যাচ্ছে, লোকে লোকারণ্য। আমি বললাম: "তোমার স্ত্রী কোথায়?" সে জবাব দিল: "এই সবে তাকে এত্রেতাতে রেখে এলাম।"

"তুমি এখন যাচ্ছ কোথায়?"

"আমি? একটু ভুলে থাকবো বলে ক্রভাইলে যাচ্ছি।" তারপর একটু থেমে যে যোগ করল: "তুমি ভাবতে পারবে না, কখনও কখনও সহধর্মিণী কত বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।"

## বসন্তে

নয়ন জুড়োনো বসন্তের প্রথম আবির্ভাবে আনন্দ মুখর প্রকৃতি সবুজ সাজে সজ্জিত হয়। মৃদুমন্দ সুগন্ধ পবন মুখে চোখে পরশ বুলিয়ে দেয়। বুক ভরে ওঠে আর হৃদয় জুড়িয়ে যায়। অবর্ণনীয় সুখের স্বপ্নাচ্ছন্ন আবেশে সবাই পাগল হয়ে যত্র তত্র ছুটে বেড়ায়, আকণ্ঠ পান করে নিতে চায় বসন্ত-নির্যাস। গত বছর বেজায় শীত পড়ায় এবার মে মাস পড়তেই লোক মাতাল হয়ে উঠল। যেন অপর্যাপ্ত বৃক্ষরস পানের উত্তেজনায় সবাই বেসামাল।

এক সকালে ঘুম থেকে উঠে জানালার বাইরে দৃষ্টি মেলে দিলাম। আশপাশের বাড়িগুলোর মাথার ওপর দিয়ে সূর্যস্নানতৃপ্ত নীলকান্ত আকাশ। বাতায়নে ভাসমান ক্যানারি পাখীর উচ্চকণ্ঠ কাকলী আর তার সঙ্গে তাল রেখে ঘরে ঘরে ভৃত্যদের খুশীর গুঞ্জন। পথে পথে পথে আনন্দের মাতামাতি। ঘরে থাকা গেল না। উজ্জ্বল এই দিনটির মতোই অকারণ আনন্দে পথে বেরিয়ে পড়লাম। কোথাও যেতে হবে—কিন্তু কোথায়, জানি না। যার দিকে চোখ পড়ে, দেখি সেই হাসছে। সমাগত বসন্তের মনোরম আলোয় সব কিছু উদ্ভাসিত। এক কথায় বলতে গেলে নগর জুড়ে যেন ভালবাসার হাওয়া বইছে। তরুণীরা প্রভাতী প্রসাধনে বেড়াতে বেরিয়েছে। তাদের চোখের গভীরে সুপ্ত প্রেমের ছায়া, চলনে মদির মন্থর ছন্দ। এক মধুর অস্বস্তিতে মন আমার নেচে উঠল।

কেন, কি ভাবে জানিনা স্প্রেন নদীর ধারে এসে পড়লাম। মোটর বোটগুলোকে সুরেঁসের দিকে রওনা হতে দেখে বনের মধ্য দিয়ে বেড়ানোর বাসনা কিছুতেই দমন করতে পারলাম না। মাউসের* ডেকে যাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড়। আপনহারা মানুষ নব বসন্তের অরুণ

* স্প্রেন নদীর ওপরে ভাসমান ছোট ছোট মোটর বোটের নাম।

আলোয় ভ্রমণে বেরিয়েছে। সকলেই চঞ্চল—ঘুরছে, ফিরছে, দেখছে, আর পরিচিত কাউকে পেলেই গল্পে মশগুল হয়ে যাচ্ছে। দলের মধ্যে আমার সেই মহিলা পড়শীটিও রয়েছে। সেই ছোটখাটো চাকুরে মেয়েটি। সত্যিকারের প্যারিসিয়ান লাবণ্য তার আছে, তাতে সন্দেহ নেই। ছোট মাথাটি ছাপিয়ে একরাশ কোঁকড়া চুল কর্ণমূল ছেয়ে নেমে এসে গ্রীবাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। মনে হয় যেন একরাশ আলো জমাট বেঁধে গেছে। চুলে এমন উজ্জ্বল সোনালী রংয়ের বাহার খুব কমই দেখা যায়। বাতাসে তুলছে, যেন এক হালকা রংয়ের ঢেউ। শুধু দেখে আশ মেটে না, চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতে সাধ যায়।

আমার চুম্বক দৃষ্টির আকর্ষণে তার চোখ আমার দিকে ফিরল। কিন্তু একবার তাকিয়েই সে চোখ নামিয়ে নিল। তার গালে একটি ছোট্ট টোল, যেন এক্ষুণি হাসির বাঁধ ভেঙে পড়বে। সেই নরম রোদে তার বিব্রত ভাবটুকু মসৃণ রেশমের মতো মোলায়েম হয়ে তাকে আরও সুন্দর করে তুলল।

শান্ত নদী প্রশস্ত হয়ে এল। প্রশান্ত আরামদায়ক পরিবেশ। কিন্তু জীবনের কূজনগুঞ্জনে বিশ্বচরাচর কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

প্রতিবেশিনী আবার চোখ তুলল। আমার অপলক দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হতেই দেখি মুখে সুস্পষ্ট হাসির ঝিলিক। অপরূপা নারীর চকিত চাহনিতে সহসা আমার চোখের সামনে যেন অজানা লোকের হাজার দুয়ার খুলে গেল। দেখলাম, রহস্যময় গভীরতা, মনোহর লাবণ্যপুঞ্জ, কাব্যের কল্পলোক, মানবজীবনের পরম কাম্য সুখ। উত্তাল বাসনায় তখন আমি উন্মাদ। মনে হোল দুটি বাহুতে তুলে ওকে নিয়ে অন্য কোথাও উধাও হই, যেখানে ওর কানে ভালবাসার কথা মধুর সংগীতের মতো ঢেলে দিতে পারবো।

কথা বলতে যাব, কে যেন কাঁধ চেপে ধরলো। বিস্ময়ে ঘুরে দেখি একজন গোবেচারা গোছের লোক। যৌবন পেরিয়ে এসেছে, তবে বুড়ো হতে এখনও অনেক বাকী। বিষণ্ণ বদনে তাকিয়ে বললো: "আপনাকে গোটা কয়েক কথা বলতে চাই।"

আমার বিরক্তি তার নজরে পড়ে থাকবে, তাই আবার বললো: "ব্যাপারটা খুবই জরুরী।"

সুতরাং উঠতে হোল। তার পেছু পেছু বোটের অপর প্রান্তে এলে পর সে বললো: "যখন ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে বরফ-জমা শীত আসে, ডাক্তার সতর্ক করে বলেন—পা গরম রাখবেন, সর্দি, ব্রঙ্কাইটিস্, রিউমেটিজম এবং প্লুরিসি থেকে সাবধান থাকবেন; আর আপনারা সাবধান হয়ে যান। গরম জামা পরেন, ভারী ওভারকোট গায়ে চাপান, পায়ে দেন মোটা পুরু চামড়ার জুতো। কিন্তু এত করেও অন্তত দু'টি মাস কি বিছানায় পড়ে থাকতে হয় না? কিন্তু পত্র পল্লবের প্রাচুর্য, ফুলের সমারোহ নিয়ে যখন ঋতুরাজের আগমন হয়, উষ্ণ স্নিগ্ধ বায়ু বয়, মাঠে প্রান্তরে সুগন্ধ ছড়িয়ে থাকে; অবুঝ চাঞ্চল্য আর অকারণ পুলকে মন মেতে ওঠে, তখন কেউ আপনাকে বলবে না, 'মসিয়ো, ভালবাসা থেকে সাবধান! ভালবাসা এখানে ওখানে নিঃশব্দে ওৎ পেতে আছে, প্রতিটি কোণ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে, সর্বত্র এর জাল পাতা, প্রত্যেকটি অস্ত্র শান দেওয়া, সব রকম ছল চাতুরী প্রস্তুত। ভালবাসা থেকে সাবধান,···সাবধান!' সর্দি ব্রঙ্কাইটিস বা প্লুরিসি থেকেও এ সাংঘাতিক! এর হাত থেকে কারও নিস্তার নেই, আর এ ভুল একবার করলে সারা জীবনে শোধরানো যায় না। সত্যি মসিয়ো, যেমন রাস্তায় সাইনবোর্ড ঝোলানো হয়, 'সদ্য লাগানো রং থেকে সাবধান।'—তেমনি ফরাসী সরকারের উচিত পথে পথে বিজ্ঞাপন দেওয়া: "বসন্ত আসছে! নাগরিকবৃন্দ, ভালবাসার হাত থেকে সাবধান!'

"কিন্তু সরকার যখন করছেনা, আমাকেই সে কাজ করতে হচ্ছে। তাই আপনাকে বলছি—'ভালবাসা থেকে সাবধান!' কেন না এই মোহিনী শক্তি আপনাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। রাশিয়াতে যেমন প্রত্যেকে অপরকে তার নিঃশ্বাস জমে যাবার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, আমারও তেমনি অপরকে সচেতন করে দেওয়া কর্তব্য।"

ভদ্রলোকের আচরণে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে যথেষ্ট গাম্ভীর্য সহকারে বললাম: "সত্যি মসিয়ো, আপনার অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।"

ছট্‌ফট্ করে উঠে সে বললো: "আঃ মসিয়ো! মসিয়ো। কোন বিপদজনক স্থানে কাউকে ডুবে যেতে দেখলে আমার কি নিষ্ক্রিয় থাকা উচিত? আমার গল্পটা আগে শুনুন, তবে বুঝবেন কেন এভাবে আপনাকে নিরস্ত করতে সাহস করছি।

"গত বছর প্রায় এমনি সময়েই ঘটনাটা ঘটে। গোড়াতেই বলে রাখি আমি নৌবিভাগের একজন কেরাণী। আমাদের কর্তারা অর্থাৎ কমিশনাররা সব অধস্তন অফিসারদের মতো সমান আগ্রহ নিয়েই সোনালী ফিতে বাঁধে। আর জাহাজের খালাসীদের মত আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করে। সে যাক্‌গে। আমার অফিস ঘর থেকে এক টুকরো নীল আকাশ আর সোয়ালো পাখীর ঝাঁক দেখা যেত। আনন্দে ওই ঘরের মধ্যে আমার নাচতে ইচ্ছে করত।

"আমার বড়বাবু ছিল বেঁটেখাটো খিট্‌খিটে লোক। মেজাজ সব সময় তিরিক্ষি। তবু মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার কাছে গেলাম। বললাম—শরীরটা ভাল নেই। শুনে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জবাব দিল: 'তোমার কথা একবর্ণ বিশ্বাস করি না। তবু চলে যাও। তুমি কি মনে কর তোমার মতো কেরাণী দিয়ে কোন অফিস চলে?' তক্ষুণি বেরিয়ে এলাম একেবারে স্যেন নদীর ধারে। ঠিক আজকের মত দিনটি। সাঁ ক্লদ অবধি যাব বলে একটা মাউস ভাড়া নিলাম। কিন্তু আমার মনিব সেদিন আমায় ছুটি না দিলে কি উপকারটাই না হত!

"উজ্জ্বল আলোয় ষ্টীমার, নদী, গাছপালা, ঘরবাড়ি, আমার সহযাত্রী সবাইকে ভাল লাগলো। আমার বুকে তখন আনন্দের জোয়ার, হৃদয়ে চুম্বনের তৃষ্ণা। জানিনা কি চাই, কাকে চাই। এ আর কিছু নয়, ভালবাসা তার জাল বিছিয়েছিল। এমন সময় ত্রোকাদেরোতে একটি মেয়ে উঠে ঠিক আমার সামনে বসলো। হাতে

তার ছোট একটা পুঁটলি। সে নিঃসন্দেহে সুন্দরী। কিন্তু অবাক কাণ্ড মসিয়ো, বসন্তের আবির্ভাবে মন মাতানো আবহাওয়ায় মেয়েরা আমাদের চোখে কি আশ্চর্য সুন্দরই না ঠেকে! তখন তাদের এই নেশা-ধরানো আকর্ষণ বড় অদ্ভুত সুখদায়ক। পনিরের পর মদের মতোই তৃপ্তিকর। একটু আগে ওই মেয়েটি যেমন আপনার দিকে চাইছিল, ঠিক তেমনি আমাদেরও মাঝে মাঝে চোখাচোখি হচ্ছিল। তারপর ঘন ঘন দৃষ্টি বিনিময় হতে হতে মনে হোল আমাদের বেশ চেনাজানা হয়েছে। এবার কথা শুরু করা যায়। কথা বললাম, শুনলামও। সত্যি বলছি মসিয়ো, তার ওই সুমিষ্ট সৌন্দর্য আমায় মাতাল করে দিয়েছিল।

"সাঁ ক্লুদে ও নেমে পড়তে আমিও নামলাম। পৌঁটলাটা যথা-স্থানে পৌঁছে দিয়ে ও যখন ফিরে এল, তখন নৌকো ছেড়ে দিয়েছে। দু'জনে পাশাপাশি হাঁটছিলাম। উষ্ণ বাতাসে আমাদের তপ্ত নিঃশ্বাস মিলিয়ে যাচ্ছিল। বললাম:

" 'এখন বনের ভেতরটা বেশ।' সে জবাব দিল: 'সত্যিই তাই।'

" 'মাদমোয়াজেল, যাবেন সেখানে বেড়াতে?'

"এক নজরে আমার মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে যেন আমার মনের ভাব আন্দাজ করে নিল, তারপর কিছুটা দ্বিধা সংকোচে আমার প্রস্তাবে সায় দিল। স্বল্প পত্রগুচ্ছের নিচে অকৃপণ আলোর প্রসাদে দীর্ঘ, ঘন, সতেজ সবুজ ঘাসের প্রাচুর্য। ছোট ছোট কীট পতঙ্গ প্রেম-ক্রীড়ায় মত্ত, উৎফুল্ল পাখীর গানে চারদিক মুখরিত। এই অরণ্যের বাতাসে ও ঘ্রাণে উন্মাদ আমার বান্ধবী ছুটোছুটি লুটোপুটি করে বেড়াতে লাগলো। আমারও সেই অবস্থা। মসিয়ো, মাঝে মাঝে আমরা কেমন বোকা হয়ে যাই!

"গলা ছেড়ে দিয়ে ও হাজারো রকমের গান গাইলো, অপেরার গান, মুশেতের গান। মুশেত সংগীত। এই সংগীত তখন আমার কানে কি কাব্যময়ই না মনে হয়েছিল! আমার চোখে জল আসে

আর কি। ওই অশ্লীল গানগুলো আমাদের মাথা খারাপ করে দেয়। আমার পরামর্শ শুনুন, যে মেয়ে বনে গান গায়—বিশেষ করে মুশেতের গান—তাকে কদাচ বিয়ে করবেন না।

"কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পরিশ্রান্ত হয়ে একটা ঢালু জমিতে ঘাসের ওপর বসে পড়লো। পায়ের কাছে বসে তার হাত দু'খানি আমার মুঠোর মধ্যে তুলে নিলাম। ছোট দু'খানি হাত। তাতে অসংখ্য ছুঁচের ফোঁড়ের দাগ। আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। মনে মনে বললাম 'এগুলো পরিশ্রমের পবিত্র চিহ্ন।' হায়, মসিয়ো! শ্রমের ওই পবিত্র চিহ্নের মানে কি জানেন? এর অর্থ কাজের সময়ে খোশ-গল্প, ফিসফিস্ করে বলা যত সব অকথ্য গালাগাল, যত রাজ্যের অশ্লীল বিষয়ে মন কলুষিত করা; এর অর্থ হোল নষ্ট চরিত্র, নির্বোধ প্রলাপ, দৈনন্দিন বদভ্যাসের গ্লানি। ইতর মেয়েদের মনের যত সব নীচতা সব এসে জড়ো হয়েছিল কর্মের পূত চিহ্ন ধারিণী ওই মেয়েটির পবিত্র অঙ্গুলিতে।

"তারপর আমরা দু'জনে পলকহীন চোখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওঃ! নারীর দৃষ্টিতে কি অদ্ভুত শক্তি! কী করেই আমাদের উত্তেজিত করে, সত্তাকে পরাভূত করে তারপর আমাদের ওপর অধিকার বিস্তার করে আমাদের পুরোপুরি জয় করে নেয়। কী গভীর সে চাহনি, মনে হয় অসীম সম্ভাবনাময়! একেই আবার লোকে পরস্পরের হৃদয় জানাজানি বলে। হায়, মসিয়ো, কি আত্মম্ভরিতা! যদি পরস্পরের হৃদয়ই দেখতে পেতাম, তবে কিছু করে ফেলার আগে অন্তত আর একটু সাবধান হতে পারতাম। যাহোক আমি তখন উন্মত্ত, একেবারে তলিয়ে গেলাম। হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে চাইলে সে বলে উঠলো: 'হাত সরিয়ে নাও।' আমি সরে বসে তার কাছে মনের কথা বললাম। আমার হৃদয়ের রুদ্ধ ভালবাসা উজাড় করে তার পায়ে ঢেলে দিলাম। আমার আচরণে বিস্মিত হয়ে আমার দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে যেন এ কথাই বলতে চাইল: 'আ! বুড়ো খোকা! এ ভাবেই মেয়েরা তোমাদের বোকা

বানায়। ঠিক আছে, দেখা যাবে।' প্রেমের হাটে মসিয়ো, পুরুষ শিল্পী, আর মেয়েরা ব্যবসায়ী।

"পরে আমার বোকামি বুঝতে পেরেছি। ওকে জয় করা তখন অসম্ভব ছিল না। কিন্তু নারীদেহ সম্ভোগের বাসনা আমার ছিল না। আমি চেয়েছিলাম ভালবাসা, সেই আদর্শ প্রেম। অন্য কোন মহান আদর্শের জন্য সময় ব্যয় করতে পারতাম, কিন্তু আমি ছিলাম স্পর্শকাতর।

"অনেকক্ষণ ধরে আমার ভালবাসার প্রলাপোক্তি শুনবার পর সে উঠে পড়লো। আমরা আবার সাঁ ক্লদে ফিরে এলাম। কিন্তু প্যারিসে না পৌঁছনো অবধি আমি ওর সঙ্গে থাকলাম। কিন্তু ফিরবার পথে ওকে খুব বিষণ্ণ দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললো :

'এমন একটা দিন জীবনে খুব কমই আসে,—তাই ভাবছি।'

"হৃদয়ের প্রলয় নাচনে আমার বুকের পাঁজর ভেঙে খান খান হবার যোগাড়।

"আগামী রবিবার, তার পরের রবিবার, তারপর প্রতি রবিবারে তার সঙ্গে দেখা হোল। তাকে নিয়ে বেড়ালাম বোগিভাঁ, সাঁ জারমাঁ, মায়জোঁ-লাফিত, পাসি,—মফঃস্বলে প্রেমিকদের সমস্ত মহাতীর্থে। বিনিময়ে সেই ক্ষুদে শয়তানী প্রেমের ভান করলো। শেষ পর্যন্ত আমার মাথা বেঠিক হয়ে গেল, তাই তিন মাসের মাথায় তাকে বিয়ে করে বসলাম।

"মসিয়ো, আত্মীয় বান্ধব নেই, উপদেশ দেবার কেউ নেই, এমন এক নিঃসঙ্গ কেরাণীর কাছ থেকে এর বেশি আর কি আশা করা যায়? অবিবাহিতরা ভাবে ঘরে একটি ঘরণী থাকলে জীবন কি সুখেরই না হোত!

"বিয়েটি যেই হোল, সকাল থেকে সন্ধ্যা স্বামীর নাম ধরে ডাকা আর ডাকা, কিছু বুঝবে না, জানবে না, এক নাগাড়ে বক্ বক্ করবে, তারস্বরে মুশেতের গান জুড়ে দেবে ( ওঃ, মুশেতের গান কি বিরক্তিকর!) কয়লাওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করবে, ঘরের খুঁটিনাটি

বিষয় বলবে মুটে মজুরকে, পাড়া পড়শীর ঝি-কে ডেকে দেবে শয়ন কক্ষের গোপন সংবাদ, স্বামীর সম্বন্ধে আলোচনা করবে দোকানদারদের সঙ্গে। আর যত সব সস্তা গালগল্প, অস্বাভাবিক ধারণা, অন্ধ বিশ্বাস, আর কুসংস্কারে মগজ এমন ঠাসা যে কোন কথা বোঝানো আমার পক্ষে অরণ্যে রোদন।"

ভদ্রলোক বেশ হাঁপিয়ে পড়ে অভিভূত অবস্থায় থামলেন। এই সাদামাটা হতভাগ্য বেকুবটার জন্য করুণা হোল। একটু সান্ত্বনা দিতে যাব, বোট থেমে গেল। সাঁ ক্লদ এসে গেছে।

আমার কল্পনায় দোল দেওয়া ছোট্ট রমণী নামবার জন্য উঠে দাঁড়াল। আমার গা ঘেঁষে যাবার সময় আমার পানে কটাক্ষ হেনে মাতাল করা এক ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি ছুঁড়ে দিয়ে লাফ দিয়ে পা-দানিতে নেমে গেল। ঝুঁকে পড়ে তাকে অনুসরণ করতে যাব, আমার সহযাত্রী খপ্ করে আমার হাত ধরে ফেললো। জোর করে তার হাত ছিনিয়ে নিলাম। কিন্তু আমার কোটের খুঁট ধরে পেছনে টেনে নিয়ে সে চেঁচিয়ে বললো : "যাবেন না! যাবেন না!" তার চিৎকারে সকলের দৃষ্টি আমার ওপর এসে পড়ল, সকলের মুখে হাসি। বিদ্রূপ আর কেলেঙ্কারী বাড়াতে চাইলাম না। সক্রোধে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। নৌকো ছেড়ে দিল।

হতাশভাবে যখন ফিরে আসতে উদ্যত হয়েছি, দেখি নীচের পা-দানিতে দাঁড়িয়ে মেয়েটি আমার চলমান দেহ আর বিমর্ষ মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এদিকে সেই জল্লাদ লোকটা হাত কচ্‌লে বিড়বিড় করে বলল :

"আপনার মস্ত উপকার করলাম, পরে বুঝবেন।"

# ব্রানিজার ভেনাস

কয়েক বছর আগে ব্রানিজাতে এক নামকরা তালমাদ*পন্থী বাস করতেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান এবং ঈশ্বর ভীতির জন্য তিনি যতটা পরিচিত ছিলেন, রূপসী স্ত্রীর স্বামী হিসেবে তার পরিচয় ছিল আরও বেশি। ব্রানিজার ভেনাস নাম সত্যিই তার স্ত্রীকে সাজে; তার অনুপম রূপের জন্যও বটে আবার তালমাদ বিশারদের স্ত্রী হিসেবেও বটে। কারণ ইহুদী দার্শনিকদের বধূরা কুৎসিত অথবা বিকলাঙ্গ হবে—এটাই যেন স্বাভাবিক।

তালমাদপন্থী দার্শনিক ব্যাপারটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করতেন: এতো জানা কথাই যে বিয়ে সাদির ব্যাপার স্বর্গেই সমাধা হয়ে যায়, কোন ছেলের জন্মের সময় দৈব কণ্ঠে তার ভাবী স্ত্রীর নাম ঘোষিত হয় এবং মেয়েদের বেলায়ও তার স্বামীর নাম জানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু একজন ধার্মিক পিতা যেমন বাড়ির ভাল জিনিসপত্র বাইরের লোকের জন্য মজুত রেখে খারাপগুলো তার ছেলে মেয়েদের ব্যবহার করতে দেয়, তেমনি জগৎ পিতা, যে সব মেয়েদের কেউ নিতে চায় না, তাদেরকেই তালমাদদের উপহার দেন।

যাই হোক আমাদের তালমাদপন্থীর বেলায় ভগবান ব্যতিক্রম করেছেন, তাকে একজন ভেনাস উপহার দিয়ে বিয়ের ব্যাপারে সত্যিই যে তাঁর একটা নীতি আছে এবং সে নীতি যে নিষ্ঠুর নয়—সম্ভবত তাই প্রমাণ করেছেন। এই দার্শনিকের স্ত্রী এমন এক নারীরত্ন যে কোন রাজপ্রাসাদের অলঙ্কার হতে পারত অথবা কোন ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে শোভা পেতে পারত। দীর্ঘাঙ্গী, আশ্চর্য মাদকতাময় চেহারা। তার আকর্ষণীয় মাথাটি ছাপিয়ে গর্বিত গ্রীবা বেয়ে নেমে এসেছে ঘন কালো চুলের বিনুনী, দীর্ঘ পক্ষ্মের নীচে দুটি ডাগর,

* প্রাচীন ইহুদী ধর্ম সম্প্রদায় বিশেষ

কালো চোখ দীপ্ত কিন্তু আবেশে মন্থর। তার নিটোল হাত দুটি যেন হাতির দাঁত থেকে খোদাই করে বানানো।

এই মহিমান্বিত নারী, প্রাকৃতিক নিয়মেই যে অপরকে শাসন করতে পারে, চরণের দাস করে রাখতে পারে, শিল্পীর তুলি, ভাস্করের ছেনি এবং কবির কলমের রসদ জোগাতে পারে, হট্-হাউসে[১] বন্দী একটি দুর্লভ এবং সুন্দর ফুল গাছের মতোই সে বন্দী জীবন যাপন করত। দামী পশমী জামা কাপড়ে সর্বাঙ্গ মুড়ে সারাদিন জানালায় বসে সে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে পথের দিকে চেয়ে থাকত।

তার সন্তান ছিল না; পড়াশুনো এবং প্রার্থনা, প্রার্থনা এবং পড়াশুনো এবং ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত স্বামী এই নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন; তিনি বলতেন, "গুপ্ত সৌন্দর্যই" তার প্রেয়সী—তালমাদ-পন্থী দার্শনিক কাব্যালা[২]-র ঐ নামই দিয়েছিলেন। ধনী হওয়াতে সংসার চালানো নিয়েও স্ত্রীকে মাথা ঘামাতে হোত না, সপ্তাহে একবার দম দিলেই চলে এমন ঘড়ির মতো সব কিছুই আপন নিয়মে ঠিকমতো হয়ে যেত; কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে আসত না, সেও কখনও বাড়ির বাইরে পা বাড়াতো না; কেবল বসে বসে স্বপ্ন দেখত আর ভাবত আর হাই তুলত।

* * *

একদিন যখন ভয়ঙ্কর ঝড় বিদ্যুৎ বজ্রপাতের তাণ্ডবে শহরবাসী ভয়ে কাঁপছে এবং মিশ্যাইয়া[৩] যাতে ঘরে ঢুকতে বাধা না পান, তাই জানালাগুলো খুলে রাখা হয়েছে—ইহুদী ভেনাস তখনও তার আরামদায়ক ইজি-চেয়ারে বসে চিন্তায় ডুবে আছে, পশমী পোশাক

---

১ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গাছপালা বাঁচানর জন্ম শীত প্রধান দেশে যে কৃত্রিম উষ্ণঘর থাকে, তাকেই হট্-হাউস বলে।

২ বাইবেলের মধ্যে যে ইহুদী পণ্ডিতেরা গোপন অর্থের সন্ধান পেয়েছিলেন —তাদের গুপ্ত মন্ত্র বিশেষ।

৩ মানব জাতির পরিত্রাণের জন্ম যে অবতার অবতীর্ণ হবেন বলে ইহুদীদের বিশ্বাস।

পরা সত্ত্বেও ঠাণ্ডায় তার শরীর কেঁপে উঠছে। সামনে পেছনে দুলে তার স্বামী গুপ্তমন্ত্রের চর্চা করছিলেন, সে তার উজ্জ্বল স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল :

"ঠিক করে বলতো, ডেভিড পুত্র মিশ্যাইয়া কখন আসবেন।"

তালমাদ দার্শনিক জবাবে জানালেন :

"তিনি আসবেন, হয় যখন প্রতিজন ইহুদী সৎ হবে অথবা সকলেই অসৎ হয়ে যাবে—তখনই তিনি আসবেন।

"প্রতিজন ইহুদী সৎ হবে—এ কথা তুমি বিশ্বাস কর ?"—ভেনাস বলে উঠল।

"এমন কথা কি করে বিশ্বাস করবো ?"

"তাহলে ইহুদীরা বিলকুল অসৎ হলেই মিশ্যাইয়া আসবেন ?"

দার্শনিক কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফের তালমাদ দর্শনের গোলক ধাঁধায় হারিয়ে গেলেন, যেখান থেকে, লোকে বলে, মাত্র একজনই সুস্থ মস্তিষ্কে ফিরে আসতে পেরেছিল। রূপসী নারী আবার স্বপ্নালু চোখে বাইরের দুর্যোগের দিকে তাকাল, তার ফর্সা আঙুলগুলো তখন নিজের অজান্তে আপন মনে তার সুন্দর পোশাকের ঘন লোমগুলো নিয়ে খেলে চলেছে।

* * *

একদিন দার্শনিক পাশের শহরে গেছেন, সেখানে ধর্মের ওপর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তাঁর ডাক পড়েছে। ধন্য তাঁর পাণ্ডিত্য, যতটা সময় লাগবে বলে তিনি আন্দাজ করেছিলেন, তার চেয়ে ঢের কম সময়ে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল বলে তিনি সেদিনই সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এলেন, যদিও আগে ঠিক ছিল পরদিন ফিরবেন। এক বন্ধু—যিনি পাণ্ডিত্যে তাঁর চেয়ে বিন্দুমাত্র খাটো নন, তাঁর সঙ্গে এক গাড়িতে তিনি ফিরে এলেন। বন্ধুর গাড়ি থেকে নেমে বাকি পথটুকু তিনি হেঁটেই চলে এলেন। তাঁর বাড়ির জানালাগুলো আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে আর বাইরের দরজায়

বসে এক অফিসারের চাকর মৌজ করে ধূমপান করছে দেখে তিনি একটুও অবাক হলেন না।

"তুমি এখানে বসে কি করছ ?"—বেশ আন্তরিক সুরেই তিনি চাকরটিকে জিজ্ঞেস করলেন ; যদিও একটু কৌতূহল যে ছিল না তা নয়।

"পাছে রূপসী ইহুদিনীর স্বামী হুট করে এসে হাজির হয়—তাই আমি পাহারা দিচ্ছি।"

"তাই নাকি ? বেশ বেশ, দেখো, ভাল করে নজর রেখো।"

একথা বলে দার্শনিক ভান করলেন যেন চলে যাচ্ছেন, কিন্তু বাড়ির পেছন দিকে বাগানে ঢোকার খিড়কির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। প্রথম ঘরটিতে ঢুকেই দেখলেন টেবিলে দুজনের মতো খাওয়ার আয়োজন হয়েছিল এবং খুব বেশিক্ষণ আগে যে খাওয়া দাওয়া শেষ হয়নি তা টেবিলের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। বরাবরের মতো সেই পশমী পোশাকে সর্বাঙ্গ ঢেকে তাঁর স্ত্রী সেই-ভাবেই জানালায় বসে আছে, কিন্তু তার গালদুটি সন্দেহজনক লাল, আর কালো চোখ দুটিতে সেই স্বাভাবিক স্থির জ্যোতির বদলে এমন একটা ভাব ফুটে আছে যাতে একই সঙ্গে পরিতৃপ্তি এবং স্বামীর প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। ঠিক তখনই মেঝেতে স্বামীর পায়ে কিসের সঙ্গে যেন ঘর্ষণ হোল, যার ফলে অদ্ভুত একটা আওয়াজ হোল। তিনি জিনিসটা তুলে নিয়ে আলোর সামনে ধরলেন। এক জোড়া জুতোর তলার লোহার নাল।

"তোমার কাছে আজ কে এসেছিল, বলত ?" তালমাদপন্থী জানতে চাইলেন।

ইহুদী ভেনাস ঘৃণাভরে কাঁধ ঝাঁকাল কিন্তু মুখে কোন জবাব দিল না।

"আমি বলবো ? উঁশা-র ক্যাপটেন এসেছিল।"

"কেনই বা আসবে না শুনি ?"— ফর্সা হাতখানি দিয়ে পশমী জ্যাকেটের লোমগুলো পাট করতে করতে স্ত্রী পাল্টা প্রশ্ন করল।

"নারী! তোমার কি মাথা বিগড়েছে?"

"আমার মাথা ষোল আনা ঠিক আছে," সে জবাব দিল, এবং তার রক্তিম মদির ঠোঁটে এক টুকরো চতুর হাসির ঢেউ খেলিয়ে সে যোগ করল :

"আমাদের হতভাগা ইহুদীদের উদ্ধার করবার জন্যে যাতে মিশ্যাইয়ার আবির্ভাব হয়, সে জন্যে আমার যেটুকু করণীয়—তা কি আমি করবো না?"

"সে কি প্রেসিডেণ্ট আমাদোঁকে কেন যেতে হোল, তুমি জান না ?"

"কই না তো !"

"তার সম্বন্ধে বলেই হয়তো কথাটা চিরকাল গোপন থেকে যেত। কিন্তু ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত ধরনের।"

"বল তো শুনি।"

"সেই রূপসী তন্বী মিসেস আমাদোঁর কথা তোমার মনে আছে নিশ্চয়, যার মাথার চুল আর চোখ দুটি কালো, গায়ের রঙ্ একটু চাপা, চালাক চতুর সুন্দরী বলে সারা পায়্ ইস-লা-লঙ্-এ যে মাদাম মার্গারেত নামে পরিচিত ছিল ?"

"হ্যাঁ, বেশ ভালই মনে আছে।"

"তবে তো ভালই। তোমার বোধহয় এও মনে আছে, লোকে তাকে কেমন সমীহ করত, মানতো। এই শহরে তার মতো এত ভালবাসাও আর কারুর বরাতে জোটেনি ; অতিথি আপ্যায়ন বল, উৎসব পরব পরিচালনা বল, অথবা গরীবের জন্য চাঁদা আদায়—যে কোন কাজেই তার সমান দক্ষতা ছিল। তাছাড়া হাজারো রকমে যুবকদের খুশী করায় তার জুড়ি ছিল না।

"সে ছিল যেমন সুশ্রী তেমনি মোহময়ী কিন্তু কামগন্ধহীন খাঁটি সোনা। মফঃস্বলের মেয়ে বলে তার চেহারায় একটা সতেজ ভাব ছিল, এই ছোটখাটো সুন্দরী মহিলাটি যেন তরতাজা গ্রাম্য রূপের নিদর্শন।

শহুরে কবি ও লেখকেরা প্যারিসের মেয়ের রূপের সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ, কেননা তাঁরা শহরের মেয়েকেই চেনেন ; কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি যে মফঃস্বলের মেয়ে যদি রূপসী হয়, তার কাছে শহুরে মেয়ে কোনমতেই দাঁড়াতে পারে না।

পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের চেয়ে তারা বিবেচক ও নম্র; মুখে কোন প্রতিশ্রুতি না দিয়েও তারা অনেক কিছু দেয়, অপর দিকে প্যারিস-নন্দিনীরা প্রতিশ্রুতি দেয় ঝুড়ি ঝুড়ি কিন্তু একমাত্র শিথিল বেশবাস ছাড়া দেয় না কিছুই। মিথ্যার বেসাতি করেই প্যারিসীয় ললনারা জয় করে নেয়; অথচ শহরতলীর মেয়েরা সত্যের মাধুর্যে নম্রতার প্রতিমূর্তি।

"শহরতলীর মেয়ে হোলেও মাদাম আমাদোঁর সহজ সপ্রতিভ চাহনি, স্কুল ছাত্রীর মতো সরলতা ও ছলনা, অকারণ হাসি, কমনীয় ভাবাবেগ—সব মিলিয়ে তার আকর্ষণ ছিল সুদৃঢ় ও অনিবার্য। এই ছোট শহরে যেখানে প্রতিটি জানালা থেকে জোড়া জোড়া চোখ তার দিকে নজর রেখেছে, সেখানেও তার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ, কলঙ্ক রটনা বা মুখরোচক আলোচনার সুযোগ না দিয়ে নিজের অভিরুচি বা কামনা চরিতার্থ করতে এমন নিপুণভাবে মোহজাল বিস্তার করতে যে কোন শহুরে ছলনাময়ীও তার কাছে হার মানবে।

"মিসেস আমাদোঁ এমনই এক বিরল সৃষ্টি, তবে আকর্ষক। কেউ কখনও তাকে সন্দেহের চোখে দেখেনি। সরল চাহনির মতো তার জীবনধারা যে তত সরল নয়, একথা কারো মনে হয়নি। গহন, স্বচ্ছ মরমী দুটি চোখ, পবিত্রতার প্রতিচ্ছবি—তুমি দেখলে বুঝতে পারতে!

"আশ্চর্য উদ্ভাবনী শক্তি, সুচতুর নৈপুণ্য আর অবিশ্বাস্য সরলতা এই রমণীর।

"সেনাবাহিনী থেকে সে তার প্রেমিক বেছে নিত, এক এক জনের সঙ্গে তার প্রেমলীলার মেয়াদ ছিল তিন বছর—অর্থাৎ শহরে তাদের কার্যকালের সময়টুকু। সংক্ষেপে, তার ভালবাসা অবুঝ ছিল না।

"পার্যু ইস-লা-লণ্ডে কোন নতুন বাহিনী এলে সে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছরের অফিসারদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতো; কারণ

তিরিশের নীচে অনেক সময় বিবেচনা আসে না, আর চল্লিশ পেরিয়ে গেলে প্রায়ই উদ্যমে ভাঁটা পড়ে।

"ওঃ! কর্নেল থেকে শুরু করে প্রত্যেক অফিসারের নাম-ধাম তার কণ্ঠস্থ ছিল। স্বভাব-চরিত্র, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ, দেহের গঠন, শরীরের বল, সহিষ্ণুতা-অসহিষ্ণুতা, আর্থিক অবস্থা, দিলদরিয়া না হাড়কিপ্‌টে—এককথায় তাদের প্রত্যেকের নাড়িনক্ষত্র তার নখদর্পণে ছিল। বেশ করে বাজিয়ে নিয়ে তবে সে কোন একজনকে বেছে নিত। স্বভাবে তার নিজের মতো ধীর স্থির ব্যক্তিকেই সে সবার আগে বেছে নিত্; অবশ্য তাকে সুদর্শন হতে হবে। প্রেমিকদের অতীত প্রেমের কোন ঝামেলা বা মনে দাগ কাটার মতো কোন ভাবাবেগ থাকাটা তার পছন্দ ছিল না; কেননা যার প্রেমের ব্যাপার নিয়ে লোকে কানাঘুষো করে তাকে কোন-মতেই বিচক্ষণ বলা চলে না।

"সামরিক অফিসারদের কার্যকালের মেয়াদ তিন বছর। তিন বছরের জন্য একজনকে বেছে নেবার পর শুধু মাত্র হাত বাড়িয়ে দেওয়ারই যা অপেক্ষা।

"অন্যান্য মেয়েরা যে ক্ষেত্রে সঙ্কোচ বোধ করে, আর দশটা মেয়ের মতো সাধারণ নিয়মে প্রেমের বিজয় অভিযানে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে ভয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করে—প্রথম দিন শুধুমাত্র আঙুলে চুমু খেতে দেয়, দ্বিতীয় দিন মণিবন্ধে, তারপর দিন গালে, তারপর ওষ্ঠাধর এবং ধীরে ধীরে আর কোন বাধাই থাকে না; কিন্তু মাদাম আমার্দোর রীতি ছিল আরও সংক্ষিপ্ত, সতর্ক এবং নির্ভুল। সে বল নাচের আয়োজন করত।

"নির্বাচিত অফিসারকে গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে নাচের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হোত। দ্রুত লয়ের মাদকতাময় ওয়াল্‌জ বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে সে বিহ্বল হয়ে আত্ম নিবেদনের ভঙ্গীতে সঙ্গীর গায়ে ঢলে পড়ত। তারপর যেন স্নায়বিক দুর্বলতার ফলেই কাঁপা কাঁপা হাতে তার হাত মুঠো করে ধরে ক্রমাগত চাপ দিয়ে যেত।

"এতেও সাড়া না দিলে বলতে হবে লোকটি নিরেট বোকা। ঐ বোকচন্দরকে ছেড়ে মাদাম তখন তার বাছাই তালিকার দুই নম্বর নামটি বেছে নিত।

"আর যদি সাড়া মিলত, তবে কোন রকম সোরগোল না তুলে, আভিজাত্য বজায় রেখে, অকারণ হেথা হোথা ঘোরাঘুরি না করেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যেত।

"এর চেয়ে সহজ আর বাস্তবসম্মত উপায়—আর কি হতে পারে ?"

"স্ত্রী জাতি এভাবে আপন মনের উল্লাস কি করে যে আমাদের বোঝায় ! কেমন করেই বা ভুল বোঝাবুঝির অশান্তি, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর নানা রকম অসুবিধা ঢেকে রাখে ! চিন্তার অপার রহস্য, গোপন মনের বেপরোয়া অভিলাষ অনুভব করতে না পারার দরুন কত সময় আমরা কত সম্ভাব্য সুখের পরশ থেকেই না বঞ্চিত হই, দেহের নীরব আকুতি ব্যর্থ হয়, বিশেষ করে যে নারীর মুখে কথা জোগায় না, যার চোখ অভেদ্য এবং স্বচ্ছ—তার দুর্গম হৃদয় অজানাই থেকে যায়, এমন কি এ বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহও উঁকি মারে না।

"আমন্ত্রিত পুরুষ সে আবেদন বুঝতে পারলে একদিন নিরালায় দেখা করতে চাইত। কিন্তু তার মধ্যে কোন মারাত্মক দোষত্রুটি আছে কিনা, নিঃসন্দেহ হবার জন্য এক দেড় মাস তাকে ঠেকিয়ে রেখে যাচাই করে নিত।

"আর এই সময়টা বিজনে দেখা সাক্ষাৎ করার মতো একটা নিরাপদ ঠাঁই খুঁজে বার করবার জন্য প্রেমিকটি মাথা খুঁড়ে মরত, শেষ কালে হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবত এভাবে মেলামেশা যেমন দুঃসাধ্য তেমনি বিপজ্জনক।

"এরপর একদিন কোন সরকারী ভোজসভায় মহিলা একান্তে ভদ্রলোককে ফিস্‌ফিসিয়ে বলত :

" 'মঙ্গলবার, রাত নটায়, গড়পাঁচিলের ধারে ভজিয়ার্স রোডের গোল্ডেন হর্স হোটেলে গিয়ে মিস্ ক্লারিসির খোঁজ করবে। তোমার

পথ চেয়ে থাকব। আর শোন, একটা কথা, অসামরিক পোশাক পরে আসবে কিন্তু।'

"আট বছর ধরে সে এই ওঁচা হোটেলের একটা কামরা ভাড়া করে সজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। বুদ্ধিটা এসেছিল তার প্রথম প্রেমিকের মাথায়, বেশ বাস্তবসম্মত মনে হওয়ায় সেও এতে সায় দিয়েছিল। সময় হোলে সেই ব্যক্তিটিকে একদিন সে বিদায় দিল, কিন্তু নীড়টিকে ভেঙে দিল না।

"ওঃ! নিতান্ত সাদামাটা এই মিলন-কুঞ্জ; চার দেওয়ালে নীল ফুল আঁকা ধূসর রঙের কাগজ সাঁটা; পাইন কাঠের একটি পালঙ্ক—তার মাথায় পাতলা মশলিন কাপড়ের মশারি টাঙানো, ছুটো চেয়ার, মাদাম হোটেল মালিকের স্ত্রীকে বলে একটা বাড়তি আরাম কেদারা আনিয়ে রেখেছে; এছাড়া আছে কয়েকটি টুকিটাকি দরকারী প্রসাধন সামগ্রী—এর বেশি দিয়ে দরকার কি? দেওয়ালে তিনখানা বড় মাপের ছবি টাঙানো—তিনজন ঘোড়সওয়ার কর্নেলের। কর্নেলরা কি তার প্রেমিক? কেন নয়? আসল ব্যক্তিদের হুবহু ছবি সে রাখতে চায়নি, বরং অন্যদের এই ছবি কয়টি প্রতিভূ হয়ে তার প্রেমাস্পদদের স্মৃতি ধরে রেখেছে।

"তার মানে বলতে চাও, গোল্ডেন হার্স এতদিন যাতায়াত করেও সে কারো চোখে ধরা পড়ে নি?'

"কোনদিন না। কাকপক্ষীতেও টের পায়নি।"

"তার কর্মপন্থা ছিল সহজ এবং প্রশংসনীয়। ভেবেচিন্তে সে কোন খয়রাতী-অনুষ্ঠান বা ধর্ম-সভার আয়োজন করত, যার কোনটায় সে সশরীরে হাজির হোত, কোনটায় বা যেতই না। স্বামী বেচারা তার সৎ কার্যের খবর রাখতেন, কেননা এজন্য তাকে বেশ মোটা অর্থদণ্ড দিতে হোত। তাই তার মনে কোনদিন সন্দেহ দেখা দেয়নি।

"যেদিন অভিসারের কথা থাকত, সে চাকর-বাকরদের বলত: 'পক্ষাঘাতে পঙ্গু বৃদ্ধদের ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে আজ সন্ধ্যার সময় আমাকে সঙ্ঘে যেতে হবে।'

"সেদিন সে প্রায় রাত আটটায় বেড়িয়ে সোজা সঙ্ঘে যেত, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখান থেকে বেরিয়ে নানা অলি গলি ঘুরে কোন সরু রাস্তার বাতিহীন অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে নিজের টুপি খুলে ফেলত; গায়ের ঢোলা কামিজের তলা থেকে ঝি-এর টুপি বের করে পরে নিত, তাদেরই মতো করে রুমাল ভাঁজ করে ঘাড়ে জড়িয়ে নিত; নিজের টুপি আর ঢোলা জামা একটা কাপড়ে পুঁটলি করে বেঁধে নিত। সাহসে ভর করে পাছা দুলিয়ে সদর্পে রাস্তা ধরে হেঁটে যেত—যেন কোন কাজের ভার নিয়ে একজন শান্ত সুবোধ বালিকা চাকরানী পথ হেঁটে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে সে দৌড়ত, ভাবখানা যেন খুবই তাড়া আছে।

"এ রকম পরিপাটি চাকরানীকে প্রেসিডেন্ট আমাদোঁর প্রাণচঞ্চল স্ত্রী বলে চেনে সাধ্য কার?

"হোটেলে সে তার নিজের ঘরের দিকে চলে যেত, ঐ ঘরের একটা চাবি তার কাছেও থাকত। তাকে ডেস্কের পাশ দিয়ে যেতে দেখে হোটেলের মালিক মাস্টার ক্রুভ্যো গলা নামিয়ে মন্তব্য করত: 'এই যে মিস্ ক্লারিসি এসে গেছে কোন নাগরের সঙ্গে পিরিত করতে।'

"বদমাশ লোকটা বোধহয় কিছু একটা আঁচ করে থাকবে, কিন্তু এর বেশি জানবার চেষ্টা করেনি, তবে তার এই খদ্দেরটি যে মিসেস্ আমাদোঁ—যাকে পার্যুইস-লা-লণ্ডের লোকেরা মাদাম মার্গারেত বলে জানে, এ কথা জেনে সেও নিশ্চয় দারুণ অবাক হয়েছিল। সেই ভয়ঙ্কর আবিষ্কারটা কি ভাবে হল শোনো।

"অতি তুখোড় এবং অতীব দূরদর্শী ছিল বলে মিস্ ক্লারিসি কোনদিনই পর পর দুদিন তার সঙ্কেতকুঞ্জে যেত না, কস্মিন কালেও নয়। মাস্টার ক্রুভ্যো এ কথা ভাল করেই জানত, কেননা গত আট-বছরের মধ্যে এমন ঘটনা একদিনও ঘটেনি। তাই দায় ঠেকলে কখন সখনও সে এক রাতের জন্য তার ঘরটা অন্যকে ভাড়া দিত।

"গত গ্রীষ্মের কোন এক সময় নিঃসন্দিগ্ধ প্রেসিডেন্ট এক

সপ্তাহের জন্য বাইরে গেলেন। তখন জুলাই মাস। মাদাম পিরিতের রসে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে, আচমকা ধরা পড়ার ভয়ও নেই, তাই মাদাম তার প্রেমিক সুদর্শন কমাণ্ডার ভারাঁজেলেস্‌কে এক মঙ্গলবার রাতে বিদায় দেবার সময় জিজ্ঞেস করল পরদিনও সে তার সান্নিধ্য চায় কিনা ?

"প্রেমিকের জবাব : 'আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে চাই।'

"ঠিক হোল, বুধবার দিনও তারা ঐ সময়েই আসবে। খুব নীচু গলায় সে প্রেমিককে বলল : 'তুমি যদি আগেই এসে পড় তো বিছানায় অপেক্ষা কোরো।'

"তারপর আলিঙ্গন বিচ্ছেদ।

"পরদিন মাস্টার ক্রুভ্যো শহরের রিপাবলিকান মুখপত্র 'পার্যু ইস তাবলেত' পড়তে পড়তে গিন্নীর উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল : 'শুনেছো! শহরে কলেরা লেগেছে। কাল ভাভিগনিতে একজন মারাও গেছে।' গিন্নী তখন উঠোনে মুরগী কাটায় ব্যস্ত, কথাটা কানে গেলেও তেমন আমল দিল না। কারণ এখন হোটেলের ঘরে ঘরে খদ্দের, এবং ব্যাবসা জমজমাট।

"দুপুরের দিকে একজন লোক এল, পদব্রজে ভ্রমণকারী। সে দু'বোতল সবুজ মদ গেলার পর বেশ ভারী ধরনের প্রাতরাশের ফরমাশ দিল। গরমে তেতেপুড়ে এসেছিল বলে সে এক বোতল মদ আর আর অন্তত দু'বোতল জল খেল। তারপর সে কফি নিল, পর পর তার ছোট গ্লাসের দু'তিন গ্লাস সাবাড় করে দিল। তন্দ্রার আমেজ বোধ করায় সে দু'একঘণ্টা ঘুমিয়ে নেবার জন্য একটা ঘর চাইল। কোন ঘর খালি ছিল না, তাই বউয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে হোটেলের মালিক তাকে মিস্ ক্লারিসির ঘরটা দিল।

"লোকটি সেই যে ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল, বিকেল পাঁচটা বেজে গেল, তবু বেরোবার নাম নেই দেখে মালিক তাকে ডেকে দিতে গেল। গিয়ে দেখে মালিকের চক্ষুস্থির! লোকটা বিছানায় মরে পড়ে আছে!

"হোটেল মালিক তড়িঘড়ি নেমে এসে স্ত্রীকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল : 'শুনছো, এগারো নম্বরে যে পদযাত্রীকে থাকতে দিয়েছিলাম, মনে হচ্ছে সে মারা গেছে!'

"রমণী আঁতকে উঠে দু'হাত ওপরে তুলে কেঁদে ফেলল :

"এ কি করে সম্ভব! হায় ভগবান! এ নির্ঘাত কলেরা'

"মাস্টার ক্রভ্যো মাথা নেড়ে বলল : 'আমার কিন্তু দেখে মনে হয়েছে মাথায় রক্ত জমেই এমনটা হয়েছে, কেননা লোকটা মদের তলানি গাদের মতো কালো হয়ে গেছে।'

"কিন্তু তার স্ত্রী ঘাবড়ে গিয়ে বার বার বলতে থাকে :

'বলার দরকার নেই, একথা কক্ষনো বোলো না যে আমরা কলেরা বলে সন্দেহ করছি। যাও, চুপচাপ রিপোর্ট দিয়ে দাও, কোন মতেই ফাঁস কোরো না। রাত্তিরে এসে ওরা লাশটাকে সরিয়ে ফেলুক, কেউ যেন ঘুণাক্ষরে টের না পায়। চোখে না দেখলে, কানে না শুনলে লোকে কোন বিষয়ে ঘাবড়ায় না।'

"স্বামী বিড়বিড় করে বলল : 'মিস ক্লারিসি গতকাল এসেছিল, কাজেই ঘরটা আজ খালিই থাকবে।'

"ডাক্তার ডাকা হল। তিনি তার রিপোর্টে লিখলেন : 'গুরু ভোজনের ফলে রক্তের চাপে মৃত্যু।' তারপর পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করে দুপুর রাতে লাশ সরিয়ে ফেলা সাব্যস্ত হোল, যাতে হোটেল সম্বন্ধে কারো মনে সন্দেহ না জাগে।

"তখন খুব সম্ভব রাত ন'টা হবে, মাদাম আমার্দো গোল্ডেন হর্সের সিঁড়ি বেয়ে সবার অলক্ষে চুপি চুপি ওপরে উঠে গেল। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। চিমনির মাথায় একটা মোমবাতি জ্বলছিল। সে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, কমাণ্ডার হয়ত মশারী ফেলে শুয়ে পড়েছে। সে বলল : 'এক মিনিট সবুর কর, প্রিয়, এক্ষুণি যাচ্ছি।'

"নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে সে তাড়াহুড়ো করে বেশবাস খুলতে লাগল, জুতো মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল, কাঁচুলি গিয়ে পড়ল

আরাম-কেদারায়। কালো বসন ও ঘাগরা তার অঙ্গ বেয়ে নেমে এসে যখন গোলাকার হয়ে তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল—শুধু-মাত্র একটা লাল সিল্কের সেমিজে তাকে একটি ফুটনোন্মুখ ফুলের মতো দেখাল।

"কমাণ্ডারের কোন সাড়া না পেয়ে সে শুধাল: 'ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি, আমার বুড়ো খোকন?'

"এবারেও কোন জবাব না পেয়ে সে হাসতে হাসতে গুন গুন করে বলল: 'ঘুমিয়ে পড়েছে! রোসো দেখাচ্ছি মজা!'

"পায়ে খালি কালো সিল্কের মোজা, ঐ অবস্থায়ই সে এক ছুটে বিছানায় উঠে যায় এবং আচমকা জাগিয়ে দেবার বাসনায় ছু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমু খায়। কিন্তু ও যে পথচারীর জমাট বাঁধা ঠাণ্ডা মৃতদেহ! প্রচণ্ড ভয়ে বোধশক্তি লোপ পাওয়ায় এক সেকেণ্ড সে নিস্পন্দ হয়ে রইল; কিন্তু জড় মাংসপিণ্ডের শীতলতা তার আপন দেহে-সংক্রামিত হওয়ায় নৃশংস এক আতঙ্ক তাকে এমন ভাবে গ্রাস করল যে সে কোন কিছু ভেবে দেখার অবকাশ পেল না।

"এক ঝট্‌কায় সে বিছানা থেকে নেমে পড়ল, আপাদমস্তক থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল, চিমনির দিকে এগিয়ে গিয়ে ছু'হাতে মোমবাতিটা আঁকড়ে ধরে ফিরে এসে দেখল! এমন বিকট মুখ সে জীবনে দেখেনি, কালো, ফোলা, চোখ ছুটো বোজা আর চোয়ালের বীভৎস ভেঙ্‌চানিতে ভয়ঙ্কর সে মুখ!

"সে চিৎকার করে ওঠে, ভীষণ ভয় পেলে মেয়েরা যে অন্তহীন হৃদয়বিদারক আর্তনাদ করে, তার গলা চিরে তেমনি ভয়ার্ত কান্না বেরিয়ে এল। হাতের মুঠোর মোমবাতি ফেলে দিয়ে বিবসনা নারী দরজা খুলে ভয়ে আকুল চিৎকার করতে করতে ছুটে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। চার নম্বর ঘরের বাসিন্দা—বাণিজ্যিক-প্রতিষ্ঠানের এক ক্যানভাসার শুধু মোজা পরেই হুট করে বেরিয়ে এসে তাকে ছু'হাতে সাপটে ধরল। ভদ্রলোক হক্‌চকিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল: 'কি হয়েছে, মিষ্টি খুকু?'

"আতঙ্কে মাদামের কথা আটকে তোতলামো শুরু হোল ঃ

'আ—আ—আমার—ঘরে এ-একজন খুন হয়েছে ?'

"ততক্ষণে অন্য ঘরের লোকজনও এসে জড়ো হয়েছে, হোটেল মালিক স্বয়ং ছুটে এসেছে।

"এমন সময় হঠাৎ বারান্দার শেষপ্রান্তে দীর্ঘকায় কমাণ্ডারের আবির্ভাব। তাকে দেখা মাত্র নারী ছুটে গিয়ে তার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতে থাকে : 'বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও গোঁএাঁ, আমাদের ঘরে কে একজন খুন হয়েছে!'

"পরিস্থিতি ঘোরাল হয়ে দাঁড়ায়। মাস্টার ক্রভ্যো অবশ্য সত্য ঘটনা প্রকাশ করে মিস ক্লারিসিকে রেহাই দেবার জন্য আবেদন জানায়, এমন কি তার জন্য সে নিজে জামিন থাকবে বলে কথা দেয়। কিন্তু সেই মোজা-পরা বাণিজ্যিক প্রতিনিধি লাশ পরীক্ষা করে রায় দেয় যে ঘটনার পেছনে অপরাধের ইঙ্গিত আছে, সুতরাং মিস্ ক্লারিসি ও তার প্রেমিককে ছেড়ে দেওয়া যুক্তি সঙ্গত হবে না। হোটেলের অন্য আগন্তুকদেরও সে নিজের দলে টেনে নেয়।

"পুলিশ কমিশনার না আসা পর্যন্ত যদিও তারা ছাড়া পেল না, কিন্তু তিনি এসে ওদের মুক্তি দিলেন ; তবে তিনি যে মুখে কুলুপ এঁটে থাকলেন, এমন নয়।

"পরেই মাসেই প্রেসিডেণ্ট আমাদোঁর পদোন্নতি হয় এবং তিনি অন্যত্র বদলি হন।

## মৃত্যুর অন্তরালে

নিরুদ্‌বেগে, পরম শান্তিতে তিনি চোখ বুজলেন। জীবনে যার নিন্দনীয় কিছুই নেই, এমন রমণীর পক্ষেই এ রকম মরণ সম্ভব। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন, চোখ দুটি বোজা, প্রশান্ত চেহারা, লম্বা সাদা চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো; যেন শেষ যাত্রার মাত্র দশ মিনিট আগে তিনি প্রসাধন সেরে নিয়েছেন। প্রসন্ন করুণ মুখমণ্ডল দেখে সন্দেহ থাকে না যে ঐ দেহখানি পবিত্র আত্মার আধার ছিল। ধীর স্থির এই বৃদ্ধার জীবনে কোন উদ্‌বেগ ছিল বলে মনে হয় না, তিনি যে ধর্মপরায়ণা এবং জীবনে কোন বড় রকমের আঘাত যে তাকে সইতে হয়নি—নিষ্প্রাণ এই দেহখানিই তার প্রমাণ।

কড়া নীতিবাগীশ ম্যাজিষ্ট্রেট আর সন্ন্যাসিনী যুলালী—সন্ন্যাস জীবনে যার নাম হয়েছে মার্গারেত, খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে অঝোরে কাঁদছেন। বৃদ্ধার ছেলে আর মেয়ে। সন্তানেরা যাতে কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ হয়ে ওঠে, সে দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। কোন রকম দুর্বলতার প্রশ্রয় না দিয়ে তারা যাতে ধর্ম পালনে নির্মম এবং কর্তব্যের ক্ষেত্রে আপোসহীন হতে পারে—সেই শিক্ষাই তিনি তাদের দিয়েছেন। ছেলে ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন। রায় দেবার সময় আইনের বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি তিনি বরদাস্ত করেন না। এই পরিবারের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা কন্যাটিরও মজ্জায় মিশে গেছে। পুরুষের প্রতি বিদ্বেষ থেকেই তিনি ঈশ্বরকে জীবন-সঙ্গী করে নিয়েছেন।

ভাইবোন তাঁদের বাবার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতেন না; শুধু এটুকুই শুনেছিলেন যে বাবা মাকে দুঃখ দিয়েছেন। হাতির দাঁতের মতো মসৃণ মৃতার একখানি হাত ক্রুশবিদ্ধ বিশাল যীশু মূর্তির হাতের

মতো খাট থেকে ঝুলে পড়েছে। সন্ন্যাসিনী কন্যা আবেগ ভরে সে হাতে চুমু খেলেন। শয়ান দেহটির অন্যদিকে অপর হাতখানি মুমূর্ষুর সেই অদ্ভুত ভঙ্গীতে তখনও কোঁচকানো বিছানার চাদরটি মুঠো করে ধরে আছে, চিরকালের তরে থেমে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আঁকড়ে ধরার যে প্রাণপণ প্রচেষ্টা—চাদরের ছোট ছোট ভাঁজগুলি যেন তারই প্রমাণ দিচ্ছে। দরজায় মৃদু টোকা শুনে ক্রন্দনরত ভাই বোন ফিরে তাকালেন। পাদ্রী এসে ভেতরে ঢুকলেন। পর পর কয়েকটি রাত তাঁকে রোগিনীর পাশে জাগতে হয়েছে। আরও কয়েক রাত জাগতে হতে পারে ভেবে রাতের খাওয়াটা তিনি সেরে এসেছেন। রাত জাগার ক্লান্তি দূর করার জন্য কফির সঙ্গে একটু বেশি মাত্রায় ব্রাণ্ডি সেবন করেছেন। পানের মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে যাওয়ায় তাঁর চোখ মুখ ফোলা ফোলা এবং একটু লালচে দেখাচ্ছিল। তাঁর মুখ বিষণ্ণ, মানুষের মৃত্যুই যাদের জীবিকার উপায়, এ-ধরনের বিষাদের মুখোশ তাঁদের পরতে হয়। তিনি ক্রুশ-চিহ্ন আঁকলেন। তারপর কাছে এসে পেশাদারী ভঙ্গীতে বললেন: "বাছারা, তোমাদের এই দুঃখের সময় আমি সাহায্য করতে এসেছি।"

বোন য়ুলালী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: "ধন্যবাদ, ফাদার; কিন্তু আমরা ভাইবোন আমাদের মায়ের কাছে আরও কিছুক্ষণ নিরিবিলি থাকতে চাই। এই দেখাই শেষ দেখা। তাই আমাদের তিনজনকে আরও কিছুক্ষণ একসঙ্গে থাকতে দিন, যেমন আমরা অনেক আগে থাকতাম—আমাদের একেবারে ছেলেবেলা। আমাদের বেচারী—দুঃখিনী মা—।" তার কথা শেষ হোল না চোখে বন্যা নামল, কান্নায় গলা বুজে এল।

পাদরী মাথা নেড়ে বললেন: "ঠিক আছে, বাছারা, তোমরা যা বলবে তাই হবে।" তাঁর মুখখানা এখন আরও প্রশান্ত, কেননা মন টানছিল বিছানার দিকে।

তিনি হাঁটু গেড়ে বসে আবার ক্রুশ আঁকলেন, প্রার্থনা করলেন,

তারপর আস্তে করে উঠে যাবার সময় গুণ গুণ করে বললেন!" উনি ছিলেন প্রকৃতই পুণ্যাত্মা।"

ঘরে এখন শুধুই ওরা—মৃতা নারী এবং তার সন্তানেরা। এক অন্ধকার কোণ থেকে টেবিল ঘড়ির টিক্ টিক্ আওয়াজ আসছে, খোলা জানালা দিয়ে আবছা চাঁদের আলো এসে পড়েছে, শুকনো খড় আর বুনো গাছগাছালীর গন্ধে ঘর ভরে গেছে। ভবঘুরে ব্যাঙের একটানা ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ্ আর দু'একটা নিশাচর পতঙ্গের বলের মতো দেওয়ালের গায়ে এসে আছড়ে পড়ার শব্দ ছাড়া বাইরে আর সব নিস্তব্ধ। এক অনন্ত শান্তি, স্বর্গীয় বিষন্নতা, নিঃশব্দ সুষমা এই মৃত রমণীকে ঘিরে ধরেছে; মনে হয় যেন এই নৈঃশব্দ্য বাষ্পের মতো তার দেহ থেকে উত্থিত হয়ে বিশ্বপ্রকৃতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট তখনও বিছানায় মুখ গুঁজে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন। এক সময় তাঁর গলা চিরে গোঙানী শোনা গেল: "মা, মাগো, আমার মামণি!" যেন বুক-ফাটা এক আর্তনাদ দূর থেকে এসে বিছানার চাদর আর শব-আচ্ছাদনীর ওপর লুটিয়ে পড়ল। বোন ততক্ষণে কাঠের মেঝেতে পড়ে মৃগী রোগীর মতো গড়াগড়ি খেতে খেতে খ্যাপার মতো বিড়বিড় করছেন; "যীশু—যীশু—আমার মা যীশু···!"

প্রচণ্ড শোকের ঝড়ে বিপর্যস্ত দুই সন্তানের গলা থেকে গোঙানী বেরিয়ে আসছিল।

ক্রমে শোকের দাপট কমে এল। ঝড়ের তাণ্ডব থেমে গেলে পর সমুদ্রের বুকে যেমন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ে, তেমনি করে ভাইবোন চোখের জল ফেলতে লাগলেন। তারপর, একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁরা প্রাণহীন প্রিয় দেহখানির দিকে চেয়ে রইলেন। মনের মাঝে স্মৃতির মিছিল; কতদিনের কত অন্তরঙ্গ পারিবারিক তুচ্ছ ঘটনা, অতীতের কত মধুর স্মৃতি—আজ সে সব মনে পড়ায় হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, ভুলে যাওয়া নানা খুঁটিনাটি সহ সব ভিড় করে আসছে। এই সব কিছু নিয়ে একদিন যাঁর অস্তিত্ব গড়ে উঠেছিল—তাঁকে আর কখনও ফিরে পাওয়া যাবে না। টুকরো টুকরো কথা, হাসি, গলার

স্বর—এখনও যেন কানে বাজে ; অথচ ঐ স্বর আর কখনও শোনা যাবে না। মায়ের প্রশান্ত পরিতৃপ্ত মুখখানার দিকে তাঁরা আবার ফিরে তাকালেন, ঘরোয়া কথাবার্তায় তিনি যে সব শব্দ বেশি ব্যবহার করতেন—সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করবার সময় তিনি এমন ভাবে বাঁ হাতখানা এদিক ওদিক একটু একটু নাড়াতেন, যেন ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন ; সেই বিশেষ ভঙ্গীটিও ভাইবোনের মনে পড়ে গেল।

মাকে তাঁরা আরও গভীর করে ভালবাসলেন, এত ভাল এর আগে আর কখনও বাসেননি। গভীর হতাশা বোধ থেকে তাঁরা উপলব্ধি করলেন কি নিবিড় বন্ধনেই না তিনি তাঁদের বেঁধে রেখেছিলেন, তাঁর অভাবে এখন তাঁরা কত অসহায়।

যিনি ছিলেন তাঁদের প্রধান অবলম্বন, তাঁদের পথ-প্রদর্শক ; তাঁদের যৌবনের আনন্দ, জীবনের সুখ, তাঁকে আর কোনদিনই ফিরে পাওয়া যাবে না। তিনিই তাঁদের সত্তা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন : মা মামণি, জন্মদায়িনী, পূর্বপুরুষের সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র। এখন থেকে তাঁরা নিঃসঙ্গ, একা, পেছু টান বলে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

সন্ন্যাসিনী ভাইকে বললেন : "মনে পড়ে, দাদা, মা পুরোনো চিঠিগুলো ফিরে ফিরে পড়তেন ? মায়ের দেরাজে সবগুলোই সাজানো আছে। এসো না, আমরা দুজনে পালা করে চিঠিগুলো পড়ি ; তাঁর পাশে বসে আজকের এই রাতটিতে তাঁর সারা জীবন স্মরণ করি। এ হবে আমাদের তীর্থ পরিক্রমা—ওঁর মা, ওঁর দাদু-দিদিমা—যাঁদের আমরা কখনও দেখিনি বটে কিন্তু ওঁর মুখে যাঁদের কথা বিস্তর শুনেছি, তাঁদের সঙ্গেও পরিচয় হবে। ওঁদের চিঠিপত্রও সবগুলোই আছে।"

ডজন খানেক ছোট ছোট চিঠির প্যাকেট দেরাজ থেকে বেরোলো। হলদে কাগজের মোড়কে বেঁধে একটার পর একটা সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এই স্মৃতিচিহ্নের গুচ্ছ তাঁরা বিছানায়

ছড়িয়ে দিলেন, তারপর একটি মোড়ক বেছে নিলেন—যার ওপরে লেখা—"বাবা।"

সনাতন বনেদি পরিবারের লেখার দেরাজে এ-ধরনের বহুকালের পুরোনো চিঠি দেখতে পাওয়া যায়, এই সব চিঠিপত্রে যেন বিগত শতাব্দীর গন্ধ লেগে থাকে। প্রথম চিঠিটিতে সম্বোধন রয়েছে—"আমার সোনামণি," আর একখানায়—"আমার লক্ষ্মী মেয়ে", তার পর—"আমার আদরের মামণি," পরের খানায়—"আমার প্রাণপ্রিয় কন্যা।" হঠাৎ সন্ন্যাসিনী গলা চড়িয়ে দিলেন; মৃতা মহিলার আপন ইতিহাস, তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত মনোরম স্মৃতিকথা তাঁকে শোনাতে লাগলেন। ম্যাজিস্ট্রেট বিছানায় ঝুঁকে পড়ে মায়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বোনের পড়া শুনতে লাগলেন। নিস্পন্দ দেহখানি যেন সুখের আবেশে চোখ বুজে আছে।

পড়া থামিয়ে মৃণালী একবার বলে উঠলেন: "মায়ের সঙ্গে চিঠি-গুলোও দিয়ে দেব, ওগুলো দিয়ে মাকে ঢেকে দেব, একই সমাধিতে ওগুলো মায়ের সঙ্গেই থাকবে।"

মেয়ে এরপর আর একটি মোড়ক হাতে তুলে নিলেন, এতে কোন শিরোনাম ছিল না। জোরে জোরে পড়তে লাগলেন:

"আমার প্রাণের প্রতিমা, তোমার প্রেমে আমি পাগল। তোমার জন্য গতকাল থেকে আমার হৃদয় অভিশপ্ত আত্মার মতো যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে। আমার অধরে তোমার সুধা বর্ষণ, আমার নয়নে তোমার মদির চাহনি, আমার-দেহে তোমার সুখস্পর্শ এখনও আমায় রোমাঞ্চিত করছে। আমি তোমায় ভালবাসি। তোমায় ভালবাসি! তুমি আমায় পাগল করে দিয়েছো! আমার দুই বাহু মেলে রেখেছি! তোমাকে আর একবার পাবার আকুল কামনায় আমার চিত্ত ব্যাকুল! আমার সর্বাঙ্গে তোমার আমন্ত্রণ, তোমাকে আমার চাই। আমার মুখে তোমার চুম্বনের আস্বাদ এখনও লেগে আছে।"

ম্যাজিস্ট্রেট উঠে দাঁড়ালেন; সন্ন্যাসিনীর পড়া থেমে গেল। বোনের হাত থেকে ছোঁ মেরে চিঠিটা কেড়ে নিয়ে লেখকের নাম

খুঁজতে লাগলেন। নাম ধাম তেমন কিছু নেই। "তোমার প্রেম-মুগ্ধ"-র নিচে শুধু একটি শব্দ "আঁরি।" তাদের বাবার নাম ছিল 'রেনে'। সুতরাং তাঁর চিঠি হতে পারে না।

ম্যাজিস্ট্রেট পুত্র তখন দ্রুত হাত চালিয়ে চিঠির গোছা হাতড়ে আন্দাজে একটা তুলে নিয়ে পড়তে লাগলেন: "তোমার আদর না পেলে আমি আর বাঁচবো না।"

এরপর বিচারক সন্তান দণ্ডাদেশ দেবার মতো কঠোর ভাবে মৃত মায়ের নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

ভাই, এরপর কি করেন, দেখবার জন্য সন্ন্যাসিনী স্থির মূর্তির মতো সটান দাঁড়িয়ে রইলেন, দুই চোখের দুই কোণে দুটি অশ্রুবিন্দু টল্‌টল্‌ করতে লাগল। ভাই ধীরে ধীরে পা ফেলে ঘরের অন্যপ্রান্তে জানলার ধারে গিয়ে চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

যখন দৃষ্টি ফেরালেন, বোন য়লালী মাথা নিচু করে তখনও বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে। তাঁর চোখ শুকনো।

ম্যাজিস্ট্রেট মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা চিঠিগুলো কুড়িয়ে নিয়ে দেরাজের মধ্যে ছুঁড়ে ফেললেন। তারপর বিছানার চারদিকে পর্দা টেনে দিলেন।

ঊষার আলোতে টেবিলের ওপরের মোমবাতিগুলো যখন ম্লান হয়ে এল, ম্যাজিস্ট্রেট আরাম কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন; এবং যে মাকে ধিক্কার দেবার জন্য আগেই পর্দা টেনে চোখের আড়াল করেছেন, বিদায় নেবার সময় তার দিকে একবারও না তাকিয়ে ধীর গলায় বললেন:

"এসো বোন, এঘর থেকে বাইরে যাই।"

# সে কি স্বপ্ন

উন্মত্তের মতো তাকে ভালবেসেছিলাম।

কেন লোকে ভালবাসে? কেন? কি অপূর্ব অদ্ভুত, প্রেমিকের চোখে পৃথিবীব্যাপী একটি সত্তা, সারা মনে একটি মাত্র ভাবনা, হৃদয় জুড়ে কেবল মাত্র একটি বাসনা, মুখে একটি মাত্র প্রিয় নাম। স্বতোৎসারিত একটি নাম— আত্মার অতল উৎস থেকে অধরে উচ্ছ্বসিত ঝর্ণাধারা, এই নাম বারংবার আবৃত্তিতেও তৃষ্ণা মেটে না— প্রার্থনা মন্ত্রের মতো অবিরাম গুঞ্জরণে সাধ যায়।

আমাদের কাহিনী আপনাদের শোনাবো। কেননা, প্রেম জীবনে একবারই আসে, আর চিরচিহ্ন রেখে যায়। তাকে দেখলাম। তার লাবণ্যে সোহাগে সতেজ হয়ে উঠলাম। তার বাতুলতায়, সাজসজ্জায়, তার সুমধুর বচনে আমি আচ্ছন্ন হলাম, হারিয়ে গেলাম। আমাদের এই বৃদ্ধ জগতের দিবস রজনী, জীবন মরণ কোন কিছুতেই আমার চৈতন্য রইল না।

এমন সময় অবধারিত মৃত্যু এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল কেমন করে? আমি জানি না; আমি আর কিছুই জানি না। একদিন ধারাবর্ষণে সিক্ত কলেবরে সে ঘরে ফিরলো। পরদিনই সর্দি-কাশিতে শয্যা নিল, শুয়ে রইল এক সপ্তাহ। কি ঘটেছিল এখন আমার স্মরণ নেই। কিন্তু ডাক্তার এসেছে, ওষুধের নাম লিখে দিয়ে চলে গেছে। ওষুধ আনা হয়েছে, কোন নার্স তাকে খাইয়েও দিয়েছে। তার হাত দুটো ছিল তপ্ত, ললাট আগুনের মতো, চোখদুটো টকটকে লাল আর ব্যথাতুর। সে আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল, কিন্তু আমরা কি কথা বলেছিলাম, মনে নেই। সব ভুলে গেছি, স-ব, স-অ-ব। তার সেই ক্ষীণ দুর্বল শেষ নিঃশ্বাসটুকু শুধু মনে পড়েছে। নার্স বলে উঠলো— 'আঃ!' আর আমি বুঝতে পারলাম, সব বুঝে গেলাম।

আর কিছু আমার জানা নেই, কিচ্ছু না। যখন দেখলাম একজন যাজক আমায় বলছে "আপনার প্রেমিকা ?" তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলাম। মনে হোলো লোকটা তাকে অসম্মান করছে। সে এখন মৃত। এখন আর কারও ও কথা বলবার অধিকার নেই। আর একজন দয়ালু, দরদী গির্জা-পুরোহিত এসে যখন তার সম্বন্ধে নানা কথা বললেন, আমার আঁখি থেকে অশ্রুবন্যা নেমে এলো।

গির্জার লোকেরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করলো, কিন্তু তাদের কোন কথাই আজ আর আমার মনে নেই। তবু সেই বীভৎস শবাধার এখনও আমার চোখে ভাসছে। কফিনের ওপর হাতুড়ির ঘায়ে পেরেক ঠোকার শব্দ এখনও আমার কানে বাজে। ওঃ ভগবান! ঈশ্বর!

তাকে সমাধি দেওয়া হোলো! সমাধিস্থ সে! গহ্বরের মধ্যে শয়ান। তার কয়েকজন বান্ধবী এসেছিল। তাদের কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে গেলাম। এড়িয়ে গেলাম। তারপর পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে গেলাম। পরের দিনই বেরিয়ে পড়লাম ভ্রমণে।

* * *

গতকাল প্যারিসে ফিরে এসেছি। ঘরে পা দিতেই সেই বেদনা নূতন করে উদ্‌বেল হয়ে উঠলো। আমাদের ঘর, আমাদের শয্যা, আমাদের আসবাবপত্র—একটি প্রাণ শুকিয়ে যাবার পরও সব বস্তু সঠিক থাকতে পারে—তার সব কিছুই ঠিক তেমনি সাজানো রয়েছে। আমার ব্যথা দুঃসহ হয়ে উঠলো, মনে হোলো জানালা খুলে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ি। এই সব স্মৃতির ভারে আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছিল। এই চার দেওয়াল তাকে আড়াল করে রেখেছিল, তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। এই গৃহপ্রাচীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার দেহের শত সহস্র অতীন্দ্রিয় অণু-পরমাণু বহন করছে, তার নিঃশ্বাস এখানকার বাতাসে ছড়িয়ে আছে। থাকতে না পেরে টুপি হাতে করে আমি পালিয়ে এলাম। দরজায় পা দিতেই হল্ ঘরের বিশালাকার আয়নাটা সামনে পড়লো। বাইরে যাবার আগে আপাদমস্তক নিরীক্ষার জন্য মাথার রুমাল থেকে

পায়ের জুতো অবধি প্রসাধন অপরূপ নিখুঁত হয়েছে কিনা দেখে নেবার জন্যে সে-ই এটা ওখানে স্থাপন করেছিল।

আয়নাটার কাছে থমকে দাঁড়ালাম। এতে কতবার তার তনু-দেহের প্রতিফলন হয়েছে—কতবার, কত অসংখ্যবার। এর বুকে নিশ্চয় তার প্রতিচ্ছবি নিমজ্জিত রয়েছে। কম্পিত দেহে সেই বিস্তৃত বিরাট শূন্য মুকুরের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইলাম। এই আরশি আজ যেমন আমাকে, আমার এই আবেগ বিধৌত দৃষ্টিকে ধারণ করে আছে, তাকেও তেমনি সম্পূর্ণ স্থান দিয়েছিল। আমি যেন তাই ওই কাচটিকেই ভালবেসে ফেললাম। ওকে স্পর্শ করে দেখলাম। শীতল। হায়! স্মৃতি! পীড়াদায়ক দর্পণ, অগ্নিগর্ভ দর্পণ, ভয়ানক দর্পণ! মানুষকে যন্ত্রণায় বিদ্ধ করবার চক্রান্তকারী দর্পণ। যার অন্তর থেকে সব কিছু মুছে যায়, সেই সুখী। স্নেহ, মমতা, প্রেম-ভালবাসা, হৃদয় কন্দরের সমস্ত স্মৃতি, সব ঘটনা যে ভুলতে পারে, সেই সুখী। হায় আমি কেন দুঃখ পাই!

অজান্তে, অনিচ্ছায় কখন যেন সমাধিক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলাম। তার নিরলঙ্কার সমাধি খুঁজে নিলাম। একটি শুভ্র মার্বেল পাথরের ক্রুশচিহ্ন, তাতে লেখা :

"সে ভালবেসেছে, ভালবাসা পেয়েছে, মৃত্যুবরণ করেছে।"

সে ওই মৃত্তিকার তলায়, ধ্বংস হয়ে গেছে। কী ভয়ঙ্কর! মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে আমি ফোঁপাতে লাগলাম। সেখানে অনেকক্ষণ ছিলাম—অনেকক্ষণ। দেখলাম আঁধার ঘনিয়ে আসছে। তখন একটা অদ্ভুত ইচ্ছা আমায় পেয়ে বসলো। হতাশ প্রেমিকের এক উদ্ভট নিশি-যাপন আকাঙ্ক্ষা আমাকে ঘিরে ধরলো। আজকের রাতে—এই শেষ যামিনীতে আমি তার সমাধি কান্নার শিশিরে ভিজিয়ে দেব। কিন্তু ধরা পড়ে যেতে পারি, বিতাড়িত হতে পারি। কি করে তা সম্ভব! মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে সেই মৃতের রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। হাঁটছি, শুধুই হাঁটছি। আমাদের জীবিত নগরীর তুলনায় কতই না ক্ষুদ্র এই মৃত নগরী। তবুও

জীবিতের তুলনায় মৃতের সংখ্যা কত বেশি। একই যুগে এক সঙ্গে চারপুরুষের বসবাসের জন্য আমাদের আকাশছোঁয়া অট্টালিকা, প্রশস্ত রাস্তা আর যথেষ্ট স্থান না হলেই নয়। পানীয় জলের জন্য ঝরনা, সুরা প্রস্তুতের জন্য দ্রাক্ষারস, আর খাদ্যের জন্য সমতল ভূমি আমাদের প্রয়োজন। আর আমাদের কাছে সোপানরূপে অবতীর্ণ মৃতদের সমস্ত পূর্বপুরুষ কত সামান্য উপকরণেই না সন্তুষ্ট! ধরিত্রী তাদের কোলে ফিরিয়ে নেয়, বিস্মৃতি তাদের বিলুপ্ত করে দেয়। হায় ঈশ্বর!

সমাধি ক্ষেত্রের শেষ প্রান্তে এসে পড়লাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, এ দিকটা সবচেয়ে পুরাতন। এখানে এখন বহুযুগ আগেকার মৃতদেহগুলো মাটিতে মিশে নিখোঁজ। ক্রুশ চিহ্নগুলো ভেঙ্গে চুরমার। হয়তো খুব শীগগির নতুন মৃতেরা এখানে স্থান পাবে। দেখলাম অযত্নে বিকশিত গোলাপ, অবাধে বর্ধিত ঋজু, শক্ত সাইপ্রেস গাছ—মানবদেহের ওপর গজিয়ে ওঠা এক বিষণ্ণ ও সুন্দর উদ্যান।

আমি ছিলাম একা, একেবারে একা। সুতরাং একটি সবুজ গাছের ঘন শাখাপল্লবের অন্ধকারে আত্মগোপন করে রইলাম। ডুবো জাহাজের মানুষ যেমন করে এক টুকরো কাঠ আঁকড়ে ধরে, আমিও তেমনি গাছের ডাল জাপ্টে ধরে প্রতীক্ষা করে রইলাম।

অন্ধকার গাঢ় হোলে সেই আশ্রয় ছেড়ে সাবধানে ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে সেই শবাকীর্ণ ভূমির ওপর দিয়ে বিচরণ শুরু করলাম। বহুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু বাঞ্ছিত কবরটি খুঁজে পেলাম না। সামনে হাত বাড়িয়ে চলেছি। আমার হাত, পা, জানু, বুক, এমনকি আমার মাথা দিয়ে অবধি সমস্ত স্মৃতিসৌধ আঘাত করে যাচ্ছি। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। অন্ধের মতো আমি পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছি। পাষাণ ফলক, ক্রুশ, লোহার রেলিং, ধাতব মাল্য, শুকনো ফুলের মালা—সব কিছুই আমি স্পর্শে অনুভব করতে পারছি। খোদাই অক্ষরগুলোর ওপর আঙুল বুলিয়ে নামগুলো পড়ে যাচ্ছি। কী রাত! কী রাত! আমি আর তাকে খুঁজে পাব না।

আকাশে চাঁদ নেই। কী ভয়াল রজনী। এই সারিবদ্ধ সমাধির মধ্যে সরু গলিপথে অগ্রসর হচ্ছি। আমার ভয় করছে, দারুণ আতঙ্কে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। কবর! কবর! কবর! চারিদিকে কবর ছাড়া আর কিছু নেই। দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে পশ্চাতে, আমার চতুর্দিকে, সর্বত্র শুধু কবর! আমি দুর্বল শ্রান্ত বোধ করছি, আমার পা কাঁপছে। আর চলতে পারছি না। একটা কবরের ওপরই বসে পড়লাম। আমার হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। আরও কী সব আমার কর্ণে প্রবেশ করছে। ও কিসের ধ্বনি? যেন একটা নামহীন বিশৃঙ্খল হট্টগোল। এ হট্টগোল আমার মস্তিষ্কে, অভেদ্য রাত্রির বুকে অথবা মৃতদেহে উর্বরা মেদিনীর গহন গর্ভে? আশে পাশে তাকালাম। কিন্তু কতক্ষণ সেভাবে বসেছিলাম বলতে পারবো না। আমি আতঙ্কে অবশ, ভয়ে ঠাণ্ডা। চীৎকার করতে চাইলাম, মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রইলাম।

যে মার্বেলের ওপর আমি বসেছিলাম, হঠাৎ মনে হোলো সেই পাথরের টুকরোটা নড়ছে। নিশ্চয়ই নড়ছে। আস্তে আস্তে উঠে আসছে। এক ধাক্কায় আমি পাশের একটা কবরে এসে ছিটকে পড়লাম। দেখলাম, হাঁ, পরিষ্কার দেখতে পেলাম, আমার ছেড়ে-আসা পাথরটা উপরে উঠছে। সেই গর্ত থেকে মৃত ব্যক্তি, একটি নগ্ন কঙ্কালের আবির্ভাব হোলো। সে তার বঙ্কিম পৃষ্ঠদেশের সাহায্যে পাথরটাকে ঠেলে দিল। সেই প্রগাঢ় তমসাবৃত রাত্রিতেও আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, সেই ক্রুশের গায়ে উৎকীর্ণ :

"জাক আলভাঁ এখানে শায়িত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল একান্ন। তিনি ছিলেন দয়ালু, সম্ভ্রান্ত, পরিবারের প্রতি তাঁর প্রেম ছিল অগাধ। মৃত্যুর দ্বারা তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছেন।"

মৃত ব্যক্তিটিও তার স্মৃতিস্তম্ভের ওপর উৎকীর্ণ লেখাগুলো পড়লো। তারপর পথ থেকে ছোট্ট, ধারালো এক টুকরো পাথর তুলে নিয়ে অক্ষরগুলোকে একটা একটা করে খুঁটে তুলে ফেলতে লাগলো। ক্রমে সব ক'টি লেখা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সে তার

চক্ষুর কোটর দিয়ে মাটিতে ফেলে-দেওয়া অক্ষরগুলোর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো। তারপর বালকেরা যেমন দীপ শলাকার অগ্রভাগ দিয়ে দেওয়ালের ওপর দাগ কাটে, তেমনি সে তার মেদ নিঃশেষিত অঙ্গুলির অস্থি দিয়ে অগ্ন্যাক্ষরে লিখে চললো :

"এখানে আলভা চিরনিদ্রায় অভিভূত। একান্ন বছর বয়সে ঘটে তার জীবনাবসান। সম্পত্তির লোভে সে নিষ্ঠুরতার দ্বারা তার পিতার অকালমৃত্যু ঘটিয়েছে। সে তার স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করেছে, সন্তানদের পীড়ন করেছে, প্রতিবেশীদের প্রতারণা করেছে, সর্বক্ষেত্রে দস্যুতা করেছে এবং পরিণামে হতচ্ছাড়ার মতো মরেছে।"

লেখা শেষে মৃত ব্যক্তিটি তার কীর্তির দিকে তাকিয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকলো। ফিরে চেয়ে দেখি সমস্ত কবরগুলো খোলা, তার অভ্যন্তর থেকে প্রত্যেকটি মৃতদেহ উঠে এসেছে। তার প্রত্যেকেই আত্মীয় পরিজনের দ্বারা ক্ষোদিত অক্ষরগুলোকে নিজের সমাধি ফলক থেকে উপড়ে ফেলে তার পরিবর্তে গোপন সত্য লিখে রেখেছে। আমি দেখলাম—প্রত্যেকেই তাদের প্রতিবেশীকে উৎপীড়ন করেছে—প্রত্যেকেই বিদ্বেষ-পরায়ণ, অসৎ, চক্রান্তবাজ, মিথ্যাবাদী, দুরাত্মা, দুষ্কৃতকারী, হিংসুক। ওরা চুরি করেছে, ঠকিয়েছে, সব রকমের অন্যায়, ঘৃণ্য কাজ করেছে। এই আদর্শ পিতারা, এই সাধ্বী পত্নীরা, এই সেবাপরায়ণ পুত্রেরা, নিষ্পাপ কন্যারা, এই সব সাধু ব্যবসায়ী, নির্দোষ নামধারী স্ত্রী পুরুষেরা সকলেই নরক। দেখলাম সকলে একসঙ্গে তাদের শাশ্বত গৃহের প্রবেশ দ্বারে সত্য—সেই বীভৎস এবং পবিত্র সত্য, যে সত্য তাদের জীবিতকালে হয় তারা জানতে পারেনি, অথবা জেনেও অজ্ঞতার ভান করেছে সেই পরম সত্য তারা লিখে যাচ্ছে।

মনে হোলো সেও নিশ্চয় তার সমাধি ফলকে কিছু লিখেছে। মনে হতেই নির্ভয়ে সেই অর্ধোন্মুক্ত কফিন, মৃতদেহ, নরকঙ্কালের ওপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললাম তাকে খুঁজে নিতে। তক্ষুনি তাকে দেখলাম, কিন্তু চাদরে ঢাকা থাকাতে মুখ দেখতে পেলাম না। যে

মার্বেল পাথরের গায়ে আগে পড়েছিলাম : "সে ভালোবেসেছে, ভালোবাসা পেয়েছে, মৃত্যু বরণ করেছে।"—কিন্তু এখন সেখানে পড়লাম : "একদিন প্রেমিককে প্রতারণা করবার জন্য বৃষ্টির মধ্যে অভিসারে গিয়ে ঠাণ্ডা লেগে মারা গেছে।"

* * *

পরদিন সকালে লোকজন এসে আমাকে সেই সমাধির ওপর অচৈতন্য অবস্থায় পেয়েছিল।

বৃদ্ধ ও পঙ্গুদের ঐ আশ্রমটি সরকারীভাবে পরিদর্শনের ইচ্ছা আমার আদপেই ছিল না। কিন্তু বাচাল পরিসংখ্যানবিৎ পরিচালককে খুশী করতে সঙ্গে যেতে হোলো, আশ্রম মালিকের নাতিটিও আমাদের সঙ্গে এলো। খুঁটিয়ে দেখছি বলে খুব খুশী। চমৎকার লোক। মস্ত এক বনভূমির মালিক। সেখানে শিকারে যাবার আমন্ত্রণও পেলাম। অবশ্য এই আশ্রমের মালিক তার দিদিমার এই জনহিতকর কাজের গুণগান করার ভান করতে হোলো। পরিচালকের অনর্গল বক্‌বকানির আর কামাই নেই। আমি ঠোঁটের ফাঁকে এক ফালি হাসি নিয়ে তার কাজের তারিফ করছি, আর মাঝে মাঝে উৎসাহ দেবার জন্য দু'একটা মন্তব্য জুড়ে দিচ্ছিঃ 'বাঃ! সত্যি! আশ্চর্য তো! না দেখলে বিশ্বাসই হোতো না।'

কিছু না বুঝেই বলে যাচ্ছিলাম। কেননা বাক্যবাগীশ এই গাইডের কথার তোড়ে আমার ভাবনা চিন্তা বেবাক ঝিমিয়ে পড়ছিল। তবু সেই অসাড়তার মধ্যে একটু চেতনা জেগে ছিল, ভাবছিলাম একাকী যদি ধীরে সুস্থে রয়ে সয়ে সব কিছু দেখতে পেতাম, ভাল লাগতো। তাহলে বোধহয় পরিচালককে জিজ্ঞেস করতাম : 'আচ্ছা, এখানকার প্রায় সব বাসিন্দাই যার নামে নালিশ করছে, সেই বাবেত কী ধরনের চীজ?

প্রায় ডজন খানেক মেয়ে পুরুষ ঐ নামটা উচ্চারণ করল, কখনও বা প্রশংসা করে। বিশেষ করে মেয়েরা তো পরিচালককে দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছে : "মসিয়ো, বাবেত আবার···"

"ঠিক আছে, বুঝেছি, এবার থামুন তো!" সে তাদের থামিয়ে দিল। তার শান্ত স্বর হঠাৎ রুক্ষ হয়ে উঠছিল। আবার মাঝে মাঝে খুব নীচু গলায় কোন বৃদ্ধকে বন্ধুর মতো জিজ্ঞেস করছিল 'আচ্ছা

ভাই, এখানে আপনারা তো বেশ সুখেই আছেন, তাই না?' কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে অনেকে অনেক কথাই বলছিল, যার মধ্যে বাবেত নামটা ঘন ঘন শোনা যাচ্ছিল। তাই শুনতে শুনতে পরিচালকমশাই ভাবাবেগ চেপে রাখতে না পেরে নিজের এক হাত দিয়ে আর একহাত শক্ত করে চেপে ধরে আকাশের দিকে মুখ তুলে ধীরে ধীরে মাথা দুলিয়ে বললো : "আঃ! বাবেত এক অমূল্য নারীরত্ন, খুবই দুর্লভ!" হ্যাঁ, এরপর ঐ জীবটি সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই পরিবেশে কৌতূহল দমন না করে উপায় নেই। সুতরাং এ নিয়ে আর বেশি মাথা না ঘামিয়ে ঠিক করলাম, বাবেত সম্বন্ধে অন্ধকারেই থাকব। কেননা, দেখতে সে কেমন হবে, বেশ আন্দাজ করতে পারছিলাম। মনে মনে তার ছবি আঁকলাম সে যে এই নিষ্প্রাণ প্রাঙ্গণের একটি কোণে পূর্ণ প্রস্ফুটিত একটি ফুল, বিষণ্ণ কবরখানার মতো নিরানন্দ এই স্থানে উজ্জ্বল এক ঝলক সূর্যের আলো।

মনের পটে তার ছবি এত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম যে তাকে জানবার আর আগ্রহ রইল না। তার কথা বলতে গিয়ে লোকের চোখে মুখে খুশী উপচে পড়তে দেখে আমার ভারী ভাল লাগছিল; আর যে বুড়িগুলো ওর নামে কুৎসা গাইছিল তাদের ওপর বেজায় রাগ হচ্ছিল। কিন্তু একটা বিষয় আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকল : বাবেতের নামে যারা আনন্দে আত্মহারা—আশ্রম পরিচালকও তাদের দলে। এই জন্যেই তার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করতে আমার আদৌ ইচ্ছে হোলো না। যদিও আমার এই মনোভাবের পেছনে আর কোন কারণ ছিল না।

কিন্তু এ সমস্ত কিছুই আমার মাথায় এলোপাথাড়ি ঘটে যাচ্ছিল, কোন একটা কিছুতে মনস্থির করা অথবা ভেবে চিন্তে সঠিক কারণ খুঁজে বার করার কষ্ট স্বীকার করতে মন চাইছিল না। তাই সক্রিয় চিন্তার বদলে স্বপ্নে মগ্ন হয়ে গেলাম। এখান থেকে চলে গেলে সম্ভবত এখানকার কথা আমার মনে থাকত না, এমনকি বাবেতের

কথাও হয়ত ভুলে যেতাম যদি না মূর্তিমতী বাবেত সশরীরে হাজির হয়ে আমার স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে দিত। আমি খুব দমে গেলাম। আমার কল্পনার সঙ্গে তার বাস্তব চেহারার আকাশ পাতাল তফাত।

পেছনের চাতাল পেরিয়ে আমরা সবে একটা ঘুটঘুটে অন্ধকার সরু গলিতে গিয়ে পড়েছি, হঠাৎ গলিটার শেষ মাথায় একটা ঘরের দুয়ার খুলে বেরিয়ে এল অপ্রত্যাশিত এক প্রেতচ্ছায়া। আবছা ভাবে দেখলাম ছায়াটি একটি রমণীর অবয়ব। সঙ্গে সঙ্গে পরিচালকের উত্তেজিত গলা শোনা গেল : 'বাবেত, বাবেত!'

পরিচালকমশাই এবার নিজের অজান্তেই যন্ত্রের মতো দ্রুত পা ফেলতে লাগল। প্রায় দৌড়য় আর কি! আমরা তার পিছে পিছে চললাম। যে দরজা দিয়ে ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়েছিল, সেই দরজাটা সে খুলে ফেলল। সিঁড়ি কোঠা, একটা সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। সে আবার চেঁচিয়ে ডাকল। কিন্তু উত্তরে দম আটকানো এক অট্টহাস্য ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। আমি রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে নিচে তাকালাম। সিঁড়ির তলায় একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। সে আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। রমণীর মুখের চামড়া তোবড়ানো, টুপির ফাঁক দিয়ে পাকা চুল উঁকি দিচ্ছে, দেখেই বেশ বোঝা যায় যে বয়স হয়েছে। কিন্তু তার চোখের দিকে তাকালে বয়সের কথা মনে থাকে না। আশ্চর্য সুকুমার দৃষ্টি! আর সত্যি বলতে কি, ও দুটি দেখলে অন্য কিছু নজরেই আসে না। আয়ত গভীর দুটি চোখ। বেগুনীর ওপর হালকা নীলের আভা। ঠিক যেন একটি শিশুর চোখ।

হঠাৎ পরিচালক ধমকে উঠল : "লা ফ্রিজের কাছে আবার গিয়েছিলে?" বৃদ্ধা জবাব দিল না। কিন্তু আগের মতো আবার হাসির দমকে ভেঙে পড়ল। তারপর প্রশ্নকর্তার দিকে এমন এক দৃষ্টি হেনে পালিয়ে গেল, মুখে বলার মতোই যাতে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে : 'ভেবেছো তোমাকে আমি পরোয়া করি?' এই অসম্মান-সূচক কথাগুলো স্পষ্ট অক্ষরে তার চোখে মুখে লেখা ছিল। লক্ষ্য

করলাম, স্পর্ধা দেখানোর সেই ক্ষণকালের অবসরে তার দৃষ্টি আমূল বদলে গেল; শিশুসুলভ চোখদুটি একটি বানরের, একটা হিংস্র অবাধ্য বেবুনের চোখ হয়ে গেল।

পরিচালককে কোন প্রশ্ন করার ইচ্ছা ছিল না। তবু মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল: "ওই বোধহয় বাবেত, তাই না?"

"হ্যাঁ"— সে জানালো। বৃদ্ধার অবজ্ঞা-দৃষ্টি আমার নজরে পড়ছে অনুমান করে সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

"ঐ কি সেই অমূল্য, দুর্লভ নারীরত্ন?"— আমার প্রশ্নে একটু খোঁচা ছিল, যার জন্য এবার সে একেবারে খাড়া হয়ে গেল।

"হ্যাঁ ওই"—বলেই সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল যাতে আরও প্রশ্নবাণ সইতে না হয়। কিন্তু আমার কৌতূহল তখন বাঁধ মানতে চায় না। আশ্রম চালকের ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে আমি সোজাসুজি অনুরোধ করলাম:

"ফ্রিজ কে? আমি একবার তাকে দেখতে চাই।"

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো: "ওঃ! ও কিছু নয়, কিছু নয়। তাকে একটুও ভাল লাগবে না। ওকে দেখে কি হবে? ও মোটেই দেখার মতো নয়।"

এবার ভদ্রলোক একসঙ্গে দুটো করে সিঁড়ি টপকে নিচে নামতে লাগল। এতক্ষণ প্রতিটি তুচ্ছ জিনিস খুঁটিয়ে ব্যাখ্যা করার তার উৎসাহের অন্ত ছিল না, এখন যেন তড়িঘড়ি চুকিয়ে ফেলতে পারলেই বাঁচে। অগত্যা আমাদেরও অল্পেতেই তুষ্ট থাকতে হোলো।

পরদিন ঐ এলাকা ছেড়ে এলাম। বাবেত সম্পর্কে আর কিছু জানা হোলো না।

চার মাস পর শিকারের মরশুমে আবার গেলাম। এই চার মাসের ব্যবধানে তাকে ভুলতে পারিনি। ওই চোখ দুটি একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। স্টেশান থেকে আমার বন্ধুর বাড়ি পুরো তিন ঘন্টার পথ। এই একঘেয়ে যাত্রাপথে এমন একজন সঙ্গী

পেলাম যে সারাক্ষণ বাবেতের কথা বলছিল। শুনে আমার ভাল লাগছিল।

ভদ্রলোক অল্পবয়সী এক ম্যাজিস্ট্রেট। তার সঙ্গে আগে থেকেই আমার পরিচয় ছিল। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, অসাধারণ সংবেদনশীল বিবেক আমাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। চাকরির ক্ষেত্রে কঠোর অথচ জীবন দর্শনে সহনশীল—তার স্বভাবের এই বৈপরীত্যে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।

তবে সেদিন তার মুখে রহস্যময়ী বাবেতের কথা শুনে তাকে যেমন ভাল লেগেছিল, এমনটি আগে আর কখনও লাগেনি।

আশ্রম দেখতে গিয়ে আমার মতো তারও কৌতূহল হওয়ায় হাকিমী ক্ষমতাবলে আগাগোড়া ব্যাপারটা সে খোঁজখবর করে। এই অনুসন্ধানে সে যা জেনেছিল, আমায় খুলে বলল।

বাবেতের বয়স যখন মাত্র দশ, আপন পিতার দ্বারাই তার কৌমার্য বিনষ্ট হয়। তের বছরে তাকে পাঠানো হয় উড়নচণ্ডী বিপথগামীদের শোধনালয়ে। কুড়ি থেকে চল্লিশ বছর তার আশ-পাশের গাঁয়েগঞ্জে ঝি-এর কাজ করে কাটে। ঘন ঘন তাকে ঠাঁই পালটাতে হোতো। কেননা কোন জায়গাতেই তার সঠিক কোন কাজ নির্দিষ্ট ছিল না এবং বেতনও বরাতে জুটত না; কিন্তু প্রায় সব বাড়িতেই সে বাড়ির কর্তার রক্ষিতা হয়ে থাকত। এভাবে সে অনেক পরিবার ধ্বংস করেছে। এক দোকানদার ওর জন্য আত্মঘাতী হোলো, আর এক সম্ভ্রান্ত যুবক হোলো চোর ও গৃহদাহক। শেষপর্যন্ত তাকে গারদে পচে মরতে হয়। বাবেতের দুবার বিয়ে হয়, কিন্তু দু'দুবারই সে বিধবা হয়। তারপর একটানা দশবছর—যতদিনে না পঞ্চাশে পা দেয়, সেই ছিল এই জেলায় একমাত্র বারাঙ্গনা।

"ও বোধহয় রূপসী ছিল?"

"না মোটেই নয়। মনে হয় বেঁটে আর রোগা ছিল। শুনেছি ভরা যৌবনেও ওর বক্ষে বা নিতম্বে ঢেউ ওঠে নি, এমন কি বয়স-কালেও যে ও সুন্দরী ছিল, এমন কথা কারও মনে পড়ে না।"

"তাহলে এমন হওয়ার কারণ কি, বলুন তো ?"

"কারণ ?" হাকিম সাহেব আবেগে উথলে উঠল :

"কেন ; চোখদুটি ? আপনি কি ও দুটি দেখেন নি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।" বললাম। "সত্যি ও দুটি অনেক কিছুই বলে। যেন দুটি নিষ্পাপ শিশু নয়ন।"

উৎসাহের আতিশয্যে ম্যাজিস্ট্রেট আবার গলা চড়িয়ে বলে গেল : "ওঃ ! ক্লিওপেত্রা, পয়তাবের ডায়ানা, নিনোঁ দ্য এলয়েনক্লোস—যত সব প্রেমের রানী, যারা বুড়ো বয়সেও পূজো পেয়েছেন, তাদেরও নিশ্চয় ওর মতো দুটো চোখ ছিল। যে নারীর অমন চোখ, সে কখনও বুড়ো হতে পারে না। বরং এক'শ বছর বাঁচলেও ঠিক আগের মতো বা এখনকার মতো সব সময়ই আদর পাবে।

"এখনকার মতো ! বাঃ ! বলুন না, কে ওর প্রেমিক ?"

"হা ঈশ্বর ! ঐ আশ্রমের সব বুড়োগুলো। যাদের দেহে এখনও ধরা ছোঁওয়ার মতো একরত্তি মাংস লেগে আছে, যাদের মনের কোণে আজও একটু উত্তাপ রয়েছে অথবা যাদের কামনার শেষ স্ফুলিঙ্গ এখনও নিভে যায়নি, তাদের সকলের কাছে ওর কদর।"

"আপনি কি তাই ভাবেন ?"

"আমি নিঃসন্দেহ। ওকে সবার চেয়ে বেশি ভালবাসে আশ্রম পরিচালক।"

"অসম্ভব।"

"আমি বাজি রাখতে পারি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, হবেও বা, অসম্ভব নয় ; খুব সম্ভব তাই। হ্যাঁ এখন আমার বেশ মনে পড়েছে।"

সুপারের দিকে তার সেই অবজ্ঞাসূচক হিংস্র অথচ অন্তরঙ্গ চাহনি আমার চোখে ভেসে উঠল।

"লা ফ্রিজ কে ?" ম্যাজিস্ট্রেটকে দুম্ করে জিজ্ঞেস করে বসলাম : "বোধহয় তাকেও চেনেন ?"

"সে এক অবসরপ্রাপ্ত মাংস বিক্রেতা। ১৮৭০ সালের যুদ্ধে তার

ছুটো পাই শীতে জমে অবশ হয়ে যায়। বারেত ওকে খুব পছন্দ করে। সন্দেহ নেই লোকটার খোঁড়া পা-দুটো কাঠের। তবু এই তিপ্পান্ন বছর বয়সেও তাগড়া জোয়ান। হারকিউলিসের মতো কোমর আর স্যাতারের* মতো মুখের গড়ন। সুপার ওকে হিংসে করে।'

ব্যাপারটা আগাগোড়া আর একবার ভেবে দেখলাম। খুবই সম্ভব বলে মনে হোলো।

"ও কি লা ফ্রীজকে ভালবাসে?"

"হ্যাঁ সে-ই ওর মনের মানুষ।"

আমরা আশ্রম মালিকের বাড়ি পৌঁছেই প্রত্যেককে ভয়ঙ্কর উত্তেজিত দেখে অবাক হলাম। শুনলাম, আশ্রমে নাকি একজন খুন হয়েছে। দারোগা পুলিশ এসেছে। আশ্রম মালিকও সেখানেই রয়েছে। আমরাও তক্ষুণি সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। লা ফ্রিজ সুপারকে খুন করেছে। সবাই যা বর্ণনা দিল, শুনে গা শিউরে ওঠে। প্রাক্তন কশাই একটা দরজার আড়ালে লুকিয়ে থেকে সুযোগ বুঝে সুপারকে জাপটে ধরে। ধ্বস্তাধ্বস্তি করে তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর তার টুঁটি কামড়ে দাঁত বসিয়ে রক্তবহা নালী ছিঁড়ে ফেলে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে এসে খুনেটার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

লা ফ্রিজকে দেখলাম। আনাড়ি হাতে ধোয়ার ফলে ওর ধ্যাবড়া মুখে এখনও রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। ওর কপাল বসা, চোয়াল দুটো চৌকো, ছুঁচলো কান দুটো মাথা থেকে ঝুলে আছে, মস্ত দুটো নাকের ফুটো। ঠিক যেন কোন বন্য জন্তুর ধ্যাবড়া মুখ। কিন্তু আমি তখন বারেতকে চেয়ে দেখছিলাম।

সে হাসছিল। সেই মুহূর্তে তার চাহনিতে ক্রুদ্ধ বানরের হিংস্রতা দেখিনি, দৃষ্টি আবেদনে কোমল, শিশুর মতো সুমিষ্ট সরল।

গলা নামিয়ে আশ্রম মালিক আমায় বললো: "দেখুন, বুড়ো হয়ে

---

* গ্রীক পুরাণের অরণ্য দেবতা। দেহের কিছু অংশ মানুষের, কিছুটা পশুর মতো।

বেচারীকে ভীমরতিতে ধরেছে। তাই অমন করে তাকাতে পারছে। নইলে এই বীভৎস দৃশ্য দেখার পর কেউ এমন করে তাকাতে পারে?"

"আপনি কি তাই ভেবেছেন?" বললে ম্যাজিস্ট্রেট। "ভেবে দেখুন ওর বয়স এখনও ষাট হয়নি, বুড়ো বয়সের ভীমরতি বলে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে না, বরং যে কাণ্ডটা ঘটে গেছে, সে বিষয়ে সে পুরোপুরি সচেতন বলেই মনে হয়।"

"তাহলে ও অমন খুশী কেন?"

"কারণ ব্যাপারটা ওর মনোমত হয়েছে।"

"ওঃ! না না, এটা বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে!" হাকিম তৎক্ষণাৎ বাবেতের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা তার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলো:

"এখানে যা ঘটেছে, আর কি কারণে ঘটেছে, আশাকরি তুমি সবই জান?"

তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। শিশুসুলভ চোখ দুটো আবার সেই বানরের চোখের মত কদাকার হয়ে উঠল। কোন জবাব না দিয়ে সে তার পরনের সায়া তুলে ধরল। হ্যাঁ, ম্যাজিস্ট্রেট যথার্থ বলেছে। এই বৃদ্ধা রমণী একজন ক্লিওপেত্রা, আয়ানা, নিনোঁ দ্য এনক্লোস। আর তার দেহের এই আবৃত অংশটুকু চোখ দুটির চেয়েও অনেক বেশি সুকুমার। ওই দৃশ্যে আমরা থ হয়ে গেলাম।

লা ফ্রিজ আমাদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললো: "শূয়োরের বাচ্চা! তোরাও ওর সঙ্গে যা তা করতে চাস?" লক্ষ্য করলাম, হাকিম মশায়ের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে কুঁকড়ে গেল, হাত ঠোঁট কাঁপতে লাগল; দোষ করে ধরা পড়লে লোকের যেমন হাল হয়, তারও তেমনি দশা।

# জোয়েত

কাফে রিচি থেকে বেরিয়ে এসে জাঁ দ্য সারভিনি লিঅঁ সেভেলকে বললো, "এখন একা ভাল লাগবে না। যদি আপত্তি না থাকে, চল হেঁটেই যাই।"

বন্ধু বললো, "বেশ তো, আমার বরং ভালই লাগছে।"

"এখন সবে এগারোটা", জাঁ বলে চললো, "রাত ত্বপুরের অনেক আগেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাব। স্বতরাং আস্তে আস্তেই যাওয়া যাক।"

তরুবীথিতে অশান্ত জনতার কলগুঞ্জন। তৃপ্ত হাস্যোজ্জ্বল জনতা কথায় ও চলনে ছলছল, খলখল, চঞ্চল। মদালসা নদীর মতোই কলস্বনা। এ দৃশ্য গ্রাষ্মের প্রতিটি রাতের। ব্যস্ত পথচারীর চলার পথে বিঘ্ন ঘটিয়ে এখানে ওখানে ছোট ছোট দল পানীয় নিয়ে বসেছে গোল হয়ে। মাঝখানে ছোট গোল টেবিল—বোতল ও পানপাত্রে ঠাসাঠাসি। পথের ধারের কাফে থেকে উজ্জ্বল আলোর রশ্মি কখনো কখনো ঠিকরে পড়ছে তাদের ওপর। দ্রুত ধাবমান একাগাড়িগুলোর লাল, নীল, সবুজ চোখ থেকে ঝলকে ঝলকে আলো ছড়িয়ে পড়ছে পথের গায়ে। সেই আলোয় জোর কদমে ছুটন্ত ঘোড়ার ছায়ামূর্তি, আসনে বসা চালকের মুখের একাংশ আর কালো চৌকো গাড়িটা চকিতে দেখা দিয়েই অদৃশ্য হচ্ছিল।

ত্বই বন্ধু চলেছে ধীরে ধীরে। তাদের পরনে সান্ধ্য পোশাক, হাতে ওভারকোট, বোতাম ঘরে ফুল, টুপিটা একদিকে হেলে পড়েছে। ভোজন শেষে পরিতৃপ্ত, ধূমপানে রত বন্ধুযুগল মোলায়েম বাতাসের সুখ-স্বাদ নিয়ে জনতার ভিড় কাটিয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে যাচ্ছে।

স্কুল জীবনের ত্বই অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত। জাঁ দ্য সারভিনি চেহারায় ছোট, ছিপ্ছিপে, মাথায় একটু টাক, তুর্বল কিন্তু

ভারী সুশ্রী। তার গোঁফে ঢেউয়ের দোল, পাতলা ঠোঁট, সতেজ দৃষ্টি। নিকুঞ্জে লালিত নিশাচর বিহঙ্গের মতই স্বচ্ছন্দবিহারী। ক্ষীণদেহী প্যারিসিয়ান, কিন্তু নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা, অসিচালনা, অতিরিক্ত শীতে ঘোরাফেরা আর তুর্কী রীতিতে স্নান করার ফলে সে ছিল স্নায়বিক শক্তিতে ভরপুর; বিমর্ষ হয়েও ক্লান্তিহীন, নিত্যকার পাণ্ডুরতা সত্ত্বেও বলবান, স্বভাবে সহানুভূতিশীল অথচ বেপরোয়া। সদা প্রফুল্লতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অর্থকৌলিন্য আর দরদী অন্তঃকরণের জন্যে বন্ধুমহলে তার নামডাক ছিল, বাইরের মহলেও জনপ্রিয়তা আর মর্যাদার আসন তার জন্যে ছিল সুরক্ষিত।

অন্যদিকেও প্রকৃত শহুরে বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে যথেষ্ট দেখা যেত: তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, অস্থির, দুর্দম সাহসী অথচ খেয়ালী— সব কিছুই করতে পারে, অথবা কিছুই পারে না; নীতিপরায়ণ অথচ বিশ্বপ্রেমিক। তার ব্যয় কখনও আয়ের সীমা লঙ্ঘন করে না, শরীর সুস্থ রেখে যত খুশি মজা লুটতে রাজী; কখনও শান্ত, কখনও অশান্ত। [illegible] [illegible] সে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। [illegible] কিছু সে আলোচনা করতে চেষ্টা করে না।

আর বন্ধু লিঅ সেভেলও বলে, 'অত্যুজ্জ্বল সাম্যের অলংকার' পথে ঘাটে মেয়েরা তার দিকে এক নজর না তাকিয়ে পারে না। প্রাচীনকালের [illegible] কোন মডেলের আদল তার চেহারায়, যেন [illegible] আদিবাসীর খোদাইকরা মূর্তির জীবন্ত প্রতিরূপ। সুন্দর, দীর্ঘ, উদার ও বলবান। প্রতিটি বিষয়ে বাড়াবাড়িটুকুই তার চরিত্রবৈশিষ্ট্য। অপরের জন্য বিলীন করার গৌরবের সে অধিকারী।

[illegible] পৌঁছে সেভেল প্রশ্ন করলো, "মেয়েটি জানে তো যে তুমি যাচ্ছ?"

সারভিনি হেসে বললো, "মারসিঅনেস ওবারদি নিজেই জানবে। গাড়ীর এক কোণে যে তুমি বসবে, তা কি আগে থেকেই ড্রাইভারকে জানিয়ে দাও?"

সেভেল বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে বললো, 'আচ্ছা, মেয়েটি তবে সত্যিকারের কে?'

"একজন ভুঁইফোঁড়", বন্ধুর জবাব, "মস্ত ঠগ, জোচ্চোর এবং শয়তানী। কোথা থেকে এবং কি করে ঈশ্বর জানেন, এই ভুঁই-চাঁপাটি হঠাৎ একদিন পৃথিবীতে গজিয়ে উঠে অস্বাভাবিক দক্ষতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। অবশ্য তাতে কি এসে যায়। আসল ব্যাপারটি বাদ দিলে আর সব বিষয়েই সে পুরোপুরি কুমারী। লোকে বলে তার কুমারী জীবনের নাম ছিল একজেভি বারদিন। নামের আদ্যক্ষর রেখে আর পদবীর শেষ অক্ষর বাদ দিয়ে এখন নাম দাঁড়িয়েছে ওবারদি। কামনা করবার মতোই মেয়ে। আর এই সুন্দর স্বাস্থ্য নিয়ে তুমিও নিশ্চয় ওর প্রিয়পাত্র হবে। হারকিউলিসের সঙ্গে মোনালিসার যোগাযোগ কোন উদ্দেশ্য ছাড়া ঘটে না। কাজের কথা বলছি, কোন দোকানের মতো সেখানে খুব সহজেই যায়, আর গেলেই তোমাকে সওদা করতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাস ও ভালবাসা হচ্ছে ব্যবসার মূলধন, কিন্তু কোনটাই তোমাকে কেউ কিনতে বলবে না। আসা যাওয়া চারদিকেই দোর খোলা।

"বছর তিনেক আগে সবুজ চাদরের দেশ কোয়াবিলিয়ার ত্য ইতোইলে সে বাসা নিয়েছে। তার গোটা মহাদেশের যত অপদার্থ অপোগণ্ড, বিচিত্রধরনের ভয়ঙ্কর ও কুৎসিত কার্নিভালের নমুনা দেখাতে প্যারিসে আসে—সেখানে তাদের সবরকম অবারিত দ্বার।

'তার বাসায় আমি যে কি করে গিয়ে পড়েছিলাম, জানি না। বোধহয় সেখানে জুয়ার আড্ডা জমে বলে, বোধহয় পুরুষ স্বভাবতই বদ আর মেয়েরা সুগম বলে। এই জমকালো দস্যুদের আমার ভাল লাগে। এরা সবাই বিদেশী, সম্ভ্রান্ত, নামজাদা, কেবল ছদ্মবেশী কয়েকজন গুপ্তচর ছাড়া। সামান্য উসকানিতেই তারা তাদের পদমর্যাদা সম্বন্ধে তুবড়ীর মতো ঝলসে ওঠে, উসকানি ছাড়াই বংশ কৌলিন্যে মুখর, যে কোন উৎসাহে গৌরব গাথা সম্বন্ধে বাঙ্ময়। ওরা সব

হামবড়া, মিথ্যুক, চোর, ইশকাপনের টেক্কার মতো ধূর্ত, ওরা দুঃসাহসী। সাহসী না হয়ে উপায় নেই, কেননা জোচ্চুরি করে রোজগার করতে হলে জীবন বিপন্ন করার দুঃসাহস ছাড়া গত্যন্তর নেই। এক কথায় গ্যালির* মতো অভিজাত।

"আমি ওদের সমীহ করি। ওদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা, ওদের পরিচয় নেওয়া বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। ওদের গালগল্প শোনাও বেশ মজার। ওদের কথাবার্তা বেশ বুদ্ধিদীপ্ত, ফরাসীদের উর্ধ্বতন মহলের মতো কাটাছাঁটা, সমাজের তলানীর মতো নয়। ওদের অর্ধাঙ্গিনীরাও প্রায়ই রূপসী। কিছু বিজাতীয় অসংযমের ছাপ, রহস্যময় অতীতের চিহ্ন, জীবনের অর্ধেকটাই হয়তো কেটেছে কোন সংশোধনী বিদ্যালয়ে—তাদের চোখ অনিন্দ্য, চুল আশ্চর্য মনোরম, মনে ধরার মতো নিটোল দেহ, সৌন্দর্যে মাথা ঘুরে যায়, মন-মাতানো, নেশা-ধরানো সৌন্দর্যে বুকে তুফান ওঠে। শ্রীমতীদেরও আমি সমীহ করি।

"মারসিঅনেস ওবারদিও এই মোহিনী যাদুকরীদের একজন। একটু ভাঁটার টান ধরেছে, কিন্তু গোল্লায় দেবার পক্ষে যথেষ্ট—মজ্জায় মজ্জায় দুষ্টামি। তার ঘরে মজা লুটবার অঢেল উপকরণ। জুয়া, নাচ-গান, সান্ধ্যভোজ—চিত্তবিভ্রমের যত পার্থিব উপাদান, যাকে বলে মনোহর জাহান্নাম।"

"তুমি কি ওর প্রেমে পড়েছ?" সেভেল জিজ্ঞেস করলো।

সারভিনি জবাব দিলো, "না পড়িনি, পড়বোও না। তার মেয়েটির জন্যই আমি ওখানে যাই।"

"ও, তাহলে তার একটি মেয়ে আছে?"

"হ্যাঁ, তাই। অপরূপ। এখন সে-ই মধ্যমণি। দীর্ঘাঙ্গী, অপূর্ব রূপ, কিশোরী—সবেমাত্র আঠার। তার মায়ের রং একটু শ্যামলা, তার গায়ের রং কিন্তু নিখাদ গৌর। হাস্যময়ী, রসিকা, প্রাণবন্ত,

* লম্বা ও নিচু পাটাতন বিশিষ্ট জাহাজ, পাল ও দাঁড়ের সাহায্যে চলে। ক্রীতদাসদের দ্বারা এই জাহাজ চালানো হোতো।

নাচের নেশায় মশগুল। কে তাকে পাবে, কেই বা তাকে পেয়েছে, কেউ জানে না। আমার মতো জনাদশেক আশায় আশায় ঘুরছে।

"ওবারদির কাছে এখন মেয়ে সম্পত্তি। এই সম্পত্তি দখল করা সহজ নয়, আর ওই ঘুঘু কারও কাছে হাত উপুড় করবে না। বোধহয় আমার চেয়েও ভাল কোন দাঁও মারার তালে আছে! তবে বলে রাখছি, ভাগ্যক্রমে সুযোগ যদি মেলে, ছাড়বো না।

"মেয়েটির নাম জোয়েত। ওকে দেখলে আমি দিশেহারা। ও এক রহস্য। অনেক বিপথগামিনী ছলনাময়ীর চেহারা আমি দেখেছি। কিন্তু ওকে তা মনে হয় না। ও যদি সে রকম না হয় তবে ও নিষ্পাপ, অনাঘ্রাতা, অতুলনীয়। ওই পঙ্কিল পরিবেশে সহজ পবিত্র আলোক শিখার মতো সগর্বে ঘুরে বেড়ায়, হয় চরম খল, নতুবা নিতান্ত অকপট।

"জোয়েত অনন্যা, যেন কোন দুঃসাহসিকা নাবিকার সঙ্কট মুহূর্তে জন্ম লাভ করে উর্বর জমির ওপর জঙ্গলে সতেজ চারা গাছটির মতো স্বাধীন ভাবে বেড়ে উঠেছে। অথবা কোন রাজকর্মচারী, সুমহান শিল্পী, কোন মহান পুরুষ, কোন রাজপুত্র অথবা রাজা ওর মাতার শয্যাসঙ্গী হয়েছিল— ও তারই সার্থক ফসল। ও কেমন, আর কি যে ভাবে— কেউ জানে না। তবে তুমিও তাকে দেখতে পাবে।"

উচ্চহাস্যে মেভেল মন্তব্য করলো, "তুমি দেখছি ওর প্রেমে তলিয়ে গেছ!"

"না, যাইনি। ও আমার মধ্যে আলোড়ন জাগায়, আমাকে প্রলুব্ধ করে, অস্থির করে। ওর আকর্ষণ যেমন দুর্বার, ওর প্রতি আমার শঙ্কাও তেমনি প্রবল। জানি ওকে ধরা দেওয়া, একটা ফাঁদে পা দেবার সামিল, তবু তৃষ্ণার্ত লোকের কাছে এক গ্লাস শীতল পানীয়ের মতোই ও আমার পরম কাম্য। ওর মোহে আকৃষ্ট হয়ে দুরু দুরু বক্ষে এগিয়ে যাই, যেন সন্দিগ্ধ মনে অসম্ভব ধূর্ত কোন চোরের সঙ্গে এক ঘরে বাস করতে যাচ্ছি। ওর সামনে গেলে মন গলে যায়, আবার বিরক্তিও কম হয় না। একবার মনে হয় ওর সরলতায় খাদ

নেই, পরক্ষণেই সন্দেহে উদ্‌বেল হয়ে উঠি। মনে হয় প্রকৃতির বিধানের বাইরে অস্বাভাবিক কোন চরিত্রের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছি, উপাদেয় কি বিস্বাদ জানি না।”

সেভেল তৃতীয়বার ঘোষণা করলো, “আমি বলছি, তুমি মজে গেছ। ওর কথা বলতে গিয়ে তুমি ভাবুক হয়ে উঠছ, আর মুখ থেকে অনর্গল ত্রুবাদুরের* কবিতা নিঃসৃত হচ্ছে। এবার একটু চোখ বুজে মনের মধ্যে ডুব দিয়ে দেখ দেখি, তোমাকে স্বীকার করতেই হবে।”

“বেশ, হয়তো হবে। ওর আসন আমার মনে পাকা হয়ে গেছে সত্যিই বোধ হয় ভালবেসে ফেলেছি। খুব বেশিই ওকে ভাবি। স্বপনে, জাগরণে, যখন তখন। চারদিক থেকে ওর ছায়া আমাকে ঘিরে রেখেছে। সামনে, পেছনে, চতুর্দিকে—এমন কি আমার অন্তরের মধ্যে! এই যে শারীরিক প্রবসাদ—এর নামই কি ভালবাসা? ওর মুখ আমার মনে এমন গাঁথা হয়ে গেছে যে চোখ বুজলেই দেখতে পাই। অস্বীকার করবো না, ওর কাছে গেলে আমার বুকে কাঁপন লাগে। তবু আমার প্রেম প্রাচীনপন্থী। ওকে নাকি প্রত্যাশায় ধরে রাখতে চাই, তবু ওকে বিয়ে করা বোকামি বলেই মনে হয়। ছোট্ট পাখি যেমন বাজপাখীকে ভয় করে, আমিও ওকে তেমনি ভয় করি, আবার ঈর্ষাও করি। ওই দুর্বোধ হৃদয়গহ্বরে গোপনে সঞ্চিত ভাবনারাশির জন্য আমার ঈর্ষা। ভাবি ও কি চঞ্চল, ছোট্ট কাদাখোঁচা পাখীটি অথবা হৃদয়হীনা। কখনও এমন কথা বলে যাতে যোদ্ধা সৈনিকও লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠবে, কিন্তু টিয়াও কথা বলতে পারে। কখনও ওর অশোভন বেয়াদপি দেখে পবিত্রতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হই, আবার কখনও অবিশ্বাস্য সরলতা সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। বারাঙ্গনার মতো উত্যক্ত, উত্তেজিত, করে দিয়ে নিজের কুমারীত্ব বাঁচিয়ে চলবে। এক এক সময় মনে হয় আমাকে ভালবাসে; আবার বিদ্রূপ করতেও ছাড়ে না। সভার মাঝে আমার সঙ্গে এমন

* ত্রুবাদুর—একাদশ শতাব্দীর দক্ষিণ ফ্রান্সের চারণ কবি।

ব্যবহার করে যেন আমার বিবাহিতা স্ত্রী ; আর যখন নিরালায় কেবল আমরা দুজন—তখন ভাবখানা যেন আমি ওর হুকুমের চাকর অথবা ছোট ভাই।

"এক এক সময় মনে হয়, ওর মায়ের মতো ওর প্রেমিকের সংখ্যাও হয়তো অগুনতি। আবার ভাবি জীবন সম্বন্ধে ওর কোন ধারণাই নেই।

"গল্পের বইয়ে অসম্ভব ঝোঁক। ভবিষ্যতের [illegible] জন্য প্রতীক্ষা করে আছি বটে, তবে আপাতত আমি ওর পুস্তক-সংগ্রাহক। ও আমার নাম দিয়েছে 'লাইব্রেরীয়ান'।

"প্রতি সপ্তাহে যত নতুন বই বাজারে বেরোয় সেগুলো সংগ্রহ করে দেওয়াই আমার কাজ। ও নিশ্চয় তার সবগুলোই পড়ে। তারই ফলে মাথায় নানা জটিলতার জট পাকিয়ে গেছে, নানা উদ্ভট ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। পড়ে [illegible] উপন্যাসের মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখতে গেলে বিচিত্র অদ্ভুত [illegible] হওয়াই স্বাভাবিক।

"অপেক্ষা করে আছি [illegible]। এমন সময় [illegible] কোনদিন প্রাণের টান [illegible]!

"ওকে বিয়ে করব না এটা [illegible] স্থির করেছে আমি একটি [illegible] মাত্র। সবাই যদি কেটে পড়বার তালে থাকে, সবার আগে গা-ঢাকা দেব আমি। আমার সাথে [illegible] বিয়ের আশা নেই। মারসিআনেস [illegible] থেকে [illegible] বাপদিনের মেয়ের পাণিগ্রহণ করবে কে? কেউ না। না করার কারণও অনেক আছে।

"পাত্রটি জুটবে কোথা থেকে শুনি? [illegible]? কক্ষনো নয়। মাতৃদেবীর আস্তানাটি তো [illegible] বিলাসকেন্দ্র আর কন্যারত্নটি খদ্দের ভোলানোর হাতিয়ার। ওকে ঘরে কেউ বিয়ে করবে ভেবেছ? মধ্যবিত্ত পরিবারে? দুরাশা। তা ছাড়া মারসিআনেসের মস্তিষ্ক উর্বর। গণ্যমান্য ব্যক্তি ছাড়া সে জোয়েতকে হাতছাড়া করবে না। আর তেমন পাত্রের আশা মরীচিকা।

"একেবারে নীচু তলায় গেলে? সে গুড়েও বালি। বংশগত বা

জন্মগত পরিচয় নেই। তাছাড়া পরিবেশ, উত্তরাধিকার এবং আচার ব্যবহার সব মিলিয়ে সে গিল্টিকরা ঝলমলে বারবণিতাদেরই একজন।

'এখন একমাত্র সন্ন্যাসিনী হলে মুক্তি সম্ভব। কিন্তু ওর স্বভাবে সন্ন্যাসিনীর কোন লক্ষণ নেই। তাই সামনে একটি পথই খোলা আছে—প্রেম। এখনও সে পথে পা না বাড়িয়ে থাকলে একদিন বাড়াতেই হবে। 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'! তন্বী তরুণী থেকে একদিন ভরা যুবতী হবে; সেই পরিবর্তন যে আনবে, আমি সেই ব্যক্তিটি হতে চাই।

"অপেক্ষায় আছি। আরও কয়েকজন আছে। একজন ফরাসী, মসিয়ো ত্থ বেলভিনো। একজন রাশিয়ান, যে নিজেকে প্রিন্স ক্রাভালো বলে জাহির করছে, আর কাভেলিআর ভলরেলি নামে এক ইতালিয়ান। প্রেমের দৌড়ে এরা প্রত্যেকেই অংশ নিয়েছে, আর রীতিমত জেতার চেষ্টাও চলছে। এরা ছাড়া আর কয়েকজন আনাড়ি খেলোয়াড়ও রয়েছে।

"এদিকে মারসিঅনেস সদা সতর্ক। মনে হয় আমার ওপর কিছুটা প্রসন্ন। কেননা আমি যে ধনী তা জানে, অন্যদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা নেই।

"ওদের বাড়ির মতো এত সুন্দর স্থান আমি আর দেখিনি। আমরা বিনা নিমন্ত্রণে যাচ্ছি, কিন্তু দেখবে, একা থাকতে হবে না। অনেক সম্ভ্রান্ত লোককে ওখানে পাবে। ওটা যেন রূপের হাট। পসারিনী মাসসিঅনেস যত সব সুন্দরীদেরই সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে উচ্চমূল্যের আশায়। কোথায় যে এদের পেলো ঈশ্বর জানেন। মারসিঅনেস নিজেও এমন অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষের সংস্পর্শে এসেছে, যারা সন্তানের জনক, তাদের নন্দিনীরা চোখে পড়ার মতো। ফলে অনভিজ্ঞ লোকের মনে হবে স্থানটি একটি নিষ্পাপ কুসুম বাগিচা।"

সাঁজেলিজের মোড় এসে পড়লো। পল্লবের বুকে কাঁপন জাগিয়ে মৃদুমন্দ বাতাস দুই বন্ধুর মুখের ওপর আলতো পরশ বুলিয়ে গেল—যেন আকাশ জুড়ে প্রকাণ্ড পাখা কেউ ঝুলিয়ে দিয়েছে—এ তারই

বাতাস! তরুতলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, নিশ্চল নির্বাক ছায়া, বেঞ্চের ওপর দু'একজন মসিবিন্দুর মতো বিরাজমান। এইসব সচল ছায়া অতি মৃদু স্বরে আলাপরত—যেন কোন গুরুত্বপূর্ণ অথবা লজ্জাকর বিষয়ে গোপনতা রক্ষার প্রচেষ্টা।

সারভিনি বলে চললো, "হাঁ, জেনে রেখো, ওখানে তোমাকে আমি কাউন্ট সেভেল বলে পরিচয় দেব কিন্তু। নতুবা শুধু সেভেলকে কেউ পাত্তা দেবে না।"

"না না, কক্ষনো নয়", বন্ধুটি চেঁচিয়ে উঠলো, "চুলোয় যাক্ ও সব। এই সব লোকের জন্যে অমন একটা যাত্রারদলের রাজার উপাধি আমি দিনেকের জন্যও নেব না। আমার দিব্যি; দোহাই বন্ধু, ওসবে যেয়ো না।"

সারভিনি হেসে ফেললো। "আস্ত বোকারাম! আমার লেজুড় ডিউক দ্য সারভিনি জুড়ে দিয়েছি কেন? কি করে যে হয়ে গেল জানি না কিন্তু বরাবর আমি ডিউক দ্য সারভিনি রয়ে গেছি, কোন দিন ধরা পড়িনি, বেকায়দায়ও পড়িনি। ওটি না থাকলে কেউ ফিরেও তাকাত না।"

সেভেলকে সহজে ভোলান গেল না। "তুমি বড়লোক মানুষ, তোমার পোষায়। আমার কথা হোলো, ভালমন্দ যাই হোক, আমি নিজের পরিচয়েই এখানে থাকব। সেই হবে আমার বিশেষ আভিজাত্য।"

সারভিনিও নাছোড়বান্দা। "সম্ভব নয়, তা কিছুতেই সম্ভব নয়। ওসব রাজা মহারাজার দরবারে তোমাকে বাউণ্ডুলে মনে হবে। এ ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমাকে উত্তর মিসিসিপির লাট বাহাদুর বলে ঘোষণা দেব, কারও সন্দেহ হবে না। শুধু লেজুড়ের ওপর যখন খাতির, প্রতিষ্ঠা নির্ভর করছে, তখন নিঃসঙ্কোচে তাই করতে হবে।"

"না ভাই, আবার বলছি, ওসবে আমার কাজ নেই।"

'ঠিক আছে, তোমাকে বোঝাতে যাওয়াই আমার বোকামি

হয়েছে। জান তো এমন অনেক দোকান আছে, মহিলারা প্রবেশ করলেই যেখানে ভায়োলেট গুচ্ছ উপহার দেয়? এখানে ঢোকার মুখেই কেউ যদি তোমাকে কোন বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করে, তার দায় আমার নেই।"

তারা ডান দিক ঘুরে রু দ্য বেরির দিকে এগিয়ে এসে একটি সুন্দর অট্টালিকার দ্বিতলে উঠে এলো। উর্দিপরা, তকমা আঁটা চারজন ভৃত্য এগিয়ে এসে তাদের কোট আর ছড়ি নিয়ে নিল।

ফুল আর রমণীদেহের সুবাসে বাতাস রীতিমত ভারী। চারদিকে আনন্দমুখর উৎসবের পরিবেশ। আশে পাশে অস্পষ্ট অবিরাম মেয়েপুরুষের মিলিত কলকণ্ঠ। আসর জমজমাট।

শান্তদর্শন, স্ফীতোদর, দাড়িগোঁফের মধ্যে সমাহিত এক ব্যক্তি চটপট আগন্তুকদের দিকে এগিয়ে এলো। একটুখানি ঝুঁকে অভিবাদন করে প্রশ্ন করলো, "নামটি জানতে পারি কি?"

সারভিনি জবাব দিলো, "মঁসিয়ো সেভেল।"

শোনামাত্রই সটান দরজা খুলে দিয়ে অভ্যাগতদের উদ্দেশ্যে লোকটি উচ্চস্বরে ঘোষণা করলো—"মঁসিয়ো ল ডিউক দ্য সারভিনি : মঁসিয়ো ল ব্যারন সেভেল।"

প্রথম ঘরটিতে প্রমীলাকুলের সমাবেশ। উন্মুক্তবক্ষের প্রদর্শনীতে নয়নের পরিতৃপ্তি—শ্বেত জালি বস্ত্রের আবেষ্টনীতে যেন অনন্ত সমুদ্র তরঙ্গায়িত।

গৃহকর্ত্রী তিনজন বন্ধুর সঙ্গে কথায় ব্যস্ত। কথা রেখে গর্বিত পদবিক্ষেপে এগিয়ে এলো। সুদর্শনা, মুখে প্রসন্ন হাসি।

হালকা পশমের মতো রাশি রাশি কুন্তল শুধু ছোট্ট সরু ললাটই নয়, কর্ণমূল পর্যন্ত ছেয়ে আছে। সুদীর্ঘ লাবণ্যময় অবয়ব, স্বাস্থ্যবতী। দেহের ভাঁজে সামান্য শিথিলতা এলেও প্রকৃত সুন্দরী—কমনীয় অথচ মাদকতায় ভরা। কেশরাশির প্রাচুর্যের নিচে আয়ত ভ্রমর কৃষ্ণ চক্ষু দু'টির স্বপ্নমায়া তাকে পরম মোহময়ী করে তুলেছে। তার বাঁশির মতো নাক। আর মধুর বচনী পুরুষ হৃদয় জয় করবার উপযুক্ত।

॥ সূচী ॥

তার কথায় জাদু আছে। মধু মাখানো কণ্ঠস্বর ঝরনা ধারার মতো সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে, অবিরল ধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে শ্রবণে জগতের পরমানন্দ বর্ষণ করে। তার মুখনিঃসৃত বাক্যরাশি নদীর কুলু কুলু ধ্বনির মতোই শ্রুতিমধুর, আর দৃষ্টিনন্দন তার রঞ্জিত অধরোষ্ঠের নিয়ত পরিবর্তমান কারুকার্য।

তার প্রসারিত করপদ্মের ওপর সারভিনি চুম্বন করলো। বহুমূল্য সোনার চেনে ঝোলানো হাত পাখাটা দুলিয়ে সেভেলের দিকে হাত বাড়িয়ে মহিলা মুখর হোলো। "স্বাগত ব্যারন। ডিউকের বন্ধুদের জন্য আমার কুটিরের দ্বার সর্বদাই অবারিত।" নবাগত এই বিশালকায় লোকটির প্রতি তার আঁখি স্থির। তার ওষ্ঠের ওপর অতি সূক্ষ্ম একপোঁচ কালো রেখা একটি সরু গোঁফের ছায়া, কথা বলার সময় পরিষ্কার চোখে পড়ে। কোন আমেরিকান অথবা ভারতীয় প্রসাধনী ব্যবহারে তার দেহ থেকে অতি সুমিষ্ট অথচ মন মাতানো উগ্র গন্ধ ছড়াচ্ছে।

কিন্তু অন্যান্য নামকরা অভ্যাগতের আগমন শুরু হয়েছে। মহিলা এবার মায়ের গাম্ভীর্য নিয়ে সারভিনির দিকে ফিরে বললো, "পাশের ঘরে আমার মেয়ে রয়েছে, আপনারা চাইলে ওখানে গিয়ে গল্পগুজব করুন। এ আপনাদের নিজেরই বাড়ি মশিয়ো।"

নতুন অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য সে এগিয়ে গেলো। যাবার সময় সেভেলের দিকে এক টুকরো চোরা হাসি ছুঁড়ে দিয়ে তার নারীমনের প্রসন্নতা উন্মোচিত করে দিয়ে গেল।

সারভিনি বন্ধুর হাত ধরে বললো, "এখানে তোমাকে পরিচালনার দায়িত্ব আমার। দেখতেই পাচ্ছ এখানে বাসী. তাজা সব রকম মাংসের হরেক রকম বাজার। নতুন, খাস্তা সব রকম মালের একই দাম। এখানে সব মেয়ের একই কদর। আর বাঁ দিকে জুয়ার আড্ডা। টাকা-পয়সার হরির লুট। এ সম্বন্ধে তুমি ভালই জান।

"আর ঐ কোণে নাচের আসর, পবিত্রতার মন্দির। যদি বিশ্বাস কর, এখানকার সমস্ত সম্ভ্রান্ত মহিলাদের কন্যারাই ওখানে আছে।

সত্যিকারের আইনসিদ্ধ বিবাহও ওখানে হেসে উড়িয়ে দেওয়া হয়। ওখানেই আমাদের ভবিষ্যতের আশা—রাতের স্বপ্ন। ঘুণধরা চরিত্রের এই যাদুঘরেও বাৎসল্যরসের কিছু আধিক্য আছে। ক্ষুদে ভাঁড়দের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো কন্যাগতপ্রাণা মাতা এবং পিতা-মাতার জন্য বিগলিতচিত্ত সুন্দরীদল। চল দেখে আসা যাক্।"

মাঝে মাঝে ডাইনে বাঁয়ে ঈষৎ ঝুঁকে হাসিমুখে সে সকলকে অভিবাদন জানালো। ফাঁকে ফাঁকে দুপাশের অসংখ্য অনাবৃত স্কন্ধদেশে তার চতুর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো আর পরিচিত গরবিনীর সঙ্গে অজস্র সাজানো কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে যেতে থাকলো। সব-চেয়ে কোণ থেকে দ্বিতীয় ঘরটির দরজায় এসে তারা থামলো। নাচের বাজনা বাজছে। প্রায় পনের জোড়া স্ত্রী পুরুষ জোড়বেঁধে নেচে চলেছে। পুরুষেরা গম্ভীর, কিন্তু সঙ্গিনীর ওষ্ঠে হাসির রেশ। মায়েদের মতো কন্যাদেরও দেহের অধিকাংশই অনাবৃত।

হঠাৎ এক দীর্ঘাঙ্গী তরুণীর চমক ভাঙলো। সুদীর্ঘ পরিচ্ছদের ভূলুণ্ঠিত প্রান্তভাগ বাঁ হাতে সামলে নিয়ে নৃত্যরত কপোতকপোতীদের ঠেলেঠুলে এগিয়ে আসতে লাগলো। ললনাকুলে বাধা পেয়ে দ্রুত পায়ের তরঙ্গ তুলে এগোতে এগোতে সে চেঁচিয়ে উঠলো, "ওঃ, এই যে মাস্কেদ। তুমি কেমন আছ মাস্কেদ?"

তার হাসিখুশী মুখে আশার আলোর দ্যুতি। তার সোনার বরণ শরীরে তাম্রবর্ণের অতি ক্ষুদ্র রোমের আচ্ছাদন। উজ্জ্বল আগুন রংয়ের নরম রেশমের মতো একরাশ চুল ললাট বেয়ে নেমে এসে সুকোমল গ্রীবা বেষ্টন করেছে। তার চরণবিহারে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য, নাচের আবেগ। মনে হয় ওর মায়ের মাধুর্য যেমন বচনে, ওর সৌন্দর্য তেমনি চলনে। ওর এই সচল গতিভঙ্গী, মস্তকের হিন্দোল, হস্তের আন্দোলন শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতেই সাধ যায়, এক অনাস্বাদিত আনন্দ ও দেহসুখের আমেজ এনে দেয়।

"ওঃ, মাস্কেদ", সে আবার বললো, "তুমি কেমন আছ?"

সারভিনি এমন প্রচণ্ড আবেগে তার করমর্দন করলো, যেন সে

নারী নয়, পুরুষ। পরে বললো, "মাসজেল জোয়েৎ, এ আমার বন্ধু—ব্যারন সেভেল।'

নবাগতকে অভিবাদন জানিয়ে তার দিকে অপাঙ্গদৃষ্টি হেনে জোয়েত বললো, "ভালো তো? আচ্ছা আপনি কি বরাবরই এত লম্বা?"

বিরক্তি গোপন করে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে সারভিনি জবাব দিলে, "না, না, তোমার মা বিশালায়তপছন্দ করেন বলে তাঁকে খুশী করতে ও আজই এত লম্বা হয়ে এসেছে।"

মিষ্টি রিনরিনে গলায় মেয়েটি ঝাঁঝিয়ে উঠলো, "বাঃ ভালই তো। তবে আমার কাছে এলে আপনি আর একটু খাটো হয়েই আসবেন। আমি আবার মিষ্টি মাঝারি গড়নটাই পছন্দ করি কিনা। এই যেমন মাস্কেদ: প্রায় আমারই সমান—' ব'লে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। বললো, "মাস্কেদ, তুমি কি নাচবে? চল, এই নাচটায় যোগ দেওয়া যাক।"

সারভিনি মুখে জবাব দিল না। তার কটিতট বেষ্টন করে দমকা ঘূর্ণি বাতাসের মতো এক ঝটকায় সামনে এগিয়ে গেল।

এঁকে বেঁকে, নানা অঙ্গভঙ্গী করে তারা মাদকতায় সকলের চেয়ে দ্রুতলয়ে নেচে চললো; সবল নিষ্পেষণে দু'টি দেহ এক হয়ে গেল। যেন পদতলে লুক্কায়িত কোন সুরের অমোঘ শক্তিবলে তাদের দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গ দৃঢ় সম্পৃক্ত, আর পদযুগল সচল। একে [illegible] পড়লো। কিন্তু তারা যেন ক্লান্তিহীন [illegible] তালে তালে নেচেই চলেছে, নেচেই চলেছে। মনে হোলো [illegible] চেতনা বিলুপ্ত। স্থান কাল পরিবেশ ভুলে তারা যেন কোথায় কত বহু দূরের কল্পলোকে চলে গেছে। বিমুগ্ধ তন্ময় এই জোড়াটির দিকে দৃষ্টি রেখে বাদ্যকর বাজিয়ে চলেছে, সবার চোখেই ঔৎসুক্য। অবশেষে তারা থামার সঙ্গে সঙ্গে ঘর ফাটা হাততালি।

'জোয়েতের মুখে লজ্জার আবির, নিঃসঙ্কোচ ভাবটি অন্তর্হিত। দৃষ্টি উজ্জ্বল অথচ স্তিমিত। গাঢ় কৃষ্ণ আঁখি পল্লবের ছায়ায় নীল নয়নতারা। ক্লান্ত সারভিনি প্রকৃতস্থ হবার জন্য দরজায় হেলান দিয়ে

দাঁড়ালো। জোয়েত বললো, "তুমি একটি বেচারা, মাস্কেদ। আমার মতো পরিশ্রম তোমার সয় না।'

ম্লান হেসে লোভাতুর দৃষ্টি দিয়ে সারভিনি তাকে লেহন করলো। তার চোখে বন্য কামনা, ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

জোয়েত কিন্তু এই যুবকের সামনে থেকে সরে গেল না। শ্রান্তিতে তার বুক দ্রুত ওঠানামা করছে। সে বললো, "কখনও তুমি আবার দুষ্টু বেড়ালের মতো লাফ ঝাঁপ দিতে পার? হাত ধর, চল তোমার বন্ধুটিকে খুঁজে বার করি।" নীরবে হাত এগিয়ে দিয়ে সারভিনি বড় ঘরটি পার হতে লাগলো।

সেভেলও নিঃসঙ্গ ছিল না। মারসিঅনেস ওবারদি তাকে সঙ্গ দিচ্ছিল। তার সুধা-ঢালা কণ্ঠস্বরে যত সব তুচ্ছ বস্তুর আলোচনায় সেভেলের কানে মায়াজাল বিস্তার করছিল। ব্যগ্র দৃষ্টিতে যুবকের মুখপানে চেয়ে তার কণ্ঠ থেকে যে কথার নির্ঝরিণী বইছিল, আসলে তার অনুচ্চারিত অর্থ অন্য রকম—নারী হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত ভাবাবেগ।

সারভিনিকে দেখে সে হেসে তার দিকে ফিরে বললো, "ওহে ডিউক, শুনেছ তো আমি কয়েক মাসের জন্য বোগিভাঁতে একটা বাংলো ভাড়া নিয়েছি? তুমি কিন্তু মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে আমাদের খোঁজ খবর নেবে, তোমার বন্ধুটিরও নিমন্ত্রণ রইলো। আসবে তো? আগামী সোমবার আমরা যাচ্ছি, তোমরা শনিবার এসো, কেমন? এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করা যাবে, আর ছুটির দিনটাও কাটানো যাবে?"

সারভিনির ব্যাকুল দৃষ্টি জোয়েতের মুখে এসে পড়লো। অতি নিশ্চিত ও প্রশান্ত হাসি হেসে খুব জোর দিয়ে জোয়েত বলে উঠলো, "শনিবার ডিনারে মাস্কেদ আসবেই, আর জিজ্ঞেস করতে হবে না। গাঁয়ে সবাই মিলে বেশ হৈ চৈ করা যাবে।"

সারভিনি দেখলো, ওই হাসিতে অস্ফুট প্রত্যয় আর কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক দৃঢ়তা। মারসিঅনেস তার গভীর গহন কালো চোখ

ছুটি সেভেলের চোখে ফেলে বললো, "আর আপনিও কিন্তু ব্যারন ?"

তার হাসিতে দ্ব্যর্থ ভাষা ছিল না। সেভেল সম্মতি জানালো। "আমি বরং খুশীই হব।"

জোয়েত বলে উঠলো, "পাড়াপড়শীর মধ্যে আমরা একটা কেলেঙ্কারী করে ছাড়বো, তাই না মাস্কেদ্ ?" তারপর চারদিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে-থাকা ঘরের অন্যান্য লোকদের দিকে ফিরে ইচ্ছে করেই হোক, না বুঝেই হোক বিদ্বেষ ছিটিয়ে বললো—"আর আমার সব গুণমুগ্ধের ঈর্ষায় জর্জরিত করে দেব, তাই না ?"

সারভিনি উত্তর করলো, "যত খুশি।"

সেভেল জোয়েতের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলো, "আমার বন্ধুকে সব সময় মাস্কেদ বলেন কেন জানতে পারি কি ?"

নেহাত গোবেচারার ভাব ফুটিয়ে জোয়েত বললো, "ছোট মটর দানাকে জাদুকরেরা মাস্কেদ্ বলে। ও ঠিক তেমনি মনে হয়, এই তো হাতের মুঠোয় রয়েছে, অথচ দেখা যায় কোন্ ফাঁকে সরে পড়েছে।"

সেভেলের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি, কোন ভাবনার অতল থেকে অন্যমনস্ক মারসিঅনেস বলে উঠলো, "সোনামণি, বাছারা সত্যিই কি তাই নয় ?" রেগে উঠে জোয়েত জবাব দিল, "আমি মোটেই সোনামণি নই। আমার সাফ কথা হলো, আমি মাস্কেদকে চাই, আর ও সুড়ুৎ করে পালিয়ে যায়, এত খারাপ লাগে।"

তার দিকে ছোট্ট করে মাথা নুইয়ে সারভিনি বললো, "এবার থেকে আর পালিয়ে যাব না মা'মজেল। দিনরাত তোমার সঙ্গে কাটাবো।'

জোয়েত যেন আঁতকে উঠলো, "ওহো, সেটি হচ্ছে না। দিনে সারাক্ষণ থাক, আপত্তি নেই। কিন্তু রাতে কোন খাতির নেই।"

"কেন ?"

বড় নির্বিকার নির্ভীক উত্তর। "কেন না, পুরুষের নিরাবরণ দেহখানা এমন একটা কিছু দর্শনীয় বস্তু নয়।"

আক্ষেপের সুরে মারসিঅনেস ধম্‌কে ওঠে, "ও আবার কি ধরনের কথা! তোমার তো অত অবুঝ হবার কথা নয়!"

ব্যঙ্গের ঝাঁঝে সারভিনিও বলে বসলো, "আমিও আপনার সঙ্গে একমত।"

জোয়েত একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে তপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলো, "তুমি রীতিমত অভদ্র ব্যবহার করেছো; আর ইদানিং তোমার অত্যন্ত বাড় বেড়েছে।"

পেছন ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বললো, "কাভেলিআর এদিকে এসে আমায় উদ্ধার কর, আমায় অপমান করেছে।"

একজন ছিপ্‌ছিপে কালো লোক এগিয়ে এলো। চেষ্টাকৃত হাসি ফুটিয়ে সুধালো, "অপরাধী কে?"

সারভিনিকে দেখিয়ে জোয়েত বললো, "এই সেই লোক, তোমাদের চেয়ে আমি ওকে একটু বেশি পছন্দ করি, কারণ ও ততটা বিরক্তিকর নয়।"

কাভেলিআর ভলরেলি অভিবাদন করে বললো, "আমাদের সাধ্য অনুযায়ী আমরা করি। বোধহয় আমরা ততটা চৌকশ নই, কিন্তু তা বলে আমাদের একাগ্রতায় খাদ নেই।" ধূসর গুম্ফ একজন স্বাস্থ্যবান দীর্ঘ লোক পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে স্বভাব গম্ভীর স্বরে বললো, "আপনার সেবক মামজেল জোয়েত?"

জোয়েত চেঁচিয়ে উঠল, "এই যে মসিয়ো দ্য বেলভিনো।" তারপর ঘুরে সেভেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো, "আমার অনুরাগীদের একজন। লম্বা, ধনী; এবং চেহারার অনুপাতে বুদ্ধি। ওদের প্রতি আমার ভালবাসার এই নমুনা। ও সত্যিকারের একজন ফিল্ড মার্শাল—প্রচণ্ড শক্তিতে রেস্তোরাঁর দরজা উন্মুক্ত করতে দক্ষ ব্যক্তি। কিন্তু আপনি ওর চেয়েও লম্বা। তাই আপনাকে কি বলে ডাকা যায়? মনে পড়েছে। এবার থেকে আপনাকে জুনিয়ার রোদ্‌স*

* রোডস্‌ দ্বীপের এ্যাপোলো দেবের মূর্তি। প্রকাণ্ড সেই ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি অধুনা লুপ্ত।

বলে ডাকবো। সেই প্রকাণ্ড দেবমূর্তি নিশ্চয় আপনার পিতা ছিলেন। কিন্তু এখন বোধহয় আমাদের বুদ্ধির অগম্য উচ্চমার্গের কোন গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আপনাদের আলোচনা শুরু হবে ; তাই বিদায়! শুভরাত্রি।"

সে এক ছুটে অর্কেষ্ট্রার দিকে এগিয়ে গেল। কোয়াড্রিলের[১] বাজনা বাজাতে অনুরোধ করলো।

ওবারদির মনোযোগে ছেদ পড়ল। খুব আস্তে করে বললো, "তোমরা সব সময় ওকে ব্যতিব্যস্ত কর। ফলে মেয়েটার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আর কতকগুলো বদ অভ্যাসও হচ্ছে।"

"অর্থাৎ এখনও ওঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ করেননি?"

—সারভিন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল। কিন্তু মাদামের উদার হাসি দেখে মনে হোলো এ কথা তার কানে যায়নি।

বুকে নানা সম্মানসূচক পুরস্কারের নিদর্শন শোভিত এক গম্ভীর ভদ্রলোককে এগিয়ে আসতে দেখে মাদাম ব্যস্ত হয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলো, "এই যে প্রিন্স, কি সৌভাগ্য!"

সারভিনি সেভেলের হাত ধরে ওখান থেকে উঠে আসতে আসতে বললো, "ওই আমার শেষ পরাক্রমশালী প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রিন্স ক্রাভালো। কিন্তু জোয়েত সত্যিই কি খাসা মেয়ে নয়?"

সেভেলের জবাব—"মা মেয়ে দুজনেই খাসা। আর মা'টি আমার ওপর খুবই সদয়।"

সারভিনি মাথা দুলিয়ে বললো, "হাঁদারাম, উনি গোড়া থেকেই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেছেন!" কোয়াড্রিলে অংশ নেবার জন্য নারী পুরুষ সারিবদ্ধ হয়ে কনুইয়ের গুঁতোয় তাদের সরিয়ে পথ করে এগিয়ে যেতে লাগলো। সারভিনি বললো, "চল খানিকক্ষণ গ্রাহকদের দেখে আসি।" তারা জুয়ার আড্ডার দিকে চলল।

প্রত্যেকটা টেবিলের চারপাশে বহু লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে। কারো মুখে কথা নেই। মাঝে মাঝে শুধু নিক্ষিপ্ত মুদ্রার ঝনৎকার।

১ কোয়াড্রিল—একটি বিশেষ ধরনের নাচের বাজনা।

ক্ষিপ্র হস্তে সেই মুদ্রা সরিয়ে নেবার সময় বিশেষ ধরনের ধাতব শব্দের সঙ্গে অস্পষ্ট গুঞ্জন মিশে মনে হচ্ছিল মনুষ্য কণ্ঠেই বুঝি ধাতব শব্দের অনুরণন।

প্রত্যেকটি লোক প্রতীক চিহ্ন আর ফিতের দ্বারা পৃথক। তাদের বিভিন্ন মুখাকৃতির মধ্যে অটুট গাম্ভীর্য পরিস্ফুট। পৃথক পৃথক গুম্ফ সজ্জায় প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত।

রুক্ষ মুখ আমেরিকানটির ঘোড়ার লেজের মত গোঁফ, ক্রুদ্ধ স্বভাব ইংরেজের পাখার মতো এক মুখ দাড়ি, স্প্যানিশ লোকটির ভেড়ার লোমের মতো কালো গোঁফ সোজা লম্বা হয়ে প্রায় চোখের কোলে গিয়ে ঠেকেছে। ভিকতর ইমানুয়েল যেন সুবিশাল গোঁফগুচ্ছ ইতালিকে দিয়ে গিয়েছিলেন, আর সেই গোঁফরাশি আশ্রয় পেয়েছে ঐ রোমান লোকটির মুখে। অস্ট্রিয়ান লোকটির পরিষ্কার কামানো চিবুকের দুপাশে মসৃণ কেশগুচ্ছ ডানার মত বিস্তৃত। রাশিয়ান জেনারেলের গোঁফ তো নয়, যেন ঠোঁটের ওপর প্রসারিত দুটো বাঁকা তলোয়ার। আর ফরাসীদের মুখে যত সব সৌখিন হাল ফ্যাশানের গোঁফ—পৃথিবী নরসুন্দরদের নিত্য নতুন উদ্ভাবনী শক্তির অপূর্ব নিদর্শন।

সারভিনি জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি এক দান খেলবে?"

"এখানে আমি কখনও খেলিনি। তাছাড়া বড় ভিড়, সুবিধে করতে পারব না। হট্টগোল কম থাকলে বরং অন্য একদিন আসা যাবে—চল আজ চলে যাই, কি বল?"

"তাই ভাল, চল যাওয়া যাক।"

বড় ঘরটা পেরিয়ে তারা বাইরে বেরিয়ে এলো। সারভিনি বললো, "এখানকার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা হোলো?"

"চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই। তবে লোকগুলোর চেয়ে মেয়েরাই বেশী আকর্ষণীয়।"

"আলবাৎ, খাঁটি কথা বলেছো। যত রাজ্যের সেরা সব শিকার এখানে মিলবে। সেলুনের সামনে দিয়ে হাঁটলে যেমন এক বিশেষ

ধরনের প্রসাধনীর গন্ধ নাকে আসে, এদের সামনে গেলেও তেমনি ভালবাসার এক ধরনের আমেজ আসে। তুমি কি একথা অস্বীকার করতে পারবে? এখানে এলে পয়সা উসুল হয়ে যায়। সুদক্ষ প্রেমিক আর নিপুণ শিল্পী! কখনও রুটিওয়ালার তৈরি কেক খেয়েছ? দেখতে ভাল, কিন্তু খেতে বিস্বাদ। সাধারণ মেয়েদের ভালবাসা আমাকে রুটিওয়ালার পেস্ট্রির কথা মনে করিয়ে দেয়। অথচ মারসিঅনেস ওবারদির মতো মেয়েদের ভালবাসা—সেই হলো আসল প্রেম। প্রেমের মতো মুখরোচক উপাদেয় কেক তৈরি করতে এরা ওস্তাদ। কেবল অন্য জায়গায় যেখানে এক পেনি ব্যয় করলেই চলে, এখানে তার জন্য দিতে হবে আড়াই পেনি—এই যা।"

সেভেল জিজ্ঞেস করলো, "এটা এখন চালাচ্ছে কে?"

সারভিন ঘাড় নেড়ে বললো, "আমি ঠিক জানি না। আগে ছিলেন একজন ইংরেজ লর্ড, তিন মাস হোলো চলে গেছেন। মারসিঅনেস বড় খেয়ালী। কখনও সম্ভ্রান্ত লোকেদের সঙ্গে, কখনও জুয়াড়ীদের সঙ্গে ওর দিন কাটে, কিন্তু আগামী শনিবার আমরা বগিভাঁতে তার ডিনারের নিমন্ত্রণে যাচ্ছি—কেমন তো? শহরের চেয়ে গ্রামে স্বাধীনতা বেশী, তাই আমার সম্বন্ধে জোয়েতের মনের সত্যিকার ধারনাটা জানা যাবে।"

"আমার বড় রকমের কোন আশা নেই"—সেভেল বললো, "ঐ দিন কিন্তু আমি কিছুই করব না।"

সাঁজেলিজেতে যখন তারা ফিরে এলো, তারায় ভরা উন্মুক্ত আকাশ তলে বেঞ্চের ওপর আলিঙ্গনাবদ্ধ একটি জোড় পড়েছিল। সারভিনি বিড় বিড় করে বলে উঠলো, "মানুষের জীবনে অপরিহার্য হলেও, ভালবাসা ব্যাপারটা নেহাত জঘন্য! একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, অথচ প্রতিবারেই নতুন। অতি সাধারণ, কিন্তু তবু যেন কোন সুদূর কল্পলোক। আমি ওবারদির মতো কারও কাছ থেকে দশ হাজারের বিনিময়ে যা পেতে চাই, ওই মেয়েটিকে এক ফ্রাঁ দিয়েই কুষ্মাণ্ডটা তাই পেয়ে যাচ্ছে। আর বয়স বা আর সব দিক থেকে

ওবারদিও এই হতভাগীর তুলনায় এমন একটা আহা মরি কিছু নয়—যত সব আহাম্মুকি !"

একটু থেমে সে আবার বললো, "তবে যাই বলো না কেন, জোয়েতের প্রথম প্রেমিক হওয়াটা চাট্টিখানি কথা নয়। এর জন্য আমি দিয়ে দেব···আমি দেব।" কি যে দেবে, তা আর ঠিক করে বলা হলো না। রয়েলের মোড় এসে পড়াতে সেভেল শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল।

২

ছোট একটা পাহাড়ের কোলে মারসিঅনেস ওবারদির নতুন বাংলো ভিলা প্রিতেমস। বাগানের পাঁচিলের পা ছুঁয়ে স্যেন নদী বাঁক নিয়ে সোজা চলে গেছে মালির অভিমুখে। ভিলার বিপরীত দিকে দীর্ঘ বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত ক্রেসি দ্বীপে ঘন সবুজের সমারোহ! নদীমুখী বারান্দায় একটি টেবিল পাতা। নদী পেরিয়ে গাছপালার ভিড়ের ওপর দিয়ে চোখ চলে যায় দূরে শ্যামল শাখার আড়ালে অর্ধলুক্কায়িত ভাসমান কাফে, লা গ্রেনোইলের দিকে।

এমন শান্ত সন্ধ্যায় চারিদিকে অনুচ্চার সুখের পরশ। নদীর বুকে রক্তরাগ ছড়িয়ে সূর্য অস্ত গেল। ধীর প্রশান্ত পদে রাত্রি ঘনিয়ে এলো। নিস্তব্ধ নিঝুম পরিবেশ। গাছের পাতায় দোল দিতে বাতাস এলো না, শান্ত নদীর জলে হিন্দোল তুলতে ঘুর্ণি ঝড় আসেনি। বাতাসে উষ্ণ স্পর্শ, তা বলে গরম নয়, বরং আরামদায়ক আমেজ। নদীকুলের মনোরম শান্তি প্রশান্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত।

সূর্য বনের অন্তরালে ডুব দিয়ে অন্য কোন দেশে উদিত হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ঘুমন্ত পৃথিবীর সৌম্য রূপে সকলেই পরিতৃপ্ত; গোলাকার এই উদার আকাশের তলায় নিত্য উদ্‌বেল জীবনের অনন্ত বিশ্বরূপ যেন তারা উপলব্ধি করতে পারলো।

ড্রইং রুম থেকে বেরিয়ে এসে খাবার টেবিলে বসে তাদের মনে

আনন্দধারা বয়ে গেল। স্নিগ্ধ আবেগে হৃদয় প্লাবিত হলো। এই মনভুলানো বাতাসের ঘ্রাণ নিতে নিতে এই গ্রামীণ পরিবেশে বিস্তৃত নদীবক্ষের ওপর অতুলনীয় সন্ধ্যায় মুখোমুখি বসে খাওয়ার পরম সুখ তাদের মন মাতিয়ে দিলো।

চারজনের ছোট পার্টি। মারসিঅনেস সেভেলের হাতে হাত রেখেছে, জোয়েত রেখেছে সারভিনির হাতে। মহিলা দুটির স্বভাবসিদ্ধ শহুরে ভাব অন্তর্হিত। পরিবর্তনটা জোয়েতের ক্ষেত্রেই চোখে পড়ার মতো। সে বিষণ্ণ, গম্ভীর; কথা বলছিল খুবই কম। ওকে চেনাই যায় না। সেভেল প্রশ্ন করলো, "তোমার কি হয়েছে, আগের চেয়ে তোমায় অন্য রকম দেখছি! এরই মধ্যে যেন অনেক গম্ভীর হয়ে পড়েছ?"

জোয়েত জবাব দিল, "পরিবেশের গুণ। নিজের কাছেই আমার তাজ্জব ঠেকছে, আমি আর আগের মতো নেই। আমার বেশ পরিবর্তন হচ্ছে। কেন বুঝতে পারছি না, ঋতুর মত আমিও বদলে যাচ্ছি। আজ পাগলের মতো ব্যবহার করছি, কাল হয়ত হবে শব-যাত্রীর মতো। যে-কোন সময়ে আমি যে-কোন কাজ করতে পারি। কোন কোন দিন আমি মানুষ অবধি খুন করতে পারি। তা বলে পশুকে কখনও করবো না, কিন্তু মানুষকে নিশ্চয় পারবো। আবার কখনও আমার অকারণে কান্না পায়। কত বিভিন্ন ধরনের চিন্তা মাথায় ভিড় করে আসে। অবশ্য সকালে ঘুম থেকে উঠে যা ভাবি তার ওপর অনেকটা নির্ভর করে। সারাদিন কেমন কাটবে, সকালেই বুঝতে পারি। বোধ হয় স্বপ্নেই আমাদের মতি গতি স্থির হয়ে যায়, তবে যে বই পড়ছি—তার ওপরও কিছুটা নির্ভর করে বোধহয়!"

তার পরনে সাদা পশমের পোশাক। বিভিন্ন অলঙ্কারে আপাদ-মস্তক সজ্জিত। সুপরিসর শিথিল বক্ষ-আবরণীতে দৃঢ়তার পরিবর্তে তার স্বাভাবিক তরঙ্গায়িত সুডোল উরোজযুগল রেখায় রেখায় উদ্ভাসিত। দীর্ঘ কোমল মৃণাল গুচ্ছের মতো গ্রীবাদেশে অপূর্ব দ্যুতি; তার পোশাকের চেয়েও শুভ্র এই কণ্ঠদেশ সোনালী কেশরাশির ভারে বিনম্র।

অনেকক্ষণ মুগ্ধচোখে তাকিয়ে থেকে সারভিনি বললো, "আজ রাতে তুমি অপরূপা, প্রতিদিন যেন তোমায় এই রূপেই দেখি।"

স্বাভাবিক অথচ আবেগভরে জোয়েত বললো, "তা বলে আরজি পেশ করে বোসো না মাস্কেদ। এমন দিনে হয়ত প্রার্থনা মঞ্জুর করে ফেলতে পারি। পরে সে জন্য পস্তাতে হবে প্রিয়তম।"

মারসিঅনেস আজ বড় সুখী। তার আগাগোড়া কালো পোশাকের ভাঁজে ভরা দেহের প্রতিটি কারুকার্য সুস্পষ্ট, সুন্দর। তার কাঁচুলিতে লালের ছোপ, কটিতট থেকে বহমান লাল ও গোলাপীর দুটি ধারা, তার নিবিড় কালো চুলে একটি রক্তগোলাপ। আজ রাতে যেন তার তনুমনে আগুনের পরশ লেগেছে। রক্তলাল পুষ্প সজ্জায়, দৃঢ় পিনদ্ধ পোশাকে, সঙ্গীর ওপর পতিত তার মদালস দৃষ্টিতে, অস্ফুট কথা আর মন্থর চলনে এই বহ্নুৎসবের স্বাক্ষর।

সেভেলও গম্ভীর চিন্তাক্লিষ্ট। মাঝে মাঝে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে তার পিঙ্গল রুক্ষ দাড়ির ওপর হাত বুলোতে বুলোতে চিন্তায় ডুবে যাচ্ছে।

মাছ পাতে পড়লে পর দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করে সারভিনি বললো, "নীরবতার একটা নিজস্ব মহিমা আছে। অনেকক্ষণ কথা-বার্তায় যেটুকু ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়, তার চেয়েও বেশি হয় পাশাপাশি চুপচাপ বসে থাকলে—তাই নয় মাদাম?"

তার দিকে ফিরে মারসিঅনেস বললো, "ঠিক বলেছো। সকলে মিলে কোন এক সুখের কথা ভাবতে এত ভাল লাগে।" তার জ্বলন্ত দৃষ্টি সেভেলের ওপর ন্যস্ত হোলো এবং কিছুক্ষণ চার চক্ষু এক হয়েই থাকল। টেবিলের নিচে অলক্ষ্যে এক মৃদু আলোড়ন ঘটে গেল।

সারভিন বললো, "মানজেল জোয়েত, তোমার প্রসন্ন ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে, তুমি প্রেমে পড়েছ। ব্যাপারটা কার সঙ্গে হোতে পারে এসো দুজনে মিলে ভেবে বের করি। হা হুতাশ করা একগণ্ডা অপোগণ্ডের কথা বাদ দিয়ে ডাগর চাঁইকটাকে ধরা যাক। প্রিন্স ক্রাভালোকে কেমন মনে হয়?"

জোয়েত ক্ষেপে উঠলো; "ওহো! মাস্কেদ আমার, কি যে বল!

ওই প্রিন্স তো একটা মোমের তৈরি রাশিয়ান পুতুল। চুল ছাটার প্রতিযোগিতায় ও একটা মেডেল পেয়েছে।"

"ঠিক আছে, হিসেব থেকে প্রিন্স বাদ। তবে ভাইকোৎ পিয়ারো হ্য বেলভিনোই বোধ হয় তোমায় মজিয়েছে?"

উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ে জোয়েত বললো, "কেন আমাকে কি কখনও রাইসিনার কাঁধে ঝুলে পড়ে কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করতে শুনেছ 'দুষ্টু পিয়ারো,' 'হে স্বর্গের পেড্রো,' 'আদরের পিয়াত্রি', অথবা 'আমার প্রিয়তম পিরু, তোমার ওই রেশমের মতো নরম তুলতুলে ছোট্ট মাথাটা তোমার প্রেয়সীকে দুহাতে ধরতে দাও—কেননা তার এখন সাধ হয়েছে চুমু খাবে'?"

জোয়েত প্রত্যেককে একটি করে আদরের নাম দিয়েছিলো। সপ্তাহের বিশেষ বিশেষ দিনে সে বেলভিনোকে কখনও রাইসিনা, কখনও বা মালভসি অথবা আর্জেনাভিউল নামে ভূষিত করতো।

সারভিনি বললো, "তালিকা থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তির নামও কাটা গেল, বাকি রইল কাভেলিআর ভলরেলি; তাকে মারসিয়নেস কিছুটা পছন্দ করে।"

জোয়েত পূর্ববৎ উল্লসিত—"কি বললে, লাসরিমোস্? ও তো মাভেলিনের ভাড়াটে শবযাত্রাদের একজন। যত সব নামজাদা লোকের শবানুগমন করে বেড়ায়। ও যখনই আমার দিকে তাকায়, মনে হয় আমিও শব হয়ে গেছি।"

"তিনজনই বাতিল। তবে তুমি নিশ্চয় এক ব্যারন সেভেলের প্রেমে ডুবেছ?"

"জুনিয়ার রোদসের সঙ্গে? উহুঁ ও বড় বেশি পালোয়ান।"

"আচ্ছা বেশ মানলুম, তবে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে যে তোমার অসীম করুণা এই অধমের প্রতি—কেননা তোমার উপাসকবৃন্দের মধ্যে এর কথাই এখনও আলোচনা হয়নি। কিছুটা বিনয়ে খুব ভেবে চিন্তে আমি নিজের নামটা তালিকার সবার শেষে রেখেছিলাম। কি বলে যে তোমায় ধন্যবাদ জানাব?"

"ওহো মাস্কেদ", প্রসন্ন হাসিমুখের উত্তর, "তোমায় খুবই পছন্দ করি—তা বলে ভালবাসি না, কিন্তু···অবশ্য তোমার হতাশ হবার কারণ নেই···ধৈর্য ধরো মাস্কেদ···আগ্রহ আরও বাড়াও, সব দিক থেকে হিসেব করে এগোও···একটু আনুগত্য···আমার তুচ্ছতম সাধ পুরণ করো···যা বলব তাই করতে তৈরী থাকো ··· তখন··· তারপর দেখা যাবে।"

"কিন্তু মামজেল সবই আমি করতে রাজী, কিন্তু আগে নয়, সখী, পরে।"

অকপট সরলতায় জোয়েত শুধালো, "কিসের পরে মাস্কেদ ?"

"কেন না বোঝার ভান করছো ? আগে প্রেম, তারপর আর সব।"

"ঠিক আছে, ধরে নাও ভালবাসি। যদি অবশ্য বিশ্বাস হয়।"

"কিন্তু আমি বলতে চাই ···"

"থাম মাস্কেদ, এ-প্রসঙ্গ আর নয়।"

সামরিক কায়দায় সেলাম ঠুকে সারভিনি চুপ করে গেল।

দ্বীপের পরপারে সূর্য অস্ত গেছে। কিন্তু আকাশ জুড়ে যেন হোলি খেলা। নদীর বুকেও রংয়ের ছোপ। লোকজন, ঘরবাড়ী, সবকিছু গোধূলির আলোয় রাঙা। মাবসিঅনেসের মাথায় লাল গোলাপ তো নয়, যেন মেঘ থেকে ছড়িয়ে পড়া এক মুঠো আবীর।

জোয়েতের দৃষ্টি দিগন্তে প্রসারিত। তার মায়ের একটি হাত সেভোলের হাতে, যেন আনমনে এসে পড়েছে। কন্যার চোখ পড়তেই মাবসিঅনেস দ্রুত হাত সরিয়ে পোশাকের মধ্যে গুটিয়ে নিল। সারভিনির দৃষ্টি এড়ায় না কিছুই। সে বললো, "মামজেল, তোমার ইচ্ছে থাকলে আমরা খাওয়ার পর ঐ দ্বীপে বেড়াতে যাব।"

খুশীতে নেচে উঠে জোয়েত বললো, "বাঃ, ভারি মজা হবে। শুধু আমরা দু'জন যাব মাস্কেদ, কেমন ?"

"হ্যাঁ মামজেল, শুধু আমরা দু'জন।"

আবার সব চুপচাপ। উন্মুক্ত বিশাল প্রান্তরে পরিপূর্ণ প্রশান্তি, নিস্পন্দ, নিথর সন্ধ্যার অনিবার্য প্রভাব ঘনিয়ে এলো তাদের দেহে,

মান, কণ্ঠস্বরে। জীবনের কোন তুর্লভ মুহূর্তে হৃদয় হয় মূক। নীরবতার ছোঁওয়া লেগেছে ভৃত্যদের মধ্যেও। তারা নিঃশব্দে কাজ করে গেল। আকাশে আগুনের রং ফিকে হয়ে এলো, ধীরে ধীরে তমিস্রা এসে গ্রাস করে ফেলল প্রকৃতিকে। স্তব্ধতা ভেঙ্গে সেভেল কথা বললো, "এখানে কি বেশ কিছুদিন থাকবেন?"

"হুঁ," প্রতিটি কথায় জোর দিয়ে মারসিঅনেস বললো, "যতদিন ভাল লাগবে, ততদিন।"

অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় ঘরে বাতি দেওয়া হোলো। অদ্ভুত বিষণ্ণ আলো ছড়িয়ে পড়ল। টেবিলের বাতি ঘিরে কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গ এসে জড়ো হোলো। আলোর উপর দিয়ে উড়ে যেতে গিয়ে পা আর পাখা খুইয়ে টেবিল ঢাকনা আর কাপ ডিসের ওপর ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল। খাবার আর পানীয়ের সঙ্গে বেশ কিছু সবার পেটে গেল, আর কিছু নির্বিবাদে রুটির ওপর বিচরণ শুরু করে দিল। মাথার ওপর অগুনতি পতঙ্গের আক্রমণে তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পোকার হাত থেকে খাবার বাঁচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কিছুই করা গেল না। গ্লাসে, প্লেটে পোকা ছেয়ে গেল। বার বার গ্লাসের মদ ওপর থেকে ফেলে দিতে হচ্ছিল। জোয়েত বেশ মজা পেলো। জোয়েত যাতে কোন পোকা গিলে না ফেলে, সেদিকে সারভিনি নজর রেখেছে। যখনই সে কোন কিছু মুখে তুলতে যাচ্ছে, সারভিনি তার মাথার ওপর রুমাল দিয়ে চাঁদোয়ার মতো ধরছে; মদের গ্লাস ঢেকে রাখছে। কিন্তু খুঁতখুঁতে মারসিঅনেস পোকার জ্বালায় অস্থির: তাই খাওয়ার পাট তাড়াতাড়িই চুকিয়ে ফেলতে হোলো।

সারাভিনির প্রস্তাব জোয়েত ভুলে যায়নি। বললো, "এবার তাহলে দ্বীপ থেকে ঘুরে আসা যাক্।"

মৃদু গলায় তার মা বললো, "খেয়াঘাট অবধি আমরাও যাচ্ছি, তোমরা কিন্তু বেশি দেরি কোরো না, বুঝেছ?'

চতুর্দিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সরু পায়েচলা পথে তু'জন তু'জন

করে হাঁটছে। সামনে তরুণী ও তার বন্ধু। পেছন থেকে মারসিঅনেস আর সেভেলের কথা আবছা ভেসে আসছে। গাঢ় আঁধারের মাঝে নিবিড় কালো নদীজলে তারকাখচিত আকাশের প্রতিবিম্ব। পথ চলতে অসুবিধে হোলো না। নদীতীর বরাবর ভেককুলের অবিরাম উল্লাসধ্বনি আর উর্ধ্ব আকাশে অসংখ্য নাইটিঙ্গেলের মধুর ঐকতান হোলো তাদের পথের সাথী।

হঠাৎ একসময় জোয়েতের খেয়াল হোলো, "আরে! ওরা তো আর আসছে না, গেল কোথায়?" সে চেঁচিয়ে ডাকলো, "মা"। সাড়া না পেয়ে বললো, "কিন্তু একটু আগেও তো ওদের কথা শোনা গেছে, এর মধ্যে বেশি দূর যাওয়ার কথা নয়।"

সারভিনি জবাব দিলো, "ওরা নিশ্চয় ফিরে গেছে। সম্ভবত তোমার মায়ের ঠাণ্ডা লেগে থাকবে।" তারা এগিয়ে গেল।

সামনে সরাইখানার আলো দেখা গেল। মারতিনেত নামে এক জেলে এই সরাইয়ের মালিক। ঘাটে বেশ চওড়া একটা নৌকোয় উঠে বসে তারা হাঁকডাক শুরু করে দিল। ঘর থেকে মাঝি বেরিয়ে এলো। দাঁড় আর লগির ঠেলায় তরতরিয়ে তরী এগিয়ে চললো আর নদীর বুকে পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রিত নক্ষত্রপুঞ্জ এসে কেঁপে উঠে ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে লাগলো। ওপারে নেমে বিশাল বিশাল গাছের তলা দিয়ে তারা হাঁটতে শুরু করলো। ঘন পাতার আড়ালে অসংখ্য নাইটিঙ্গেল, পায়ের তলায় আর্দ্র ধরিত্রীর অতলান্ত শান্তি। দূর থেকে ভেসে আসছে পিয়ানোর অতি পরিচিত একটি সুর। সারভিনি জোয়েতের হাত ধরলো, আলতো করে তার কোমর জড়িয়ে একটু চাপ দিয়ে বললো, "কি ভাবছো?"

'আমি? কিছুই না, বড় ভাল লাগছে।'

"তবে তুমি আমার কথা একটুও ভাব না?"

"ভাবি মাস্কেদ, একটু বেশিই ভাবি। তবে এখন ও কথা থাক। এই সুন্দর পরিবেশে ওসব ভাল লাগবে না।"

সারভিনি ধীরে ধীরে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করলো।

জোয়েত বাধা দিল, নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। তার নরম পশমী পোশাকের ওপর দিয়ে মোলায়েম ও মসৃণ স্পর্শে যেন উত্তপ্ত দেহের স্বাদ। একটি অস্ফুট ধ্বনি, "জোয়েত?"

"বল।"

"দেখ,...তোমায় আমি ভালবাসি।"

"তুমি...এমন করে বোলো না মাস্কেদ।"

"সত্যি ভালবাসি ; অনেক দিন থেকে।"

জোয়েত পৃথক হতে চেষ্টা করলো। দুটি দেহের মাঝে বন্দী তার হাতটিকে মুক্তি দিতে চাইলো। পুরুষের নিষ্পেষণে আর নারীর বিচ্ছিন্ন হবার প্রয়াসে তারা মাতালের মতো এঁকে বেঁকে হেলে দুলে পথ চলতে লাগলো।

সারভিনি দ্বিধাগ্রস্ত। এমন পরিবেশে একজন অভিজ্ঞা রমণীকে যে কথা বলা চলতো, এই তরুণীকে সে ভাবে বলা যায় না। সে বুঝতে পারলো না তার উষ্ণ, ঘনিষ্ঠ ও অর্থপূর্ণ রসিকতায় জোয়েত সম্মতি দিয়েছে অথবা আদৌ বুঝতে পারেনি। সে ক্রমাগত অনুরোধ জানালো, "জোয়েত, কথা বল জোয়েত।"

তারপর কথা নেই, বার্তা নেই হঠাৎ একটি দুঃসাহসিক চুম্বন মুদ্রিত করে দিল তার কপোলে। একটু ছট্‌ফট্ করে বিরক্তিভরে জোয়েত বললে, "আঃ কি অসভ্য! আমাকে একটু রেহাই দেবে?" এ কথায় তার ইচ্ছা অনিচ্ছা কোনটাই স্পষ্ট হোলো না। তাকে রাগ করতে না দেখে সারভিনির সাহস বেড়ে গেল। জোয়েতের ঘাড়ে গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুল,—কতদিনের আকাঙ্ক্ষিত সেই দুর্লভ স্থানটিতে সে তার ঠোঁট দুটি নামিয়ে আনলো।

হিতে বিপরীত। জোয়েত সবটুকু শক্তি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলো। কিন্তু দৃঢ় বেষ্টনে তাকে বেঁধে ফেললো সারভিনি। অপর হাতে তার গলা জড়িয়ে জোর করে তার মাথা নিজের বুকে চেপে ধরে সুদীর্ঘ সময় ধরে আকণ্ঠ চুম্বন সুধা পান করে মাতাল হয়ে গেল।

শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে একসময় জোয়েত তার হাতের ফাঁক দিয়ে সারভিনির বলিষ্ঠ বন্ধন থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর একঝাঁক উড়ন্ত পাখীর পাখার ঝট্‌পটের মতো পোশাকের শব্দ তুলে ছোট ছোট ক্ষিপ্র পদে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটে গেল যে সারভিনি হতভম্ব। কিছুক্ষণ কেটে গেল, কোন আওয়াজ না পেয়ে সে আস্তে করে ডাকলো, "জোয়েত।" সাড়া না পেয়ে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে খুঁজে দেখতে লাগলো, ঝোপেঝাড়ে উঁকি মেরে দেখলো—যদি সাদা পোশাকের একটুও চোখে পড়ে। কিন্তু শুধুই অন্ধকার। এবার একটু জোরে ডাকলো, "মামজেল জোয়েত!"

পাখীরা নীরব। ঘোর আঁধারে হোঁচট খেতে খেতে অপটু দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে সে ডেকেই চললো, "জোয়েত! মামজেল!"

মাঝে মাঝে থেমে কান পেতে শুনছে। না, কোথাও কোন সাড়া নেই। নিঝুম, নিস্তব্ধ দ্বীপ, মাথার ওপর পাতার খস্‌খসানি পর্যন্ত কানে আসে না। কেবল নদীতীর জুড়ে একটানা দাদুরীর বিষণ্ণ আর্তনাদ। সে তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। বৃক্ষবহুল ঢালু জমির কিনারা ধরে একবার খরস্রোতা ঝরনার দিকে, একবার পেছনের নদীর সমতল পাড় দিয়ে বগির্ভার উল্টো দিকে চলে এলো। বনে আনাচ কানাচ পাঁতি পাঁতি করে খুঁজতে খুঁজতে তারস্বরে ডাকলো, 'মামজেল জোয়েত, তুমি কোথাও, সাড়া দাও। আমি ঠাট্টা করেছিলাম! আমাকে আর এভাবে শাস্তি দিও না। সাড়া দাও, সাড়া দাও।"

কাফে লা গ্রেনোইলের কাছাকাছি এসে তার কানে এলো ঘণ্টাধ্বনি। মধ্য রাত্রির সময় সংকেত। তাহলে পুরো দু'ঘণ্টা ধরে সে বন বাদাড় চষে বেড়িয়েছে! ভাবলো, এতক্ষণে নিশ্চয় জোয়েত বাড়ি ফিরে গেছে। পুল পেরিয়ে দুরু দুরু বক্ষে সে ঘরে ফিরলো।

হল ঘরে অপেক্ষমান একটি চাকর চেয়ারের ওপর ঢুলে পড়ে আছে। তাকে জাগিয়ে সারভিনি প্রশ্ন করলো, "মাদমোয়াজেল

জোয়েত কি অনেকক্ষণ আগে ফিরেছেন? পথে তাকে দাঁড় করিয়ে আমায় একটি কাজে যেতে হয়েছিল।'

"আজ্ঞে হাঁ হুজুর।" ভৃত্যটির জবাব, "রাত দশটার আগেই মাদমোয়াজেল ফিরে এসেছেন।"

সারভিনি নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুম এলো না। সেই ছিনিয়ে-নেওয়া চুমুটিই ওকে এমন বিগড়ে দিয়েছে। সে অবাক হয়ে ভাবলো, ও কি চাইছিল, ও কি জানে, কিই বা ভাবে? কি জ্বালাময় সৌন্দর্য! এ যাবৎ সারভিনি যত মেয়ের সংস্পর্শে এসেছে, তাদের দৈনন্দিন একঘেয়েমিতে জীবনের সব বৈচিত্র্য হারাতে বসেছিল। এই লাবণ্যময়ী চঞ্চলা মেয়েটি তার জীবনে নতুন স্বাদ এনে দিল, সে বাঁচার অর্থ খুঁজে পেলো।

ঘড়িতে একটা বাজলো, দুটো বাজলো। সে বুঝলো আজ আর ঘুমের আশা নেই। বুকের মধ্যে তোলপাড়, গরম আর প্যাচপেচে ঘাম। সে উঠে জানালা খুলে দিল।

এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস প্রাণভরে টেনে নিল। নিশ্চুপ, থমথমে কালো রাত্রি। বাগানের অন্ধকার কোণে জ্বলন্ত একটু আগুনের ফুলকি না? নির্ঘাৎ সিগারেট। সেভেল ছাড়া আর কেউ নয়। সে মৃদুকণ্ঠে ডাকলো, "লিওঁ।"

স্বর ভেসে এলো, "কে, জাঁ?"

"হ্যাঁ, দাঁড়াও আমি আসছি।" গায়ে জামাটা গলিয়ে সে বেরিয়ে এলো। একটি লোহার চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে লিওঁ সিগারেট ফুঁকছিল।

"এত রাতে তুমি এখানে কি করতে?"

সেভেল মুচকি হেসে জবাব দিল, "বিশ্রাম নিতে"।

"তোমাকে অভিনন্দন বন্ধু। কিন্তু আমি এতক্ষণ মিছেই দেওয়ালে মাথা ঠুকে মরেছি!"

"তুমি বলছ কি?"

"ঠিকই বলছি···জোয়েত ওর মায়ের মতো নয়।"

"হয়েছিল কি ? সব খুলে বল দেখি।"

তার ব্যর্থ প্রচেষ্টার কথা আদ্যোপান্ত বিবৃত করে সারভিনি বললো, "দেখ ওই কিশোরী আমায় বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। বিশ্বাস করো এতক্ষণ চেষ্টা করেও চোখ বুজতে পারিনি। নারী কিমাশ্চর্যম্! দেখতে নেহাত সাদাসিধে, কিন্তু এক একটি রহস্যপুরী। বয়স্ক প্রাজ্ঞ প্রেমিকাকে বোঝা সহজ। কিন্তু কিশোরীর মন দুর্বোধ্য। এখন তো মনে হচ্ছে আমাকে বোকা বানিয়ে ছাড়বে।"

নড়ে চড়ে বসে সেভেল বললে, "সাবধান বৎস। ও তোমাকে বিয়ে করেই ছাড়বে। ইতিহাসের দৃষ্টান্ত স্মরণ রেখো। সাধারণ বংশের মেয়ে মাদমোয়াজেল দ্য মঁতিজেল কি করে সম্রাজ্ঞী হয়ে বসেছিলেন! দেখো আবার নেপোলিওঁ হয়ে না যাও।"

সারভিনি বললো, "সে আশঙ্কা নেই। আমি সম্রাট বা নির্বোধ কোনটাই নই। পাগল না হোলে ও দুটোর কোনটাই হওয়া যায় না। কিন্তু তোমার কি ঘুম পেয়েছে?"

"একটুও না।"

"তবে চল নদীর ধার থেকে একটু বেড়িয়ে আসি।"

"বেশতো—।"

গেট খুলে নদীতীর ধরে তারা মার্লির দিকে এগিয়ে চললো।

প্রশান্ত গম্ভীর ব্রাহ্মমুহূর্ত। প্রকৃতি বিশ্রামের কোলে শায়িত, গভীর নিদ্রায় অভিভূত। নিশাকালের অস্পষ্ট গুঞ্জন আর শোনা যায় না। নাইটিঙ্গেলের গান আর ব্যাঙের কাতরানি থেমে গেছে। শুধু নাম না জানা কোন পাখীর কলের করাতের মতো একটানা একটা বিরক্তিকর আওয়াজ রাত্রির নৈশব্দ্য খড়্ খড়্ করে চিরে চলেছে। কখনও কখনও সারভিনি কবি দার্শনিকের মতো ভাবুক হয়ে পড়ে। তেমনি ভাবে বিভোর হয়ে এক সময় বলে উঠলো, "দেখ এই তরুণী আমায় পাগল করে দিয়েছে। অঙ্কশাস্ত্রে একে একে দুই হয়, আর প্রেমশাস্ত্রে একে একে হওয়া উচিত এক। কিন্তু এখানে তা না হয়ে হচ্ছে দুই। কোন একটি রমণীর সত্তায় মিলে মিশে একাকার হয়ে

যাওয়ার দুর্বার অনুভূতির স্বাদ কেমন জানা আছে? একটি নারীর কাছে নিজের হৃদয় মন উজাড় করে দিয়ে তার সত্তার গভীরে নিমগ্ন হয়ে যাওয়া, শুধু দৈহিক আলিঙ্গন নয়—দুটি হৃদয়ের ঐহিক ও পারমার্থিক মিলনের কথাই বলছি। তবু তার অনেকটাই অচেনা থেকে যাবে, তার ভাবনা, বাসনা ও ইচ্ছার অনেক রহস্যই অনাবিষ্কৃত থাকবে। অতি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার পরও তার নিভৃত অন্তরের সামান্যতম রহস্যের সন্ধানও মিলবে না, তার বারি বিন্দুর মতো স্বচ্ছ চক্ষুর অন্তরালবর্তী গোপনতা অনুদ্ঘাটিতই থেকে যাবে। একটি প্রিয় মুখের অনর্গল কথা কি এক অমোঘ শক্তি ছড়িয়ে দেয় শিরায় শিরায়, এমন এক দুর্নিবার আকর্ষণে অহরহ বাঁধতে চায়, মনে হয় সে যেন অন্য কেউ নয়—একান্ত আপন। তবু আকাশের তারাদের ব্যবধান তার মাঝে। হয়ত তারাদের কাছে পৌঁছানো সহজ। অদ্ভুত তাই নয়?"

"অত সব ব্যাপার আমি বুঝি না," সেভেল বললো, "ও সব গভীরতা আমি বুঝতে চাই না। চোখের ভেতরে কি আছে, জানতে আমার বয়েই গেছে। বাইরেটুকু বুঝলেই আমার যথেষ্ট।"

সারভিনি নিজের মনেই যেন বললো, "যাই বলো, জোয়েত এক অপার রহস্য। কাল সকালে আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে, কে জানে!"

মার্লির কাছাকাছি আসতে আকাশ পরিষ্কার হলো। দূরে কোন খামার বাড়ি থেকে অস্পষ্ট মোরগের ডাক শোনা গেল। বাঁ দিকের পার্ক থেকে ভেসে এলো কোন পাখীর একটানা বিরক্তিকর সুর। সেভেল বললো, "চলো ফেরা যাক।"

সারভিনি যখন ঘরে পা দিলো, খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পেলো পূব দিগন্ত জুড়ে গোলাপী আভা। ভেনিসীর পাল্লাটি বন্ধ করে পুরু পর্দা টেনে দিলো। তারপর বিছানায় এলিয়ে পড়তে ঘুম আসার দেরি হোলো না। সারাক্ষণ জোয়েতের স্বপ্ন।

একটা অদ্ভুত শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসে কান পেতে

থাকলো, কিন্তু কিছু বোঝা গেল না। হঠাৎ জানালার পাল্লার অবিশ্রান্ত বিকট আওয়াজ হতে থাকায় সে গিয়ে জানালা খুলে দিলো। বাগানের পথে দাঁড়িয়ে জোয়েত তার জানালায় পাথরের নুড়ি ছুঁড়ছিল। তার পরনে হলদে পোশাক, মাথায় সেপাইয়ের মতো পালক-গোঁজা চাওড়া ঘাসের টুপি, মুখে দুষ্টুমি ভরা বিদ্রূপের হাসি। "এই যে মাস্কেদ, এখনও ঘুম? কাল সারারাত ধরে কি করা হয়েছিল যে এত বেলায় ঘুমুতে হচ্ছে? বেচারা মাস্কেদ, কোন এ্যাডভেঞ্চার?"

"আসছি, আসছি মামজেল, এক মিনিট। চোখে মুখে জল ছিটিয়েই আসছি।"

"দশটা বাজে, শীগগির। কয়েকটা কথা বলবো, তোমার কিছু কাজ আছে, জান তো এগারোটায় ব্রেকফাস্ট?"

বাগানে নেমে সারভিনি দেখলো হাঁটুর ওপর একটা গল্পের বই খুলে সে বসে আছে। যেন গত রাতে কিছুই হয়নি এমনি সহজ সহৃদয়তায় খুশী হয়ে জোয়েত সারভিনির একটি হাত নিজের মুঠোয় ভরে নিয়ে বাগানের কোণের দিকে এগিয়ে চললো। "আমার প্ল্যানটা শোন। মা বলছেন, ভদ্রমেয়েরা গ্রেনোইলেরে যায় না। কেউ যাক বা না যাক ওতে কিছু এসে যায় না। আমি দেখতে চাই মার আদেশ অমান্য করে তুমি আমাকে আজ ওখানে নিয়ে যাচ্ছ, ঠিক তো? ওখানে গিয়ে সকলের সঙ্গে আমরা নদীর ওপর হৈ চৈ করব।"

জোয়েতের সারা দেহ ঘিরে এক হালকা-মধুর স্নিগ্ধ সুবাস। তার মায়ের মতো প্রসাধনীর উগ্র গন্ধ নয়, বরং এক কমনীয় মৃদু সৌরভ, তার মধ্যে একটু আলতো করে আইরিশ পাউডারের প্রলেপ। সব মিলিয়ে যেন এক সতেজ সুগন্ধি ভার্বিনা তরু।

সারভিনির মুখের খুব কাছে তার মুখ। তার নির্মল প্রশ্বাসে সারভিনির মুখ তৃপ্ত, বুক কানায় কানায় ভরে উঠলো। সে ভেবে পেলো না তার বেশ, কেশ অথবা দেহের সুরভি। মনে হোলো

এই অপরিচিত মধুর সুগন্ধ যেন এই কিশোরীর দেহে বসন্ত সমারোহে বিমুগ্ধ ইন্দ্রিয় থেকে স্বতোৎসারিত।

"তুমি যাবে না মাস্কেদ?" সে বললো, "মা গরমকে খুব ভয় পায়। আর খাবার পর যা গরম পড়বে, উনি কিছুতেই ঘর ছেড়ে বেরোতে চাইবেন না। তোমার বন্ধুকে রেখে আমরা বনে ঘোরবার ছল করে বেরিয়ে পড়ব। গ্রেনোইলেরে গেলে খুব মজা হবে—নিয়ে যাবে তো?"

রাস্তা ধরে ওরা ধীরে ধীরে হাঁটছে। সেন নদীর ধারে একটি গেট। শান্ত নদীর বুকে তাথৈ আলোর বন্যা। স্রোতের ওপর উজ্জ্বল কুয়াশার বাষ্প ঝুলছে। মাঝে মাঝে দুটো একটা হাল্কা নৌকো আর মাল বোঝাই বোট নদীর ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে, মার্লির পাশ দিয়ে যাবার সময় স্টীম বোটগুলো ভেঁপু বাজিয়ে সংকেত জানায়। দূর থেকে সেই ভেঁপুরব কানে আসছে। রবিবারের ছুটি কাটাতে দলে দলে লোক রেলগাড়ি করে ছুটে আসে এই গ্রাম্য পরিবেশে। দূরাগত সেই গাড়ির বাঁশিও শোনা যাচ্ছে।

টুং টুং ঘণ্টা বাজতেই ওরা ফিরে এলো। ব্রেকফাস্ট সমাধা হলো চুপচাপ। ক্রমে জুলাইয়ের নিদাঘের দুপুর ভারী হয়ে চেপে বসল, দেহ মনে এক অমোঘ অবসন্নতা। বাঁধা ঠেলে জড় জিহ্বা যেন বাক্যস্ফুরণে অনিচ্ছুক।

এতক্ষণের নীরবতায় একমাত্র জোয়েতই অধৈর্য, বিরক্ত। খাওয়া শেষ হতেই সে বলে উঠলো, "এই গরমে বনের মধ্যে গাছের ছায়ায় ছায়ায় বেড়ালে বেশ হতো।"

মারসিঅনেস আঁতকে উঠলো, "পাগল হয়েছ নাকি?" তাব চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। "এই গরমে বাইরে যাওয়া যায়!"

কন্যার জবাব, "বেশতো তুমি আর ব্যারন ঘরে থাক। মাস্কেদ আর আমি পাহাড়ে গিয়ে ঘাসের ওপর বসে বই পড়ব।" সারভিনির দিকে ফিরে বললো, "কিছু বলছ না যে!"

"তোমার জন্যে সব করতে পারি মামজেল।" জোয়েত দৌড়ে গেল টুপি আনতে।

"মেয়েটার সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেছে—" মাথা নেড়ে বলতে বলতে অবসাদে ঝিমিয়ে পড়ে মারসিঅনেস তার ফর্সা সুন্দর হাতটি ছড়িয়ে রাখল, আর ব্যারন তার ওপর দীর্ঘ একটি চুম্বনের আলিম্পন এঁকে দিলো।

জোয়েত আর সারভিনি বেরিয়ে পড়লো। এখনও গ্রেনোইলেরে যাবার সময় হয়নি, তাই নদী বরাবর এগিয়ে পুল পেরিয়ে তারা এলো দ্বীপের ভেতর, ঝরনার ধারে উইলো গাছের ছায়ায় বসলো আরাম করে। জোয়েতের পকেট থেকে বেরলো একটা বই। হাসতে হাসতে সারভিনির দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো, "এটা পড় তো মাস্কেদ, শুনি।"

অত্যন্ত হতাশ ভঙ্গীতে মাস্কেদ বললো, "আমায় বলছ মামজেল? আমি পড়তে জানি না।"

"হায় আদর্শ প্রেমিক আমার! কিছু না পেলেও সব উজাড় করে দাও—এই তোমার নীতি। কোন অজুহাত চলছে না, লক্ষী ছেলের মতো শুরু করে দাও দেখি।"

বইটার পৃষ্ঠা ওল্‌টাতেই চোখ ছানাবড়া। কীট তত্ত্বের বই, এক ইংরেজ লেখকের লেখা 'পিপীলিকার ইতিবৃত্ত'। এ কি ধরনের কৌতুক, সে ভাবলো কিছুক্ষণ। জোয়েতের তাগাদা, "কই শুরু করো।"

সে প্রশ্ন করলো, "একি তোমার কোন বাজি, না শুধুই কৌতুক?"

"কোনটাই নয়। দোকানে গিয়ে পেয়ে গেলাম। দোকানদার বললে পিঁপড়ের ওপর এটাই সবচেয়ে ভাল বই। ভাবলাম এই ক্ষুদে জীবদের জীবনের নানা কথা শুনতে শুনতে ঘাসের ওপর দিয়ে ওদের চলাফেরা দেখতে বেশ মজা লাগবে। পড় দেখি।"

কনুয়ে ভর রেখে সে সটান উপুড় হয়ে শুয়ে একদৃষ্টে ঘাসের দিকে তাকিয়ে থাকলো। সারভিনি পড়ে চললো:

'দৈহিক গঠনাগত মিলের কথা ধরিলে একথা নিঃসন্দেহে বলিতে হয় যে, অন্যান্য সব জীবজন্তুদের মধ্যে একমাত্র বানর জাতীয় জীবেরাই মানুষের নিকটতম আত্মীয়। কিন্তু পিপীলিকাদের আচার ব্যবহার, সমাজব্যবস্থা, সংগঠন, তাহাদের গৃহনির্মাণ পদ্ধতি, পথঘাট, পশুপালন-বিধি এবং কখনও কখনও তাহাদের মধ্যে প্রবর্তিত দাসপ্রথা মনোযোগ সহকারে অবলোকন করিলে এ কথা মানিতে হইবে যে বুদ্ধির অগ্রগতিতে মানুষের পরবর্তী স্থান ন্যায়তঃ তাহাদেরই প্রাপ্য।'

একটানা বিরক্তির সুরে সারভিনি পড়ে পড়ে যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে থেমে বলছে, "অনেক তো হোলো, এবারে আমি থামি?"

জোয়েতের হাতে একটি ঘাসের শীষ। তার ওপর সঞ্চরমাণ একটি পিঁপড়ের দিকে সোৎসাহে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে পিপীলিকার গতিবিধি পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত। কথা বলার ফুরসত নেই। মাথা নেড়ে ইশারায় সারভিনিকে থামতে নিষেধ করে ঘাসের ডগাটি উল্টে পাল্টে পিঁপড়েটিকে স্বচ্ছন্দে চলাফেরার সুযোগ করে দিলো। পিঁপড়েটা চলতে চলতে আঙুলের কাছাকাছি চলে এলে ঘাসটাকে উল্টো করে ধরে তাকে নিচের দিকে নামিয়ে দিচ্ছিল। নীরব ধৈর্যে অতীব মনোযোগের সঙ্গে সে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটের জীবনবৃত্তান্ত, তার বিস্ময়কর খুঁটিনাটি শ্রবণরত। কেমন করে মাটির তলদেশে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদের গোপন ঘরবাড়ি নির্মিত হয়, মানুষের গরু পোষার মতো ছোট ছোট কীটের ছানা ধরে এনে তাদের দেহ নির্গত রসপান করার জন্য কেমন করে তাদের খাইয়ে দাইয়ে যত্ন নিয়ে বাঁচিয়ে তোলে, চোখ না ফোটা ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ-শিশুদের ধরে কেমন করে ওরা পোষ মানায়, পরে ভৃত্যের মতো ওরাই তাদের বাসস্থান পরিষ্কার করে, আর প্রয়োজনে প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিতদের বন্দী করে নিয়ে আসে প্রভু পিঁপড়েদের সেবায় নিয়োজিত করবার জন্য। ভৃত্যরা এসব কাজ

এমন উদ্‌বেগাকুল চিত্তে একাগ্র মনে সম্পন্ন করে যে অনেক সময় নিজেদের খাবার কথা ভুলে যায়।

অতি ক্ষুদ্র অথচ অতীব বুদ্ধিমান এই জীবটির জন্য জোয়েতের মনে ধীরে ধীরে কেমন এক মাতৃসুলভ মমতা জন্ম নিল। আঙুল বেয়ে উঠছে দেখেও সে বাধা দিলো না, বরং স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার আদর করতে ইচ্ছে হলো। সারভিনি পড়ে চলেছে, কেমন সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত এই জীব, কেমন ভাবে শক্তি ও বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য নিজেদেব মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে থাকে। তারুণ্যের চাঞ্চল্যে ভরপুর জোয়েত চুম্বন করতে গিয়ে দেখে কোন্ ফাঁকে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে দুষ্টু কীটটি তার গালের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে। যেন বাঘ পড়েছে, এমনি প্রবল ভাবে জোয়েত মাথা ঝাঁকিয়ে লাফিয়ে উঠলো, সজোরে গালে চড় মেরে পোকাটাকে তাড়াতে চাইল। উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ে সারভিনি তার ঘাড়ের ওপর ঝুলে থাকা থোকা থোকা চুলের মধ্য থেকে জন্তুটিকে উদ্ধার করলো আর সেই বিশেষ স্থানটিতে আবেগভরে অর্পণ করলো এক দীর্ঘতর চুম্বন। জোয়েত কিন্তু সরে গেল না।

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জোয়েত ঘোষণা কবলো, "উপন্যাসের চেয়েও এই কাহিনী আমার ভাল লেগেছে। এবার চল না গ্রেনোইলেরে যাওয়া যাক।"

দ্বীপের এই মনোবম উদ্যানটিতে ঘন সমাচ্ছন্ন বৃক্ষের ছায়াতলে উপস্থিত হোয়ে তারা দেখলো স্নেন নদীর নয়নাভিবাম উপকূল জুড়ে ইতিমধ্যেই কপোত কপোতীর ভিড়। নদীতে তরণীর আনাগোনা। কত ধরনের লোক। যুবকেব সঙ্গে তরুণী বান্ধবী, কর্মী যুবতীর সঙ্গে প্রেমিক পুরুষ—সব হাঁটছে পাশাপাশি—ঘেঁষাঘেঁষি। কতকগুলো লোকের চেহাবা ক্লান্ত ঝোড়ো কাকের মতো। কোট খুলে ঝুলিয়ে নিয়েছে হাতে, পবনে ঢিলা জামা, মাথার পেছন দিকে ঝোলানো মস্ত লম্বা টুপি। কেরানীবাবুরা এসেছে সপরিবারে। স্ত্রীর পরনে

রবিবাসরীয় সুন্দর পোশাক, আর মাকে ঘিরে মুরগীর ছানার মতো একপাল ছেলেমেয়ে। মনুষ্য মুখনিঃসৃত নিরবচ্ছিন্ন গুঞ্জরণ, একটানা হট্টগোল নৌকোবিলাসীদের প্রিয় স্থানটির নিকটত্ব ঘোষণা করছে। হঠাৎ প্রকাণ্ড এক বজরা এসে তীরে ভিড়লো, মস্ত ছাউনির ভেতরটা অগণন মেয়ে পুরুষে ঠাসা। টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে অথবা বসে তারা সুরাপান করছে। একজন বাদ্যকরের হাতে বেহালা, ভাঙা টিনের কানেস্তারার মতো তার বিকট, বেসুরো আর্তনাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সবাই হাসি হুল্লোড়, নাচ গানে মাতোয়ারা। সুঠামাঙ্গী সুকেশী বামাকুল তাদের সম্মুখ ও পশ্চাদভাগের সঞ্চরণশীল উন্নত দেহাংশ যতদূর সম্ভব প্রস্ফুটিত করে সতৃষ্ণ নয়নে মদে আর আহ্লাদে নিজেদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথায় জোকারের টুপি আর পরনে সাঁতারের ছোট প্যান্ট অর্ধনগ্ন একজন যুবককে ঘিরে শুরু হয়েছে একদল মেয়ের উদ্দাম নৃত্য। পাউডারে আর ঘামে মাখামাখি, রকমারী প্রসাধনীর সঙ্গে স্বেদ গন্ধ মিশে চারিদিক আমোদিত। বাকি যারা লাল, সাদা, হলুদ, সবুজ পানীয়ের পাত্র নিয়ে বসেছে, পূর্ণ পাত্র গিলতে গিলতে বিনা কারণে বিকৃত তীক্ষ্ণ চীৎকারে কান ঝালাপালা করছে। ফলে এক আসুরিক হট্টগোলে কর্ণ ও মস্তিষ্ক ঝিম্‌ঝিম্‌ করার যোগাড়। মাঝে মাঝে দু'চারজন সাঁতারু জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আর বসে-থাকা লোকজনের গায়ে জলের ছাট আসতেই শুরু হচ্ছে যত রাজ্যের খিস্তির মধুর আপ্যায়ন।

নদীর বুকে সারিবদ্ধ নৌকোর মিছিল। সরু, লম্বা, হাল্কা নৌকোগুলো বলিষ্ঠ কর্ণধারের উন্মুক্ত পেশল বাহুর জোরে তর্‌তর্‌ করে এগিয়ে চলেছে। নৌকোর ওপর মেয়েরা চুপচাপ অলস ভঙ্গীতে বসে। যেন তন্দ্রার আমেজে জলের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে। তাদের পশমের পোশাক আর মাথার ওপর ধরা ছাতার বর্ণ বাহার রৌদ্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে অপূর্ব কিরণচ্ছটা সৃষ্টি করেছে। যাত্রী বোঝাই তরীগুলির গতি মন্থর। চপলমতি এক ছাত্র বাহাদুরী দেখাবার জন্য

বেপরোয়ার মতো সাঁতার কাটতে গিয়ে প্রতিটি নৌকোর গায়ে গুঁতো খেলো আর যাত্রীদের নির্বিচার গালাগাল নীরবে হজম করলো। তারপর দুজন সাঁতারুকে প্রায় নাকানিচোবানি খাইয়ে ভাসমান কাফেগুলোর অগণিত যাত্রীর বিদ্রূপ বাক্য নস্যাৎ করে দিয়ে ডুব সাঁতারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই গড্ডালিকার মধ্য দিয়ে সারভিনির বাহুলগ্ন জোয়েত সানন্দে ভিড় ঠেলে এগিয়ে চললো। এই রকমারী লোকের মেলায় পিষ্ট মহাসুখী এই মেয়েটি অন্যান্য মেয়েদের প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো!

"ওই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখ মাস্কেদ কি সুন্দর চুল! ওগুলো যেন নিজেরাই খেলা করছে।"

আগাগোড়া লাল পোশাকে মোড়া বাদ্যকর, মাথায় আবার মেয়েলী ছাতার মতো প্রকাণ্ড রঙিন টুপি, পিয়ানো নিয়ে নাচের বাজনা শুরু করতেই স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতায় সঙ্গীর কোমর জড়িয়ে ধরে জোয়েত নাচের আসরে অবতীর্ণ হোলো। তাদের একটানা উন্মত্ত মাদকতা সমগ্র জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। যারা বসে বসে মদ খাচ্ছিল, লাফিয়ে টেবিলের ওপর উঠে পায়ে তাল ঠুকতে শুরু করে দিলো—গ্লাস ভাঙলো কেউ কেউ।

বাদ্যকর যেন জ্ঞানহারা। বিশাল টুপিসহ মাথাটিকে প্রচণ্ডভাবে দুলিয়ে সমস্ত শরীরে বিচিত্র ভঙ্গী করে পিয়ানোর হাতির দাঁতের চাবির ওপর উদ্দাম গতিতে হস্ত সঞ্চালন করে চললো।

অকস্মাৎ বাজনা থামিয়ে শ্রান্ত বাদক তার মস্ত টুপিসহ মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লো, সকলের উল্লাস ধ্বনিতে কাফে ফেটে পড়বার যোগাড়। যেন মারা গেছে, এমনি ত্রস্ত পায়ে চারজন বন্ধু ছুটে গেল। বিশাল টুপিটা বাদকের পেটের ওপর চাপিয়ে চারজন চারদিক থেকে তাকে চ্যাংদোলা করে ঝুলিয়ে নিল। আর এক প্রস্ত হৈচৈয়ের পালা। এই নকল, মৃতটিকে নিয়ে এক দীর্ঘ মিছিল সমগ্র দ্বীপটি পরিক্রমা করে বেড়ালো। উদ্দেশ্যহীন পথচারী অথবা পানরত

মানুষ এই কৌতুকের আস্বাদ পেয়ে নিখরচায় মজা লুটে নিল। হাততালি দিয়ে আনন্দে জোয়েত নেচে উঠলো, "কি মজা, মাস্কেদ্, দেখেছ কি মজা!"

সারভিনি গম্ভীর। এই উচ্ছৃঙ্খল জনতার মধ্যে তাকে এমন উল্লসিত দেখে সে ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ। তার মনে বদ্ধমূল ধারণা, কোন উত্তেজনার মুহূর্তেও সম্ভ্রান্ত লোকেরা এমন অরুচিকর পরিবেশ আত্মবিস্মৃত হয় না। বিস্ময়ে হতবাক্ সারভিনি মনে মনে উচ্চারণ করলো—'তোমায় এই অতি উৎসাহের জন্যে কেউ তোমাকে বাহাদুরী দেবে না, বালিকা!' কোন বারাঙ্গনার সঙ্গে কথা বলতে যেমন কোন গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন হয় না, সারভিনিও তেমনি সহজে মনে মনে জোয়েতের সঙ্গে সাফ কথা বলতে চায়। সকলের মতো সেও যেভাবে এগিয়ে চলেছে, যেভাবে অশ্রাব্য রসিকতায় মেতে উঠেছে, তাতে ওই লালচুলো মেয়েগুলোর চেয়ে তাকে আর পৃথক মনে হচ্ছে না। এই জনতার মুখে এখন ইঙ্গিতময় অশ্লীল কথা ছাড়া অন্য কথা নেই, যেন সব আঁস্তাকুড়ের মাছি অথবা গুবরে পোকার মতো মাথার ওপর ভন্ ভন্ করে বেড়াচ্ছে। এতে কারো বিরক্তি বা বিস্ময় নেই। আর আশ্চর্যের কথা, জোয়েতও নির্বিকার।

"মাস্কেদ, আমরা স্নান করবো। চলো নদীর মাঝখানে যাই।"

"যো হুকুম", সারভিনির উত্তর।

স্নানের পোশাক আনতে তারা গেল কেবিনের দিকে। চট্‌পট্ তৈরি হয়ে জোয়েত নদীর পাড়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো, আর যে কেউ তার দিকে তাকালো, সবাইকে মিষ্টি হাসি বিতরণ করে চললো।

নদীর খানিকটা তারা পাশাপাশি হেঁটে পার হলো। তারপর স্রোতে গা ভাসিয়ে পরম আয়াসে সাঁতার কাটলো জোয়েত। হাত চালানোর সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে শরীরটাকে আলগা করে তুলে ধরার কসরত চললো কিছুক্ষণ। ওর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া রীতিমতো কঠিন। হাঁপিয়ে পড়ে নিজের দুর্বলতায় নিজের ওপর বেজায় রাগ হলো

সারভিনির। কিন্তু জোয়েত তলিয়ে গিয়ে অনেক দূরে সহজ ভঙ্গীতে ভেসে উঠলো জলের বুকে। তার হাতদুটো আড়াআড়ি করে বুকের ওপর রাখা, চোখদুটি স্থির হয়ে আছে নীল আকাশের দিকে। সারভিনির দৃষ্টি তার প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো কোমল চিক্কণ তনুদেহের দিকে। ওই বরণীয় দেহের প্রতিটি রেখা তার চোখে ধরা দিলো। যেন প্রলুব্ধ করার জন্যে, নিজেকে উজাড় করে দেবার জন্যে অথবা প্রতারণা করার জন্যে জোয়েত এভাবে নিজেকে মেলে ধরেছে। প্রতিটি অঙ্গ একান্ত করে পাবার জন্যে তার চিত্ত আকুলিবিকুলি করতে লাগলো। অকস্মাৎ ঘুরে তার দিকে তাকিয়ে জোয়েত সহাস্য বদনে বলে উঠলো, "তোমার মাথাটি ভারী সুন্দর তো!"

কৌতুকময়ী নারীর এই বিদ্রূপবাণে সারভিনি আহত হলো। প্রত্যাঘাতের জেদ থেকে বললো, "ওই জীবনই তোমার ভাল লাগে, তাই না?"

"কোন জীবন?"—অবুঝ অবলার ভঙ্গী।

"আমি কি বলতে চাইছি, বেশ ভালই বুঝতে পেরেছ। এবার চল দেখি, বেয়াদবি যথেষ্ট হয়েছে।"

"সত্যি বলছি, আমি বুঝতে পারিনি।"

"বলছি, অনেক আনন্দ করা হলো, এবার যাবে কি?"

"তোমার কথা সত্যিই মাথায় ঢুকছে না।"

"তুমি তো এত বোকা নও, তাছাড়া কাল রাতেই তোমায় জানিয়ে দিয়েছি।"

"কি বলেছিলে? একদম ভুলে গেছি।"

"বলেছিলাম, তোমায় ভালবাসি।"

"তুমি?"

"হ্যাঁ, আমি!"

"মিথ্যুক!"

"ঈশ্বরের দোহাই।"

"প্রমাণ দাও।"

'এর চেয়ে বেশি প্রমাণ দিয়ে আমার আর কাজ নেই

"দাওই না, দেখি।"

"কাল রাতে এ কথা তো বলনি!"

"কাল রাতে তুমি তো কিছু জানতে চাওনি।"

"ওঃ, যত বাজে কথা।"

"তাছাড়া আমাকে জানালেই তো হবে না

"সে তোমার করুণ তবে আর কাকে বলতে হবে?"

"অবশ্যই মাকে।"

সারভিনির ঠোঁটে হাসি।

"তোমার মাকে? ওটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না?"

জোয়েতের মুখ অন্ধকার। সোজা সারভিনির চোখে চোখ রেখে বললো, "শোনো মাস্কেদ, তুমি যদি সত্যিই আমায় ভালবেসে বিয়ে করতে চাও, তো আগে মাকে বল, তারপর আমার মত জানাব।"

তাকে পরিহাস করছে ভেবে এবার সারভিনি সত্যি সত্যি গরম হয়ে উঠলো, "আমাকে তোমার অন্য সব চাটুকারদের মতোই নির্বোধ ভাব, তাই না মামজেল?"

"ঠিক বুঝলাম না।"

রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়ে রুক্ষ গলায় সারভিনি বললো, "দেখ জোয়েত, তোমার এই বিরক্তিকর ন্যাকামি অনেক তো হলো, এবার একটু ক্ষান্ত দাও দেখি। তুমি যতই অবোধ বালিকা সাজতে চাও না কেন, বিশ্বাস করো, তোমায় একটুও মানায় না। খুব ভাল করেই জান যে তোমায় বিয়ে করার কোন প্রশ্নই ওঠে না—কথাটা হচ্ছে প্রেমের। আগেও বলেছি, এখনও বলছি—তোমায় ভালবাসি, আর এ কথাটা বিশ্বাস করতে পার। এখন আর না বোঝার ভান কোরো না, আর আমাকেও বোকা বানাতে চেষ্টা কোরো না।"

হাত দিয়ে জল কেটে কেটে তারা মুখোমুখি ভেসে এল। সেই অবস্থায় কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল থেকে যেন জোয়েত কথাগুলির অর্থ উদ্ধার করতে চেষ্টা করলো, তারপর হঠাৎ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো।

তার গণ্ডদেশ থেকে রক্তের ধারা উছলে পড়লো কর্ণমূলে। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সমর্থ বাহুর দ্রুত সঞ্চালনে সে তীরের দিকে ছুটে চললো। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সারভিনির হাঁপানোই সার হলো, তার নাগাল পেলো না। কূলে উঠে জোয়েত তার পোশাক নিয়ে সোজা কেবিনে ঢুকে গেল—একবার ফিরেও তাকালো না।

সারভিনি মনমরা, কি যে করবে, বুঝে উঠতে পারলো না। অনেক সময় নিয়ে পোশাক পরতে পরতে চিন্তা করলো কি করা যায়; —ক্ষমা চাইবে, না রাগ পড়া অবধি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে। কিন্তু সে তৈরী হয়ে দেখলো জোয়েত একাই চলে গেছে। বিরক্ত ও চিন্তাগ্রস্ত সারভিনি ফিরে চললো।

সেভেলের বাহুবন্ধনে মারসিঅনেস উদ্যানের বৃত্তাকার পথে পায়চারী করছিল। গতরাত থেকেই মারসিঅনেস বেশ সাহস সঞ্চয় করেছে। সারভিনিকে দেখতে পেয়ে বেশ সাহস ভরেই বললো, "দেখতো রোদ্দুরে জোয়েতের শরীর খারাপ করেছে—চোখমুখ লাল টক্‌টক্‌ করছে, মেয়েটার ভীষণ মাথা ধরেছে। দেখগে বিছানায় পড়ে আছে। তখনই বলেছিলাম, এই রোদে বাইরে গিয়ে কাজ নেই। এতক্ষণ রোদে রোদে টো টো করে এল, ভগবান জানেন—আরও কি কি দস্যিপনা করেছে। মেয়েটার যেটুকু জ্ঞান আছে, তোমার দেখছি তাও নেই!"

জোয়েত ডিনারেও এলো না। বন্ধ দরজার ভেতর থেকে জানিয়ে দিল তার ক্ষিদে নেই—আর সে একাই থাকতে চায়।

দশটার ট্রেনে যুবকদ্বয় ফিরে গেল। জানিয়ে গেল পরের বৃহস্পতিবার আবার আসবে। খোলা জানালার কাছে বসে রইল মারসিঅনেস। নির্জন শান্ত রাত্রির বাতাসে ভেসে এলো দূরের লা গ্রেনোইলেরের নৃত্য গীতের মন-মাতানো বাজনার রেশ।

ওস্তাদ ঘোড়সওয়ারের মতো প্রেমের ব্যাপারে অভিজ্ঞ মারসিঅনে-সের মনেও মাঝে মাঝে জ্বরের মতো হৃদয়দৌর্বল্য উপস্থিত হয়। কামাভিলাষ তখন তার তনুমন সম্পূর্ণ বিবশ করে দেয়। হৃদয় হয়

অশান্ত, উতলা, মাতাল। প্রচণ্ড নাটকীয় খামখেয়ালিপনায় অন্তর ভরে ওঠে।

শুধু দেহের বেসাতির জন্যেই যেন তার জন্ম। নিজের অজ্ঞাতসারেই কখন ভালবাসা মূলধন করে সমাজের নীচের তলা থেকে ওপর তলায় উঠেছে। জীবন সংগ্রামে পশুদের ধূর্ততা যেমন সহজাত, তেমনি স্বতঃস্ফুর্ত প্রেরণায় চুম্বন আর মুদ্রার মধ্যে কোন ব্যবধান না করে সে আশ্চর্য ক্ষমতাবলে অগ্রসর হয়েছে। তার বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছে অসংখ্য প্রেমিক, কিন্তু কারও প্রতি বিশেষ ভাবে অনুরক্ত বা বিরক্ত সে হয়নি কখনও। পথচারীর যেমন খাদ্যের বাছবিচার নেই কেননা সে জানে, তাকে বাঁচতে হবে—তারও কোন বিচার ছিল না। প্রত্যেকের আলিঙ্গন সে শান্ত চিত্তে অসীম ধৈর্যে বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম ঘটে। এক এক জন তার দেহ মনে বহ্নি প্রজ্বলিত করে দেয়, সে জ্বলতে থাকে। বিশেষ কোন প্রেমিকের স্পর্শে সে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস দগ্ধ হতে থাকে। সেইগুলোই তার জীবনে সুখের দিন। তখন সে এক কল্পলোকের ভাবনায় বিভোর হয়ে প্রেমের স্বর্গ রচনা করেছে। প্রেম-সুরায় উন্মত্ত উত্তেজিত মারসিঅনেস নিজেকে সঁপে দিয়েছে প্রেমের বন্যায়—মহাসুখে গা এলিয়ে ভেসে গেছে ভালবাসার টানে--ভেবেছে আসে আসুক মৃত্যু। এ যেন আত্মহত্যার নিমিত্ত সমুদ্রের বুকে আত্মসমর্পণ। কতদিন কত ভিন্ন প্রকৃতির লোকের কথা ভেবে নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে সারারাত ধরে স্বপ্ন রচনা করেছে—সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সে খুবই অবাক হবে। তবু প্রতিবারেই নতুন অনুভূতির রং লেগেছে মনে।

এবারের স্বপ্ন সেভেলকে ঘিরে। তার উজ্জ্বল স্মৃতিতে অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত, হৃদয়ে সুখের আবেশ। সেভেল তাকে জয় করে নিয়েছে, তার প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছে।

পেছনে শব্দ শুনে সে ফিরে তাকালো। উল্টোদিকের খোলা জানালায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে জোয়েত। সারাদিনের পরে-থাকা

পোশাক মলিন, তার রাঙা চোখ দুটোয় পরিশ্রমের সুস্পষ্ট ছাপ। সে বললো, "আমার কয়েকটা কথা ছিল।"

একটু অবাক হয়ে মা মেয়ের দিকে তাকালো। কন্যার প্রতি তার ভালবাসা একেবারে নিঃস্বার্থ নয়। সম্পদের জন্য ধনীব গর্ব, আর তার গর্ব মেয়ের রূপেব জন্য। সে নিজেও রূপসী। তাই ঈর্ষার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু তার মনে যে ভাবনা স্বাভাবিক, তাব বাস্তব রূপায়ণে যেন ততটা আগ্রহ নেই; তবে মেয়েব মূল্য না বোঝার মতো এত কম বিচক্ষণও তাকে ভাবা উচিত নয়।

মাবসিঅনেস বললো, "হ্যাঁ, মা, কি বলবি বল, আমি শুনছি।"

জোয়েত যেন চোখ দিয়েই মায়েব মন পড়ে ফেলবে—এমনি জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে বললো, "এক্ষুনি একটা অবাক কাণ্ড ঘটে গেছে।"

'কি ঘটেছে?'

"মসিয়ো দ্য সাবভিনি বলেছে, সে আমায় ভালবাসে।"

কিছুটা অশান্ত চিত্তে মা প্রতীক্ষা কবলো। কিন্তু জোয়েতকে নীরব থাকতে দেখে বললো, "কি ভাবে কথাটা পাড়লে—খুলে বল দেখি!"

মায়ের পায়ের কাছে গুটি সুটি বসে আদুরে ভঙ্গীতে তাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'ও আমায় বিয়ে কবতে চায়।"

এর চেয়ে বিস্ময় আব নেই, এমনি করে মা বলে উঠলো. "সারভিনি? তুমি কি পাগল হয়েছে?"

মায়ের বিস্ময় আর ভাবনাব প্রতিটি রেখা পাঁতি পাঁতি কবে খুঁজে নেবার জন্য জোয়েত তাব মুখ থেকে এক মুহূর্তেব জন্যও দৃষ্টি শিথিল হতে দিলো না। গম্ভীর গলায় শুধালে, "কেন, এতে পাগলামীব কি দেখলে! মসিয়ো দ্য সারভিনি কি আমায় বিয়ে করতে পাবে না?"

বিব্রত মারসিঅনেস আমতা আমতা করে জবাব দিলো, "এ বোধ-হয় ঠিক নয়। কোথাও ভুল হয়েছে। তুমি শুনতে ভুল করেছ, অথবা ঠিক ঠিক বুঝতে পারনি। মসিয়ো দ্য সারভিনির মতো বড়লোক

তোমায় বিয়ে করবে না, আর এমন একজন গোঁড়া প্যারিসিয়ান আদৌ বিয়ে করবে কিনা সন্দেহ।"

জোয়েত ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। বললো, "কিন্তু ও যদি ভালবাসে, ও যেমন বলে থাকে ?"

অধৈর্য হয়ে মারসিঅনেস বলে উঠলো, "এ সব ধারণা মনে স্থান না দেওয়ার মতো যথেষ্ট বয়স আর বুদ্ধি তোমার হয়েছে বলেই আমার ধারণা ছিল। সারভিনি এ জগতের লোক, আর নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে খুবই সচেতন। ও সমাজ এবং অর্থকৌলিন্য দেখেই বিয়ে করবে। তোমাকে বিয়ের কথা বলে থাকলে তার অর্থ হোলো সে চায়···সে চায়—।'

নিজের সন্দেহটি ভাষায় প্রকাশ করতে না পেরে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে বললো, "যাও শোও গে, আমায় একটু নিরালা থাকতে দাও।"

যা জানতে এসেছিল—যেন জানা হয়ে গেছে এমন বিনীত ভাবে তরুণী বললো, "আচ্ছা মা,"—মায়ের কপালে চুমু খেয়ে সে চলে গেল। দরজার কাছে পৌঁছতে মারসিঅনেস ডেকে বললো, 'শরীরটা এখন ভাল আছে তো ?"

"আমার শরীর বরাবরই ভালো আছে। ওই ব্যাপারটার জন্যে মনটা খুব খারাপ ছিল।"

মারসিঅনেস জানালো, "এ সম্বন্ধে পরে আরও কথা বলা যাবে। কিন্তু এখন থেকে কিছুদিন একা একা ওর সঙ্গে কোথাও যেও না। এটা নিশ্চিত জেনে রেখো, ও কখনও তোমায় বিয়ে করবে না, বুঝেছ ? ও শুধু তোমাকে চায়—একটা বোঝাপড়ার জন্যেই চায়।"

অনেক চেষ্টায় মনের ভাব এইভাবেই সে ব্যক্ত করতে পারলো। জোয়েত নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। মাদাম ওবারদি আবার অতীত চিন্তায় ডুব দিলো।

দীর্ঘদিনের বিলাসবহুল উচ্ছল আনন্দময় জীবনে অভ্যস্ত মারসি-অনেস অযথা মন ভারাক্রান্ত করতে চায় না। পাছে দুঃখ পায়, তাই

নানা রকম চিন্তা এতদিন জোর করে ঠেকিয়ে রেখেছে। এইজন্য জোয়েতের ভবিষ্যৎ কখনও ভাবেনি। সময় এলে ভাবা যাবে—এই মনে করে নিশ্চিন্ত থেকেছে। সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে সম্ভ্রান্ত ধনীর ঘরে তার মেয়ের বিয়ে হবে না। অভাবনীয় জোর বরাত থাকলে আলাদা কথা, নয়ত দুঃসাহসী প্রেমের মন্ত্রবলে সিংহাসন লাভের কাহিনীও তো শোনা যায়! এমন সব সম্ভাবনায় সে বিশ্বাস করে না। কিন্তু নিজে আসরে না নেমে কি ভাবে কাজ হাসিল করা যায়, এই চিন্তাই এখন তাকে পেয়ে বসল।

মেয়েকেও তারই পথ বেছে নিতে হবে। তাকেও হতে হবে প্রেমের শিখা ; নয়ই বা কেন? কিন্তু কবে কি ভাবে তা সম্ভব হবে —একথা নিজের মনেও যাচাই করার সাহস তার হয়নি। আর আজ মেয়ে আচমকা এমন এক প্রশ্ন করে বসল, হুট করে যার জবাব দেওয়া যায় না। এমন জটিল, সূক্ষ্ম অথচ বিপজ্জনক ব্যাপারে চট্ করে কোন সিদ্ধান্ত করা উচিতও নয়। আর মেয়ের সামনে এই সব সম্বন্ধে মাকে একটু বিব্রত হতে হয়। মারসিঅনেসও ব্যতিক্রম নয়।

জীবনে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে যথেষ্ট। মানুষ চিনতে ভুল করে কমই, বিশেষ করে সারভিনির মতো মানুষ। তার বৈষয়িক বুদ্ধি সাময়িক ভাবে নিস্তেজ হতে পারে, কিন্তু কখনও পুরোপুরি উবে যায়নি। সারভিনির আসল উদ্দেশ্য ধরতে তার অসুবিধা হয়নি। তাই জোয়েতের কথা শুনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, "সারভিনি তোমায় বিয়ে করবে, তুমি কি পাগল হয়েছ?"

এই শক্তরে শয়তানটির সেই পুরোনো চাল চালবার পেছনে কি মতলব আছে? এর পর ও কি করবে? আর এই অবুঝ মেয়েটাকেই বা আর কিভাবে সচেতন করে দেওয়া যায়? প্রয়োজন হলে ওকে রক্ষা করার উপায় কি? এতটা বয়েস হোলো, তবু একটুও বুদ্ধি হয়নি, এখনও এত বোকা আর ছেলেমানুষ—এ কথা কেই বা বিশ্বাস করবে?

মানসিক উত্তেজনায় মারসিঅনেস কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ক্লান্ত, অবসাদ-গ্রস্ত। এই জটিল পরিস্থিতিতে সে বিচলিত হয়ে পড়লো। অবশেষে মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত করলো, ঠিক আছে, এবার থেকে এদের ওপর প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে, তারপর রোগ বুঝে চিকিৎসা। দরকার হলে সারভিনিকে দু'চার কথা বলতে হবে— ওর যা সূক্ষ্ম অনুভূতি, সামান্য মুখ খুললেই বুঝতে পারবে।

সে কি বলতে পারে, কি জবাব শুনতে হবে অথবা কোন ধরনের বোঝাপড়া করতে হবে—এ সব কিছুই সে ভাবলো না। আপাতত দুরূহ সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছে মনে করে সে মহাসুখী। তাই আবার প্রিয়তম সেভেলের স্বপ্নে তলিয়ে গেল। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে তার দৃষ্টি চলে গেল আবছা উজ্জ্বল কুয়াশায় ঢাকা প্যারিসের দিকে। দু' হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে যেন ওই মহানগরীকে আলিঙ্গন করবে—অসংখ্য চুম্বনে ওর ললাট ভরে দেবে। আঁধার পথে একের পর এক চুম্বন-দূত ছুটে চলল বিরহিণী প্রিয়ার বারতা নিয়ে। অস্ফুট স্বরে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো, "আমি তোমায় ভালবাসি, তোমায় ভালবাসি।"

৩

জোয়েতের চোখেও ঘুম নেই। তার মায়ের মতোই উন্মুক্ত বাতায়নে কনুই রেখে বসে আছে। আঁখি ভরে গেছে জলে—তার জীবনের প্রথম বেদনার অশ্রুবিন্দু। দুঃখ বেদনাহীন সুখী পরিবেশে সে বড় হয়ে উঠেছে। সে ছিল আত্মপ্রত্যয়শীল উজ্জ্বল এক যৌবন। কেন এই দুঃখ, চিন্তা আর আত্মবিশ্লেষণ! তার বয়সী অন্য মেয়েদের মতো কেন সে থাকতে পারবে না? কেন সন্দেহ, ভয় আর জ্বালাময় চিন্তায় সে ভুগবে? সব ব্যাপারেই সে থাকে বলেই কি? তার বন্ধু-বান্ধবদের চলন, কথাবার্তার ধরন আর স্পষ্টবাদিতা সেও অনুকরণ করে বলেই কি? অথবা সব কিছু জানার ভান করেছে বলে তার

এই দশা? তার গুছিয়ে বলা সুন্দর কথার মালা কোন পরিপক্ক মনের অভিব্যক্তি নয়, বরং নারী মনের স্বভাবসিদ্ধ অনুকরণস্পৃহা থেকেই সম্ভব হোতো। আসলে সদ্য কনভেণ্টে আগত বালিকার মতোই তার জ্ঞান ছিল অপরিপক্ক। শিল্পী বা সঙ্গীতজ্ঞের বালক পুত্র যেমন শিল্প বা সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করে, তার প্রেম সম্পর্কে ধারণাও ছিল সেই ধরনের। তাদের ঘরে উচ্চারিত যত সব প্রেমের প্রলাপের পেছনে কোন রহস্য আছে বলে সে হয়ত আঁচ করতে পারতো, কিন্তু তার সামনেই এমন ভাবে হাসি ঠাট্টা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হোতো যে তার অজ্ঞতার অন্ধকার ঘুচবার সুযোগ কোনদিনই হয়নি। কিন্তু প্রতিটি ঘর যে তাদের মতো নয়, এ কথা তাকে কে বলে দেবে? সম্ভ্রান্ত মহিলার মতো সবাই তার মায়ের হাতে চুমু খেত। তাদের সব বন্ধুরাই নামকরা, প্রত্যেকেই ধনী। সকলেই রাজপুত্র অথবা রাজপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুরে কথা বলে। মারসিঅনেসের ঘরে কবে দু'জন সত্যিকারের রাজপুত্রের পদধূলি পড়েছে সন্ধ্যেবেলায়—একথা কেই বা তাকে বোঝাবে?

তাছাড়া স্বভাবতই ও ছেলেমানুষ। কোন কিছু তলিয়ে দেখা তার ধাতে সয় না। লোক চরিত্র বুঝতে তার মায়ের মতো তার বিচক্ষণতা ছিল না। সাধারণ অনুভূতিসম্পন্ন, মোটামুটি সুখী লোক যেমন ধীর স্থির সহজ জীবন যাত্রায় প্রতিপদে হিসেব করে চলে—অবস্থার একটু হেরফেরে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে—তার এসবের বালাই ছিল না। তার ছিল শান্তিময় দিন যাপন—কানায় কানায় ভরা এক পরিপূর্ণ জীবন। আর আজ সামান্য একটি মাত্র কথায়—অর্থ না বুঝেও যার নিষ্ঠুরতা তার বুকে বিঁধেছে, এক মুহূর্তে সারভিনি এমন এক অস্বস্তি এনে দিলো, যা ক্রমেই এক যন্ত্রণাময় ভীতিতে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে।

সারভিনির কথায় বিক্ষত-চিত্ত জোয়েত আহত জন্তুর মতো তার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল। ঐ কথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোঝার জন্য বার বার কথাগুলো মনে মনে আউড়েছে, "খুব ভাল

করেই জান যে তোমায় বিয়ে করার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কথাটা হচ্ছে প্রেমের!"

এ কথার অর্থ কি? কেন এই অপমান? এর পেছনে নিশ্চয়ই এমন কোন লজ্জাকর গোপন সংবাদ আছে, যা তার অজানা। কিন্তু কি হোতে পারে? যাই হোক ব্যাপারটা কলঙ্কময় আর বন্ধুর এই ব্যবহারও বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছু নয়—এই উপলব্ধিতে তাব মন অত্যন্ত দমে গেল। যতই ভেবেছে, সংশয়, ত্রাস, দুঃখ এসেছে ভিড় করে, কান্না এসেছে বুক ছাপিয়ে।

তার অনাবিল শিশু অন্তর এক সময় শান্ত হোলো। বইয়ে-পড়া যত সব আজগুবি কাহিনীর সঙ্গে নিজের অবস্থার সাদৃশ্য খুঁজে বেড়ালো। বইয়ে কত কাহিনীই সে পড়েছে, কত হৃদয় বিদাবক উপাখ্যান, ভাগ্যের আমূল পরিবর্তনের গল্প, তাব এই রহস্যময় জীবনটাও যদি কোন অত্যাশ্চর্য শক্তির অমোঘ টানে সুন্দর ভবিষ্যতের সন্ধান পায়!

ক্রমে ব্যথা ভুলে সে স্বপ্নে মশগুল হোলো। যত সব অলীক কল্পনায় মন মেতে উঠলো। তার ভাবি আনন্দ হোলো। সে কি কোন রাজকন্যা? কোন রাজা, সম্ভবত ভিক্তব ইমানুয়েলই তার মাকে ভালবেসে ছিনিয়ে এনেছেন, আর পরে বাজপবিবাবের রোষ থেকে রক্ষা পাবার জন্য দূরে সবে থাকতে বাধ্য হয়েছেন! অথবা সে কোন বিখ্যাত দম্পতিব অবাঞ্ছিত মিলনের ফসল—মাবসিঅনেস হয়ত কুড়িয়ে এনে নিজের সন্তানের মতো মানুষ করেছে! আরও অজস্র ধারণা বানের জলের মতো হুড়মুড় কবে এসে পড়লো, কোনটা মনে স্থান পেল, কোনটা আপনিই বাতিল হয়ে গেল। মনোরম বিষাদে হৃদয় ভরে গেল। এক রহস্যময় উপন্যাসের নায়িকার আসনে নিজেকে বসিয়ে, জাহির করবার মতো এক সম্ভ্রান্ত কৌলিন্য নিজের ওপর অরোপ করে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

তার কল্পলোকের নায়িকার ভূমিকা সে মনে মনে অভিনয় করলো। মনে হোলো সে যেন ক্লাইব অথবা জর্জ সান্দ-এর উপন্যাসের

নায়িকা। তাহলে তার জীবন হবে গভীর একাগ্রতা, গর্ব, আত্মত্যাগ আর সুন্দর সুন্দর কথার মিলিত ফলশ্রুতি। এই নতুন ধারণায় তার হৃদয় উথলে উঠলো।

সারাটা বেলা সে ভেবেছে কি করে মায়ের কাছ থেকে প্রকৃত সত্য জেনে নেওয়া যায়।

এই সব বিষাদময় কাহিনীর উপযুক্ত পরিবেশ রাত। তাই রাত এলে পর সে ভেবে চিন্তে একটি ছোট্ট ফন্দি আঁটলো, এই চাল চেলে সে মারসিঅনেসের কাছ থেকে ঠিক আসল কথা বের করে নিতে পারবে। সেই ফন্দি হচ্ছে—মারসিঅনেসকে কিছু ভাববার অবসর না দিয়েই বলে ফেলবে যে সারভিনি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। এতে মাদা[illegible] ওবারদি যদি বিস্মিত হয়ে কোন কথা বলে ফেলে, তবেই জো[illegible] দ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

পরিকল্পনা[illegible]জ রূপান্তরিত করতে দেরি হোলো না। সে ভেবেছিল তার মা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ভাবে গদগদ চিত্তে প্রতিবাদ করবে, আর অশ্রু সজল কণ্ঠে সব বলে ফেলবে।

কিন্তু আশ্চর্য হোলো সে নিজেই। একটু বিচলিত ভাব ছাড়া তার মায়ের আচরণে বিস্ময় বা দুঃখের কোন লক্ষণ প্রকাশ পেলো না। বিরক্ত-গলায় আমতা আমতা জবাব শুনেই জোয়েতের সদ্য-জাগ্রত নারীমন স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে বুঝে নিলে তার জীবনের রহস্য তার ধারণার চেয়েও গভীর লজ্জাময়। আর এও বুঝলো, জেদা-জেদিতে কোন লাভ হবে না, বুদ্ধি খাটিয়ে তাকে নিজেই সব উদ্ধার করতে হবে। এতক্ষণে দুর্ভাগ্যের বাস্তব দিকে তার নজর পড়লো। ভীত দুঃখিত জোয়েত নিজের ঘরে ফিরে এলো। কি থেকে কি ঘটে গেল, সে কিছুই জানে না, কিন্তু মনে হোলো আর কোন আশাই নেই, জানালার গরাদ ধরে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলো।

স্বপ্ন ভেঙে গেছে, রহস্য আবিষ্কারের বাসনা অন্তর্হিত, দীর্ঘ সময় শুধু নীরব কান্না। ধীরে ধীরে দুচোখের পাতায় শ্রান্তি ঘনিয়ে এলো। চোখ আপনিই বুজে এলো। কাপড় ছাড়া হয়নি, বিছানায়

শোওয়া হয়নি, তাই গভীর ঘুমের প্রত্যাশা করা যায় না। ঘুমের ঝোঁকে করতলে রাখা মাথাটি বার বার নেতিয়ে পড়ছে, আচমকা ধাক্কা লেগে নিদ্রা টুটে যাবার যোগাড়—তবু ওই ভাবেই অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে নিল জোয়েত। অবশেষে শেষ রাতের কন্‌কনে হাওয়া গায়ে লাগতে জানালা ছেড়ে সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

পরের দিন সারা দিনমান গম্ভীর, বিষণ্ণ। কিন্তু চোখ কান খোলা রাখলো, সব কিছু খুঁটিয়ে বিচার করবার জন্য মন রইল সদা সতর্ক। তার পরিচিত পরিবেশের ওপর যেন এক নতুন আলোকের আভাস। আর এতদিন যাদের ওপর আস্থা ছিল, এমন কি তার মায়ের ওপরও অবিশ্বাস ঘনিয়ে এলো। পুরো দুটো দিন তার কাটলো যত রকম আন্দাজ বিশ্লেষণে। কল্পনার বল্গা সে সংযত করলো না। বুধবার দিন আটঘাট বেঁধে গোয়েন্দাগিরিতে অবতীর্ণ হবার সঙ্কল্প করলো। বৃহস্পতিবার এলে কোন অভিজ্ঞ গোয়েন্দার চেয়েও অধিকতর ধূর্ততার সঙ্গে সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামার জন্য তৈরী হয়ে রইলো। মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করলো, "শুধু আমিই একা।" আর চিন্তা করতে থাকলো কি করে ওদের স্পষ্ট চেনা যায় আর হৃদয়ে খোদাই করে রাখা যায়।

সারভিনি ও সেভেল এলো দশটার গাড়িতে। কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে গাম্ভীর্য বজায় রেখে পরিচিত ভঙ্গীতে জোয়েত বললো, "সুপ্রভাত মাস্কেদ, কেমন আছো?"

"ধন্যবাদ, তুমি ভালো তো?" মনে মনে ভাবলো— এখন আবার কি খেলা খেলবে কে জানে।

মারসিঅনেস সেভেলের হাত ধরেছে, জোয়েত সারভিনির। উদ্যানের বৃত্তাকার পথ ধরে তারা পায়চারি করছে। কখনও যুগল মূর্তি ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য আবার কখনও দেখা যাচ্ছে জোড়ায় জোড়ায়।

জোয়েতের সঙ্গীটি বকে চলেছে, কিন্তু জোয়েত নিরুত্তর। যেন তার কানে কিছু ঢুকছে না। সে যেন গভীর মনোযোগে পথ দেখে

চলেছে। হঠাৎ সে প্রশ্ন করে বসলো, "তুমি কি সত্যিই আমার বন্ধু, মাস্কেদ ?"

"অবশ্যই, মামজেল।"

"কিন্তু যথার্থ খাঁটি—সত্যিকারের ?"

"সখী, যথার্থ ই—একেবারে খাঁটি। দেহমন তোমাতেই সমর্পিত।"

"একবারের জন্যেও মিথ্যা বলবে না, অন্তত বারেকের জন্যে ?"

"কেন, প্রয়োজন হলে দ্বিতীয়বার আর মিথ্যা উচ্চারণ করবো না।"

"খাঁটি সত্যি কথা, নেহাত অপ্রিয় হলেও বলবে ?"

"নিশ্চয়ই, মামজেল।"

"আচ্ছা তোমার প্রিন্স ক্রাভালো সম্বন্ধে কি ধারণা—সত্যি, সত্যি, সত্যি করে বলবে।"

"হায় ভগবান।"

"এই যে মিথ্যে বলার জন্যে তৈরী হচ্ছো।"

"না ঠিক কি বলবো, কোন্ কথাটা বললে ঠিক বোঝাতে পারব তাই ভাবছি। যাক্ গে, শোনো প্রিন্স একজন রাশিয়ান, সত্যিকারের রাশিয়ান। ওর জন্ম রাশিয়াতে, কথা বলে রুশ ভাষায়, সম্ভবত একটি পাশপোর্ট যোগাড় করে ফ্রান্সে এসেছে। তার সম্বন্ধে মিথ্যা কিছুই নেই, শুধু নাম এবং উপাধিটি ছাড়া।"

জোয়েত সোজাসুজি তার দিকে তাকাল। "তুমি বলতে চাও ও একজন···একজন···"

কিছুক্ষণ সঙ্কোচের দোলায় দোলায়িত সারভিনি মন স্থির করে বললো, "একজন ভাগ্যান্বেষী বলতে পারো।"

"ধন্যবাদ। আর কাভেলিআর ভলরেলিও বোধহয় সেই দলে ?"

"ঠিকই আন্দাজ করেছ।"

"আর মসিয়ো দ্য বেলভিনো ?"

"ও কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। গোঁয়ার হলেও ভদ্রলোক। মোটামুটি সম্ভ্রান্ত—কিন্তু আগুনের কাছে গিয়ে পাখা দুটো হারিয়েছে।"

"আর তুমি ?"

সারভিনির নিঃসংকোচ জবাব। "আমি? আমাকে সোজা ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় একটি উৎফুল্ল সারমেয়। সম্ভ্রান্ত বংশের একজন অবিবাহিত যুবক—উপহাসে পরিহাসে যার এককালীন বুদ্ধি ব্যয়িত, বে- -তে আর রাজ্যের যত সব বাজে কাজে স্বাস্থ্য ও সর্বস্ব -পগত। এত সব হারিয়ে যা পেয়েছি তা হচ্ছে জীবন সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা, অন্ধ সংস্কার থেকে মুক্তির স্বাধীনতা, মানুষের ওপর—স্ত্রীজাতিও বটে—ঘৃণা—নিজের কৃত-কর্মের অসারতা সম্বন্ধে জ্ঞান এবং জগতের যত বাজে লোকদের সহ্য করবার ক্ষমতা। এখনও আমার মধ্যে সততা উঁকিঝুঁকি দেয়, তুমি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে। আর এখনও ভালবাসার কিছুটা যোগ্যতা আমার অবশিষ্ট আছে, ইচ্ছে থাকলে তুমি হয়তো বুঝেছো। এই সব দোষ গুণ নিয়ে আমি তোমার সদিচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দিলাম—তোমার যা ইচ্ছা তুমি করতে পারো। ব্যস্ আমার কথাটি ফুরোলো।"

জোয়েত হাসল না। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সারভিনির কথাগুলোর মর্মোদ্ধার করতে সচেষ্ট হোলো।

"কাউন্তেস লামিয়ে তোমার কেমন মনে হয়?"— জোয়েতের জিজ্ঞাসা।

"কোনো মেয়ের সম্বন্ধে আমার মতামত না জানানোই ভাল।"

"কোন মেয়ের সম্বন্ধেই নয়?"

"না, কারও সম্বন্ধেই নয়।"

"তার মানে, ওদের সম্বন্ধে তোমার ধারণা খুবই খারাপ। এখন ভেবে দেখ দেখি কোন ব্যতিক্রম চোখে পড়েছে কিনা?"

তার সারাক্ষণের সঙ্গী সেই তাচ্ছিল্যের হাসিটি মুখে মেখে বাঁচার বিরুদ্ধে তার অস্ত্র, তার সর্বশক্তি সেই বেপরোয়া ভাবটি বজায় রেখে সারভিনি বলে উঠলো; "বর্তমান সঙ্গীটি সর্বদাই এর ব্যতিক্রম।"

কিছুটা আরক্তিম জোয়েত স্পষ্ট স্বরে প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা, তবে আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি?"

"জানতেই হবে? ঠিক আছে, তবে শোনো। একজন সুরুচি-সম্পন্না, অভিজ্ঞা, যদি রাগ না করো তো বলি—যথেষ্ট সাধারণ জ্ঞানের অধিকারিণী। দক্ষতার সঙ্গে ছলনার মুখোশ পরতে জান, অন্যকে অপদস্থ করে মজা দেখ, টোপ ফেলে ধৈর্য ধরে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে জান।"

"এই সব"—জোয়েতের জিজ্ঞাসা।

"ব্যস্—এই"—সারভিনির উত্তর।

"তোমার এই ধারণাগুলো পাল্টাতে হবে মাস্কেদ", গম্ভীর গলায় এই মন্তব্য করে জোয়েত তার মায়ের কাছে রওনা হোলো।

তার মা তখন মাথা নুইয়ে শ্লথ গতিতে এমন বিভোর ভাবে হাঁটছে যেন কোন মধুর গুঞ্জনে রত। সেভেলের দিকে না তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে অনর্গল কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে ছড়িয়ে মারসিঅনেস হাঁটছে আর মাঝে মাঝে রোদ প্রতিরোধের রঙিন চশমার মধ্য দিয়ে শূন্যে কি চিত্র এঁকে চলেছে—হয়ত সেও কোন অক্ষর মালা। শক্ত দৃঢ় বাহুর বন্ধনে দেহের একপাশে সজোরে তাকে বেঁধে রেখেছে দীর্ঘকায় সেভেল। সে দিকে নজর পড়তেই জোয়েতের মনে একটা সন্দেহ বিদ্যুতের মতো চমকে উঠলো। এ যেন অর্ধ উপলব্ধ কোন শারীরিক বেদনার অনুভূতি—যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেন বাত্যাতাড়িত মেঘের ছায়া—ভূপৃষ্ঠে পড়েই দ্রুত মিলিয়ে গেল।

খাবার ঘণ্টা বাজল। চারদিক নিস্তব্ধ, বিষাদময়!

বাতাসে ঝড়ের পূর্বাভাস। দিগন্তে কালো মেঘের পাহাড় থমকে আছে, কিন্তু পেছনে ওৎ পেতে আছে ঝঞ্ঝা। বারান্দায় বসে কফি খাবার সময় মারসিঅনেস বললো, "জোয়েত সোনা, তোমার বন্ধুকে নিয়ে আজও বেড়াতে যাচ্ছ তো? আজকের আবহাওয়া সত্যিই বনে বেড়াবার মতো।"

দ্রুত এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে জোয়েত জবাব দিলো: "না মা, আজ আর বাইরে বেরোব না।"

একটু দমে গিয়ে মারসিঅনেস বোঝাতে চেষ্টা করলো: "আজ

বরং একটু ঘুরেই এসো। তোমার শরীরের পক্ষে সেটা ভালই হবে।”

জোয়েত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো: “না মা, আজ আমি ঘরেই থাকব, কেন তা তো তুমি জানই—সেদিন তোমায় সবই বলেছি।”

সেভেলকে একা পাবার তাগিদে মাদাম ওবারদির এই বিস্মরণ। কিছুক্ষণের নিরিবিলির বাসনা তাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। এবার লজ্জা পেয়ে সসঙ্কোচে বললো: “ঠিক বলেছো, ওকথা আমার মনেই ছিল না। কি জানি বাবা, আজকাল আমার স্মরণ শক্তির কি হয়েছে!”

কাপড়ে সুতোর ফুল-তোলা জোয়েতের ভাষায় ‘জনকল্যাণকর’ কাজ। অবশ্য বছরে পাঁচ ছ’বারের বেশি এই কল্যাণ কর্মের কথা তার মনে পড়ে না। আজ মাত্রাতিরিক্ত বিরক্তির মুহূর্তে মায়ের পেছন দিকে একটি নিচু চেয়ারে সে সেলাই নিয়ে বসে গেল।

আর যুবকটি ডেক চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে সিগারেট ধরালো।

অলস সময় যেন আর কাটতে চায় না। মেয়ের হাত থেকে নিস্তার না পেয়ে অধৈর্য মারসিঅনেস ঘন ঘন সেভেলের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চললো। এড়িয়ে যাবার কোন উপায় না দেখে অস্থির চিত্ত মারসিঅনেস সারভিনিকে বললো: “প্রিয় ডিউক, তুমি তো জানই আজকের রাতটা তোমরা এখানে থাকবে। কাল সবাই মিলে শাতুর ফোরনাইজ রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খাওয়া হবে।”

ইশারা বুঝতে পেরে সারভিনি অভিবাদন করে সহাস্যে বলে উঠলো, “আপনার কথা মতোই হবে, মাদাম।”

আসন্ন ঝড়ের করাল ছায়াতলে ধীর অস্বস্তির মধ্যে দিন ফুরিয়ে এলো। ক্রমে ডিনারের সময় হোলো। ভ্রূকুটি কুটিল কালো মেঘের ভারে আকাশ নুয়ে পড়েছে। বাতাসের গতি স্তব্ধ।

নিঃশব্দে সমাধা হোলো সান্ধ্যভোজ। কিসের অস্বস্তি, সংযম ও সংশয় যেন এক জোড়া নারী এক জোড়া পুরুষের মুখে কুলুপ এঁটে

দিয়েছে। টেবিল পরিষ্কারের পরও তারা বারান্দা ছেড়ে গেল না —কথা হোলো মাঝে মাঝে দুটো একটা। ক্রমে নেমে এলো জমাট রাত্রি। অকস্মাৎ বাঁকাচোরা বজ্র রেখায় দিগন্ত বিদীর্ণ হোলো আর অন্ধকারের বুকে তীব্র আলোর ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল। তারপর শোনা গেল দূরাগত অস্পষ্ট গুন্‌গুন্‌ ধ্বনি, পুলের ওপর দিয়ে গাড়ি গেলে যেমন হয়। আকাশের উত্তাপ আরও বেড়েছে, বাতাস হয়েছে আরও স্তব্ধ, রাত্রি হয়ে উঠলো আরও নিথর নিবিড়।

জোয়েত উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "আমি শুতে চললাম, ঝড় দেখলেই আমার গায়ে জ্বর আসে।"

মায়ের চুম্বনের জন্য ললাট এগিয়ে দিলো, ভদ্রলোক দুজনের দিকে হাত বাড়িয়ে শুভ রাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল।

ঠিক বারান্দার ওপরেই তার ঘর। তার দরজা বরাবর প্রকাণ্ড বাদাম গাছটার ফাঁকে ফাঁকে সবুজ আলো আছড়ে পড়লো। সেই আলোকিত পত্রগুচ্ছের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সারভিনির মনে হোলো একটি ছায়া যেন তাকে অতিক্রম করে গেল।

হঠাৎ আলো নিভে যেতেই মারসিঅনেস স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললো, "কন্যা আমার শুয়ে পড়লেন।"

সারভিনি উঠে দাঁড়ালো।

"মারসিঅনেস অনুমতি দিলে আমিও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করি।" বলে মারসিঅনেসের হস্ত চুম্বন করে সেও অদৃশ্য হোলো।

অন্ধকারে সেভেল আর মারসিঅনেস। ভুজপাশে ধরা দিতে দেরি হলো না, পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ, তন্ময়। তারপর সেভেলের বাধা সত্ত্বেও তার সামনে নতজানু হয়ে বসে মারসিঅনেস বিড়বিড় করে বললো, "বিদ্যুতের আলোয় তোমায় দেখবো।"

এদিকে জোয়েত নিজের ঘরে বাতি নিভিয়ে দিয়ে খালি পায়ে ব্যালকনিতে বেরিয়ে এলো। সকালবেলাকার সেই বাগানের অনুভূতি

নিয়ে সে নীচের কথা শুনতে চেষ্টা করলো। ঠিক মাথার ওপরে বলে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না, তবে মৃদু কথার আওয়াজ কানে এলো। কিন্তু তার নিজের বুকের সোরগোল আর অস্ফুট শব্দ তরঙ্গ মিলে মিশে একাকার হয়ে কানে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল, সে কিছুই শুনতে পেলো না। তার ঘরের সোজাসুজি আরেকটা জানালা বন্ধ। তার মানে সারভিনি শুয়ে পড়েছে। নিচে সাথী সহ তার মা একা।

দ্বিতীয়বার তড়িৎ প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভূ-প্রকৃতি ক্ষণিক আলোকে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। গলিত সীসার স্রোতের মতো নদী যেন কোন অবাস্তব কল্পরাজ্য দিয়ে বহমান। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি স্বর কানে এলো, 'তোমায় ভালবাসি।' আর কোন সাড়া নেই। জোয়েতের শরীরে শিহরণ খেলে গেল, ভয়াল এক দুঃস্বপ্নের সাগরে চেতনা বিলুপ্ত হলো। অনন্ত নিস্তব্ধতায় পৃথিবী সমাচ্ছন্ন—যেন কারখানার নিথর নীরবতা। তার দম আটকে গেল, অজানা এক ভয়ঙ্কর কিছু যেন তার ফুসফুসে চেপে বসেছে। উদ্দাম দামিনীর দ্যুতিতে দিগন্ত ঝলসে উঠলো, তারপর আবার, আবার, বার বার। মুহুর্মুহু আলোর রোশনাই। সেই কণ্ঠস্বর আবার ভেসে এলো, 'ওঃ, তোমায় কি ভীষণ ভালবাসি। ভালবাসি!'

এ স্বর জোয়েতের খুবই চেনা। এ স্বর তার মায়ের।

তপ্ত একটি বড় জলের ফোঁটা পড়লো তার কপালে, গাছ পালার মৃদু কম্পন—আসন্ন বৃষ্টির পূর্বাভাস। দূর থেকে ছুটে এল পত্র মর্মর, যেন এক ঝাপটা দমকা হাওয়া আছড়ে পড়লো বৃক্ষরাজির ওপর। তারপর মাঠ, ঘাট, নদী, গাছপালার ওপর শুরু হোলো বৃষ্টির মাতামাতি। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল বৃষ্টি ধারায় স্নান ক'রে উঠলো জোয়েত। নিচের বারান্দা তাকে যেন কিছুতেই সরে যেতে দিলো না। ওদের ঘরে যাবার শব্দ শোনা গেল—দরজা বন্ধের আওয়াজ। নিঃসন্দেহ হবার দুর্বার বাসনায় যন্ত্রণাদায়ক উদ্দাম কামনার বশে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বাইরে বেরিয়ে এলো জোয়েত। অঝোর

বারিধারার মধ্যে জানালার নীচে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

শুধু মাত্র তার মায়ের ঘরেই আলো। সেই আলোয় দেখলো ছুটো ছায়ামূর্তি ঘনিয়ে এলো, পাশাপাশি। ক্রমে ছায়াছুটো ঘনিষ্ঠতর হতে হতে এক হয়ে মিশে গেল। ঠিক সেই সময়েই বিছ্যুৎ চমকালো। জোয়েত দেখলো একে অপরের গলা জড়িয়ে এক হয়ে গেছে।

বিস্ময়াভিভূত জোয়েত কিছু না ভেবে, কিছু না জেনে তার সর্বশক্তি দিয়ে চীৎকার করে উঠলো 'মা' !—যেন বিপদের সঙ্কেত।

তার তীক্ষ্ণ চীৎকার বাতাসে মিলিয়ে গেল, ছায়া ছুটো আলাদা হয়ে গেল। বিচলিত একটি অদৃশ্য, আর একটি অন্ধকার উদ্যানে অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে উঠলো।

মায়ের কাছে ধরা পড়বার ভয়ে জোয়েত দৌড়ে পালালো—সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে জলের ছাপ রেখে নিজের ঘরে গিয়ে খিল এঁটে দিলো। স্থির করলো, কারও কাছে আত্মপ্রকাশ চলবে না। জামা ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। ছুঃখ বিপদে লোকে যে অজানা শক্তির অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, সেও হাঁটুগেড়ে বসে হাতজোড় করে সেই অজানা ঈশ্বর ও মহাশক্তিমান বিধাতা পুরুষের কাছে বিপদ উদ্ধারের প্রার্থনা জানালো। যতবার বিছ্যুৎ চমকালো, তার আলমারির আয়নায় নিজের সিক্ত দেহ, সিক্ত কেশ আর বেশবাসের চেহারা দেখে আশ্চর্য হলো।

দীর্ঘ সময় এইভাবে কেটে গেল। তার অগোচরে কখন ঝড় বৃষ্টি থেমে গেল। আকাশের হালকা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আলোর ঝিকিমিকি। খোলা জানালা দিয়ে ভেজা পাতা, ঘাস আর বৃষ্টি-ধৌত নির্মল প্রকৃতির স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে ঘর ভরে গেল। কৃতকর্মের কথা আর বিন্দুমাত্র না ভেবে জোয়েত ভেজা জামা কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

উষালোকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তার ছুচোখ ঝাপসা হয়ে গেল। আবার ভাবনা এলো তার মনে।

প্রেমিকের সঙ্গে তার মা! ঘেন্নার কথা। কিন্তু অনেক গল্পে সে পড়েছে--মেয়েরা এমনকি মায়েরাও মর্যাদা বৃদ্ধির লোভে গল্পের শেষ দিকে প্রেমের বন্যায় এইভাবে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছে। ঐ সব নাটুকে গল্পের মতো নিজেও এভাবে এক নাটকে জড়িয়ে পড়ায় তার অভিভূত ভাব কমে এলো। গল্পের কাহিনীগুলো যতই মনে পড়লো, প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা, তার নিদারুণ মনোবেদনা ধীরে ধীরে প্রশমিত হোলো। তার এই আবিষ্কার যেন গত রাতে শুরু করা গল্পটারই স্বাভাবিক পরিণতি। নিজের মনেই বললো, 'আমার মাকে রক্ষা করবো।'

এই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নেবার পর মনে শান্তি ফিরে এলো। নিজেকে মহৎ, শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমতী মনে হোলো, সে সত্যিকারের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হোলো। মনে মনে পরিকল্পনাটা ছকে নিল। তার ভাবুক প্রকৃতির সঙ্গে ধারণাটা বেশ খাপ খেয়ে গেল। মায়ের সঙ্গে তার সম্ভাব্য কথাবার্তার মহড়া দিয়ে নিল মনে মনে।

রোদ উঠে গেছে! চাকরবাকরেরা যে যার কাজে লেগেছে। ঝি তার জন্য চকোলেট নিয়ে টেবিলের ওপর রাখতেই জোয়েত বললো, 'মাকে বোলো, আমার শরীর ভাল নেই। ভদ্রলোক দুজন চলে না যাওয়া অবধি আমি শুয়েই থাকবো। কাল রাতে আমার একটুও ঘুম হয়নি, আমি ঘুমোতে চেষ্টা করবো; কেউ যেন আমায় বিরক্ত না করে।'

কার্পেটের ওপর জড়ো করা ভেজা জামা কাপড় দেখে বিস্মিত দাসী বললো, 'মাদমোয়াজেল, আপনি কি বাইরে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, মাথা ঠাণ্ডা করতে একটু ভিজতে বেরিয়েছিলাম।'

কাদামাখা জুতো, ভেজা জবজবে জামাকাপড় আলগোছে তুলে নিয়ে ঝি বিরক্ত মুখে বেরিয়ে গেল। ওগুলো যেন কোন ডুবে যাওয়া মেয়ের পোশাক—তখনও জল ঝরছে ফোঁটায় ফোঁটায়।

জোয়েত জানে মা আসবে। তাই প্রতীক্ষায় রইল।

রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করা সেই 'মা' চীৎকারের পর থেকেই মারসিঅনেস অস্বস্তিতে ভুগছে। দাসী খবর দিতেই এক লাফে বিছানা ছেড়ে জোয়েতের ঘরে এসে হাজির।

'কি হয়েছে ?'

জোয়েত কি বলতে গেল—'আমি আমি…' তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

হতভম্ব মারসিঅনেস আবার প্রশ্ন করলো, 'তোর হয়েছে কি ?'

সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল, বাছাই করা শব্দগুলি কোথায় উধাও। মায়েব মুঠোর মধ্যে মুখ লুকিয়ে বালিকা কাঁদতে আরম্ভ করলো 'মা, মাগো !'

ব্যাপারটা বোধগম্য না হওয়ায় বিস্ময়াবিষ্ট মাদাম ওবারদি বিছানা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকলো। তবে প্রখর বুদ্ধিবলে ব্যাপার কিছুটা আন্দাজ করলো।

ক্রন্দনরত জোয়েতের মুখ দিয়ে একটিও কথা বের হোলো না। হতচকিত মারসিঅনেস একটু সামলে নিয়ে সহজ ভাবে বললো, 'বলি তোমার হয়েছে কি, বলবে তো ? আমায় বলো তো দেখি।'

অনেক চেষ্টায় জোয়েত তোতলাতে শুরু করলো, 'উঃ…কাল রাতে…আ…আ…মি… তোমার জানালা দেখেছি।'

'তাতে হয়েছে কি ?' মারসিঅনেসের নিস্প্রভ জবাব।

কান্নায় ব্যাকুল জোয়েতের মুখে ঐ এক কথা: 'ও মা, মাগো !'

এতক্ষণে মাদাম ওবারদির মনের ভয় ও বিস্ময় বিরক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। রাগে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়ে বললো, 'মাথাটা একেবারেই গেছে দেখছি। এসব ন্যাকামি শেষ হলে আমায় খবর দিও।'

মায়ের হাত ছেড়ে দিয়ে অশ্রু-আঁখি জোয়েত তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'না, শোনো, তোমাকে আমার বলতেই হবে… শোনো। কথা দাও—আমরা এই শহর ছেড়ে দূর কোন পাড়াগাঁয়ে চলে যাব। সেখানে আমরা কৃষকদের সঙ্গে ওদের মতো হয়ে

থাকব—আমাদের এরা কেউ খুঁজে পাবে না। যাবে মা? আমি তোমায় মিনতি করছি, আমায় ক্ষমা করো মা—আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি।'

যেতে যেতে মারসিঅনেস থমকে থেমে গেল। তার শিরা উপশিরায় কত লোকের উষ্ণ রক্তস্রোত। জননীর লজ্জা, অজানা আশঙ্কা, কুলকামিনীর অবৈধ ভালবাসার ঘৃণা একত্র হয়ে এক অবর্ণনীয় মানসিক অবস্থায় তার সর্ব দেহ থর থর করে কেঁপে উঠলো।

সে ক্রোধে ফেটে পড়বে, না অপরাধ ক্ষমা করবে সহসা ঠাহর করতে পারলো না। শুধু বললো, 'তোমার কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'গত রাতে',—জোয়েত বললো, 'তোমায় আমি দেখেছি মা। ওরকম আর কক্ষণো কোরো না···ওঃ, তুমি যদি জানতে···দু'জন মিলে আমরা চলে যাব···তোমায় আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসবো—দেখবে এসব আর মনে থাকবে না···'

ধরা গলায় মাদাম ওবারদি বললো, 'শোনো বাছা, দুনিয়ায় অনেক কিছুই আছে···যা বোঝার মতো অবস্থা তোমার এখনও হয়নি। আর মনে রেখো···মনে রেখো···তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি···আর কক্ষণো···ওসব···ওসব ব্যাপারে আমায় উপদেশ দিতে এসো না।'

কিন্তু জোয়েত এখন ত্রাণকর্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণা—অতএব এত সহজে হাল ছেড়ে দিলে চলে না। সে বলে বসলো, 'না মা, এখন আর আমি শিশুটি নেই—সব কিছু জানবার আমার অধিকার হয়েছে। আমি বুঝেছি যত সব বাজে লোক, যত খদ্দের আমাদের ঘরে আসে; আর সেই জন্যেই আমাদের কোন সম্মান নেই। আরও সব খবর আমি জানি। কিন্তু এসব আর নয়, আমি সহ্য করবো না। আমরা চলে যাব—অনেক দূরে কোথাও সৎ মহিলাদের মতো জীবন যাপন করবো। তোমার গহনাগুলো বেচে দিলেই হবে; দরকার হলে

আমরা কোন কাজও করতে পারবো। তারপর যদি আমার বিয়ে হয়ে যায়—আর কোনই ভাবনা থাকবে না।'

রাগে থমথমে মুখ মারসিঅনেস সংযত স্বরে বললো, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সুস্থ হয়ে বিছানা ছেড়ে এসো আমাদের সবার সঙ্গে বসে জলখাবার খাবে।'

নাটকীয় ভঙ্গীতে মেয়ে বলে উঠলো, 'না, মা, আমার কথার নড়চড় হবে না। ওই লোকটি যদি আমাদের ঘর ছেড়ে না যায়, তবে আমাকেই যেতে হবে।'

'কোন্ মুলুকে যাবে শুনি—করবেটা কি?'

'জানি না, আমার ওতে কিছু এসে যায় না। আমি শুধু সৎ ভাবে বাঁচতে চাই।'

'সৎ' শব্দটা যেন মারসিঅনেসের মাথায় আগুন ধরিয়ে দিলো। রাস্তার মেয়েদের মতো চেঁচিয়ে বললো; 'চোপ্! এভাবে আর কথা বলবে না, খবরদার। যে কোন মহিলার মতো আমিও সৎ, বুঝেছো? আমি বাঈজী, ঠিক—ওতেই আমার গর্ব। আমার মূল্য অমন এক ডজন সৎ মহিলার সমান।'

বিব্রত জোয়েত মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করলো; 'ওঃ মাগো!'

উত্তেজনায় মারসিঅনেস জ্বলছে। সে বলে গেল; 'হ্যাঁ, আমি গণিকা, তাতে কি হয়েছে? আমি এই না হলে তোমাকে আজ লোকের বাড়ি বাড়ি দাসীবৃত্তি করতে হোতো, একদিন আমাকে যা করতে হয়েছে। এঁটো বাসন ধুতে হয়েছে, আর যখন তখন গিন্নীর কথায় ছুটতে হয়েছে কসাইখানায়। কাজে একটু গা ঢিলে দিলেই ঘাড় ধরে বিদেয়। বুঝতে পেরেছো? আর সে জায়গায় যে দিনরাত শুয়ে বসে বাবুগিরি করছো—সে আমি 'সৎ' নই বলেই। ঝিগিরি করে পঞ্চাশ ফ্রাঁ হয়তো জমাতে পারবে কিন্তু তা দিয়ে বড় লোক হওয়া যায় না। পরে ওই কাজে বিরক্তি ধরলেও কোন লাভের ব্যাবসায় খাটাবার মতো টাকা থাকবে না। সুতরাং

আমাদের দেহ ছাড়া অন্ত কোন পথ নেই—এ ছাড়া অন্ত কোন উপায় নেই।'

অনুতপ্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তির মতো বুক চাপড়ে বিছানার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললো, 'এইসব অভাগা মেয়েদের কপালের দুর্ভোগ কোনকালে ঘুচবার নয়। হয় মানুষকে সুযোগ করে দিতে হবে, নয় সারা জীবন দারিদ্র্যে পচে মরতে হবে, জীবনভর—এ ছাড়া আর কোন পথ নেই।'

আবার আগের কথার খেই ধরে বললো, 'আর তোমার 'সৎ মহিলারাই' যত সতীত্বের পরাকাষ্ঠা? যত সব নীচ? মাথার দিব্যি দিয়ে কেউ ওদের এসব করতে বলেনি। টাকা পয়সা আছে, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারে। কিন্তু কেবল মাত্র বৈচিত্র্যের লোভে প্রেমিক পোষে। ওদের মতো হীন, ইতর আর কেউ নেই।'

মারসিঅনেস বিছানার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। জোয়েত বড় অসহায় বোধ করলো। ইচ্ছে হলো সাহায্যের জন্য চীৎকার করে কাউকে ডাকে, অথবা ছুটে পালিয়ে যায়। উপায় না পেয়ে মার-খাওয়া বালিকার মতো হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকলো।

মারসিঅনেস নীরব দ্রষ্টা। মেয়ের কান্না দেখে দুঃখে বেদনায়, মমতা ও অনুশোচনায় হৃদয় গলে গেল। হাত ছড়িয়ে বিছানার ওপর পড়ে সেও কেঁদে ফেললো। তারপর অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বললো 'আমার সোনা, সোনা আমার, আমায় কত ব্যথা দিলি, যদি জানতিস!'

অনেকক্ষণ মা মেয়েতে কাঁদলো। মারসিঅনেসের দুঃখ বেশীক্ষণ থাকে না। এক সময় ধীরে ধীরে উঠে স্নেহমাখা স্বরে বললো, 'দেখ্ জোয়েত, যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর ফেরার সময় নেই। জীবনকে সহজভাবে নিতে শেখ্।'

জোয়েতের কান্না থামলো না। এমন অপ্রত্যাশিত গভীর আঘাতে তার চিন্তা অসাড়—সহজে সুস্থ হতে পারলো না। তার মা বললো,

'এখন উঠে মুখ হাত ধুয়ে প্রাতরাশ খাবে. এসো, কেউ কিছু বুঝতে পারবে না।'

জোয়েত ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানালো। পরে কান্নাভেজা গলায় কোনক্রমে বললো, 'না, মা আমার কথা তো বলেছি। আমার মতের পরিবর্তন হবে না। ওরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি ঘর থেকে বেরোচ্ছি না। আর কখনো ওদের মুখদর্শন করবো না, কখনো না। ওরা যদি আবার এখানে আসে—আমি-আমি—আমাকে তবে আর দেখতে পাবে না।'

মারসিঅনেসের ভাবাবেগ প্রশমিত, আঁখি শুষ্ক। বললো, 'এখন এসো, একটু স্থির মস্তিষ্কে বিষয়টা ভেবে দেখো।' তারপর একটু থেমে, 'আচ্ছা থাক, আজ সকালে তোমার একটু বিশ্রাম নেওয়াই ভাল। বিকেলে এসে তোমায় দেখে যাব।' কন্যাকে আদর করে ধীর শান্ত পদে সে বেরিয়ে গেল।

মা'র অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে জোয়েত দরজায় খিল এঁটে দিল। সে এখন একা থাকবে, সম্পূর্ণ একা—একা বসে ভাববে।

এগারোটায় ঝি এসে দরজা নেড়ে শুধালো, 'মাদ্‌মোয়াজেল, দুপুরে কি খাবেন ? মাদাম জানতে চাইলেন আপনার এখন কিছু চাই কিনা ?'

জোয়েতের উত্তর শোনা গেল, 'আমার ক্ষিদে নেই। আর আমি এখন একটু একা থাকতে চাই।' প্রকৃত অসুখের মতোই সে বিছানায় পড়ে রইল। বেলা তিনটেতে আবার দরজায় টোকা পড়ল। সে জিজ্ঞেস করলো, 'কে ?'

'আমি সোনা,'—তোর মা, 'এখন কেমন আছ দেখতে এলাম।'

একটু ভাবলো, কি করা উচিত। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দরজা খুলে দিয়ে আবার বিছানায় গড়িয়ে পড়লো। তার কপালে হাত রেখে রোগীকে বলার মতো করে মারসিঅনেস কণ্ঠে সুধা ঢেলে বললো, 'এখন ভাল মনে হচ্ছে না ? একটা ডিম খাবে ?'

'না থাক মা,—কিছুই চাই না।'

মাদাম ওবারদি পাশে বসল। কারও মুখে কথা নেই। মেয়েকে চুপচাপ পড়ে থাকতে দেখে বিছানার চাদরে হাত বুলোতে বুলোতে মারসিঅনেস বললো, 'আজ আর উঠবে না?'

জোয়েত বললো, 'এখুনি উঠব। আমি অনেকক্ষণ ভাবলাম মা', খুব ধীর গম্ভীর স্বরে বলে গেল, 'ওই···ওই আমার সিদ্ধান্ত। অতীত —অতীতই। তাকে ফেরানো যায় না। কিন্তু ভবিষ্যৎ অন্য ভাবে গড়তে হবে—নাহলে···নাহলে···আমার পথ ঠিক হয়ে গেছে। এখনকার মতো এ প্রসঙ্গ তোলা থাক।'

মারসিঅনেস ভেবেছিল ব্যাপারটা চুকে গেছে। তাই এই কথায় বিরক্ত হলো। এ বিষয়ে সেও কম ভাবেনি। এই বেকুব মেয়েটার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল। ওই কথার কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু বললো, 'তুমি কি এখন উঠবে?'

'হ্যাঁ। আমি প্রস্তুত।'

দাসীর কাজ মাকে করতে হোলো। একে একে পোশাক এগিয়ে দিল। তারপর কপালে চুমু খেলো।

'ডিনারের আগে একটু বেড়াতে যাবে আমার সঙ্গে?'

'যাব মা।'

নদীর ধার ধরে তারা ঘুরে বেড়ালো। তুনিয়ার যত তুচ্ছ কথা সব নিয়ে আলোচনায় মেতে থাকলো।

৪

পরদিন জোয়েত একা বেরিয়ে পড়লো। সারভিনি যেখানটায় বসে 'পিপীলিকার ইতিহাস' পড়ে শুনিয়েছিল, সেখানটায় বসলো নিরালায়। মনে মনে আওড়ালো, 'একবার যখন ঠিক করে ফেলেছি, এর আর নড়চড় হবে না।'

তার পায়ের নীচে বহমান খরস্রোতা নদী। ছোট ছোট পাথরের নুড়িতে আছাড় খেয়ে পাক খেতে খেতে ভেসে যাচ্ছে অসংখ্য বুদ্‌বুদ্‌।

সে সব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করেছে আর মনে মনে মুক্তির উপায় খুঁজেছে। তার সর্ত যদি মা যথাযথ ভাবে রক্ষা করতে না পারে এবং তার যতসব বন্ধু, তার জীবনধারা, তার অভিরুচি সব ত্যাগ করে তার সঙ্গে দূরে চলে যেতে রাজী না হয়?

সে একাই চলে যাবে—দূরান্তরে, বহুদূরে। কিন্তু কোথায়? কি ভাবে? আর পেটই বা চলবে কি করে? চাকরি করবে? কোথায়? চাকরির জন্য কার কাছে ধরনা দেবে? কিন্তু গরিব গুরবোর মতো ঝিগিরি তার দ্বারা পোষাবে না। ওটা লজ্জার। সে বরং আয়া হবে। অনেক উপন্যাসের তরুণী নায়িকার মতো ঘরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভালবাসবে, পরে ঐ গৃহস্থ পরিবারের কোনো ছেলেকেই বিয়ে করবে। কিন্তু সে জন্য বংশ মর্যাদার প্রয়োজন। কেন না বাড়ির ছেলের মন চুরি কবার অপবাধে যখন তার মা বাবা রেগে গিয়ে তাকে কঠোব ভাষায় তিরস্কার কবতে আসবেন—সে গর্ব ভরে উত্তর দেবে—'আমার নাম জোয়েত ওবারদি।'

কিন্তু তার সে জোর নেই। তাছাড়া এ সেই মান্ধাতার আমলের মামুলি পথ।

সন্ন্যাসিনী হওয়া চলবে না, কাবণ মাঝে সাঝে একটু আধটু সহানুভূতি ছাড়া ধর্মের দিকে তার কোনো আকর্ষণই নেই। বর্তমান অবস্থায় কেউ যে তাকে বিয়ে করে বক্ষা কববে সে সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত। কারও সাহায্য পাবার সম্ভাবনা নেই, মুক্তির কোন পথ নেই—কোনো উপায় নেঁই তার!

তাছাড়া সে তো একটা দুর্দান্ত কিছু করতে চাইছে, একটা দুঃসাহসিক কাজ, এমন মহান কিছু যা নাকি চিরকাল উদাহবণ হয়ে থাকবে। তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক করলো আত্মহত্যা করবে।

খুব শান্ত মনে সে এই সিদ্ধান্ত করলো। ব্যাপারটা যেন খুবই সহজে হয়ে গেল—একটুও ভাবতে হোলো না—যেন কোথাও বেড়াতে যাবার প্রশ্ন।

মৃত্যুর অর্থ যে সব শেষ, যার আর শুরু নেই—এই মহাপ্রস্থানের পর আর ফিরে আসার পথ নেই—এই যাওয়া যে জগত ও জীবনের কাছ থেকে চিরকালের মতো বিদায় নিয়ে যাওয়া—এ বোধ যেন তার নেই!

তার সবুজ মনের অবুঝ প্রেরণায় এই বেপরোয়া মুক্তির উপায়টি সহজেই মনে ধরলো। এখন চিন্তা, কি ভাবে কাজ হাসিল করা যায়।

আত্মহত্যার পথগুলো যেন বড় বেশি বেদনাদায়ক, আর বিপজ্জনক তো বটেই। আর হিংসাত্মক কোন কাজ তো তার স্বভাব বিরুদ্ধ।

ছোরা বা পিস্তল একেবারেই চলবে না। ওতে কেবলমাত্র আহত হবার সম্ভাবনা। তাছাড়া ঐ সব কাজে যথেষ্ট সাহস আর দক্ষতার প্রয়োজন, তার ওপর শরীরটা একেবারে বিকৃত হয়ে যাবে।

গলায় দড়ি—কদর্য। কাঠপুতুলের মতো মরা—জঘন্য, বিশ্রী। ডুবে মরা তো সম্ভবই নয়—কেন না সে সাঁতার জানে। একমাত্র বিষ চলতে পারে—কিন্তু কি বিষ? প্রায় সব রকমই তো যন্ত্রণাদায়ক আর বমির উদ্রেক করে। ওসব তার ধাতে সইবে না। ক্লোরোফরমের কথা মনে পড়লো। এই বিশেষ দ্রব্যটি সেবন করে এক মহিলার মৃত্যুর খবর কাগজে বেরিয়েছিল। অবশেষে মনোমতো পথটি আবিষ্কার করে তার মনে খুশীর আমেজ এলো: বেশ আত্মতৃপ্তি! নিজেকে খুব মহৎ মনে হলো। ওরা বুঝতে পারবে সে কি ধরনের মেয়ে ছিল।

এবার সে চলে গেল বগিভাঁতে। দাঁতের ব্যথার নাম করে একটু ক্লোরোফরম্ চাইলো। পরিচিত দোকানদার প্রশ্ন না করেই ছোট্ট একটি বড়ি দিল। এ রকম আরও একটি যোগাড় করলো ক্রসি থেকে। তৃতীয় ও চতুর্থ বিষ বড়ি সংগ্রহ হোলো শাতু ও বিউ থেকে। লাঞ্চের আগেই ফিরে এলো বাড়িতে। এতক্ষণ ঘোরাঘুরিতে ক্ষিদে পেয়েছিল প্রচণ্ড। হাব পরিশ্রমের পর যা হয়, গভীর পরিতৃপ্তি ভরে পেটপুরে খেলো। ভাব খাওয়া দেখে মা বড় খুশী। সব ঠিক

হয়ে গেছে ভেবে টেবিল ছেড়ে ওঠবার সময় বললো, 'আমাদের সব বন্ধুরা রবিবার এখানে বেড়াতে আসছেন। প্রিন্স ক্রাভালো কাভেলি-আর মসিয়ো দ্য বেলভিনোকে আমি নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছি।'

জোয়েত একটু বিমর্ষ হলেও কিছু উত্তর করলো না। কিছুক্ষণ পরে ঘর ছেড়ে সোজা স্টেশন—প্যারিসের একখানা টিকিট কাটলো। সারা বিকেল ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দোকান থেকে ক্লোরোফরম্ সংগ্রহের অভিযান চললো। সন্ধ্যায় যখন সে ফিরলো ছোট ছোট শিশিতে তার পকেট ভর্তি। পরদিনও সংগ্রহের কাজ চললো। এক দোকানে ভাগ্যক্রমে দশ আউন্স পেয়ে গেল। শনিবার বেশ গরম পড়লো, আকাশ থম্‌থমে। সে কোথাও না বেরিয়ে লম্বা এক বেতের চেয়ারে বারান্দায় বসে কাটিয়ে দিল সারাটা দিন। সংকল্পে অটল বিশ্বাসের ফলে মাথা এখন হালকা।

পরদিন খুব সুন্দর করে সাজতে সাধ হলো। সুন্দর দেখে একটি নীল রংয়ের জামা পরলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, 'আগামী কাল আমি আর থাকব না।' শরীরে অদ্ভুত শিহরণ! 'সব শেষ! কথা বলবো না, পড়ব না, ভাববো না, কেউ আর আমায় দেখতেও পাবে না। এই সব সুন্দর দৃশ্য আর কোনদিন আমার সামনে আসবে না!' আয়নায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মুখ দেখলো, চোখ দেখলো, তার গড়নে কত কি বৈশিষ্ট্য! নিজেকে নতুন করে দেখলো। যেন এ রূপ সে কোনদিন দেখেনি। সে যেন কোন অপরিচিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, যেন নতুন কোনো অচেনা মেয়ে—সে আশ্চর্য হয়ে গেল। মনে মনে বললো, 'এই-আমি! আয়নায় ও আমারই ছায়া। নিজেকে দেখতে কি আশ্চর্য! আয়না না থাকলে আমরা নিজেকে দেখতে পেতাম না। অন্যকে জানা যেত, কিন্তু নিজেকেই চেনা যেত না!'

একগোছা চুল বুকের ওপর ছড়িয়ে দিল। নিজের রূপ, ভাবভঙ্গী, চলাফেরা ভাল করে দেখলো আরশিতে। 'আমি কি সুন্দর! কাল আমি ওই বিছানার ওপর মরে পড়ে থাকবো।'

সে দেখলো ধবধবে বিছানার চাদরের ওপর তার ফর্সা মৃতদেহ

পড়ে আছে। মৃত! এক সপ্তাহ পর এই মুখ, চোখ, গাল, কপাল বাক্সবন্দী হয়ে মাটির তলায় পচে কালো হয়ে যাবে!

কেমন এক ধরনের চিন্তায় তার মন মুষড়ে পড়লো। মাঠে ঘাটে আলোর বন্যা, অবারিত বাতায়ন পথে ঊষার পবিত্র পরশ।

বসে বসে ভাবলো। মৃত—অর্থাৎ তার কাছ থেকে পৃথিবী অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পৃথিবীর কোন পরিবর্তন হবে না, তার ঘরেরও নয়। এ ঘর যেমন আছে, তেমনি থাকবে। এই শয্যা, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার কিছুই বদলাবে না। শুধু চিরদিনের মতো সেই হারিয়ে যাবে —আর মা ছাড়া এতে আর কারও কিছুই এসে যাবে না। লোকে বলবে, 'আহা! মেয়েটা কি সুন্দরীই না ছিল—আহা, বেচারা জোয়েত'—বাস্ ঐ পর্যন্তই। চেয়ারের হাতলে রাখা হাতটির দিকে তাকিয়ে আবার মনে পড়লো—এই বাহু পচে গলে হৃতশ্রী হয়ে দুর্গন্ধ ছড়াবে! সারা দেহ জুড়ে আবার সেই ভীতি বিহ্বল শিহরণ!

এই আলো, বাতাস, দিগন্তব্যাপী তার অস্তিত্ব। সে ভেবে পেলো না এই বিশ্বচরাচর ঠিক টিকে থাকবে অথচ মাঝখান থেকে কি করে সে ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে!

বাগান থেকে ভেসে এলো উতরোল হাসি, উচ্ছ্বসিত কলগুঞ্জন, আনন্দমুখর কলতান। যেন এই মাত্র গ্রাম প্রান্তে ছুটে এসেছে শহুরে ছাত্রদল। মসিয়ো দ্য বেলভিনোর উদাত্ত কণ্ঠের গান শোনা গেল:

'জানালার ধারে বসে আছি
তুমি আসবে বলে।
অবশেষে প্রিয় এলে—
তুমি এলে।'

তাকে দেখে সকলে কলরব করে উঠলো। তার পরিচিত পাঁচজন ছাড়া আরও দুজন ভদ্রলোক আছে—তারা অচেনা। সে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলো। ভাবলো, এই লোকগুলো তার মায়ের বাড়িতে, একজন পণ্যা স্ত্রীলোকের বাড়িতে মজা লুটতে এসেছে!

খাবার ঘণ্টা বাজলো। সে মনে মনে বললো, 'ওদের সকলকে দেখাব কি করে মরতে হয়।'

দৃঢ় পদক্ষেপে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলো। এ যেন স্থির প্রতিজ্ঞ কোনো খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী শহীদ সিংহের আস্তানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উদ্ধত অথচ সুমিষ্ট হেসে সে প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করলো। সারভিনি জিজ্ঞেস করলো, 'আজ তবিয়ত ঠিক আছে তো মা মজেল?'

অদ্ভুত গম্ভীর গলায় জোয়েত জবাব দিল, 'আজ আমার হৃদয়ে খুশীর জোয়ার। ঠিক প্যারিসের দিনগুলোর মতো। সাবধান!'

তারপর মসিয়ো দ্য বেলভিনোর দিকে তাকিয়ে বললো, 'প্রিয় মলভসি, আজ তুমিই আমার প্রিয়পাত্র। খাবার পর তোমাদের মার্লির মেলায় নিয়ে যাব।'

মার্লিতে মেলা জমজমাট। নবাগত দুজনের সঙ্গে পরিচয় পর্ব শেষ হোলো, কাউন্ট তামিন, আর মারকুইস্ দ্য বুকেতত্।

খেতে বসে সে বিশেষ কথা বললো না। মনে মনে ভাবনা, সারাটা বিকেল কি করে হাসিখুশী থাকা যায়—কেউ যেন আন্দাজ করতে না পারে। সবাই অবাক হয়ে বলবে—'এমন কাণ্ড কে ভেবেছিলো? ওকে এত হাসিখুশী দেখাচ্ছিল। কার মনে যে কি আছে, কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই!'

সন্ধ্যার ভাবনা সরিয়ে রাখতে চাইলো সে। সবাই যখন এই বারান্দায় থাকবে—সেই হবে তার প্রশস্ত সময়।

সাহস পাবার জন্য সে যত পারল মদ গিললো, বেশ কিছুটা ব্রাণ্ডি সঙ্গেও নিয়ে নিল। তার চোখ ঢুলঢুলু কিন্তু উজ্জ্বল। দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়ার মতো সাহস ফিরে পেলো, দেহ মন উল্লাসে নেচে উঠলো। সবাইকে ডেকে বললো, 'এবার বেরিয়ে পড়া যাক।'

সামনে বেলভিনোর হাত ধরে জোয়েত, তার পেছনে সারিবদ্ধ আর সবাই। সে বললো, 'শোনো, তোমরা আমার বাহিনী।

সারভিনি তোমায় দিলাম সার্জেণ্টের পদ। দলের বাইরে ডানদিক দিয়ে তুমি কদম মিলিয়ে চলবে। সবচেয়ে সামনে থাকবে বিদেশী অশ্বারোহী বাহিনীর দুজন—আমাদের বন্ধু প্রিন্স আর কাভেলিআর আর তাদের পেছনে সত্ত নিযুক্ত দুজন নবাগত সদস্য। আগে বাড়।'

সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চললো। সারভিনি কাল্পনিক বিউগিল বাজালো, নবাগত দুজনের ভঙ্গী যেন ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে। মসিয়ো ছা বেলভিনো বিব্রত বোধ করে বোঝাতে চেষ্টা করলো, 'মাদ্‌মোয়াজেল জোয়েত, ছেলেমানুষি করাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না, এ নিয়ে নানা জনের নানা মন্তব্য শুনতে হবে।'

সে জবাব দিলো, 'রাইসিনা, লোকের কথার আমি ধার ধারি না। কালও এ রকম হবে। তবে আমার বোঝাপড়া তোমার সঙ্গে। আমার মতো মেয়ের সঙ্গে তোমার যাওয়া উচিত নয়।'

রণবাহিনী বগিভাঁর মধ্য দিয়ে চলেছে, দুপাশে কুতূহলী জনতা। প্রত্যেকে বিস্ময়ভরে তাকিয়ে দেখছে। ঘরের লোকেরা ছুটে এলো দরজায়। রিউল থেকে মার্লির দিকে ধাবমান রেলগাড়ির যাত্রীরা চীৎকার করে উঠলো, দরজায় দাঁড়ানো ছেলেরা বলে উঠলো, 'নদীর দিকে···নদীর দিকে!'

জোয়েতের যেন এ সবে ভ্রূক্ষেপ নেই। কেমন যেন বিষাদময় গাম্ভীর্য—হতাশায় ঘেরা। সারভিনির হাত ধরে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে—যেন কোনো বন্দীকে নিয়ে যাচ্ছে। সারভিনি মাঝে মাঝে বিউগিল থামিয়ে আদেশ জারি করছে। প্রিন্স ও কাভেলিআর আড়াগোড়া পথটা নানা ব্যাখ্যা, টিপ্পনি দিতে দিতে কৌতুকে ফেটে পড়ছে। নবাগত দুজনের ড্রাম বাজানোর বিরতি নেই।

মেলায় ঢুকতেই চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। মেয়েরা মজা দেখে হাততালি দিয়ে হেসে সারা, ছেলের পাল হৈ হৈ করে উঠলো। স্ত্রীর হাত ধরে অগ্রসরমান স্থূলবপু ভদ্রলোকদের সখেদ মন্তব্য শোনা গেল, 'ওরাই জীবনটা উপভোগ করছে—ওরাই!'

চারদিকে উৎসবের কত আয়োজন। কাঠের ঘূর্ণিদোলা। জোয়েত একটি কাঠের ঘোড়ায় চেপে বসে পাশেরটিতে বসিয়ে দিল বেলভিনোকে। দলের সবাই এক একটায় চেপে বসল। তাদের দান ফুরিয়ে যাবার পরও জোয়েত নামলো না—কাউকে নামতেও দিল না। দর্শকের চোখে মুখে আহ্লাদ উপচে পড়ছে। এই কাঠের ঘোড়ায় চড়ে পাঁচবার ঘুরপাক খেয়ে যখন তারা নামল—বেলভিনো ফ্যাকাশে, অসুস্থ।

দুপাশে দোকান রেখে তারা এগোচ্ছে। মেলার অসংখ্য লোকের সাগ্রহ দৃষ্টি তাদের ওপর। যত অদ্ভুত পুতুল কিনে কিনে জোয়েত প্রত্যেকের হাতে ধরিয়ে দিল। এই উদ্ভট আনন্দে প্রিন্স ও কাভেলিআর ক্লান্ত। ব্যাণ্ডবাদক দু'জন আর সারভিনিই যা উৎফুল্ল।

হাঁটতে হাঁটতে মেলার শেষ প্রান্ত। জোয়েতের বিকৃত দৃষ্টিতে বিচিত্র বিদ্বেষের ছাপ। তাব মাথায় এক অদ্ভুত খেয়াল চাপলো। নদীব দিকে মুখ ঘুবিয়ে সবাইকে সারবেঁধে দাঁড় করিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'যে নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পাববে, সেই আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে—'

কারও মুখে সাড়া নেই। তাদেব পেছনে রীতিমতো ভিড় জমে গেছে। সাদা এ্যাপ্রন পরা দুজন মহিলা গম্ভীব মুখে দেখছে, লাল কুর্তা গায়ে দুজন সেপাই বোকার মতো হেসে ফেললো। জোয়েত আবার বললো, 'তবে আমার জন্য নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়াব মতো তোমাদের মধ্যে কেউ নেই?'

'ধুত্তোর ছাই',—বলে দেহটাকে শূন্যে তুলে শেষ অবধি সারভিনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে ছলাৎ করে জল চল্‌কে এসে পড়লো জোয়েতের পায়ে। পিছনের ভিড়ে খুশী ও বিস্ময়ের গুঞ্জন। নুয়ে একটা কাঠের টুকরো জলে ছুঁড়ে দিয়ে জোয়েত চেঁচিয়ে বললো, 'ওটা আন দেখি। দ্রুত সাঁত্‌রে যুবক কাঠের টুকরোটা তুলে নিল মুখে, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে সেটি এনে নামিয়ে দিল

জোয়েতের পায়ের কাছে। কাঠটি হাতে দিয়ে তার মাথায় একটু আদরের হাত বুলিয়ে জোয়েত বললো, 'সাবাস কুত্তা।' ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত এক মোটাসোটা মহিলা বলে উঠলো, 'মাগো। কি করে যে এমন করে?'

'বহুত আচ্ছা'—আর একজনের উক্তি। একজন লোক চেঁচিয়ে উঠলো, 'কোন মেয়েছেলের জন্য এমন করার আগে আমি যেন নরকে যাই।'

জোয়েত বেলভিনোর হাত ধরে বললো, 'নির্বোধ, কি হারালে তা তুমি জান না।'

এবার ফেরার পালা। পথের লোকদের ওপর জোয়েতের বিরক্তি বর্ধিত হোলো। বললো, 'লোকগুলোকে কেমন হাবার মতো দেখায়!' তারপর সঙ্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলে উঠলো, 'তুমিও এমন কিছু ব্যতিক্রম নও।'

মসিয়ো দ্য বেলভিনো সবিনয়ে মাথা হেলিয়ে কথাটা মেনে নিল। ঘাড় ফিরিয়ে জোয়েত আবিষ্কাব করলো প্রিন্স ও কাভেলি-আর কোথায় কেটে পড়েছে। সাবভিনির বিউগিল বাজানো বন্ধ। তার জামা প্যান্ট ভিজে সপসপে। নিতান্ত বিরস বদনে যুবক-দ্বয়ের পেছনে পেছনে হাঁটছে। যুবকদুটিও ব্যাণ্ড বাজানোয় ক্ষান্তি দিয়েছে।

জোয়েতের মুখে খেলে গেল শুকনো হাসি। 'তোমরা সবাই দেখছি ঝিমিয়ে পড়লে। একেই তোমরা মজা বল, তাই না? এই জন্যেই তোমাদের এখানে আসা। আমি তোমাদের টাকার মূল্য উশুল করে দিয়েছি।'

তারপর আর একটি কথা নয়। বেলভিনো হঠাৎ লক্ষ্য করলো জোয়েতের চোখে জল। আতঙ্কে প্রশ্ন করলো, 'কি হোলো তোমার?'

জোয়েত জবাব দিল, 'আমায় রেহাই দাও। তোমার করণীয় কিছুই নেই।'

কিন্তু বেলভিনো নির্বোধের মতো পীড়াপীড়ি করলো, 'কিন্তু, কিন্তু

মাদ্‌মোয়াজেল, নিশ্চয় কিছু হয়েছে। কেউ কি তোমার মনে আঘাত দিয়েছে?'

জোয়েত চটে গেল, 'চুপ করে থাক।'

হঠাৎ দুর্বার দুঃখের বাঁধ ভেঙে পড়লো। উচ্ছ্বসিত অশ্রুর প্লাবন, পদযুগল অচল। প্রবল হতাশায় জোয়েতের নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো, দুই হাতে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে কেঁদেই ফেললো। তার পাশে দাঁড়িয়ে নিরুপায় বেলভিনো বার বার বলে চললো, 'কি হোলো, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সারভিনি ছুটে এলো। 'ঘরে চল মামজেল। এখানে এভাবে কাঁদলে পথের সবাই দাঁড়িয়ে দেখবে। এতই যদি খারাপ লাগে, এসব বাজে হুল্লোড় না করলেই পার।' জোয়েতের হাত ধরে সে প্রায় টেনে নিয়ে চললো। বাড়ীর দুয়ারে পা দিতেই জোয়েত এক ছুটে বাগান পেরিয়ে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে দরজা দিল।

ডিনারের আগে তার দর্শন পাওয়া গেল না। এলো যখন, বড় বিষণ্ণ, গম্ভীর। বাদ বাকী সকলেরই খোশ মেজাজ। কোথা থেকে সারভিনি যোগাড় করেছে এক শ্রমিকের পোশাক। মোটা কাপড়ের ট্রাউজার, ছিটের জামা, রঙীন জার্সি আর ঢলঢলে কামিজ; তার কথাবার্তাও চাষার মতো।

কিন্তু জোয়েতের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করলো। কফি শেষ করেই সটান নিজের ঘরে। জানালার ঠিক নীচে থেকে হাসির আওয়াজ আসছে। কাভেলিআর হাসির কথা বলছে, যত স্থূল, অসংযত, বিদেশী রসিকতা। জোয়েত নিরাশ। সারভিনি মদে চুর। মাতাল শ্রমিকের অভিনয় করতে করতে মারসিঅনেসকে সম্বোধন করলো 'মিসেস ওবারদি' বলে। তারপর সেভেলের দিকে ফিরে বললো, 'এই যে মিষ্টার ওবারদি।' শুনে সমবেত কণ্ঠের হাস্যরোল।

জোয়েত এখন স্থির প্রতিজ্ঞ। চিঠির প্যাডের একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে লিখলো:

'বগিভঁা'

রবিবার, রাত ন'টা।

আমি মরছি, যাতে কোনদিন আমাকে বাঈজি হতে না হয়।'

'জোয়েত।'

তারপর আরও একছত্র।

'বিদায়, মাগো, আমায় ক্ষমা কোরো।'

'জোয়েত।'

খামের মুখ আটকে ওপরে লিখলো—'মাদাম লা মারসিঅনেস ওবারদি।'

আরাম কেদারাটাকে জানালার কাছে এগিয়ে নিয়ে এলো। ছোট টেবিলটাকে হাতের কাছে রাখলো, তার ওপব কিছুটা তুলো আর বেশ বড় একটা ক্লোবোফরমেব শিশি। বারান্দার পাশেই মস্ত একটি গোলাপ গাছের পুষ্পিত শাখা জোয়েতের খোলা জানালায় উঁকি দিয়েছে। রাতের নির্মল বাতাসে গোলাপের সুমিষ্ট সুবাস। কালো আকাশের বুকে বাঁকা চাঁদ, তাব আশে পাশে অলক মেঘের লুকোচুরি খেলা। জোয়েতেব মনে হোলো আজই তার শেষ দিন, আজই শেষ! তাব বুকে ব্যথাব সমুদ্র, হৃদয় উদ্‌বেল, কণ্ঠ রুদ্ধ। গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে কবছে, হায় কেউ যদি দয়া কবতো, যদি ক্ষমা ভিক্ষা দিতো—তাকে ভালবাসতো! '

সারভিনির গলা কানে এলো। কোন সস্তা রসেব গল্প শোনাচ্ছে, মুহুর্মুহু সকলের হাস্যধ্বনি। মারসিঅনেসেব খুশী যেন সব চেয়ে বেশি। বার বার তার সহাস্য ঘোষণা শোনা গেল, 'এমন সুন্দব করে আর কেউ বলতে পারতো না।'

বোতলের ছিপি খুলে জোয়েত একটু তুলোব মধ্যে খানিকটা তরল পদার্থ ঢেলে নিল। তীব্র কটু, ঝাঁঝালো মিষ্টি গন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত; ভেজা তুলোটা জিভে নিয়ে সেই উগ্র অস্বস্তিকব স্বাদ পান করতেই তার কাশি এলো।

মুখ বন্ধ করে জোরে শ্বাস টানলো জোয়েত। চোখ বুজে সেই

মরণ গরল গিলে ফেললো। ধীরে ধীরে অনুভূতি স্তিমিত হয়ে আসবে, সে বুঝতেই পারবে না কি ঘটে যাবে।

বুক ফুলে ফুলে উঠছে। আস্তে আস্তে দুঃখের বোঝা হালকা হয়ে যেন উবে যাচ্ছে।

আঙুলের ডগা থেকে কেমন এক মধুর সুখকর শিহরণ একটু একটু করে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে, সে যেন এক কল্পনা রাজ্যের যাত্রী।

হঠাৎ খেয়াল হোলো তুলোটা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু সে এখনও জীবিত। বরং চেতনা আরও সূক্ষ্ম, সজাগ, সুতীব্র। নিচের বারান্দার প্রতিটি কথাই শুনতে পাচ্ছে। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে এক অস্ট্রিয়ান জেনারেলকে হত্যার পল্লবিত বর্ণনা প্রিন্স ক্রাভালোর মুখে।

দূর প্রান্তরে সময়ের সংকেতধ্বনি, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, কোলা ব্যাঙের আর্তনাদ আর পাতার খস্ খস্ আওয়াজ।

আর এক টুকরো তুলো ভিজিয়ে নিয়ে সে নাকের কাছে ধরলো। কিছুক্ষণ কিছুই হলো না। তারপর সেই সুমিষ্ট ঝাঁঝালো গন্ধটি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

দু'বার অনেকটা ওষুধ ঢাললো। তার অতি সজাগ দেহ-মনের চেতনা যেন কোন ঘুমের পাতালপুরীতে তলিয়ে যাচ্ছে। তার দেহ থেকে অস্থি, মেদ, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ উড়ে উড়ে চলে গেল—সে টের পেলো না। চৈতন্যনাশক বিষে তাব সমগ্র দেহটি বিলুপ্ত হয়ে গেল, পড়ে রইল কেবল তার অতি সচেতন, অনন্ত বিস্তৃত, অবাধ অনুভূতি —এমন সজীবতা সে আগে কখনও উপলব্ধি করেনি।

বিগত কত কথাই তার মনে এলো। ছেলেবেলার ফেলে-আসা দিনগুলোর কত টুকরো স্মৃতি। বড় ভাল লাগছে। স্মৃতিলোকে চলেছে দ্রুত পরিকল্পনা, এক ঘটনা থেকে আর এক ঘটনা, শত সহস্র দুঃসাহসিক অভিযান, অতীতের মধুর সুখ আর ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন। অতীত ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে এই স্বচ্ছন্দ বিচরণে হৃদয় স্বর্গ-সুখে ভরে উঠলো।

তখনও বারান্দার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। কিন্তু তার কাছে বর্তমান অসাড়। সে যেন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। নীচের কথাবার্তা তার মর্মস্থলে আঘাত হানছে, ভিতরে প্রবেশ পথ পাচ্ছে না।

জোযেত এখন বিশাল তরীর যাত্রী; ফুলের দেশের পাশ ঘেঁষে চলেছে তার তরণী। তাতে লোকজনের কোলাহল। হঠাৎ কেমন করে হোলো জানে না, দেখলো সে ফুলের দেশে হেঁটে বেড়াচ্ছে, আর সারভিঁন এসেছে তাকে ষাঁড়ের লড়াইয়ে নিয়ে যেতে। তার পরনে রাজপুত্রের বেশ। পথে কত লোক। সকলেই মুখর, আর তাদের সব কথাই সে বুঝতে পারছে। ওই লোকজনদের দেখে তার অবাক হবার কিছু নেই; সবাই যেন তার বহুকালের চেনা। তার এই জাগর স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তখনও বারান্দা থেকে কানে বাজছে মা আর তার বন্ধুদের মিলিত বাক্যালাপ আর হাস্যরব।

কিছুক্ষণ সব কিছু অবলুপ্ত। ক্রমে এক মধুর তন্দ্রা থেকে সে জেগে উঠলো। সক্লেশে চৈতন্য ফিরে পেলো।

অর্থাৎ এখনও মরেনি। কিন্তু এত ভাল লাগছে, এমন গভীর সুখ আর নিটোল শান্তি নাশ করবার ইচ্ছে হোলো না। সাধ গেল এই অবস্থা চিরস্থায়ী করে রাখে।

ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরে দম নিয়ে গাছের মাথায় চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকলো। মনের মধ্যে কোথায় যেন ওলট পালট হয়ে গেছে, খানিক আগের ভাবনা অন্তর্হিত। ক্লোরোফরমের গুণে তার দেহ মনের জ্বালা প্রশমিত—আর ইচ্ছাটিরও ঘটেছে অপমৃত্যু।

কেন সে বাঁচবে না, কেন ভালবাসা পাবে না? সুখে বেঁচে থাকায় ক্ষতি কি? জীবনটা বড়ই সুন্দর, লোভনীয় আর মনোরম মনে হোলো। তাই চিরকালের মতো স্বপ্নে মশগুল থাকবার জন্যে আবার তুলোয় ঢেলে নিল সেই মাদকদ্রব্য। মাঝে মাঝে নাকের কাছে তুলোটা বুলিয়ে নিয়ে সরিয়ে ফেললো। শুধু স্বপ্নাবেশ দীর্ঘতর হোক, মৃত্যু যেন না আসে।

চাঁদের দিকে তাকিয়ে একটি মুখ দেখতে পেলো—এক মহিলার মুখ। আকাশের চাঁদে ভাসমান সেই মুখ গান গাইছে, এ মুখ তার চির পরিচিত, এ মুখ তার মায়ের। মারসিঅনেস তখন পিয়ানোয় গান গাইছিল।

জোয়েতের যেন ডানা হয়েছে। নিস্তব্ধ নিশুতি রাতে, বন উপবনের ওপর দিয়ে সে উড়ে বেড়াচ্ছে। তার বিশাল পক্ষ দুটি বিস্তার করে মৃদুমন্দ বাতাসে ভর দিয়ে মহাসুখে নিঃসীম মহাশূন্যে ভেসে বেড়ালো। বাতাসের সোহাগ পরশে তার দেহ পুলকিত। চক্রাকারে সে এত দ্রুত ঘুরছে যে নীচের কিছুই চোখে পড়ছে না। তারপর দেখলো সে যেন একটা পুকুর পাড়ে ছিপ ফেলে বসে আছে, সুতোয় টান পড়তেই হাতে ওঠালো। বঁড়শির মাথায় গাঁথা অতি মনোহর একছড়া মুক্তোর মালা—তার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত ধন! এতে যেন বিস্ময়ের কিছুই নেই, সে ঘাড় ফিরিয়ে সারভিনিকে দেখলো। কখন এবং কিভাবে জানে না, সারভিনিও তার পাশে মাছ ধরতে বসেছিল। তার ছিপে উঠলো একটা কাঠের ঘোড়া।

আবার তার জ্ঞান ফিরে এলো। নীচে থেকে সবাই তাকে ডাকছে। মা বললো, 'বাতি নিভিয়ে দাও।'

সারভিনির পরিষ্কার সরস উক্তি—'মামজেল এবার তোমার আলো নেভাও।'

সকলে মিলে এক ধুয়ো ধরলো— 'মামজেল জোয়েত, তোমার আলো নেভাও।'

আবার সে তুলো ভিজিয়ে নিল। তার মরবার সাধ নেই, তাই প্রাণভরে টাটকা বাতাস টেনে নিল। সে জানতো নিশ্চয় কেউ খোঁজ করতে আসবে, তাই ঘরটিতে ওষধের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে দেবার জন্যে হাত লম্বা করে সেই সিক্ত তুলো শূন্যে ধরে রাখলো। শায়িত এক অতি লোভনীয় ভঙ্গীতে দেহটিকে গুছিয়ে নিয়ে সে অপেক্ষা করে থাকলো। মারসিঅনেস বললো, 'হাবা মেয়েটা টেবিলে মোমবাতি জ্বেলে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাবনার কথা! বারান্দায়

দিকের জানালাও খোলা রয়েছে। ক্লিমেন্স, যাও তো, বাতি নিভিয়ে জানালা বন্ধ করে দিয়ে এসো।'

ঝি এসে দরজায় টোকা দিল, 'মাদ্‌মোয়াজেল, মাদ্‌মোয়াজেল,' কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে আবার বললো, 'মাদ্‌মোয়াজেল, মাদাম লা মারসিঅনেস বাতি নিভিয়ে, জানালাটা বন্ধ করে শুতে বলেছেন।'

আরও কিছুক্ষণ নীরব প্রতীক্ষার পর সে চেঁচিয়ে ডাকলো, 'মাদ্‌মোয়াজেল, মাদ্‌মোয়াজেল!'

এবারও কোন সাড়া নেই। দাসী নীচে গিয়ে খবর দিল, 'মাদ্‌মোয়াজেল নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। দরজা বন্ধ বলে তাঁকে জাগানো গেল না।'

মাদাম ওবারদি বললো, 'কিন্তু ওভাবে ঘুমনো ঠিক নয়।'

সারভিনির পরামর্শে ছেলেরা সবাই জোয়েতের জানালা বরাবর দাঁড়িয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে, মামজেল জোয়েত!'

সম্মিলিত কণ্ঠস্বর জ্যোৎস্না-বিধৌত নিঝুম নিশীথিনীর বুক চিরে দূরাগত ট্রেনের শব্দের মতো শূন্যে মিলিয়ে গেল।

জোয়েতের সাড়া না পেয়ে মারসিঅনেস বললো, 'আমার ভাবনা হচ্ছে, ওর কিছু হয়নি তো?'

দেওয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড গোলাপ গাছটা থেকে এক রাশ কুঁড়ি ছিঁড়ে নিয়ে সারভিনি একটা একটা করে ছুঁড়ে মারলো জানালা লক্ষ্য করে। প্রথমটা গায়ে পড়তেই জোয়েত ভীষণ চমকে উঠলো, আর একটু হলেই চেঁচায় আর কি। কোনটা তার জামায় পড়লো, কোনটা চুলে—আবার অনেকগুলো মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বিছানাটা ভরে তুললো। মারসিঅনেস আর্তনাদ করে উঠলো, 'কি হলো জোয়েত, কথা বলছিস্ না কেন?'

সারভিনি বললো, 'ব্যাপার সুবিধার ঠেকছে না। আমি বরং বারান্দার পাঁচিল বেয়ে উঠে দেখি।'

কিন্তু কাভেলিআর বাধা দিলো, 'মাফ করবেন, কিন্তু এটা একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না? পরস্পরের সাক্ষাতের এই উপযুক্ত সময়, আর পন্থাটিও অভিনব।'

জোয়েত সকলের সঙ্গে ছলনা করছে মনে করে সবাই সমস্বরে বলে উঠলো, 'এটা সাজানো ব্যাপার। ও এভাবে যেতে পারবে না—পারবে না। আমরা সবাই প্রতিবাদ করছি।'

কিন্তু উদ্‌বিগ্ন মাবসিঅনেস বললো, 'কিন্তু একজনকে যে গিয়ে দেখতেই হবে।'

নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রিন্স ঘোষণা করলো, 'বুঝেছি, ডিউককেই ওর পছন্দ। আমাদের ঠকানো হয়েছে!'

পকেট হাতড়ে একশ' টাকার একটা স্বর্ণমুদ্রা হাতে নিয়ে কাভেলিআর বললো, 'ঠিক আছে, সম্মানের খাতিরে টস্ করে ঠিক করা যাক্, কে যাবে।'

প্রথমে এগিয়ে এলো প্রিন্স ক্রাভালো। সে বললো, টেল, কিন্তু পড়ল হেড। প্রিন্স মুদ্রাটা সেভলের দিকে ছুঁড়ে দিল। সেভল বললো, হেড, কিন্তু হলো বিপরীত। প্রিন্স একে একে সবাইকে ডাকলো, কিন্তু কারও ভাগ্যেই মুদ্রাটা কথামতো পড়লো না। একমাত্র সারভিনি বাকি ছিল। সে বিরক্ত হয়ে বললো, 'যত সব অঘটন, এর মধ্যে নিশ্চয় হাত সাফাইয়ের কারসাজি আছে!'

রাশিয়ান ভদ্রলোক মুদ্রাটি সারভিনির হাতে দিয়ে বললো, 'তাহলে ডিউক, তুমি নিজে হাতে একবার করে দেখ দেখি।'

সারভিনি নিজে হাতে টাকাটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে ডাকলো—'হেড'।

হোলো টেল। অগত্যা নতমস্তকে সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে ঝুল বারান্দার পিলারটা দেখিয়ে বললো, 'প্রিন্স, তুমিই যাও।'

বিচলিত প্রিন্স চারদিকে তাকালো। কাভেলিআর শুধালো, 'এদিক ওদিক কি দেখছো?'

'আমি···যদি একটা মই—মই পাওয়া যেত।'

একযোগে হাস্যধ্বনি। সেভেল এগিয়ে এসে বললো, 'ঠিক আছে, আমরা সাহায্য করছি।'

হারকিউলিসের মতো দুই সবল বাহুতে তাকে তুলে ধরে সেভেল বললো, 'বারান্দার কার্নিস শক্ত করে ধর।'

প্রিন্স দু'হাতে ব্যালকনি আঁকড়ে ধরতেই সেভেল তাকে ছেড়ে দিল। প্রিন্স হাতে ভর দিয়ে শূন্যে দোদুল্যমান, আর ঠিক তখনি সারভিনি তার ঠ্যাং দুটো কষে চেপে ধরে ঝুলে পড়লো। এই আকর্ষণে হাতের মুঠো আলগা হয়ে প্রিন্স কাঠের টুকরোর মতো ঝপ্ করে পপাত ধরণীতলে, আর পড়বি তো পড় মসিয়ো দ্য বেলভিনোর ভুঁড়ির ওপর—যে দৌড়ে আসছিল তাকে সাহায্য করতে।

'এবার কার পালা?'

সারভিনির এই আহ্বানের প্রত্যুত্তর নেই। সে আবার বললো, 'এসো মসিয়ো বেলভিনো, একটু সাহস দেখাও।'

'আজ্ঞে না মশায়, ধন্যবাদ! আমার হাড় কখানা অক্ষতই রাখতে চাই।'

'কাভেলিআর তুমি? দুর্গের উচ্চতা পরিমাপে তো তোমার অভিজ্ঞতা আছে।'

'বৎস ডিউক, এ কাজের ভারটা আমি তোমাকেই দিলাম।'

'বেশ—বেশ, যদিও এ ব্যাপারে তোমাদের মতো দক্ষ বলে আমার অহঙ্কার নেই।'

সারভিনি পিলারটার চারধারে একপাক ঘুরে পরীক্ষা করে নিল। তারপর এক লাফে বারান্দার কানিস ধরে ফেললো। সমান্তরাল বারে ব্যায়াম প্রদর্শনীর মতো করে একবার দোল খেয়ে দেহটাকে ওপরে তুলে ছাতের লোহার বরগা ধরে ফেললো।

ওপরে তাকিয়ে প্রত্যেকটি দর্শক বাহবা দিলো। কিন্তু পরক্ষণেই সারভিনি মুখ বাড়িয়ে আর্তনাদ করে উঠলো, 'শীগ্‌গির এসো, শীগ্‌গির! জোয়েত অজ্ঞান হয়ে গেছে!'

মারসিঅনেস বিলাপ করতে করতে সিঁড়ির দিকে ছুটলো। কন্যা

চোখ বুজে পড়ে আছে মড়ার মতো। ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকেই মা ঝাঁপিয়ে পড়লো গায়ে। তার ব্যাকুল প্রশ্ন, 'কি হয়েছে, আমাকে বল, কি হয়েছে ?'

ক্লোরোফরমের শিশিটি মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সারভিনি বললো, 'ইচ্ছে করে ওষুধ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে আছে।' তারপর ওর বুকে কান লাগিয়ে বললো, 'এখনও শ্বাস আছে, এখুনি ওকে সুস্থ করে তুলতে হবে। একটু এ্যামোনিয়া আছে ?'

'একটু কি—একটু কি, সার ?' হতচকিত ঝিয়ের জিজ্ঞাসা।

'সলভোলেতাইল জাতীয় কিছু ?'

'আছে সার।'

'দৌড়ে আনো। আর কপাট ভাল করে খুলে দাও, বাতাস আসুক।'

মারসিঅনেস হাঁটু মুড়ে বসে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছে। 'জোয়েত, জোয়েত, বাছা আমার! প্রিয়, ছোট্ট সোনা আমার, শোন্, কথা বল্ জোয়েত, মা মণি আমার! ওঃ! হায় ভগবান! হে ঈশ্বর, ওর কি হোলো ?'

হতভম্ব বিহ্বল ভদ্রলোকেরা কি করবে বুঝতে না পেরে অশান্ত ভাবে জল, তোয়ালে, গ্লাস এবং ভিনিগার নিয়ে ছুটোছুটি শুরু করলো। একজন বলে উঠলো, 'ওর জামা খুলে দেওয়া দরকার।'

ভয়ে বিহ্বল মারসিঅনেস মেয়ের জামা খুলে দিতে গেল। কাঁপা হাতে এটা সেটা টানাটানি করে আরও বেশি করে জড়িয়ে ফেললো। জড়ানো গলায় বললো, 'আমি—আমি পারছি না—পারছি না!'

ঝি ওষুধ নিয়ে এলো। সারভিনি শিশি উপুড় করে অনেকটা রুমালের মধ্যে ঢেলে নিয়ে জোয়েতের নাকের কাছে চেপে ধরলো। জোয়েত নড়ে চড়ে উঠলো। সারভিনি খুশীতে বলে উঠলো, 'ঠিক হ্যায়। ওর নিশ্বাস পড়ছে। আর কোন ভয় নেই।'

ওষুধে-ভেজা রুমাল দিয়ে সারভিনি তার কপালের দুপাশ, গাল, গলা মুছে দিল। ঝিকে ডেকে বললো ওর পোশাক খুলে দিতে।

শিথিল অন্তর্বাস ছাড়া আর সব জামা কাপড় খুলে দেওয়া হলে সারভিনি দুহাতে জড়িয়ে ধরে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। ওই স্বল্পাবৃত দেহের মদির ঘ্রাণ, কোমল ত্বকের নরম ছোঁয়ায় সারভিনি তৃপ্তি পেল।

বিছানায় জোয়েতকে নামিয়ে রেখে সে ব্যথিত চিত্তে উঠে দাঁড়ালো। জোয়েতের শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক দেখে বললো, 'বিপদ কেটে গেছে, আর কোন ভয় নেই।' কিন্তু বিবশ জোয়েতের দিকে সকলের লুব্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করে তার শিরা উপশিরায় ঈর্ষা ফেনিয়ে উঠলো। তাদের দিকে রোষ নেত্রে তাকিয়ে বললো, 'দেখুন, রোগীর ঘরে বড্ড বেশি ভিড় হয়ে গেছে। দয়া করে শুধু সেভেল আর আমাকে মারসিঅনেসের সঙ্গে থাকতে দিন।'

তার এই আদেশের সুরে স্পষ্ট ইঙ্গিতে সেভেল ছাড়া সবাই বেরিয়ে গেল।

মাদাম ওবারদি তার প্রেমিকের কোমর জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ নিয়ে ডুকরে উঠলো। 'ওকে বাঁচিয়ে দাও…ওঃ! ওকে বাঁচিয়ে দাও।'

পেছন ফিরতেই সারভিনি টেবিলের ওপর চিঠিটা দেখতে পেল। সেদিকে ঝুঁকে ঠিকানা পড়লো, এবার আগাগোড়া ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হোলো না। মারসিঅনেস না জানলেই ভাল। খাম ছিঁড়ে এক লহমায় দুছত্র লেখা পড়ে ফেললো।

'আমি মরছি, যাতে কোন দিন আমাকে বাঈজী হ'তে না হয়।'

'জোয়েত'।

'বিদায়, মাগো, আমায় ক্ষমা কোরো।'

'জোয়েত'।

'মরুক গে, এ ব্যাপারে পরে ভাবব।' মনে মনে বলে সে চিঠিটা পকেটে লুকিয়ে ফেললো। বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে মনে হোলো ওর জ্ঞান ঠিকই ফিরেছে, কিন্তু লজ্জায়, সংকোচে আর প্রশ্নবাণের ভয়ে চোখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না।

পায়ের দিকে হাঁটুগেড়ে বসে মারসিঅনেস কাঁদছে। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'একজন ডাক্তার! ডাক্তার ডাকা দরকার!'

সারভিনি ফিস্‌ফিস্‌ করে সেভেলের সঙ্গে আলাপ করছিল—শুনে বলে উঠলো, 'আর দরকার হবে না, ঠিক হয়ে গেছে। শুধু এক মিনিটের জন্যে বাইরে যান, আমি কথা দিচ্ছি আপনি ফিরে এলেই ও আপনার সঙ্গে কথা বলবে।'

মাদাম ওবারদিকে উঠিয়ে নিয়ে সেভেল ঘর ছেড়ে চলে গেল। শিয়রের দিকে বসে সারভিনি জোয়েতের একটি হাত তুলে নিয়ে ডাকলো, 'মামজেল, আমার দিকে তাকাও, কথা শোনো।'

জোয়েত নীরব, নিস্পন্দ। আর কোন কথা নয়, শুধু পড়ে থাকা, শুধু চির সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য আর পরম আবেশে এলিয়ে থাকা। অননুভূত এক অনন্ত স্বর্গলোক। প্রশান্ত রজনীর নির্মল বাতাস মাঝে মাঝে মুখে চোখে ব্যজন করে যাচ্ছে। এক অদৃশ্য হস্তের কোমল, শীতল ও আদুরে বাতাস। বনের যত গাছের পাতা, রাত্রির যত নির্বাক ছায়া, নদীর যত কুয়াশা—সব দিয়ে যেন এক পাখা রচিত হয়েছে—আর তার সুখকর নিশীথ নিঃশ্বাসে ভেসে বেড়াচ্ছে যত ফুলের সুবাস; তার ঘরে ছড়িয়ে থাকা যত গোলাপ কুঁড়ি আর বারান্দার দেওয়াল বেয়ে ওঠা গোলাপ গাছটির যত ফোটা ফুলের সুমিষ্ট সৌরভ।

জোয়েতের আঁখি পল্লব নিমীলিত, ওষুধের নেশায় তার চেতনা অর্ধ জাগরিত। আর তার মৃত্যুর ইচ্ছা নেই, শুধু বেঁচে থাকবার বাসনা, সুখে থাকবার দুর্বার আগ্রহ। আর প্রাণ ভরে, তনুমন জুড়ে ভালবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা।

সারভিনি আবার ডাকলো, 'মামজেল জোয়েত, আমার কথা শোনো।'

এবার দুটি নীলোৎপল উন্মোচিত হোলো। আর তাই দেখে সারভিনি বলে উঠলো, 'এবার ওঠো তো দেখি; এসব বোকামির কোন অর্থ হয়?'

জোয়েত ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, 'আমার এত দুঃখ হয়েছিল, মাস্কেদ।'

আদর করে হাতে হাত বুলিয়ে সারভিনি বললো, 'এসব দুষ্টুমি-বুদ্ধি ঢের হয়েছে; এবার প্রতিজ্ঞা করো—এ সব পরীক্ষা আর কখনও করবে না?'

মুখে জবাব না দিয়ে জোয়েত ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানালো। তার মুখে একটু হাসির ঝিলিক খেলে গেল—যা দেখা গেল না, কিন্তু সমগ্র অন্তর দিয়ে অনুভব করলো সারভিনি।

এবার পকেট থেকে জোয়েতের চিঠিটা বের করে সারভিনি বললো, 'এটা তোমার মাকে দেখাবে?'

মাথা নেড়ে জোয়েত নিষেধ করলো।

এ অবস্থায় কি করা যায় সারভিনি ভেবে পেলো না। ভেবে চিন্তে বললো, 'প্রিয় সখী আমার, আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব বহন করতেই হবে—তা সে যত দুঃখেরই হোক না কেন। তোমার ব্যথা আমি বুঝি··· আমি শপথ করছি ’

'তোমার অসীম দয়া।' - বাধা দিয়ে জোয়েত বললো।

আবার নীরবতা। সারভিনির চোখে পলক পড়ে না। জোয়েতের মমতা মাখানো চোখে সমর্পণের প্রতিশ্রুতি। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে জোয়েত সারভিনিকে কাছে ডাকলো। সারভিনি তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল-- ওষ্ঠাধরের মিলনে দুটি সত্তা এক হয়ে গেল।

চোখ বুজে এভাবে থাকলো বহুক্ষণ। তারপর নিজের ওপর আস্থা শিথিল হয়ে আসছে দেখে সারভিনি দাঁড়িয়ে পড়লো।

জোয়েতের মুখে ভালবাসার মধুর হাসি, সারভিনির কাঁধ ধরে আবার নিজের মুখে নামিয়ে আনতে চেষ্টা করলো। সারভিনি বললো, 'তোমার মাকে নিয়ে আসি।'

জোয়েত ফিস্‌ফিস্ করে বললো, 'আরও একটু, এত ভাল লাগছে।'

মুহূর্তের নীরবতার পর অতি মৃদুকণ্ঠে বললো, 'তুমি আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে --না?'

জানু পেতে বিছানার পাশে বসে সারভিনি জোয়েতের হাতে চুমু আঁকলো। বললো, 'তোমায় আমি শ্রদ্ধা করি।'

দরজার কাছে পায়ের শব্দ হতেই সে লাফিয়ে উঠে স্বাভাবিক পরিহাসের গলায় বললো, 'এবার সবাই ভেতরে আসতে পার—সব ঠিক হয়ে গেছে।' বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মারসিঅনেস সস্নেহ দুই বাহুতে কন্যাকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুতে তার মুখ সিক্ত করে দিল।

পায়ে পায়ে সারভিনি বেরিয়ে এলো উন্মুক্ত বারান্দায়। প্রাণ ভরে নির্মল বায়ু সেবন করলো। তার হৃদয় পরিপূর্ণ—দেহ ভালবাসার স্বাদে ভরপুর।

মেসার্স লাবুজ এণ্ড কোম্পানীর আজীবনের হিসেবরক্ষক লেভা এখন বৃদ্ধ। আজ যখন দোকান থেকে বেরোলেন, পশ্চিম দিগন্তে অস্তগামী সূর্যের বর্ণচ্ছটায় তাঁর চোখ ঝলসে গেল। পথের ওপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সারাদিন তাঁকে ছোট্ট খুপরির মধ্যে গ্যাসের হলুদ বাতি জ্বালিয়ে কাজ করতে হয়। দোকানের পেছনে অপরিসর খাদের মধ্যে তাঁর মাথা গোঁজার ঠাঁই। তার দোরে দাঁড়ালে গাঁয়ের প্রান্তর চোখে পড়ে। গত চল্লিশ বছর এক নাগাড়ে এই অন্ধকূপের মধ্যেই তাঁর দিন কেটেছে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মার্তণ্ডদেবের দুর্দান্ত প্রকোপ উপেক্ষা করে মাঝে মাঝে বেলা এগারোটা থেকে তিনটে ছাড়া ভর দুপুরেও বাতির ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

ঘরের ভেতর সর্বদা একটা ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে ভাব। ঘরের বাইরে ঠিক জানালার নিচে নোংরা নর্দমার পঙ্কিল গন্ধে বাতাস সর্বদা কলুষিত। এই কয়েদখানায় প্রতিদিন সকাল আটটায় প্রবেশ করেছেন। সারাদিন এই বাধ্য অধস্তন কর্মচারীটি মস্ত হিসেবের খাতায় ঝুঁকে মনোযোগের সঙ্গে লেখালেখি করে বেরিয়েছেন সেই সন্ধ্যে সাতটায়। গত চল্লিশ বছরে এর নড়চড় হয়নি।

বার্ষিক পনেরো শো ফ্রাঁ থেকে শুরু করে আজ তাঁর আয় দাঁড়িয়েছে তিন হাজার ফ্রাঁতে। কিন্তু এই আয়ে তো আর সংসার চলে না, তাই অকৃতদার। সত্যিকারের নিঃস্ব বলে জীবনের চাহিদাও অতি সামান্য। মাঝে মাঝে এই অনন্ত একঘেয়ে কাজে বিরক্তি আসত, মনে নিস্পৃহ ভাব জাগত। কখনও কখনও মনে মনে ঈশ্বরের কাছে দুঃখ জানাতেন :

'হে পরমেশ্বর, যদি আমার বছরের আয় পাঁচ হাজার ফ্রাঁ হোতো, তবে কি সুখেই না দিনগুলো কাটত!' কিন্তু বেতনের

বাইরে কোন উপরি না থাকায় স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর জীবনে কোনদিন এলো না।

এই আকাঙ্ক্ষাহীন জীবনে কোনদিন কোন রোমাঞ্চ ঘটেনি। আর কিছু না হলেও নির্ভেজাল স্বপ্নসৌধ গড়ে তোলায় মানুষের বাধা নেই। কিন্তু তাঁর উচ্চাশার স্বল্পায়তন উদ্যানে স্বপনের কুসুমেরা কখনও পাপড়ি মেলেনি। কুড়ি বছর বয়সে সেই কলে সাবুজ এণ্ড কোম্পানীতে ঢুকেছেন আর বেরোতে পারেননি।

আঠারো শো ছাপ্পান্ন সালে মারা গেলেন বাবা, আর মা গেলেন আটারো শো উনষাটে। তারপর একদিন বাড়িওয়ালা ভাড়া বাড়াতে চাইলে আঠারো শো আটষট্টি সালে সেই বাড়ি বদলানো। এই যা তাঁর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা।

প্রতিদিন কাঁটায় কাঁটায় ৮'টায় কামানের গোলার মতো বিকট আওয়াজ করে ঘড়ির বেল বেজেছে। তিনি লাফ দিয়ে উঠে পড়েছেন বিছানা ছেড়ে। কেবলমাত্র দুবার, একবার আঠারো শো ছেষট্টি আর একবার আটারো শো চুয়াত্তর সালে ঘড়িটি যে কেন খারাপ হয়েছিল, কে জানে?

প্রথমে জামাটা গায়ে গলিয়ে বিছানা তুলে ফেলা, তারপর ঘরদোর পরিষ্কার করা, টেবিল চেয়ার মোছা। এই তার রোজকার ধরাবাঁধা কাজ। কাজগুলো সারতে ঘণ্টা দেড়েক লাগতো। তারপর লাহুর বেকারী থেকে রুটি কিনে খাওয়া। তাঁর চোখের সামনেই দোকানটা এগারো জন মালিকের হাত বদল হোলো, অথচ নামটা ঠিক সেই আছে। জীবনের বাকি অস্তিত্বটুকু কেটেছে অফিসের অন্ধকার কুঠুরিতে, যার দেওয়ালের কাগজ কোনদিন পালটানো হয়নি। একদিন মসিয়ো ক্রুসেতেঁর সহকারী হয়ে কাজে যোগ দিয়েছিলেন, আশা ছিল তাঁর স্থানটি দখল করবেন। আশা মিটেছে, বাস্, জীবনের চাহিদা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

জীবনের চলার পথে লোকের কত অভিজ্ঞতা হয়। মনের ভাণ্ডারে জমে ওঠে কত শত সুখ দুঃখের স্মৃতি, কত অপ্রত্যাশিত

ঘটনা, দুঃসাহসিক কর্ম, প্রেম ও বিচ্ছেদ। তাঁর মুক্ত সত্তায় এ সব সুযোগ চিরকালের মতো চলে গেছে। তাঁর কাছে এখন দিন, সপ্তাহ, মাস, ঋতু, বৎসর সব একাকার। প্রতিদিন রুটিনমাফিক শয্যাত্যাগ, লাঞ্চ খাওয়া, অফিস যাওয়া, তারপর অফিস থেকে ফিরে ডিনার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়া। কোনদিন কোন সময়ে এই একঘেয়ে ক্লান্তিকর কর্ম ও চিন্তাধারায় ছেদ পড়েনি।

ঠাকুরদার আমলের ছোট গোল আয়নার মধ্যে এককালে তাঁর নিখুঁত গোঁফজোড়া আর কোঁকড়ানো চুলের বাহার দেখেছেন। আর এখন প্রতিদিন বাইরে যাবার আগে সেই একই আয়নায় সাদা গোঁফ আর টাকপড়া প্রশস্ত কপালটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর দ্রুত, বিষাদময় শূন্যতার মতো নিদ্রাহীন রাত্রির মত অতিবাহিত হোলো। এই চল্লিশ বছরের মধ্যে পিতামাতার মৃত্যু ছাড়া আর কোন স্মৃতি মনে দাগ কাটলো না। কিছু না।

কিন্তু আজ দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে মসিয়ো লেভার দুচোখ জুড়িয়ে গেল। পশ্চিম আকাশ জুড়ে সূর্যাস্তের মহা সমারোহ। আজ আর ঘরে ফিরতে মন চাইল না। ডিনারের আগে একটু হেঁটে বেড়ানোর ইচ্ছা। এমন ইচ্ছা বছরে চার পাঁচবারের বেশি হয়নি।

পায়ে পায়ে বুলভার্দ। গাছে গাছে ফুলের হাসি, আর নিচে জনতার স্রোত। নব বসন্তের এমন সন্ধ্যায় জীবনের উন্মাদনায় প্রাণ মাতাল।

মসিয়ো লেভার চরণে বার্ধক্যের অবসাদ। চোখে সজীব প্রফুল্লতা। মনে তাঁরও আনন্দ, কেননা বাতাস উষ্ণ, প্রকৃতি উৎফুল্ল। এই উষ্ণ বাতাসের স্পর্শে হৃদয়ে যৌবনের প্রেরণা সঞ্চারিত হোলো, তিনি সাঁজেলিজের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললেন।

সারা আকাশে যেন আগুন লেগেছে। আর ওই মহিমান্বিত দিগন্তের পশ্চাৎপটে আর্ক দ্য ট্রায়াম্ফি যেন বিশাল দৈত্যের মতো

ঐ জ্বলন্ত গৃহের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। বিশালকার ঐ মনুমেন্টের পাদদেশে পৌঁছে বৃদ্ধ হিসেবরক্ষকের মনে হোলো ক্ষিদে পেয়েছে। দেরি না করে ঢুকে পড়লেন একটা রেস্তোরাঁয়।

দোকানের সামনে খোলা ফুটপাথে বসে ভেড়ার খুরের শব্দ শুনতে শুনতে তাঁর খাওয়া হোলো চমৎকার। নিরামিষ তরকারি আর চাটনি। দই এর পর মুখ বদলাতে ভাল ক্লারেত* আধ বোতল। তারপর প্রতিদিনের অভ্যাসমতো এক কাপ কফি আর সব শেষে ছোট এক গ্লাস তরল ব্রাণ্ডি।

দাম মিটিয়ে বাইরে এলেন। এখন বেশ সজীব, প্রাণবন্ত, চাঙ্গা লাগছে। নিজের মনেই বললেন: 'কি সুন্দর রাত্রি! বয় দ্য বুলন অবধি যেতে ভালই লাগবে।'

শুরু হোলো চলা। একদা প্রতিবেশী একটি মেয়ে যে গানটা গাইতো, আবছাভাবে তার কলিগুলি মনে পড়লো:

'গাছেরা সেজেছে সবুজ সাজে
প্রেয়সী আমারে ডেকে যায়,
নিঃশ্বাসে উষ্ণ হবো বলে
এসো প্রিয় নিকুঞ্জ ছায়ায়।'

গুন গুন করে গাইলেন অসংখ্যবার। গুটি গুটি এগিয়ে আসছে রাতের আঁধার, নিবাত উষ্ণ রাত্রি। মসিয়ো লেভা বয় দ্য বুলনের মোড় ধরে চলতে চলতে গাড়িগুলোর দিকে তাকালেন। জ্বলজ্বলে চোখের মতো আলো জ্বালিয়ে গাড়িগুলো চলেছে সার বেঁধে। আবছা আলোয় চোখে পড়লো আলিঙ্গনাবদ্ধ আরোহী। পুরুষের পরনে কালো পোশাক, আর নারীর স্বচ্ছ আবরণ।

আরামদায়ক রাত্রির তারাখচিত আকাশতলে যুগল প্রেমিকের সে এক সুদীর্ঘ মিছিল। একের পর এক আসছে, আর নীরবে সরে যাচ্ছে। অবিরল বয়ে চলেছে গাড়ির স্রোত। পরস্পরের বাহুবন্ধনের মধ্যে যেন কোন কল্পলোক রচনা করে পরবর্তী

* ফরাসী দেশের বিখ্যাত মদ।

আলিঙ্গনের জন্যে মহা উৎকণ্ঠার নীরব প্রতীক্ষায় মগ্ন। দ্রুত আর আকস্মিক চুম্বনের আবেশে উষ্ণরাত্রি কানায় কানায় পূর্ণ। তাদের প্রাণের উষ্ণতা বাতাসে সঞ্চারিত হওয়ায় বাতাস আরও তপ্ত। নরনারীর অনুরাগের ছোঁওয়া বাতাসের মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়ে প্রতিটি মানুষের মনে একই রং ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিরক্তিকর সুখের সূক্ষ্ম অনুভব ছিটিয়ে ছিটিয়ে চলেছে প্রেমের গাড়িগুলো।

পথশ্রান্ত লেভা ভালবাসার যানগুলোকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে পথের পাশে একটি বেঞ্চে এসে বসলেন। প্রায় তক্ষুণি তার পাশে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল এক মহিলা।

'হ্যালো, ডারলিং'—মহিলাব সম্বোধন। তিনি কোন উত্তর করলেন না। মেয়েটি বললো :

'আমাকে একটু আদব কবতে দাও, প্রিয়। দেখবে কত ভাল লাগবে।'

'আপনি ভুল করছেন, মাদাম।' তিনি জবাব দিলেন। তাঁর হাতের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মেয়েটি বলে উঠলো : 'এসো তো দেখি। অবাধ্য হয়ো না সোনা, শোনো ।'

মন শক্ত করে তিনি উঠে হাঁটতে শুরু কবলেন। একশ' গজ যেতে না যেতেই আর একটি মেয়ের পাল্লায়। 'একটিবার আমার পাশে এসে বোসো তো প্রিয়।' তিনি প্রশ্ন করলেন : 'আচ্ছা তোমরা এ ব্যাবসা কেন নিয়েছ ?'

মেয়েটি পথ আগলে দাঁড়িয়ে রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলো : 'আ মরণ, নিশ্চয় মজা লুটবার জন্যে নয়।'

তাঁর শান্ত জেরা : 'তবে কিসের জন্যে শুনি ?'

'হায় দুর্ভাগ্য ; বাঁচতে তো হবে।' ঠোঁট নেড়ে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে মেয়েটি সরে গেল।

মসিয়ো লেভা হতচকিত। পাশ দিয়ে যেতে যেতে আরও কয়েকজন মেয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। মনে হোলো মাথার

ওপর ভয়াল বোঝা ঝুলছে। আবার একটি বেঞ্চে বসলেন। তখনও গাড়ির স্রোতে ভাঁটা পড়েনি। ভাবলেন— না এলেই ভালো ছিল। এসে অবধি ঝিমিয়ে আছি।

ভালবাসার ভাবনায় ডুবে গেলেন। সামাজিক অথবা অবৈধ ভালবাসা, স্বাধীন অথবা মূল্যের বিনিময়ে পাওয়া চুম্বনের দৃশ্যগুলো ভেসে উঠলো চোখের সামনে। ভালবাসা! এ সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণাই নেই। কোন রকম বিলাসিতা করবার মতো সঙ্গতি কোন কালেই ছিল না। সারা জীবনে মাত্র দু-তিন জন মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তাও ভাগ্যক্রমে। তাঁর জীবনযাত্রা সমাজের আর দশজনের মতো নয় কোন দিনই। কেমন যেন শান্ত, বিষণ্ণ, একঘেয়ে শূন্যতায় ভরা।

এমন ভাগ্যহীন লোক কিছু কিছু থাকে। মনের মধ্যে যেন এক ভারী পর্দা উঠে গেল। তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে এখন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্পষ্ট ধরা দিয়েছে। সারা জীবন জুড়ে শুধু দুঃখ, শুধু অন্তহীন দুঃখের পারাবার। প্রথম দিনটির মতোই বিরক্তি নিয়ে আসবে শেষের দিনটি—সম্মুখে, পশ্চাতে, চতুর্দিকে, হৃদয় মধ্যে স্মরণীয় কিছুই নেই, সর্বত্রই ফাঁকা—মরুভূমি। এখনও গাড়ি আসছে। দরজার ফাঁকে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ দুটি আস্তর। মনে হোলো সুখের সুধা পান করে সমগ্র মানব সমাজ মাতাল হয়ে গেছে, আনন্দের সাগরে ভেসে চলেছে। সেই দিকে কাঙালের মতো তাকিয়ে আছেন তিনি। নিঃসঙ্গ—বড়ই নিঃসঙ্গ—নিতান্ত একা। আগামীকাল; পরশু, চিরকাল—চিরকাল তাকে একা থাকতে হবে। দুনিয়ায় এমন হতভাগ্য আর কে আছে?

উঠে পড়লেন। কিন্তু কিছুটা হেঁটেই যেন দীর্ঘ পথশ্রমের ক্লান্তি নেমে এলো সর্বাঙ্গে। আবার বসে পড়লেন।

আর অপেক্ষার প্রয়োজন কি? কোন আশা? কিছুই না। ভাবলেন বৃদ্ধ বয়সে রাত্রে ঘরে ফিরে কচি কাঁচ ছেলে মেয়ের কলকাকলি শুনতে না জানি কত সুখ! সন্তান সন্ততির স্নেহ

মস্কতার মধ্যে থেকে চুল পাকানো এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। ওদের ভালবাসা, ওদের আবোল তাবোল আবদার, যত সব আজগুবি মজার মজার কথায় হৃদয় তৃপ্ত হয়, দুঃখ দেয় ভুলিয়ে।

তাঁর নির্জন ছোট ঘরটির কথা মনে হতেই মনটা ভীষণ দমে গেল। ওই রিক্ত ঘরটিতে তিনি ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করেনি কখনও। এখন মনে হোলো, অফিস ঘরটির চেয়েও তাঁর বাসা-বাড়িটি বেশি লক্ষ্মীছাড়া।

এর ভেতরে কারও পায়ের ধুলো পড়েনি। কারও কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়নি। বদ্ধ কালা, মৃত একটি ঘর। ঘরের লোকজনদের অনেক কথা, চেহারা ও চালচলনের অনেক স্মৃতি চার দেওয়ালে ছাপ ফেলে যায়। বাড়ির চেহারা দেখলেই বলা যায় কোনটিতে সুখী পরিবারের বাস, আর কোনটা হতভাগার। তার জীবনের মতো তার ঘরটিও যেন ঘোলা জলের ডোবা, কোন স্মৃতির ছায়া পড়ে না। সেই ঘরেই একা ফিরতে হবে, প্রতিদিনের কাজগুলো করতে হবে, তারপর সেই অভিশপ্ত বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়া—ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর। সেই পুঞ্জীভূত হতাশার বদ্ধ কুঞ্জ আর তাতে ফেরার বিড়ম্বনা থেকে দূরে পালিয়ে যাবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠে পড়লেন। সহসা বয়-এর প্রথম পথটি ধরে এগিয়ে চললেন একটি ছোট ঝোপের দিকে—তৃণাসনে পা ছড়িয়ে বসবেন বলে।

আকাশ বাতাস জুড়ে যেন অবিশ্রাম হট্টগোল, নানা রকম শব্দের মিলিত বিরক্তিকর ঐকতানে তিনি বিভ্রান্ত। কাছে, দূরে জোরালো সুরে যেন প্যারিসেরই স্পন্দন ধ্বনি, যেন অতি বৃহৎ কোন প্রাণীর মর্মবিদারক নিঃশ্বাস।

সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়েছে। উজ্জ্বল আলোয় চরাচর উদ্ভাসিত। পথে গুটিকয়েক গাড়ির আনাগোনা। জনাকয়েক অশ্বারোহী খুশী মনে দুলকি চালে চলে।

এক তরুণ দম্পতি জনবিরল পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। ওপরে

গাছের ডালে ঝোপের আড়ালে চোখ পড়তেই মেয়েটি চমকে উঠলো। অস্বস্তিতে সে দিকে আঙুল দেখিয়ে সঙ্গীর উদ্দেশ্যে বলে উঠলো :

'দেখ—ওটা কি ?'

আর্তনাদ করেই সুন্দরী তার স্বামীর বাহুতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। লোকটি বাধ্য হয়ে তাকে শুইয়ে দিল মাটিতে।

খবর পেয়ে নগররক্ষী বাহিনী ছুটে এলো। গাছের ওপর থেকে নামিয়ে আনা হোলো একজন বৃদ্ধের মৃতদেহ। প্যান্টের গ্যালিশ দিয়ে তিনি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছেন।

আবিষ্কৃত হোলো দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গত সন্ধ্যায়। তার পকেট থেকে উদ্ধার করা কাগজ পত্র থেকে জানা গেল ভদ্রলোক মেসার্স লাবুজ এণ্ড কোম্পানীতে হিসেবরক্ষকের কাজ করতেন, নাম লেভা।

মৃত্যুর ব্যাখ্যা হোলো আত্মহত্যা, কারণ অজ্ঞাত। তবে কি সাময়িক মানসিক বৈকল্য ?

কারাগার কক্ষের সাজসজ্জাহীন দেওয়াল পরিষ্কার চুনকাম করা। লোহার শিক বসানো সরু একটি জানালা দিয়ে আলো এসে এই ছোট ঘরটিকে আলোকিত করেছে। জানালাটা এত উঁচুতে যে সহজে নাগাল পাওয়া যাবে না। একটা খড়ে বোনা চেয়ারে বসে উন্মাদ লোকটি স্থির দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে ছিল, ভাবলেশহীন আবিষ্ট সে দৃষ্টি।

লোকটি রোগা, গালের চামড়ায় অনেক ভাঁজ, মাথার চুল প্রায় সবই সাদা, বোঝা যায় যে কয়েক মাসের মধ্যেই পেকেছে। শীর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সঙ্কুচিত বুক এবং ফাঁপা শরীরের পক্ষে তার পোশাক খুবই ঢলঢলে দেখাচ্ছিল। পোকা যেমন করে ফল খেয়ে ঝাঁঝরা করে দেয়, মনে হয় ভাবনারাশি—একটি মাত্র ভাবনা তেমনি এই লোকটিকে কুরে কুরে খেয়েছে। তার পাগলামি, অবাধ্য হয়রান-করা সর্বগ্রাসী ভাবনা, তার মাথাতেই বাসা বেঁধেছে। ঐ ভাবনা তিল তিল করে তার শরীর খেয়ে ফেলছে। যাকে দেখা যায় না, ছোঁওয়া যায় না, ধরা যায় না—সেই অপার্থিব ভাবনা তার মাংস চিবিয়ে খেয়েছে, রক্ত পান করেছে এবং তার জীবন ধ্বংস করেছে।

কি অদ্ভুত রহস্য। একটি চিন্তার হাতে নাকি লোকটি খুন হতে বসেছিল! এই উন্মাদ লোকটি এখন লোকের ভয় ও করুণার পাত্র! এমন কোন্ আশ্চর্য, ভয়ঙ্কর, বীভৎস স্বপ্ন তার মাথায় ঠাঁই নিয়েছে, যাতে তার কপালে এমন গভীর এবং সদা পরিবর্তনশীল বলিরেখা আঁকা হতে পারে?

ডাক্তার বললেন: 'লোকটি অলৌকিক উন্মত্ততার তীব্র যন্ত্রনায় দগ্ধ হয়েছে, আমি এ যাবৎ যত পাগল দেখেছি তার মধ্যে এই লোকটি খুবই স্বতন্ত্র। ওর পাগলামি প্রণয় ঘটিত এবং কামনাজাত।

ও এক ধরনের প্রেতাত্মা। ও একখানা দিনলিপি লিখেছে, যাতে ওর মানসিক ব্যাধি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। বলতে গেলে, ওর পাগলামি চোখে দেখা যায়। যদি আপনার আগ্রহ থাকে, ঐ দলিলখানা পড়ে দেখতে পারেন।'

ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর অফিস ঘরে যেতেই তিনি এই হতভাগ্য লোকটির দিনলিপি আমার হাতে তুলে দিলেন।

'পড়ে দেখুন, তারপর এ সম্বন্ধে আপনার মতামত আমাকে জানাবেন।'—ডাক্তাব বললেন।

চটি বইখানায় যা ছিল তুলে দিলাম :

'বত্রিশ বছর বয়স অবধি আমি প্রেম না কবে শান্তিতে ছিলাম। জীবন ছিল আমার কাছে অতি সরল, সুন্দর এবং সহজ। আমি ধনী ছিলাম। কোন কোন বস্তুতে আমার রুচি থাকলেও কখনও কোন কিছু পাওয়ার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করিনি। বেঁচে থাকতে ভাল লাগত! আমাব ঘুম ভাঙত সুখেব আমেজে। সারাদিন যা ভাল লাগে করতাম, তারপব নিরুদ্‌বেগ আগামীকাল এবং নিশ্চিত ভবিষ্যতের আশা নিয়ে বাত্রে আবার শুতে যেতাম।

'আমাব কয়েকজন প্রেমিকাও ছিল, কিন্তু কামনায় কখনই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়নি বা সম্ভোগের পর ভালবাসায় আত্মা ভেঙে চুরমার হয়ে যায় নি। এভাবে জীবন কাটানো ভাল। ভালবাসা আরও ভাল, কিন্তু ভয়ঙ্কর। তবুও যারা ভালবাসে, সুখ পায় নিশ্চয়ই, কিন্তু সম্ভবত আমার মতো নয়—কাবণ আমার জীবনে ভালবাসা এসেছে অবিশ্বাস্য ভাবে।

'ধনী ছিলাম বলে আমি প্রাচীন বস্তুব নিদর্শন ও পুরাতন আসবাবপত্র সংগ্রহ করতাম। এসব জিনিসপত্র যেসব হাতের পরশ পেয়েছে, চোখেব প্রশংসা পেয়েছে, হৃদয়ের ভালবাসা পেয়েছে—পাবেই, কেননা এমন সব বস্তু লোকে ভাল না বেসেই পারে না; আমি সেই সব হাত, চোখ ও হৃদয়ের কথা ভাবতাম। বিগত শতাব্দীর একটি ছোট ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে

দিতাম। সোনার বুটি ও মীনা করা সূক্ষ্ম কারুকার্যে অপূর্ব সুন্দর। এমন একটি চমৎকার রত্ন নিজ অধিকারে পাওয়ার আনন্দে যেদিন কোন রমণী ঘড়িটি কিনেছিল, এটি সেদিনও যেমন চলত, আজও তেমনি চলে। এর স্পন্দন, এর যান্ত্রিক জীবন থেমে যায়নি, বরং শতাব্দী পেরিয়ে এসে এখনও নিয়মিত টিক্ টিক্ বেজে চলেছে। প্রথম কোন নারী এটিকে পোশাকের তলায় উষ্ণ বক্ষে চেপে নিয়ে এসেছিল? ঘড়িটির হৃদস্পন্দন কোন নারীর হৃদয়ের স্পন্দনে মিলে গিয়েছিল? উষ্ণ আঙুলের প্রান্তভাগ দিয়ে কোন হাত এটিকে নাড়াচাড়া করত? কোন আর্দ্র ত্বকের ঘষায় মীনা করা মেষপালকেরা সামান্য আবছা হয়ে গেছে? সময়, আদরের, স্বর্গীয় সময়ের দায় ঐ সুশোভিত ডায়ালের দিকে কোন সে নয়ন সতৃষ্ণ হয়ে চেয়ে থাকত?

'যে নারী এই বিরল এবং অনবদ্য বস্তুটিকে পছন্দ করেছিল, তাকে দেখার এবং জানার জন্য আমার কী প্রবল ইচ্ছাই না হয়েছিল! কিন্তু সে এখন মৃত! অতীত যুগের নারীকে পাবার বাসনা আমায় পেয়ে বসল, অতীতে যারা ভালবেসেছে, আমি তাদের ভালবাসি। অতীত প্রেমের কাহিনী শুনে আমার অন্তর অনুতাপে ভরে ওঠে। আহা! সৌন্দর্য, হাসি, যৌবনের আলিঙ্গন, আশা! এ সব বস্তু শাশ্বত হওয়া উচিত।

'কত সুন্দর, কত কোমল, কি মিষ্টি প্রাচীনা প্রণয়িনীরা, চুম্বনের কালে যাদের অধরোষ্ঠ উষ্ণ হিম হোতো, কিন্তু এখন যারা মৃত, তাদের কথা ভেবে আমি কত রাত কেঁদে কাটিয়েছি! চুম্বনের মৃত্যু নেই! অধর থেকে অধরে, শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে, যুগ থেকে যুগান্তরে তার ব্যাপ্তি! মানুষ একে পায়, দেয়, তারপর মরে যায়!

'অতীত আমার মন টানে, বর্তমানে ভয় হয়, কেননা ভবিষ্যৎ মানেই মৃত্যু। নশ্বর সব কিছুর জন্য আমার অনুতাপ হয়, জীবিতের জন্য আমি কাঁদি; আমি সময়ের গতি রোধ করতে চাই, সময়কে বন্দী করে রাখতে চাই। কিন্তু সময় চলে যায়, বয়ে চলেই যায়, এবং যাবার কালে আমাকেও নিয়ে যায়, ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ ধ্বংস

করবে বলে, পলে পলে তিল তিল করে আমাকে নেয়। পুনর্বার আর আমি বেঁচে উঠতে পারবো না।

'বিদায়! বিগত দিনের রূপসিগণ, আমি তোমাদেব ভালবাসি।

'তবু আমার অভিযোগ করার মতো কিছু নেই। যার প্রতীক্ষায় ছিলাম, তাকে পেয়েছি, তাকে পেয়ে আমি অভাবনীয় আনন্দের স্বাদ পেয়েছি।

'এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালে প্যারিসের পথ ধরে বেড়াচ্ছিলাম, আমার পায়ে ছিল খুশীব ছন্দ, মনে আনন্দ। ভবঘুবের ভাসা ভাসা আগ্রহ নিয়ে আমি দোকানগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ একটা পুবনো আসবারপত্রের দোকানে নজর পড়ল সতেরোশ শতকের একটি ইতালীয় বস্তু। ভারী সুন্দর এবং দুর্লভ এক বস্তু। আমি ধরে নিলাম, ওটি ভেনিসীয় শিল্পী ভাইতেলীব ( vitelli ) তৈরি, কেননা সে যুগে তিনি ছিলেন যুগান্তকারী শিল্পী। এরপর ওখান থেকে চলে এলাম।

'এই একটি আসবাব কেন আমায় এমন প্রবল শক্তিতে আকর্ষণ কবল, যার ফলে আমি চলে গিয়েও আবার ফিরে এলাম? আবার দেখব বলে আমি আবার সেই দোকানটির কাছে এসে দাঁড়ালাম, বুঝলাম ঐ বস্তুটি আমায় প্রলুব্ধ করেছে।

'প্রলোভনের কী অসাধারণ ক্ষমতা! আপনি একটি জিনিসের দিকে তাকালেন, অমনি বস্তুটি একটি রমণী মুখের মতো একটু একটু করে আপনাকে ভোলাবে, মনে নাড়া দেবে, আপনাকে বশ করবে। ঐ বস্তুর চমৎকারিত্ব, যা আকৃতি, গঠন এবং রঙের বাহারে গড়ে ওঠে—তা আপনার মনে গেঁথে যাবে। আর তখনই আপনি বস্তুটিকে ভালবেসে ফেলবেন, বস্তুটি আপনার কামনার অঙ্গীভূত হবে, আপনি ওটিকে পেতে চাইবেন। ভোগ দখলের বাসনা আপনাকে পেয়ে বসবে, প্রথমে মৃদু বলে সুখকর, কিন্তু ঐ বাসনা বাড়তে বাড়তে শেষে প্রচণ্ড এবং দুর্দম হয়ে উঠবে। এবং চোখের চাহনি দেখেই বিক্রেতারা আপনার এই ক্রমবর্ধমান বাসনার কথা টের পেয়ে যাবে। আমি ঐ

আসবাবটি কিনে দেরি না করে তখনই বাড়ি নিয়ে এলাম। আমার নিজের ঘরে রাখলাম।

'আহা! তুচ্ছ বস্তু সংগ্রহের এই সুমিষ্ট নেশা যারা বোঝে না— সেই সব বেচারাদের জন্য আমার দুঃখ হয়। সংগ্রহকারী ঐ বস্তুটিকে দৃষ্টি দিয়ে এবং গায়ে হাত বুলিয়ে এমন করে আদর করে, যেন ওটার দেহ আছে; সে বার বার ঐ বস্তুটির কাছে ফিরে আসে, যেখানেই যাক্, যে কাজই করুক, থেকে থেকে ওর কথা মনে পড়ে যায়— এবং বাইরে থেকে বাড়িতে পা দিয়েই প্রেমিকের ভালবাসা নিয়ে ছুটে যায় ওটিকে দেখতে, দস্তানা বা টুপি খোলারও তর সয়না।

'সত্যি সত্যি আমি পুরো আটদিন ঐ এক টুকরো আসবাবের প্রেমে মশগুল হয়ে থাকলাম। দরজার পাল্লা এবং দেরাজগুলো বারবার খুললাম আর বন্ধ করলাম; নাড়াচাড়া করে আনন্দে এবং ঘনিষ্ঠতার সুখে আবিষ্ট হয়ে থাকলাম।

'একদিন রাতে ওর একটা প্রকোষ্ঠ খুব পুরু দেখে ভাবলাম হয়ত ওখানে কোন চোরা কুঠুরি থাকতে পারে। আমার বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল, সেই গোপন রহস্য খুঁজে খুঁজে সারা রাত কাটল, কিন্তু খুঁজে পেলাম না।

'পরদিন একটা ধাতু যন্ত্র দিয়ে প্রকোষ্ঠের চিড় খাওয়া জায়গাটায় চাপ দিতেই একটা তাক খুলে পড়ল। দেখলাম, কালো ভেলভেটের আস্তরণের ওপর সাজানো রয়েছে নারীর মাথার অপূর্ব সুন্দর একগোছা চুল।

'হ্যাঁ, একগোছা চুল। সোনালী চুলের সুদীর্ঘ এক বিনুনী, চামড়া ঘেঁষে যেখানে কাটা হয়েছে, সেখানটা লাল, এবং সবগুলো একত্র করে একটি সোনালী ফিতে দিয়ে বাঁধা।

'আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলাম! এই রহস্যময় দেরাজ এবং অতি আশ্চর্য এই স্মৃতি চিহ্ন থেকে, অতি মৃদু, অতি প্রাচীন এমন এক গন্ধ আসছিল, যেন কোন সুগন্ধের নির্যাস।

'কোন পবিত্র বস্তু ধরার মতো করে অতি আলগোছে আমি ওটিকে বিশ্রাম স্থান থেকে তুলে নিলাম। মেঝেতে পড়ে যেতেই ঘন ও হালকা, নরম ও উজ্জ্বল বিনুনী পাক খুলে সোনালী ঢেউ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, যেন একটি ধূমকেতুর উজ্জ্বল পুচ্ছ।

'অদ্ভুত এক ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে গেলাম। এ চুল কার ছিল? কবেকার? কোন্ পরিবেশে? কেন এই আসবাবের মধ্যে একে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে? কোন সে রোমাঞ্চ, কি নাটক এই স্মারক চিহ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে? কে এটিকে কেটে আলাদা করেছিল? বিদায় দিনে কোন প্রেমিক কি? অথবা কোন স্বামী এ ভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে? অথবা হয়ত কোন হতাশ নারী নিজেই এমন কাজ করেছে? কবরে শায়িত হবার সময় সে কি এই প্রেমের ঐশ্বর্য জীবিতের পৃথিবীতে নিদর্শন হিসেবে রেখে গেছে? অথবা রূপসী তরুণী মৃতাকে সমাধিস্থ করার সময় তার প্রিয়তম তার মাথার এই শিরোভূষণ তুলে নিয়েছিল, কেননা প্রিয়তমার দেহের কেবলমাত্র এই অংশটুকুই সে বাঁচাতে পারবে, এটি তার শরীরের একমাত্র জীবিত অংশ যা লয় হবে না, গভীর দুঃখের মধ্যে এই একটি মাত্র বস্তুকেই সে ভালবাসতে পারবে, আলিঙ্গন করে চুমু খেতে পারবে।

'এটা কি অদ্ভুত নয়, যে দেহ নিয়ে সে জন্মেছিল, তার কণামাত্রও যেখানে অবশিষ্ট নেই, সেখানে এই কেশরাশি তেমনি রয়ে গেছে?

'এই কেশ আমার আঙুল জড়িয়ে ধরল, অসাধারণ আলিঙ্গনে আমার ত্বক স্পর্শ করল, সে আলিঙ্গন মৃতার। আমি বিচলিত হলাম, মনে হোলো যেন কান্না পাচ্ছে।

'বহুক্ষণ ওটা দু হাতে ধরে থাকলাম, তারপর মনে হোলো যেন আমার ওপর ওর কোন প্রভাব পড়ছে, যেন এখনও আত্মার মতো কোন কিছু ওতে রয়ে গেছে। ভেলভেট, সময়ের প্রভাবে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ভেলভেটের ওপর আমি ওকে রেখে দিয়ে দেরাজ ঠেলে দিলাম, চোর-কুঠুরির দরজা বন্ধ করে, স্বপ্ন দেখব বলে পথে বেরিয়ে পড়লাম।

'সোজা হাঁটতে লাগলাম, দুঃখে এবং যন্ত্রণায় অন্তর পরিপূর্ণ, প্রেমের চুম্বনের পর যে ধরনের যন্ত্রণা হয়, সেই যন্ত্রণা হৃদয়ে অনুভব করলাম। মনে হোলো আমি অতীত যুগে বাস করেছিলাম এবং রমণীকে চিনতাম।

'ফোঁপাতে ফোঁপাতে আমি ভিলো-র কবিতা আবৃত্তি করলাম :

'আমায় বলে দাও, কোন্ দূর লোকে আছে
রোমের দেবী, রূপের রাণী ফ্লোরা,
থায়াসের বোন হিপারসিয়া এবং প্রকৃতির
হাতে গড়া আরও যত রূপ ;
প্রতিধ্বনি জেগে ওঠো, শুধাও তুমি
নদীকে, হ্রদকে, ঝরনাকে—
কোথায় গেল সুন্দরের আনন্দ বেদনা ?
কোথায় বিলীন হোলো অতীত সুবাস ?
পদ্মের পাপড়ির মত অপরূপা ব্লাঁস,
ললিত মধুর কণ্ঠে যে গাইত গান,
কোথায় বার্থা বড়পুট, বিয়াত্রিচে, এলিস,
লা-মেঁন প্রিয় রানী এর মেঁগার্দ
লোরেনের সরল মেয়ে জোয়ান,
ইংরেজের দেওয়া মৃত্যু হোলো যার যশের মুকুট,
সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ কোথায় তোমরা,
কোথায় বিলীন হোলো অতীত সুবাস ?

'বাড়ি ফিরে আসতেই আমার আশ্চর্য সম্পদ আবার দেখবার জন্য অদ্ভুত এক ইচ্ছা হোলো। দেরাজ থেকে বার করে হাতে নিয়ে স্পর্শ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা শরীরে বিদ্যুৎ শিহরণ অনুভব করলাম।

'কয়েকদিন কাটল স্বাভাবিক ভাবে, যদিও ঐ কেশরাশির ভাবনা সারাক্ষণই লেগে রইল। যখনই বাড়ি ফিরে আসতাম, প্রথমেই ইচ্ছে হোতো ওকে হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখি। প্রেমিকার

বাড়ির দরজা খোলার সময় যেমন হাত কাঁপে, গোপন দেরাজের দরজা খোলার সময় আমার ঠিক তেমনি হত, কেননা মৃত কুন্তলের ঝরনা ধারায় আঙুল ডুবিয়ে দেবার জন্য আমার ছুটি হাতে এবং হৃদয়ে লাজুক, অপূর্ব, বিরামহীন এক ইন্দ্রিয়ানুভূতি অনুভব করতাম।

'তারপর আদর শেষ করে যখন ওকে আবার ওর বিরাম কক্ষে রেখে দিতাম, সব সময়ই মনে হোতো ওটার যেন প্রাণ আছে, ও যেন গোপন কুঠুরিতে বন্দিনী; অনুভব করতাম, ওকে আমি অবিরাম কামনা করি, ওর স্পর্শ সুখ উপভোগ করার জরুরী তাগিদ বোধ করি; শ্রান্তিতে তুর্বল না হওয়া পর্যন্ত ঐ শীতল, উজ্জ্বল যন্ত্রণাদায়ক, উত্তেজক রমণীয় কেশগুচ্ছের সঙ্গ লাভ করি।

'এই মোহাচ্ছন্ন অভিভূত অবস্থা একমাস, তু'মাস অথবা কতদিন ছিল আমি জানি না। আলিঙ্গনের প্রতিশ্রুতি পেলে প্রেমিক যেমন সুখ ও বেদনা অনুভব করে, আমিও তেমনি সুখ এবং যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছিলাম।

'নিরালায় আমার দেহত্বকে যাতে ওর ছোঁওয়া পাই, আমার ঠোঁট ডুবিয়ে যাতে ওকে চুমু খেতে পারি, কামড়ে কামড়ে যাতে ওকে মেরে ফেলতে পারি, তার জন্যে একা ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকতাম। ঐ কেশভার মুখের ওপর বোলাতাম, মুখ ডুবিয়ে সুধা পান করতাম, সোনালী তরঙ্গমালায় আঁখি ডুবিয়ে দিতাম, শেষকালে ঐ কেশরাশির আড়ালে সোনালী প্রাণ দেখতে পেতাম।

'আমি ওকে ভালবেসেছিলাম! হ্যাঁ, ওকে আমি ভালবেসেছিলাম। ওকে ছেড়ে থাকতে পারতাম না, ওকে না দেখে এক ঘণ্টাও থাকতে পারতাম না। আমি প্রত্যাশায় ছিলাম—প্রত্যাশায় ছিলাম—কিন্তু কার? আমি জানি না—তার!

'একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে মনে হোলো, ঘরে আমি আর একা নই। যদিও আমি একাই ছিলাম। কিন্তু চোখে আর ঘুম এল না; অনিদ্রা জ্বরে চঞ্চল হয়ে আমি উঠে কেশগুচ্ছ দেখতে গেলাম। ওকে আগের চেয়ে আরও সুন্দর, আরও সজীব মনে হোলো।

'মৃত কি ফিরে আসে? অজস্র চুমু খেয়ে যেভাবে ওকে আদর করতাম, তাতে মন ভরল না, তাই ওকে আমার বিছানায় নিয়ে এসে পাশে শুইয়ে দিলাম, কোন লোক যেমন সম্ভোগের আশায় তার প্রেমিকাকে অধরোষ্ঠে চেপে ধরে, তেমনি প্রবল উত্তেজনায় আমি ওকে আমার ঠোঁটের ওপর চেপে ধরলাম।

"মৃত ফিরে এল! সে এল! আমি ওকে দেখলাম, স্পর্শ করলাম, আগে বেঁচে থাকতে যেমন ছিল, তেমনি দীর্ঘাঙ্গী, মাথায় সোনালী কেশভার, সুপুষ্ট সুডৌল গড়ন, অনুদ্ধত যুগল স্তন, এবং বীণা সদৃশ নিতম্ব প্রদেশ, আমি ওকে জীবন্ত পেলাম।

'হ্যাঁ, ওকে পেলাম, প্রতি দিনে, প্রতি রাতে। সে ফিরে এসেছে, মৃত্যু, অপরূপ মৃত্যু, শ্রদ্ধেয়, রহস্যময়, অজানা মৃত্যু প্রতি রাত্রে ফিরে আসত।

'সুখের বন্যায় আমার হৃদয় উথলে উঠল, তার কাছে খুঁজে পেলাম অলৌকিক আনন্দ এবং অনধিগম্য, অদৃশ্য মৃত্যুকে অধিকার করে, আমি জানলাম নিগূঢ় অনির্বচনীয় আনন্দের স্বরূপ। আমার চেয়ে অধিক তীব্র অথবা ভয়ঙ্কর আনন্দের স্বাদ আর কোন প্রেমিক কোন কালে পায়নি।

'জানতাম না, কেমন করে আমার আনন্দ চেপে রাখব। মুহূর্তের জন্যও এমন অমূল্য সম্পদ কাছ ছাড়া করতে চাইতাম না। সব সময়, সবখানে ওকে সঙ্গে করে বেড়াতাম, যেন ও আমার স্ত্রী; থিয়েটারে, রেস্তরাঁয় নিয়ে যেতাম, যেন ও আমার প্রেমিকা। কিন্তু ওরা দেখে ফেলল,—এবং অনুমানে ধরে নিল—একটা দণ্ডার্হ অপরাধীর মতো ওরা আমাকে পাকড়াও করে জেলখানায় পুরে দিল। ওরা আমার কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে নিয়েছে—ওঃ! হায় হতভাগ্য!—'

এখানেই পাণ্ডুলিপি শেষ হয়েছে। আমি সবে চোখ তুলে বিস্মিত দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকিয়েছি, একটা ভয়াল চিৎকার, ক্রোধ এবং অদম্য বাসনার এক তীব্র গর্জনে পাগলা গারদ ফেটে পড়ল।

'ঐ শুনুন,'—ডাক্তার বললেন, 'দিনে অন্তত পাঁচ বার ঐ নোংরা

উন্মাদটাকে জল দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। এ সেই সার্জেন্ট বারট্রাণ্ড—যে মৃত আত্মার প্রেমে পড়েছে।'

আমি বিস্ময়ে, ভয়ে এবং সমবেদনায় অভিভূত হয়ে আমতা আমতা করে বললাম: 'কিন্তু ঐ চুল—সত্যিই কি ওর অস্তিত্ব আছে?'

ডাক্তার উঠে গিয়ে একটা আলমারি খুললেন, যার ভেতরটা শিশি বোতল আর যন্ত্রপাতিতে ঠাসা, তার কাজের টেবিলের ওপর দিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন সোনালী চুলের একটি লম্বা, মোটা বিনুনী—সোনার একটি পাখির মতো সেটা আমার দিকে উড়ে এল।

আমার হাতে ঐ বিনুনীর আদরের আলতো ছোঁওয়া পেয়ে ভাবাবেগে আমি শিউরে উঠলাম। সেখানেই আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম, হতাশায় ও বাসনায় আমার বুক ঢুব ঢুব করে উঠল, অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার জন্যে হতাশা এবং কলঙ্কজনক ও রহস্যময় কোন কিছু পাওয়ার জন্য বাসনা।

ডাক্তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে মন্তব্য করলেন:

'মানুষের মনের পক্ষে সব কিছুই ধারণা করা সম্ভব

# গী দ্য মপাসাঁ

জন্ম ১৮৫০ খ্রীঃ * মৃত্যু ১৮৯৩ খ্রীঃ

প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালায় বসন্তই ঋতুরাজ। যদিও বনভূমিতে স্বল্পকাল তার অবস্থিতি তবুও মনোভূমিতে সে নিত্য নবীন। যৌবনের জয়ধ্বজা তার রথশীর্ষে উড্ডীন।

মাত্র তেরটি বছরের স্বল্প সীমায় মপাসাঁ যে সৃষ্টির কুসুম ফুটিয়েছিলেন তাতে সাহিত্যের দরবারে তিনি পেয়েছিলেন ঋতুপতির আসন। তাঁর কাব্যগুচ্ছ ছাড়া তিনি এই স্বল্পকালের সাহিত্য সাধনায় রচনা করেছিলেন ছ'খানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, তিনখানি ভ্রমণ-চিত্র, চারখানি নাটক ও তিন শতাধিক বিচিত্র ও বিভিন্ন রসসিক্ত গল্প। এমন সূক্ষ্ম রস-সন্ধান, এমন বাস্তব সচেতনতা ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য সাহিত্যের জগতে সত্যিই বিরল। এত অল্পকালের সাহিত্য সাধনায় এমন অফুরন্ত সৃষ্টি মপাসাঁর দ্বারা কি করে সম্ভব হোলো তা জানতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের দিকে।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে নরম্যাণ্ডিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে মপাসাঁ ধীরে ধীরে শেষ করলেন শৈশব-শিক্ষা। পরে বাধ্যতামূলকভাবে তাঁকে কাজ নিতে হল সৈন্য বিভাগে। সেখান থেকে ফিরে এলেন তিনি সরকারী নৌ-দপ্তর আর জনশিক্ষা বিভাগে। এইভাবে সঞ্চিত হোলো তাঁর দশটি বছরের অভিজ্ঞতা। এরপর সরকারী কলম ছেড়ে হাতে তুলে নিলেন সাহিত্যের কলম। এই সময় তাঁর সুপ্ত চিন্তাধারাকে জাগিয়ে তুললেন তাঁর বিজ্ঞ বন্ধু ফ্লবেয়র ( Flaubert )।

এবার মপাসাঁ তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলেন জীবনের বিচিত্র লীলা। শিল্পী থেকে সৈনিক, সরকারী চাকুরে থেকে সাংবাদিক, বনেদী থেকে বারবণিতা সকলকেই তিনি দেখলেন গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে। এই জীবন-দর্শনই তাঁর হাতে এনে দিল সাহিত্যের সোনার ফসল। মপাসাঁর উপন্যাসের একটি জায়গায় লেখা আছে, 'জীবন যেমন নয় অফুরন্ত আনন্দের তেমনি নয় নিদারুণ দুঃখের। সুখ-দুঃখের মিশ্রিত ফসলই এ জীবন।' মপাসাঁর জীবন যেন ঐ উক্তিরই সার্থক প্রতিধ্বনি।

এরপর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মপাসাঁর জীবনে ছেদ চিহ্ন পড়ল অত্যন্ত বেদনাময় রোগভোগ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। বিশ্ব-বন্দিত এই লেখকের জীবন ও সাধনার দিকে তাকালে মনে হয় তিনি যেন তাঁর নিজেরই সৃষ্ট কোন গ্রন্থের অনন্য এক চরিত্র।

## অরুণ চক্রবর্ত্তী

জন্ম ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ

পিতা ৺হরেন্দ্ররঞ্জন চক্রবর্তী কাজ করতেন ভারতীয় রেলপথ বিভাগে। তাই নানাস্থানে পিতার সঙ্গে সঙ্গে লেখকও বাল্যকালে পরিভ্রমণ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এইভাবে তিনি লাভ করেছেন তাঁর সৌন্দর্য-দৃষ্টি।

## গীতা গুহ রায়

জন্ম ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ

শৈশবে পিতামাতাকে হারিয়ে প্রথম মাতুলালয়ে ও পরে জ্যেষ্ঠতাতের স্নেহ যত্নে মানুষ হন লেখিকা।

অল্প বয়সে বিবাহের পর তিনি সংসার জীবনে প্রবেশ করেন। কিন্তু সংগ্রামই যাঁর জীবন-ধর্ম তিনি সহসা সংসারের সীমিত সীমায় থেমে যাবেনই বা কি করে! তাই অধ্যয়নের মধ্যে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন এবং ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'টি পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন।

বর্তমানে আসামের বিলাসীপাড়া কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান পদ অলংকৃত করে আছেন।

সাহিত্যের ছাত্রী ছিলেন শ্রীযুক্তা গুহ রায়, তাই সাহিত্যকর্মের ভেতর নিজের প্রতিভাকে রূপ দেবার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন।

MAUPASSAR SERA PREMER GALPA • Rs. 30.00



## আমাদের প্রকাশনার পূর্ণ তালিকা

**গল্প-সংগ্রহ**

মপাসাঁ/গীতা গুহ রায়
ও অরুণ চক্রবর্তী
মপাসাঁর সেরা
প্রেমের গল্প ৩০·০০
সমারসেট মম্/বাণী বসু
মমের সেরা প্রেমের গল্প ২৪·০০
তারাপদ রাহা পরিবেশিত
আরব্য রজনী : প্রথম পর্ব ৩০·০০
আরব্য রজনী : দ্বিতীয় পর্ব ৩০·০০
আরব্য রজনী : ২য়, ৩য়
এবং ১০ম থেকে ১৬শ খণ্ড।
প্রতি খণ্ড ৮·০০
সোমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
স্থ ভিন্সির দেশে ও
আরও কিছু ১০·০০
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
বরবর্ণিনী ৩·০০

**উপন্যাস**

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপসী বিহঙ্গিনী ৫·০০
বিমলজ্যোতি দাস
মঞ্জরী ও মধুকর ৫·০০
অমিয়া চক্রবর্তী
প্রেমের রং ময়ূরকণ্ঠী ৫·০০
সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
উত্তর মেলেনি ৩·৫০

**উপন্যাস**

রমাদাস হালদার
ছন্দপতন ৪·০০
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
আজও তারা ডাকে ৩·৫০
এখানে মৃত্যুর হাওয়া ৪·০০
এখানে মৃত্যুর হাওয়া
( পেপারব্যাক ) ১·৫০
মৃত্যুঞ্জয় মাইতি
নতুন জনপদ ৬·০০
সুধাংশু ঘোষ
ফানুসের উপমা ৩·০০
অজিতকৃষ্ণ বসু
শেষ বসন্ত (পেপারব্যাক) ১·৫০
দেবব্রত রেজ
স্বপ্নলোকের চাবি ৩·৫০
জ্যোতির্ময়ী দেবী
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা ৪·৫০
বনশ্রী রায়
ধান শুধু ধান ৪·০০
শিপ্রা দত্ত
আলোছায়ার অন্তরালে ৬·০০
কাওআবাতা/সন্দীপকুমার ঠাকুর
তুষারগ্রাম ৬·০০
নাবোকভ/দেবব্রত রেজ
প্রজাপতি জীবন ৬·০০

কবিতা-সঙ্কলন

এজরা পাউণ্ড/সুশীলকুমার দাশগুপ্ত
মুখবন্ধ : কে. সি. লাহিড়ী
এজরা পাউণ্ডের নির্বাচিত
কবিতা ( মূল রচনা সহ ) ৩০'০০

সন্দীপকুমার ঠাকুর, শ্রীমতী
এইকো ঠাকুর ও সুশান্তকুমার
বসু অনূদিত
জাপানী কবিতাগুচ্ছ
কোটি পাতার ছন্দ ১৫'০০

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়
অনূদিত জাপানী কবিতাগুচ্ছ
একটি ধানের শীষের উপরে ২'৫০

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়
অঙ্গুষ্ঠ ২'০০

কাব্য-নাটিকা

চিত্তরঞ্জন মাইতি
বসন্ত-বিলাপ ৪'০০

নাটক

গোপীনাথ নন্দী
উমাবনম্ ( একত্রে চারখানি
নাটিকা ) ১০'০০

বের্টোল্ট্ ব্রেশট্/অজিত
গঙ্গোপাধ্যায়
মালবাজারের মা-মালতী ১৫ ০০

রম্য-রচনা

প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়
[ প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি :
কলকাতা হাইকোর্ট ]
রাস্তা ৮'০০

অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা

ডঃ অশোক মিত্র
[ অর্থমন্ত্রী : পশ্চিমবঙ্গ স কার ]
সমাজসংস্থা আশানিরাশা ১২'০০

সাহিত্য-সমালোচনা

ডঃ ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়
শরৎ-সাহিত্যের স্বরূপ ১৮ ০০

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও
সাহিত্য ১০'০০

প্রবন্ধ

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
বাঙালী ৭'৫০

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত
স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক ৬'০০

শচীন্দ্র মজুমদার
বিবাহ-সাধনা ৩'৫০

চরিত্র-চিত্রণ

বানভট্ট/প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
হর্ষচরিত ২২'০০

দণ্ডী/প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
দশকুমার চরিত ১৬'০০

নির্মলরঞ্জন মিত্র
সেরা মানুষ দাদাঠাকুর ১৮'০০

নিখিল সেন
নবপত্র : সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়
ইন্দিরা দূরদর্শিনী ২২'০০

অপরাধতত্ত্ব

ডঃ সুকুমার বসু
মুখবন্ধ : প্রশান্তবিহারী
মুখোপাধ্যায় [ প্রাক্তন
প্রধান বিচরপতি : কলকাতা
হাইকোর্ট ]
অপরাধ ও অপরাধী ১২'০০

**ধর্মতত্ত্ব**

কালীপদ সরকার
মুখবন্ধ : শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী
কৃষ্ণকথা চিরন্তনী ১২·০০

ডঃ সুকুমার বসু ও
সুহৃদগোপাল দত্ত
মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ ১২·০০

**ভক্তিগীতি**

কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়
মায়ের গান ৩·০০

**জীবনী-স্মৃতিকথা**

কালীপদ সরকার
ইতিহাস-পুরুষ নেতাজী ২০·০০

বিমানেশ চট্টোপাধ্যায়
কালো চশমার আড়ালে :
রাজাজীর সঙ্গে হাজার দিন ৬·৭৫

মহাদেবী বর্মা/মলিনা রায়
ছায়ামগ্ন অতীত ৪·০০

মেজো, হেস/দীপক চৌধুরী
প্রেসিডেন্ট নিক্সন ৩·৫০